[illegible]

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বিজ্ঞান ও দর্শন

ইতিহাস দর্শন

ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা

বি-কেলাস [কারা উপন্যাস]



রেঙ্গুন

ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু

পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি.





রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা

১৩৭০



প্রথম সংস্করণ : এক হাজার
আশ্বিন ১৩৭০ । সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক : পূর্ণনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

দাম : দশ টাকা

ভূমিকা

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে লেখক রাজনৈতিক চাঞ্চল্য থেকে সরে এসে নৈরাজ্যবাদের পঠন-পাঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ষোল বৎসর বয়সে তিনি বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতালাভই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। উত্তরকালে তিনি অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, তবু রাজনীতিই ছিল তাঁর প্রধান নেশা। দেশ স্বাধীন হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত তাঁর এই নেশা ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের চিত্র দেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁর বিশ্বাস ক্রমশ শিথিল হচ্ছিল। ভারতের মত দরিদ্র দেশে নির্বাচনের হাতিয়ার এখন দুটি জিনিস—অর্থ এবং জাল ভোট। এই দুটি হাতিয়ার না থাকলে শুধুমাত্র চরিত্রের সততা এবং আদর্শনিষ্ঠার জোরে কেউ আজ নির্বাচনে জয়ী হবার আশা রাখেন না। রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশ্য যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করা। তাছাড়া অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত। কয়েকটি রাষ্ট্রে সামরিক অভ্যুত্থান তার সাক্ষ্য বহন করছে। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজবাদের আদর্শ যুক্ত হলেও যে সমস্যার সমাধান হবে, মনে হয় না কারণ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে সরকারী কুলীন দল সৃষ্টি হচ্ছে যারা আবার এক নতুন ধরণের স্বৈরতন্ত্র খাড়া করছে। সমস্ত দেখেশুনে মনে হয় যেখানে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা থাকে সেখানে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয়। বস্তুত কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থার পরিণাম দেখে লেখক নৈরাজ্যবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে থেকে সুরু করে গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই নিরাজ সমাজের কল্পনা করেছেন। নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে অনেকে আবার শান্তির দূত। তথাপি নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে নৈরাজ্যবাদীরা হিংসা ও বলপ্রয়োগের পথে চলে এবং এদের নিরাজ সমাজ অরাজ ও উচ্ছৃঙ্খল সমাজেরই নামান্তর। লেখক নৈরাজ্যবাদের এই বৈপ্লবিক দিকটা দেখিয়েছেন এবং পাশাপাশি দেখিয়েছেন সমাজে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যা টলস্টয়, গান্ধী, অরবিন্দ প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তায় প্রকাশ পেয়েছে। বস্তুত বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাজ্যবাদের

(Spiritual Anarchism) শ্রেষ্ঠতাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এবং এই ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে রয়েছে।

নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বিভিন্ন নৈরাজ্যবাদী দার্শনিকের চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন পুস্তক রচিত হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ভাবনা সঙ্কলিত করে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের এখনও অভাব রয়েছে। লেখক এই অভাব পূরণ করতে চেয়েছিলেন এবং স্থির করেছিলেন সর্বশেষে তিনি ভাবী সমাজ গঠনের তাঁর এক নিজস্ব পরিকল্পনা দেবেন যাতে গণতন্ত্র ও সমাজবাদের এক বাস্তব সমন্বয়সাধন হয়ত বা সম্ভব। অর্থাৎ বইখানি শুধুমাত্র নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে পর্যবসিত না হয়ে হবে একটি নতুন সমাজ-দর্শন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্তার পূর্ণ পরিণতি আত্মপ্রকাশ করবে এই গ্রন্থে। কিন্তু তিনি এই শেষের কাজটুকু অসমাপ্ত রেখে গেছেন। তা হলেও নৈরাজ্যবাদের ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের বিস্তার এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। এতে নৈরাজ্যবাদকে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, প্রজ্ঞানযুগ, বিপ্লবযুগ এই চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং সর্বশেষে নৈরাজ্যবাদের সমালোচনা দিয়ে উপসংহার টানা হয়েছে। লেখাটি লেখক চতুরঙ্গ নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় যেভাবে শেষ করেছিলেন এখন ঠিক সেইভাবে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হল।

লেখকের মূল পরিকল্পনা অনুসারে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। তবু এই গ্রন্থ পাঠ করে কেউ যদি উপকৃত হন তবে তাঁর অন্তিম সঙ্কল্প কিছুটা সফল হল বলে জানব। বইখানি ছাপা ও প্রকাশের ভার নিয়ে রূপা এণ্ড কোম্পানী আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

নারায়ণী বসু

সূচীপত্র

প্রাচীন যুগ

সভ্য জীবনের যাত্রাপথে কোথায় কেমন করে রাষ্ট্রশাসন, ধর্মব্যবস্থা ও ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জীবনে যে নানাবিধ বন্ধন আরোপ করেছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় প্রাচীন দার্শনিক ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সভ্যজীবনের বিধিনিষেধ ও ভেদবৈষম্যে ক্লিষ্ট ভাবুক মন কল্পনা করেছে এক প্রাগৈতিহাসিক স্বর্ণযুগের—যে যুগে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন স্বচ্ছন্দভাবে বাস করত, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় শাসন এবং আর্থিক অসাম্য তাকে পীড়ন করে নি। চীন, ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার ভাবনায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল—সেখান থেকে এর বিস্তার হয় গ্রীস ও রোমে তারপর ক্রমশ সারা ইয়োরোপে। পিছনে ফেলে আসা এই সত্যযুগ হল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উচ্চারিত হল নিরাজ সমাজের বাণী—সভ্য সমাজের বন্ধন ও বেদনা কাটিয়ে ফিরে আসতে হবে আদিম জীবনের মুক্ত আনন্দে, আর এই প্রত্যাবর্তনের পথে বিলুপ্ত হবে রাষ্ট্র, ধর্মবিধান, ব্যক্তিস্বত্ব আর এদের আনুষঙ্গিক যা-কিছু অনুষ্ঠান, আইনকানুন, আচার-বিচার ও শাস্ত্রশাসন।

১। চীনঃ 'তাও'-এর পথ

সকল প্রকার বিধিবন্ধনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দার্শনিক প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল আড়াই হাজার বছর আগে চীনের 'তাও' মতবাদে।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের বিচারে প্রাচ্য মনীষীদের কোন রাষ্ট্রদর্শন ছিল না, কারণ তাঁদের ধ্যানধারণায় রাষ্ট্রের স্থান ছিল গৌণ। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপর, জীবনের বাহ্য উপকরণের চেয়ে আন্তরিক সম্পদের উপর তাঁরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাচী অন্তরমুখী, প্রতীচী বহির্মুখী, সুতরাং বহির্জীবনের নিয়ন্তা যে রাষ্ট্র তা প্রাচ্য সাধনার লক্ষ্য ছিল না। তা বলে একথা সত্য নয় যে প্রাচ্য মনীষায় রাষ্ট্রচিন্তা স্থান পায় নি। এঁরা স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাষ্ট্রের বিচার করেছেন আর রায় দিয়েছেন যে, এ মানুষের বুদ্ধি দিয়ে গড়া একটি যন্ত্রবিশেষ—যা দ্বারা তার নিজেরই স্বাধীন বিকাশ খর্ব হচ্ছে। লাওৎসে ও

ম্যাকিয়াভেলি উভয়ে এ বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের কাজকারবার স্বাভাবিক ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয় না। লাওৎসের মতে এটা দোষণীয় সুতরাং তিনি রাষ্ট্রের অবসান কামনা করেছেন। ম্যাকিয়াভেলির মতে এটা সমর্থনীয়, রাষ্ট্রকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। পাশ্চাত্ত্য মতে লাওৎসের রাষ্ট্রবিচার দর্শনের পর্যায়ে পড়ে না কারণ তাঁর সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের বিলোপ। আর ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্র-দার্শনিক, কারণ তিনি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী। রাষ্ট্রের মূল্য স্বীকার করলেই তবে সে চিন্তা রাষ্ট্রদর্শনের মর্যাদা পাবে এই ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

বস্তুত লাওৎসের ভাবনা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। রাষ্ট্র তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যও নয়। চীনের অধিবাসীরা স্বভাবত যে কোন প্রকার সরকারী শাসনের বিরোধী। অতি পুরাকাল থেকে সে দেশের গ্রাম অঞ্চলে এক স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রাম-বৃদ্ধদের পরিচালনায়, সামাজিক বিধিব্যবস্থার অনুশাসনে সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হত। কনফুসিয়াসের শিষ্য রাষ্ট্রবাদীরাও স্বীকার করেছেন যে যে-লোক রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সে শুচিতা বজায় রাখতে পারে না। মেন্‌সিয়াস স্বীকার করেছেন যে রাজত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের দুর্বলতা—তিনটি কাজে উঁচুদরের লোকেরা আনন্দ পায়—একটা রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া এ তিনের মধ্যে পড়ে না (৭/৫০/২০)।

আর সকল বিষয়েই লাওৎসে ও কনফুসিয়াসের মত বিপরীত। কনফুসিয়াস ছিলেন কনিষ্ঠ। দুজনেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের লোক। তখন চীনের বুকে রাজ্যে রাজ্যে লড়াই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, জীবন ছিল অশান্তিতে ভরপুর, চিন্তাভাবনাও ছিল উচ্ছৃঙ্খল। এই স্বেচ্ছাচার থেকে কনফুসিয়াস নিষ্কৃতি খুঁজলেন সামাজিক নীতি-বন্ধন ও ভদ্র আচরণে, আর লাওৎসে দেখালেন 'তাও'এর পথ—সকল রকমের নীতি ও আইনের বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির সহজ জীবনে ফিরে যাবার রাস্তা।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীনের চু রাজ্যে লাওৎসের জন্ম হয়। ইরানের জরথুস্ত্র, ভারতের মহাবীর ও বুদ্ধ এবং চীনের লাওৎসে ও কনফুসিয়াস —এশিয়ার এই কয়জন চিন্তানায়ক ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। লাওৎসে অর্থ 'বুড়ো দার্শনিক'। কথিত আছে যে তিনি মাথাভর্তি শাদা চুল ও ভারিক্কি চেহারা নিয়ে জন্মেছিলেন—তা থেকে তাঁর এই নামকরণ হয়। তাঁকে ঘিরে বহু উপকথার সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরকালের জনসাধারণ ও রাজরাজড়ারা তাঁকে

দেবতার সম্মান দিয়েছে। কিন্তু চীন তাঁর পথ গ্রহণ করেনি। সে কনফুসিয়াসের রাস্তাই বেছে নিয়েছে।

কর্মজীবনে লাওৎসে ছিলেন চাউ রাজ্যের মহাফেজখানার জিম্মাদার। অবসর নেবার পর তিনি দর্শনচর্চায় মন দেন। তাঁর চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে একাশিটি ছোট কবিতার একটি গুচ্ছে—এর নাম 'তাও তে চিং' বা 'পথের ঠিকানা'। এর বাণী অতি সহজ। মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যা আমরা সমাজের ও নীতির শাসন দিয়ে নষ্ট করেছি। ক্ষমতার লোভ, বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার, সভ্যতার আদবকায়দা ইত্যাদি এসে সহজ জীবনের মুক্তি, সৌন্দর্য ও আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। মানুষকে সেই আদিম মুক্ত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে ঃ

"কিছু করতে গেলেই ভণ্ডুল হবে ;
আঁকড়ে ধরলেই ফস্‌কে যাবে।
জ্ঞানী কিছু করে না, তাই তার হাতে কিছু ভণ্ডুল হয় না,
সে কিছু আঁকড়ে ধরে না, তাই কিছু ফস্‌কায় না।" ৬৪[১]

তা বলে তাওবাদী সমাজের বাইরে গজদন্ত মিনারের চূড়ায় বাস করে না। সমাজে বাস করা স্বাভাবিক জৈব ধর্ম, তাও-এর পথও তাই। জ্ঞানী সমাজে বাস করে কিন্তু নিজেকে জাহির করে না, 'সাধারণ জনের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়', 'মাটিতে পা না দিয়ে হেঁটে যায়।' কিছু না করে কিছু না বলে সে তার প্রভাব ছড়ায়। আপন নির্বিকার সত্তায় অবস্থান করে সে হয় অপরের অনুকরণীয়—তার মত প্রচারের অপেক্ষা রাখে না, প্রতিষ্ঠা কর্মের ওপর নির্ভর করে না।

"যে অন্যকে জানে সে বিদ্বান ;
যে নিজেকে জানে সে জ্ঞানী।
যে অন্যকে জয় করে সে বলবান ;
যে নিজেকে জয় করে সে শক্তিমান।" ৩৩

১ প্রবন্ধের যাবতীয় উদ্ধৃতি লিন্-উ-টাং-"উইস্‌ডম্ অফ্ চায়না"য় লাওৎসে ও চুয়াংৎসের যে অনুবাদ করেছেন তা থেকে নেওয়া। যেখানে অন্য গ্রন্থের অনুবাদের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, সেখানে পাদটীকায় তার উল্লেখ আছে।

২ চুয়াংৎসের উক্তি—"এই মানব জগৎ" ; লিন-উ-টাং, ৮৭ পৃষ্ঠা।

যে জ্ঞানী ও শক্তিমান তার প্রচারের প্রয়োজন নেই, জোর জবরদস্তির দরকার নেই। জ্ঞানীর পথ জীবের অন্তরের পথ। কৃত্রিম বন্ধন হতে মুক্তিকামী মানুষ প্রকৃতির সহজ পথ খুঁজবে। তাওবাদী তাঁর স্বাভাবিক পথিকৃৎ।

"সে নিজেকে প্রকাশ করে না,
তাই সে ভাস্বর।
সে নিজেকে সমর্থন করে না,
তাই তার যশ দূরপ্রসারী।
তার অহঙ্কার নেই,
তাই সকলে তার গুণগ্রাহী।
তার দম্ভ নেই,
তাই সকলের মাথা তার কাছে অবনত।" ২২

আকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব নিজের জন্য নয়, তাই তারা অনন্তকাল বিশ্বকে ধারণ করে আছে। তেমনি যে জ্ঞানী নিজের সত্তা ভুলে যায়, তার সত্তা চিরস্থায়ী হয়। যে নম্র সেই উন্নত, যে যত বিনয়ী সে তত মহান।

"সুতরাং যদি সকলের চেয়ে বড় হতে চাও,
সকলের নীচে এসে দাঁড়াও।
যদি সকলের আগে যেতে চাও,
সকলের পিছনে চল।" ৬৬

সমাজের নিয়মকানুনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থেকে যা-কিছু উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি। সভ্যতার চাপে পড়ে যা-কিছু সৎ ও শুভ তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির বিচারবুদ্ধি যখন হারিয়ে যায় তখনই আসে ধর্ম, ন্যায়, পরোপকার, সহবত—এই সমস্ত কথার জাল বুনে সমাজকে ধরে রাখবার চেষ্টা হয়। জ্ঞান না থাকলেই পুঁথির বিদ্যা এসে আসর জমায়।

"নিজের চৌকাঠ না পেরিয়ে
জানা যায় সারা দুনিয়ার খবর।
নিজের জানলার বাইরে না তাকিয়ে
দেখা যায় আকাশজোড়া 'তাও'।
যতই জ্ঞানের পিছনে ছুটবে
ততই জানবে কম।" ৪৭

দাও বিদ্যা, বিচার ও সহবত—ফিরে আসবে মানুষের জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও সততা।

"সহজ সত্তায় ফিরে যাও,
আদিম প্রকৃতিকে মেলে ধর
স্বার্থচিন্তা দূর কর,
আকাঙ্ক্ষা থেকে নিবৃত্ত হও।" ১৯

হুশি লাওৎসের চিন্তাধারাকে 'দার্শনিক শূন্যবাদ' বলে অভিহিত করেছেন।[৩] লেগির মতে তাঁর নিবৃত্তিবাদ প্রগতির নিয়মসহ নয়,—ব্যক্তির ও সমাজের ধর্ম এগিয়ে যাওয়া, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা নয়।[৪] এঁরা লাওৎসের প্রতি সুবিচার করেননি। তাঁর মত নেতিবাচক হলেও শূন্যতা ও স্থাণুতার পরিপোষক নয়। দম্ভ ও কৃত্রিমতাকে, বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে মানুষের ভাল করার স্পর্ধাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, তিরস্কার করেছেন। সরল ও নম্রভাবে, অপরের ওপর জুলুম না করে, নিজ ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে যে কাজ হয় প্রগতিবাদীদের চাঞ্চল্যে তা হয় না। অতিবিস্তার ও অতিবৃদ্ধি প্রগতি নয়, পতনের প্রস্তুতি। গাছ বেশী বাড়লে তাকে কাটা হয়, ধনুক বেশী নোয়ালে তা ভেঙে যায়, তলোয়ারে বেশী শান দিলে তার ধার ক্ষয় হয়, বেশী ধন সঞ্চিত হলে তা আর ধরে রাখা যায় না। সুতরাং

"যার ক্ষমতা চূর্ণ করতে হবে
তাকে আগে বাড়তে দাও।
যাকে দুর্বল করতে হবে
তাকে বলবান হতে দাও।
যাকে মাটিতে শোয়াতে হবে
তাকে আকাশে উঠতে দাও।" ৩৬

অতএব

"অসন্তোষের বাড়া অভিশাপ নেই
অধিকারবৃত্তির বাড়া পাপ নেই।" ৪৬

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার সঙ্গে এর গোড়ায়ই গরমিল। জীবন ভোগ ও

৩ ফিলসফি—ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট, সম্পাদক, চার্লস এ মুর, নিউ জার্সী, ১৯৪৬, ৩০৮ পৃষ্ঠা।
৪ দি টেকস্টস অব তাওইজম—সেক্রেড বুক্‌স্ অব দি ইস্ট, ৩৯ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।

বিস্তারের জন্যে, নিবৃত্তির জন্যে নয়, তার পরিণামে যদি থাকে বিনাশ ও মৃত্যু থাক ক্ষতি নেই। এরিস্টটল-এর সময় থেকে এই ইষ্টমন্ত্র ইয়োরোপের বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত এবং রেনেসাঁস-এর সময় থেকে 'মানবধর্ম' বলে সম্বর্ধিত হয়ে এসেছে। লাওৎসে এঁদের কথার জবাবে বলবেন যাকে তুমি জীবনের গতি ও বিস্তার বলছ সে এক গোলকধাঁধার মধ্যে অবিরাম ঘুরে মরা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থ ও ক্ষমতার সুখ যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তা হলে ধর্ম ও কর্তব্যের কথা আসে কেন? আসলে জীবনের বিস্তারে ধর্মের প্রয়োজন আছে কিন্তু সে চলেছে ভুল পথে। "বাতাস যেমন যেদিকে খুশী বয়, তেমন ধর্মও খুশীমত নিজেকে স্থাপন করুক। এত হৈ চৈ করে তার সন্ধান করা কেন, যেন ঢাক বাজিয়ে এক পলাতক আসামীর খোঁজ হচ্ছে?"[৫] প্রকৃতি নিজের নিয়মে চলে, সকল বিরুদ্ধ চেষ্টাকে ছাপিয়ে তার নিয়মই বহাল থাকবে। "রাজহাঁসকে রোজ স্নান না করালেও সে শাদাই থাকে আর কাকের গায় রোজ কালি না লাগালেও সে কালই থাকে"।[৫] সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হল খোদার ওপর খোদকারী না করে নিয়মগুলোকে জানা এবং জীবনকে সেই নিয়মমাফিক পরিচালনা করা। "মানুষকে শাসন করা ভগবানের কাজ", মানুষের নয়।

সুতরাং সেই সরকারই ধন্য যার কোন শাসন নেই। সেই যথার্থ প্রভু যে প্রভুত্ব করে না।

"যারা শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা
লোকে এইমাত্র জানে যে তারা আছে;
যারা এর চেয়ে নিকৃষ্ট তাদের লোকে ভালবাসে, স্তুতি করে;
আরো নিকৃষ্টদের তারা ভয় করে;
সবচেয়ে যারা অধম তাদের তারা গালাগালি করে।" ১৭

কোন সরকার কখনও মানুষকে সুখী করতে কিংবা সাধু বানাতে পারে না। সরকার মানুষকে কেবল নষ্টই করে এবং তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, দুর্বুদ্ধি ও অসন্তোষ ছড়ায়।

---

৫ লাওৎসের শিষ্য চুয়াংৎসে তাঁর গুরু ও কনফুসিয়াসের মধ্যে একটি তর্কের অবতারণা করে সেই প্রসঙ্গে লাওৎসের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এইচ. এ. গাইলস্: চুয়াংৎসে, মিস্টিক, মর্যালিস্ট এণ্ড সোস্তাল রিফর্মার, লণ্ডন ১৮৮৯, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

"যতই বিধিনিষেধ বাড়বে ততই মানুষ হবে গরীব।
যত ধারাল হাতিয়ার বানাবে
রাজ্যে তত বাড়বে বিশৃঙ্খলা।
যত কলকৌশল ফাঁদবে
তত বেরুবে তাকে এড়াবার ফন্দি।
যে দেশে যত আইনকানুন,
সে দেশে তত চোরডাকাতের মেলা।" ৫৭

দুনিয়াকে বাহুবলে জয় করে ভোগ করার ব্যাপারেও দেখা যায় একই হেঁয়ালি। লাওৎসে শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী, কিন্তু বিশ্বপ্রেম অথবা কোন মহৎ আদর্শের জন্য নয়। 'তাও' প্রকৃতির পথ, এতে মানবিক আদর্শের জায়গা নেই। লাওৎসে যুদ্ধকে ঘৃণা করেন এর নাশকতা ও বিফলতার জন্য।

"কারণ এ জিনিস পিছন দিকেও আঘাত হানে।
সৈন্যরা যেখানে যায় সেখানে বাড়ে কাঁটাগাছের জঙ্গল।
একটা বিপুল বাহিনী সংগ্রহ কর
পরের বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।" ৩০

অস্ত্র ও আইন দিয়ে শাসন চলে না। শাসনহীন নিরাজ সমাজ ঠিক পথে চলবে। লাওৎসে বলেছেন, "জনসাধারণ একটি শিশু।" কনফুসিয়াসও মানবেন একথা, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। তিনি বললেন শিশু যেমন বাপমার হাতে গড়ে ওঠে তেমনি জনসাধারণকে গড়ে তুলবেন শাসক ও নেতৃবৃন্দ। লাওৎসে বলবেন, - শিশুর মত জনসাধারণকে তার স্বভাব মাফিক বাড়তে দাও, তার ওপর কারিকুরি করতে গেলে তার সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হবে।

"ছোট মাছকে যেমন করে ভাজে বড় দেশকে তেমন করে শাসন করতে হয়।" ৬০ মাছটাকে নাড়াচাড়া করলে গলে কাদা হয়ে যাবে, তাকে অল্প আঁচে কড়ার ওপর ছেড়ে রাখতে হয়। এই হচ্ছে তাও-এর নিষ্ক্রিয় শান্তির পথ। "পৃথিবীটা ঈশ্বরের পাত্র। মানুষ তা গড়তে পারে না।" ২৯

লাওৎসের প্রায় আড়াই শ' বছর পরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকে তাঁর মতের ব্যাখ্যান ও বিস্তার করেন তাঁর ভক্ত চুয়াংৎসে। সে আর এক অরাজকতার যুগ। চাউ সাম্রাজ্যের তখন অন্তিম দশা। সমান্তরাজারা নামে মাত্র চাউ বংশের প্রতি আনুগত্য কবুল করে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও

ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। দর্শনের রাজ্যেও বাক্‌বিতণ্ডার ঝড়। চারদিকের দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে চুয়াংৎসে নিয়ে এলেন এক অবিশ্বাসী নেতিবাচক মতবাদ। গাইল্‌স্ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে ছোকরার দল তাঁর কাছে ঘেঁষত না কারণ তাঁর বই পড়ে আমলাতন্ত্রের গদিতে বসবার পরীক্ষাগুলি পাশ করা যেত না। তাঁর বই পড়ত বুড়োর দল—যারা কর্মক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারেনি কিংবা কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছে অথবা যাদের ধর্মকর্মে মতি হয়েছে, পরলোক সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মেছে।[৬]

কনফুসিয়াসের মত প্রচারে মেনসিয়াসের যা অবদান লাওৎসের মত জনপ্রিয় করার জন্যে চুয়াংৎসে তার চেয়ে অধিক কীর্তি রেখে গেছেন। তিনি কেবল গুরুর মতের ব্যাখ্যান করেননি, গুরুর দর্শনকে নূতন ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচনাগুলি উপকথা ও বাক্যালাপের আকারে সঙ্কলিত হয়েছে। এদের যেমন ধার তেমন ভার। কনফুসিয় রাষ্ট্র ও নৈতিক শাসনকে তিনি কঠোর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। তাঁর মূলমন্ত্র লাওৎসের বাণী—সকল রকম কৃত্রিমতা ছেড়ে স্বভাবের অবস্থায় ফিরে যাও। স্বাভাবিক ও কৃত্রিমের তফাৎ বোঝা কঠিন নয়।

> "ঘোড়া ও ষাঁড়ের চারটি করে পা আছে—এটা স্বাভাবিক। ঘোড়ার লাগাম লাগালে, ষাঁড়ের নাকে দড়ি ঢোকালে—এটা কৃত্রিম" (শারদ বন্যা)

যা কিছু মূল্যবোধ, আচার আচরণের বিধান, সব অর্থহীন ও কৃত্রিম। রূপ, নীতি, বুদ্ধি, ধর্ম এই সকল মিথ্যার মোহে মানুষের বোধশক্তি আচ্ছন্ন হয়, ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়। ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ বোধ, এর অসারতা যে রূঢ় অবিশ্বাসের সঙ্গে চুয়াংৎসে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তা ম্যাক্‌স্ স্টার্নারকেও হার মানায়।

> "মানুষ খায় পশুমাংস, হরিণ খায় ঘাস, কাঁকড়াবিছার খাদ্য পোকা-মাকড় আর পেঁচা ও কাক ভালবাসে ইঁদুর। এই চারের মধ্যে কার রুচিটা ভাল? বানরের প্রিয় হল কুকুরমুখী বানরী, হরিণ ছোটে হরিণীর পিছনে, মাছ মৎস্যিনীর প্রতি আসক্ত। আর মানুষ মজে মাও চিং ও লি চির রূপে, যাদের দেখলে মাছ গভীর

৬ চুয়াংৎসে: ভূমিকা, ১৪ পৃষ্ঠা।

জলে ডুব দেবে, পাখি আকাশে উড়বে, হরিণ ছুটে পালাবে। কে বলবে কার রূপটা খাঁটি? (সকল বস্তুর সমীকরণ)

শহীদ হয়ে মর আর ডাকাত হয়ে মর, মরণ যা তাই। পো য়ি নূতন রাজবংশের গোলামি করতে অস্বীকার করে শুয়িয়াং পাহাড়ের তলায় মৃত্যুবরণ করেছিল। দস্যু চে ডাকাতির অপরাধে তুংলিং পর্বতের নীচে প্রাণ দিয়েছিল। উভয়ের কর্ম ছিল পৃথক কিন্তু কর্মফল হল এক।

"তবে কেন আমরা প্রথমকে বাহবা আর দ্বিতীয়কে ধিক্কার দিই? সকলকেই কোন কারণে মরতে হয়। তবু যে দয়া ও কর্তব্যের নামে মরে সে হল সাধু, আর যে স্বার্থের জন্যে মরে তাকে সবাই বলে নীচ!" (পায়ের জোড়া আঙুল)

সমাজে চলতি নীতিকথাগুলি ধাপ্পাবাজি, ব্যক্তিকে বিকৃত করে ও দাবিয়ে রাখবার ফন্দি। বুদ্ধি ও চালাকি'ত বদমায়েসের হাতিয়ার। চোরের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমরা বুদ্ধি করে ট্রাঙ্কে তালা লাগাই, বস্তায় দড়ি বাঁধি। কিন্তু যখন বলবান চোর মালপত্র সুদ্ধ ট্রাঙ্ক ঘাড়ে করে পালায় তখন সেই তালা আর হুড়কা তারই কাজে লাগে এবং তার ভয় হয় বুঝিবা তালা খুলে গেল।

"সুতরাং দুনিয়া যাকে বলে বুদ্ধি তা কি শক্ত চোরের সুবিধার জন্যই নয়?" (ট্রাঙ্ক খোলা)

চি রাজ্যে ছিল পণ্ডিতদের গড়া আইন-কানুনের শাসন। তবু একদিন প্রাতঃকালে তিয়েন চেংৎসে চির রাজাকে হত্যা করে তাঁর রাজ্য চুরি করলেন। শুধু রাজ্য নয়, পণ্ডিতদের বুদ্ধির খেলা আইনকানুনগুলিও হল তাঁর। সুতরাং চোর বলে খ্যাতিলাভ করলেও তিয়েন চেংৎসে শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন কাটিয়ে গেলেন।

অতএব পণ্ডিতের ধর্ম অধর্মের দান। ডাকাত পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্র মেনে চলে। দস্যু চে তার সাকরেদকে বলছে:

"পণ্ডিতদের কীর্তিত গুণপনা চোরের মধ্যেও আছে, যেমন ধন-সম্পদের সন্ধান নেওয়ার বুদ্ধি, বিপদের মুখে এগিয়ে যাবার সাহস, সকলের শেষে বেরিয়ে আসার বীরত্ব, ধরা না পড়ার সতর্কতা, লুঠের মাল সমান ভাগে বণ্টন করার সহৃদয়তা। এই পাঁচটি গুণ ব্যতিরেকে কোন দস্যু বড় হতে পারে নি।" (ট্রাঙ্ক খোলা)

সুতরাং পণ্ডিতদের শিক্ষা নিয়েই দস্যু চে তার ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে। পণ্ডিতদের তাড়াও, দস্যুরা অমনি পালাবে। রাজ্য শাসনের জন্যে পণ্ডিতদের সংখ্যা বাড়াও, দস্যু চে'র মুনাফার অঙ্ক ডবল হবে।

> "একটা আংটি চুরি করলে চোর বলে তোমার ফাঁসি হবে। একটা দেশ চুরি করলে তুমি হবে রাজা। দয়াধর্মের যা কিছু শিক্ষা তা থাকে রাজার হেফাজতে। তা হলে কি একথা সত্য নয় যে রাজারা দয়াধর্ম ও পণ্ডিতদের নীতি কথার চোর? (ট্রাঙ্ক খোলা)

চুয়াংৎসে পণ্ডিতদের নিয়ে কিভাবে ঠাট্টা তামাসা করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত দস্যু চে-র সঙ্গে কনফুসিয়াসের সাক্ষাতের গল্প। দস্যু চে-র দাদা লিউ সিয়া হুই ছিলেন কনফুসিয়াসের বন্ধু। তাঁর উপদেশ অমান্য করে কনফুসিয়াস দস্যুর কাছে গেলেন তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে সৎপথে আনবেন বলে। অনেকগুলি স্তুতিবাক্য বলে তিনি কিছু ধর্মোপদেশ দিলেন এবং দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে একজন রাজর্ষি হবার জন্যে তাকে অনুরোধ করলেন। এমনও আশ্বাস দিলেন যে এই পরিবর্তন সুসম্পন্ন করবার জন্যে তার সাহায্যের অভাব হবে না। দস্যু প্রথমে একটি প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করল—"যারা সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের প্রশংসা করে, তারা আড়ালে গেলে গালাগালি করে।" তারপর সে নিজের দর্শনের একটা ফিরিস্তি দিল :

> "আকাশ ও পৃথিবীর সীমা নেই—আর মানুষের মিয়াদ বাঁধা। অসীমের মাঝখানে একটুকরো সময়ের গণ্ডিতে সে আবদ্ধ হয়ে আছে। একটি মাত্র মুহূর্ত আর সব শেষ, যেন একটা ফুটো দিয়ে দেখা দৌড়ে যাওয়া রেসের ঘোড়া। যে এই মুহূর্তটিকে তার ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে সেই ঠিক রাস্তা চিনেছে।"

এর পর প্রশংসাবাণীর প্রত্যুত্তরে

> "শাদা আংরাখার ওপর কাজকরা ষাঁড়ের চামড়ার কোমরবন্ধ চাপিয়ে তুমি সেজেছ মন্দ নয়। আর ধাপ্পাবাজির বুলি দিয়ে রাজা-রাজড়াদের ঠকিয়ে তুমি বেশ ধনসম্মান আদায় করছ। আসলে তুমি ওরই ফিকিরে আছ। তোমার চেয়ে বড় ডাকাত আর নেই। আমি অবাক হই লোকের মুখে মুখে দস্যু চে-র কথা, কিন্তু তারা কেন তোমাকে দস্যু কনফুসিয়াস বলে না!"

তারপর আগন্তুককে ভদ্রভাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে এই মুহূর্তে বিদায়

না নিলে তার মেটে দিয়ে দস্যুদলের সকাল বেলার ঝোল রান্না হবে। কনফুসিয়াস-পালিয়ে বাঁচলেন এবং ফিরে এসে বন্ধু লিউ সিয়া হুইকে বললেন, "আমি বাঘের মাথায় হাত বুলাতে আর তার দাড়ি আঁচড়াতে গিয়েছিলাম। আর একটু হলে তার মুখের ভেতর গিয়ে পড়েছিলাম আর কি?"[৭]

এমন মনে করবার কোন কারণ নেই যে দস্যুর মুখ দিয়ে চুয়াংৎসে যা বলিয়েছেন তা তাঁর নিজের কথা। তিনি ভোগবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিতাচার ও আত্মসন্তোষে বিশ্বাসী। শুধু পণ্ডিতপ্রবরকে হাস্যাস্পদ করবার জন্যে এই গল্প ও কথার অবতারণা।

দেশে দেশে কালে কালে প্রকৃতিবাদী স্বপ্নবিলাসীরা এক অতিপ্রাচীন স্বভাবশুদ্ধ সমাজের কল্পনা করেছেন। চুয়াংৎসেও এঁকেছেন প্রকৃতির কোলের এই শান্তসুন্দর রাজ্যের ছবি যেখানে মানুষ ছিল সহজ সরল ধীর ও স্থির।

> "মানুষ পশুপাখির সঙ্গে বাস করত এবং তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। ভদ্রলোক ও ইতরলোকের তফাৎ কেমন করে জানা যাবে? কারও কোন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না কাজেই তাদের স্বভাবধর্ম বিকৃত হতে পারত না। কারও কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না কাজেই তাদের মধ্যে স্বাভাবিক সততা ছিল, তাদের প্রকৃতি তারা হারায় নি।
>
> তারপর যখন পণ্ডিতরা এলেন, মিনমিন করে দয়াদাক্ষিণ্য ও নীতিকথার উপদেশ শোনাতে লাগলেন তখন থেকে মানুষের মনে ধোঁকা লাগল, সন্দেহের উদয় হল। তাও-এর ধর্ম যদি নষ্ট না হয় তাহলে দয়াদাক্ষিণ্য ও নীতিকথার দরকার কি? মানুষের স্বাভাবিক আনন্দের উৎস যদি শুকিয়ে না যায় তা হলে গানবাজনা ও উৎসবের প্রয়োজন কি? পাঁচটা রং যদি দুনিয়াময় টিকে থাকে তা হলে আবার রঙের সাজ কেন? পাঁচটা সুর যখন কানে বাজে তখন ছয় গর্তের বাঁশি কি কেউ বাজায়?...সেই থেকে এল লোভ, লোভের জন্যে শরীরপাত, পরস্পরে ঝগড়া আর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা —যার কোন শেষ নেই।" (ঘোড়ার খুর)

সভ্যতার এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নেই। একমাত্র

৭ আর্থার ওয়ালী: থ্রী ওয়েজ অব থট ইন এনসিয়াণ্ট চায়না, লণ্ডন, ১৯৩৯। ৩৯-৪৬।

উপায় এই সভ্যতাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া। ধর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি, নীতিকথা, বিত্ত সব ঝেঁটিয়ে দূর করতে পারলে তবেই মানুষের মুক্তি।

> "দূর কর জ্ঞান, ঝেড়ে ফেল বিদ্যা, তবেই ডাকাতরা থামবে। ফেলে দাও মণিমুক্তা, চোরদের কাজ বন্ধ হবে।... গজকাঠিগুলো টুকরো টুকরো করে ফেল, দাড়িপাল্লা গুঁড়িয়ে দাও, জিনিসের পরিমাণ নিয়ে লোক মারামারি করবে না। পণ্ডিতদের সব কিছু অনুষ্ঠান মাড়িয়ে ফেল, লোকে তখন তাও-এর কথা ভাবতে শিখবে। ৎসেং আর শি-র কাজ থামাও, য়িয়াং চু আর মৎসের মুখ সেলাই করে দাও, দয়াধর্ম ও নীতিকথা বর্জন কর তখন মানুষের ধর্ম ঠিক পথে চলবে।" (ট্রাঙ্ক খোলা)

পৃথিবীর যাবতীয় বাস্তব ও নৈতিক বন্ধন হতে মুক্ত হলে মানুষ সেই পরম পথ খুঁজে পাবে, প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবার পথ।

> "তুমি কর্ম ত্যাগ কর, দুনিয়া আপনিই শোধরাবে। দেহকে ভুলে যাও, বুদ্ধিশুদ্ধি উগরে ফেল। সমস্ত পার্থক্য উপেক্ষা করে অনন্তের সঙ্গে এক হও। মনকে ছেড়ে দাও, অন্তর মুক্ত কর। শূন্য হও, হও আত্মভোলা। সব মূলদেশে ফিরে আসবে, সেখান থেকে জীবনের রস আহরণ করবে।" (সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে)

চুয়াংৎসের বর্ণিত মুক্ত আত্মার এই শান্ত স্থিত অচলপ্রতিষ্ঠ অবস্থা কতকটা বুদ্ধের নির্বাণ ও বেদান্তের মোক্ষের মত। অবশ্য এ পথ সাধারণ লোকের নয়। তার জন্যে চুয়াংৎসের বিধান অতি সহজ—

> "একটা গাছের গায় হেলান দিয়ে গান গাও; কিংবা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়।" (অঙ্গবিকৃতি)

'তাও' ভুলে গেলে যেমন আসে কর্তব্য ও নিয়মকানুনের কথা, তেমনি স্বভাবসত্তা হারিয়ে গেলে হাজির হয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংশয় ও বিশৃঙ্খলার সূচনা করে।

> "যদি তাদের স্বভাব বিকৃত না হয়, যদি তাদের চরিত্র দূষিত না হয়, তা হলে শাসনের কী প্রয়োজন?" (সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে)

আইন ও শাসনের জোরে লোককে ভাল করার মত হঠকারিতা আর নেই। মানুষের যেমন ভুলভ্রান্তি আছে, তাদের ভাল করবার দায়িত্ব নেয় যে আইন ও সরকার, তারাও কিছু কম ভুলচুক করে না।

"ঠিক-এর বিপরীত ভুল, সুশাসনের বিপরীত কুশাসন। যারা বলে ভুলকে বাদ দিয়ে ঠিককে নেব, কুশাসনকে বাদ দিয়ে সুশাসনকে রাখব—তারা বিশ্বের নিয়ম জানে না, সৃষ্টির রহস্য বোঝে না। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আকাশের কথা বলা, হাঁ-কে ছেড়ে না-র কথা ভাবা সমান অবাস্তব।" (শারদ বন্যা)

সুতরাং একমাত্র সুশাসন হল অশাসন (উ-উই)। সরকার যদি মানুষের জীবনযাত্রায় হাত না দেয় তা হলে তারা আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে। জ্ঞানী রাজা ক্ষমতার জোরে শাসন করেন না, তিনি নিজে শুদ্ধ হয়ে তাঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রজাদের প্রভাবিত করেন।

চীনের সে-সময়কার রাজনৈতিক দুর্দশা ও দার্শনিকদের ওপর তার যা প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিচার করলে চুয়াংৎসের নৈরাজ্যবাদী মতগুলি বুঝতে সহজ হবে। তখন চাউ সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের সংবিধান এক কায়াহীন ছায়ায় পর্যবসিত হয়েছিল। রাজনীতির আবহাওয়া ক্ষমতার লড়াই ও ষড়যন্ত্রে দূষিত। এই আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা মেনসিয়াস ও রক্ষণশীলদের ছিল না। তাঁরা একটি মহান আদর্শের আশ্রয় নিলেন,—ঈশ্বরের প্রতিভূ হয়ে রাজা ও পণ্ডিতেরা 'জেন'-এর শাসন বা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। সুশাসিত ধর্মরাজ্যের কর্তব্য হবে কুশাসিত দুষ্ট রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া। সাম্রাজ্যসন্ধী কুচক্রী রাজাদের স্বার্থসিদ্ধিতে এই মতবাদ বেশ কাজে লাগল। ছোট্ট রাজ্য সুং ধর্মরাজ্যের আদর্শের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেনসিয়াসের ন্যায় আদর্শবাদীদের বিশ্বাস যদি সত্য হত তা হলে অন্যান্য রাজ্যের পক্ষে স্বাভাবিক হত সুং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তা হাওয়া দূরে থাকুক সুং-এর উন্নতি দুই শক্তিমান রাজ্য চি ও চু-র গাত্রদাহের কারণ হল। অবশেষে সুং-এর বিরুদ্ধে বহু অপপ্রচার করে চি রাজ্য তাকে গ্রাস করল। এ অপকর্মের নীরব সমর্থক ছিলেন মেনসিয়াস[৮] তাঁর এক সন্দিগ্ধ শিষ্য তাঁকে এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। গুরু জবাব দিয়েছিলেন—সুং যে অন্যান্য রাজ্যের সমর্থন পায় নি এ থেকেই বোঝা যায় যে তার শাসন ধর্মসম্মত ছিল না!

এই প্রকারে কনফুসিয়াসের দর্শন হয়ে দাঁড়াল তথাকথিত 'ধর্মযুদ্ধ' এবং

৮ আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ১৪২ পৃষ্ঠা।

'দুষ্টের দমনের সংগ্রাম'-এর ওকালতি। অবশ্য একটা শর্ত ছিল যে 'যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হয়ে কাজ করবার যোগ্য' শুধু তারাই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু এ যোগ্যতার বিচার করবে কে? অবশ্যই ধর্মযোদ্ধা স্বয়ং। সুতরাং রাজাদের বুঝিয়ে সুপথে আনতে পারলেই তাদের মারফৎ জনসাধারণকে সুখী ও পুণ্যবান করা যাবে কনফুসিয়াসের এই শিশুসুলভ সরল বিশ্বাস চুয়াংৎসের তামাসার খোরাক হল আর রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়ণতা ও পণ্ডিতের নীতিবাগীশতার বিরুদ্ধে তীব্র অবিশ্বাস সৃষ্টি করল।

তরুণ বয়সে চুয়াংৎসে সরকারী চাকরি করতেন। কাজে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রের সকল সংশ্রব ত্যাগ করে তিনি টলস্টয়ের মত নিরালায় জীবন যাপন করেন। ভাল ভাল পদের লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি দারিদ্র্য ও মুক্তির জীবন বেছে নেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের চীন-ঐতিহাসিক সু মা চিয়েন এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। চু রাজ্যের রাজা উই দামী দামী উপহার দিয়ে দূত পাঠালেন তাঁকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে। চুয়াংৎসে মৃদু হেসে দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন :

> "তুমি কি কখনও বলির ষাঁড় দেখ নি? বছর কয়েক খাইয়ে মোটা করে যখন তাকে সুন্দর সাজ পরিয়ে হাড়িকাঠের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কি সে চাইবে না একটা কাদায় গড়ানো শুয়োর ছানার সঙ্গে তার অবস্থার বদল করতে?—বেরিয়ে যাও! আমাকে অপবিত্র কোর না! রাজশাসনের দাস হবার চেয়ে আমি বরং নিজের খুশীমত কাদায় গড়াব।"[১]

এ-ধরনের আর একটি গল্প আছে। চুয়াংৎসে লিয়াং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হুয়েৎসে-র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। কোন একজন গিয়ে তাঁকে লাগাল যে চুয়াংৎসের অভিসন্ধি প্রধান মন্ত্রী হওয়া এবং তিনি সেই মতলবে এদিকে আসছেন। হুয়েৎসে ঘাবড়ে গিয়ে সারা দেশে তাঁর খোঁজে লোক লাগালেন। শেষে চুয়াংৎসে নিজেই হাজির হয়ে প্রধান মন্ত্রীর আচরণ একটি উপমা দিয়ে বর্ণনা করলেন।

> "দক্ষিণ দেশে এক রকম পাখি আছে—তার নাম স্বর্গীয় পাখি। যখন সে আকাশপথে দক্ষিণ সাগর থেকে উত্তর সাগরে পাড়ি দেয়

১ এইচ. এ. গাইলস্ : চুয়াংৎসে, ভূমিকা, ৭ পৃষ্ঠা।

তখন উ-তুং গাছ ছাড়া অন্য কোথাও নামে না। সে খায় অমৃত ফল, পান করে স্ফটিকের মত ঝরণার জল। একটা পেঁচা পচা ইঁদুর নিয়ে গাছে বসেছিল। স্বর্গীয় পাখিকে উড়ে যেতে দেখে সে তার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তুমিও কি তোমার লিয়াং রাজ্য আগলিয়ে আমায় দেখে হল্লা করছ না?" (শারদ বন্দ্যা)

মরণ সম্বন্ধে চুয়াংৎসের যা ধারণা ছিল তা নিয়ে কয়েকটি গল্প আছে। তাঁর স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন একজন বন্ধু এলেন শোকপ্রকাশ করতে। তিনি এসে দেখেন চুয়াংৎসে টেবিল বাজিয়ে গুণগুণ করে গাইছেন। বন্ধুর বকুনি খেয়ে চুয়াংৎসে বললেন :

"একজন যদি পরিশ্রান্ত হয়ে শুতে যায় আমরা হাউমাউ করে তাকে তাড়া করি না। যাকে আমি হারালাম সে অন্দর মহলের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কান্নাকাটি করে তার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মালে এই প্রমাণ হবে যে আমি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মের কথা কিছুই জানি না।"[১০]

যখন তাঁর নিজের বিদায় নেবার পালা এল তখনও এই বিশ্বাস ভাঙেনি। মরবার সময়ে তিনি দেখলেন শিষ্যরা ঘটা করে সৎকারের আয়োজন করছে। তিনি তাদের ডেকে বললেন :

"আকাশ ও পৃথিবী আমার শবাধার; সূর্য চন্দ্র ও তারা আমার শবশয্যার সাজ। সকল জীব আমার শবযাত্রার সাথী। এতেও কি আমার মৃত্যু উৎসব সুসম্পন্ন হবে না?"

শিষ্যরা বললেন গুরুর দেহ শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে—এ কেমন করে হয়? গুরু বললেন :

"মাটির ওপরে ফেলে রাখলে শকুনিতে খাবে, মাটির নীচে পুতলে খাবে পোকা ও পিঁপড়ে। একদলকে বঞ্চিত করে আর এক দলকে খাইয়ে কি লাভ?"[১১]

এইরূপে চুয়াংৎসে তাঁর দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন জীবন ও মরণ।

১০ আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ২১-২২ পৃষ্ঠা।

১১ এইচ. এ. গাইল্‌স্ : চুয়াংৎসে, ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

তাও-বাদ একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ নয়। এ এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। দর্শনের কচকচির বিরোধিতা এর উপজীব্য। জীবনপ্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর ও বস্তুরহস্যের যুক্তিসম্মত সমাধান এতে নেই। যৌক্তিকের সঙ্গে অযৌক্তিক, লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিককে মিশিয়ে তাও-এর প্রণালী গড়া। এর বক্তব্য যে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি প্রকৃতির যুক্তি নয়। বুদ্ধি বাস্তবকে বিকৃত করে দেখে, আমি-তুমি, এটা-ওটা ইত্যাদি অবাস্তব পার্থক্য রচনা করে। প্রকৃতির সত্যকে জানা যায় অন্তর্দৃষ্টির বলে, শুদ্ধ চৈতন্যের বলে যাতে না তাকিয়ে দেখা যায়, কান না পেতে শোনা যায়, চিন্তা না করে জানা যায়।[১২] এই শুদ্ধ চৈতন্য বা 'মিং' এর প্রতীক দেবতা হুন-টুন বা 'অগোছাল'।

> "দক্ষিণসাগরের দেবতা হট্টগোল আর উত্তর সাগরের দেবতা হাহুতাশ একবার মধ্যরাজ্যের দেবতা অগোছালের দেশে এসে মিললেন। অগোছাল খুব যত্ন করে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। অতিথিরা পরামর্শ করতে লাগলেন কেমন করে গৃহস্বামীর বদান্যতার প্রতিদান দেওয়া যায়। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে সকলের শরীরে দেখা শোনা, খাওয়া ও নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যে যে সাতটি ছেঁদা থাকে অগোছালের দেহে তার একটিও নেই। তাঁরা স্থির করলেন অগোছালের গায় এই ছেঁদাগুলো করে তাঁর কিঞ্চিৎ উপকার করবেন। প্রতিদিন একটি করে ছেঁদা করা হল, সপ্তম দিনে অগোছাল পঞ্চত্ব পেলেন।"[১৩]

যুক্তি ও আদর্শকে ভিত্তি করে যে রক্ষণশীল মতবাদ দাঁড়িয়েছিল তার পাশাপাশি চীনে ছিল ফা চিয়া নামে আর এক গোষ্ঠী। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শাংৎসে ও তৃতীয় শতকের হান ফাইৎসে ছিলেন এঁদের গুরু। এঁরা ঐতিহ্যের দান ও অলৌকিক তত্ত্ব উভয়কে বাতিল করে তার জায়গায় আইনকে বসালেন। নীতিমূল্যের ওপরে স্থান হল আইনের, আইনের ওপরে রাষ্ট্রস্বার্থের। এঁদের মতে রাষ্ট্রের কোনো নীতির বালাই থাকবে না এবং রাষ্ট্রের যোগ্যতার পরীক্ষা হবে তার ক্ষমতায়। এঁরা সংগ্রাম ও রাষ্ট্রজয়ের মহিমা কীর্তন করেছেন এবং এই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যশাসন

১২ উপনিষদ ও বার্গসঁর সঙ্গে এই ধারণার মিল লক্ষণীয়।

১৩ আর্থার ওয়ালী : থ্রী ওয়েজ অব থট, ৯৭ পৃষ্ঠা।

পদ্ধতির বিচার করেছেন। এই দলের কঠোর বাস্তবতা ও কনফুসিয়দের নৈতিকতা উভয়ের চাপে পড়ে তাওবাদীর নিক্রিয়ার বাণী ক্ষীণ হয়ে গেল। শেষে বৌদ্ধধর্মের বন্যায় তাও-এর পথ ডুবে গেল—এর পথচারীরা আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ এক ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হল।

সতের-আঠার শতকে লক ও রুশো যে প্রকৃতি বন্দনার রেওয়াজ এনেছিলেন তাওবাদ তার পূর্বাভাস। যুক্তিবুদ্ধির ওপর রুশোর আক্রমণ এবং বর্বর জীবনের অজ্ঞানতার প্রশস্তি, বিজ্ঞান ও দর্শনের অর্থহীন কৌতূহল—এসব লাওৎসে ও চুয়াংৎসের কথা মনে করিয়ে দেয়। জার্মান শূন্যবাদী ম্যাক্স্ স্টার্নারও সভ্যসমাজের অনুশাসন ও অনুষ্ঠানগুলির মুখোশ এমনই নির্মমভাবে খুলে দিয়েছিলেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিক্রিয়ার তত্ত্বকে উনিশ শতকের ইংরেজ ব্যক্তিবাদীরা 'লেসেফের' নীতির মধ্যে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু এঁদের কারও সঙ্গে তাও-পন্থীর সম্পূর্ণ মিল নেই। তাও-পন্থী লক্ ও রুশোর মত অসঙ্গতির আবর্তে তলিয়ে যায়নি। ম্যাক্স্ স্টার্নারের মত সে ভোগবাদে এসে পরিসমাপ্ত হয়নি। বুর্জোয়া দার্শনিকদের মত সে রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যের দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণতন্ত্রকে সমর্থন করেনি। আধুনিক কালের নৈরাজ্যবাদীদের মত সে আইন ও শাসন, নীতি ও ধর্ম এ সমস্ত ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু এদের বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ বলে সে মনে করেনি। সে জেনেছে এগুলি সভ্যতার বিকৃতি এবং প্রকৃতির দেওয়া সহজ সততাকে ফিরে পেতে হলে এগুলিকে সমূলে নাশ করতে হবে। প্রকৃতির হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে এক হতে পারলে তবেই তার নিয়মকানুন জানা যায়। তাতেই আনন্দ, তাতেই উন্নতি। এই সার কথাটি তাও-র সুর—আর সব অসার বাক্বিতণ্ডা।

২। ভারতবর্ষঃ কৃতযুগের স্বপ্ন

"পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে ভারতবর্ষের কোন জায়গা নেই"—কারণ ভারতীয় মনীষা বিচরণ করেছে অধ্যাত্মদর্শনের সূক্ষ্মলোকে। কথাটা বলেছিলেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুয়েলর একশ বছর আগে।[১] বহুকাল ধরে ইয়োরোপের পণ্ডিতরা একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধারণার জন্মদাতা

১ হিস্ট্রী অব এনসিয়াণ্ট সনস্ক্রিট লিটরেচর, ১৮৫৯, ৩১ পৃষ্ঠা।

জার্মান দার্শনিক হেগেল। তাঁর কাছে রাষ্ট্রইতিহাস ছিল বিশ্ব-প্রজ্ঞানের ক্রম-বিকাশ, এর শিশু অবস্থায় আবির্ভাব হয়েছিল প্রাচ্য রাষ্ট্রের, তথা ভারতীয় রাষ্ট্রের—যেখানে প্রজ্ঞান শিশুর মত তন্দ্রাতুর। সেই থেকে পাশ্চাত্ত্য সুধী-সমাজে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার সুচিন্তিত রাষ্ট্রদর্শন অথবা শাসনপ্রণালী গড়ে ওঠেনি। বিশ্বাসটা যে ভ্রান্ত তা গত একশ বছরের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নবিদরা দেখিয়েছেন যে এই অধ্যাত্মের দেশেও রাষ্ট্রীয় ভাবনা ও সংগঠনের নানারূপ নিরীক্ষা ও পরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু পূর্বসূরীদের রাষ্ট্রপ্রতিভার প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ করবার কালে প্রাচীন চিন্তার একটা বিশেষ ধারা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—যে চিন্তাধারা কোন প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি, যার ধ্যান ছিল নিরাজ সমাজ—যেখানে বিত্ত বর্ণ ও শ্রেণীর কোন রকম ভেদাভেদ নেই।

মহাভারত ও পালিগ্রন্থে এক অতি প্রাচীন স্বর্ণযুগের বর্ণনা আছে,—যে যুগে সমাজ ছিল একবর্ণ, সকলেই ছিল দেব বা ব্রাহ্মণ, যেখানে নারী পুরুষের পণ্য নয়, যেখানে অধিকার ভেদ নেই, মানুষমাত্রই অমম, অপরিগ্রহ, কৃত-পুণ্যপ্রতিশ্রয়,—এবং তাদের পুণ্যফলে মেঘ যেখানে কালবর্ষী, শস্য যেখানে রসবান। দেববাঞ্ছিত এই পুরাকালের নাম কৃতযুগ বা সত্যযুগ। হিমালয়ের পরপ্রান্তে আছে উত্তরকুরুর মায়ালোক। পুণ্যফলভোগীরা এখনও সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দের ক্রোড়ে জীবন যাপন করেন (দীঘনিকায়, ৩২.৭ ; মহাভারত ৬.৬.১৩)[২]

ইতিহাসে কোনকালে কোন স্বর্ণযুগ হয়নি, হয়ও না। সংঘাত-ও সংগ্রাম-সঙ্কুল জীবনে অবিরাম শান্তি ও সমৃদ্ধির কল্পনা মরীচিকার মত স্বপ্নদর্শীকে আকর্ষণ করে, কিন্তু ইতিহাসের নির্মম আঘাতে তার কল্পনা ভেঙে যায়। তখন সে তার মনের রঙে রাঙিয়ে তোলে অতীত,—দূর অতীতের কোন অজ্ঞাত অধ্যায়, যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না। সেই প্রাক্‌প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে স্বপ্নতুলির আঁচড়ে সে ফুটিয়ে তোলে এক অবাস্তব স্বর্ণযুগ।

কেমন করে এই স্বর্ণশ্রী ম্লান হয়ে গেল, স্বভাবের সন্তান অপাপবিদ্ধ মানুষ ভেদবৈষম্যে বিধ্বস্ত হল এই জিজ্ঞাসা নিয়ে কৃতযুগের অনুধ্যানী স্বপ্নচারীরা সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

২ মহাভারতের যাবতীয় উদ্ধৃতি কুম্ভকোনম সংস্করণ থেকে নেওয়া।

দীঘনিকায়ের অগ্‌গঞ্ঞ সুত্তন্তে এই প্রশ্নের উত্তরে আর এক কাহিনীর অবতারণা হয়েছে। আদিতে এই আনন্দধামে কামনা ও লালসা ছিল না, বিত্ত ও রাষ্ট্র ছিল না। তারপর এল যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং তার ফলে পরিবার ও গৃহ। সেই সঙ্গে দেখা দিল লোভ, মাটির ফসল সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি। পরিণামে সর্বসাধারণের কৃষিক্ষেত্র বিভক্ত হয়ে গেল, এল ব্যক্তি-অধিকার।

> "আমরা শালিক্ষেত্রগুলি ভাগ করিয়া ফেলি এবং পরস্পরের সীমানা স্থির করিয়া দিই। এই বলিয়া তাহারা শালিক্ষেত্র ভাগ করিয়া ফেলিল এবং সীমানা স্থাপন করিল" :৮।

ব্যক্তিস্বামিত্বের সাথী হয়ে এল চৌর্য (অদিন্নাদান), গর্হিত কার্য (গরহ), মিথ্যাবাদ (মুসাবাদ) ও দণ্ডদান। বিবাদের নিষ্পত্তি করবার জন্য একজন সালিশের প্রয়োজন হল। সুতরাং সকলে এক জনসভায় সম্মিলিত হয়ে এক মহাজনকে নির্বাচন করল। তাঁর উপর ন্যস্ত হল চুরি ও মিথ্যাকথনের অপরাধে ধিক্কার ও দণ্ডদানের ভার, বিনিময়ে তাঁকে তারা শালির কিছু অংশ নিবেদন করল।

মহাভারতের শান্তিপর্বে কয়েকটি ছত্রে প্রাচীন নিরাজ সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সততায় অধিষ্ঠিত অবাধ মুক্তিতে উচ্ছ্বসিত সেই সহজ জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রশাসিত কৃত্রিম জীবনের পার্থক্য আমূল।

> "তখন না ছিল রাজ্য, না ছিল রাজা, না দণ্ড বা দাণ্ডিক ; প্রজারা স্বভাবধর্মে পরস্পরকে রক্ষা করত" (৫৮. ১৪)।
>
> "পুরাকালে ধিক্কার ছিল দণ্ড। তারপর এল বাগ্‌দণ্ড, তারপর আদানদণ্ড (অর্থদণ্ড)। এখন বধদণ্ডের প্রবর্তন হয়েছে" (২৭৩. ১৯)।
>
> "পুরাকালে সংহতভাবে ধর্মাচরণ করে তারা সুখে বাস করত। বিচার করবার মত কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করবার মত তাদের কিছু (বিবাদ কিংবা অপরাধ) ছিল না" (২৭৬. ১১)।

কৃতযুগের কবিকল্পনার পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন ঐতিহাসিক সত্যের আভাস আছে। স্বভাবশুদ্ধ অকৃত্রিম একবর্ণ সমাজ বস্তুত শিলাযুগের জাতিযূথ, জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ, গোত্রনিয়মে শৃঙ্খলিত। সে যুগে রাষ্ট্র ছিল না, দেশ ছিল না—ছিল জাতি বা বিশ্‌। পুরাবৈদিক সমাজের কেন্দ্র ছিল বিশ্‌ বা

জাতিযূথ। এদের কয়েকটি সম্মিলিত হয়ে গঠন করত জন বা গণ—যেমন যদু, তুর্বশ, পূরু, অনু ইত্যাদি। এদের কোন স্থায়ী দেশ বা ভূমি ছিল না। রাজসূয় যজ্ঞ করে যাঁরা রাজচক্রবর্তী হতেন তাঁদের অধিকার কোন দেশের ওপর স্থাপিত হত না, স্থাপিত হত ভরত, কুরুপঞ্চাল ইত্যাকার গণদের ওপর। তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে যজ্ঞকর্তা রাজা বিশ্-এর অধিপতি হন, রাষ্ট্রের নয় (২. ৩. ৩-৪)। ব্রাহ্মণ রচনার কালে বিশ্ ও গণরা বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করল এবং তখন পরিপূর্ণ বিকাশ হল ভূমি-আশ্রিত রাষ্ট্রের (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭. ৩. ১৪)।

অগ্গঞ্ঞ সুত্তন্তের আখ্যানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের জন্মের আগে উদ্ভব হয়েছিল সম্পত্তি প্রথার। এ অনুমান অসঙ্গত নয়। 'আদিম জাতিযূথের জীবিকা ছিল শিকার। এর উদ্যোগ ও ভোগ উভয়ই ছিল যৌথ। ক্রমে উন্নততর অর্থবিদ্যা আয়ত্ত হল—এল পশুপালন ও কৃষি। এ বৃত্তি অনায়াসসাধ্য, একক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং ক্রমে যৌথ উদ্যোগের জায়গায় এল ব্যক্তিপ্রয়াস। গাভী ও ক্ষেত্র হল ব্যক্তিসম্পত্তি। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও এই প্রাক্‌রাষ্ট্র যূথসমাজের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় সিন্ধুনদের উপত্যকায়। আলেকজাণ্ডারের সহযাত্রী লিপিকাররা এখানে মৌসিকন (মূষিকগণ নামে এক জাতির সাক্ষাত পেয়েছিলেন। এঁদের নজির অবলম্বন করে মৌসিকনদের সম্বন্ধে যবন লেখক স্ট্রাবো তাঁর ভূগোলে লিখেছেন:

> "এদের বিশেষত্ব হচ্ছে এইগুলি। স্পার্টানদের মত এরা একসঙ্গে বসে প্রকাশ্যে ভোজন করে। শিকার করে যা পায় তাই এদের খাদ্য। যদিও এদের সোনা ও রূপার খনি আছে তবুও এরা এইসব ধাতু ব্যবহার করে না।"

সিন্ধু-উপত্যকার আরও কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে স্ট্রাবো লিখেছেন যে তারা যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং ফলনের পর প্রত্যেকে এক বছরের মত ফসল ঘরে নিয়ে যায় (১৫. ১ ৬৬)। দীঘনিকায়ের মত ঋগ্‌বেদেও ইঙ্গিত আছে যে যৌথবিত্তকে ভাগ করেই ব্যক্তিসম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে (৪. ৫৪ ১)। শুক্ল যজুর্বেদের টীকাকার মহীধর 'অদিতি' শব্দের অর্থ করেছেন 'অখণ্ডিতা পৃথিবী' (অদিত্যাঃ অখণ্ডিতায়াঃ পৃথিব্যাঃ, ৪. ২২)। এ অনুমান কিছু অসঙ্গত নয় যে যে সমাজে ব্যক্তিস্বামিত্ব ছিল না, সে সমাজে রাজা ও রাজবিধিও ছিল না। মৌসিকনদের সম্বন্ধে স্ট্রাবো বলেছেন যে "হত্যা ও ধর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কাজের

বিরুদ্ধে এদের কোন দণ্ডবিধি নেই।" কচ্ছের কয়েকটি জাতি সম্বন্ধে প্লিনি লিখেছেন, "এরা স্বাধীন এবং এদের কোন রাজা নেই।"[৩]

কেমন করে সত্যযুগের মানুষ তার শুদ্ধ আনন্দময় জীবন থেকে ভ্রষ্ট হল তার একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা শান্তিপর্বেও আছে। নৈতিক অধঃপতনের ফলে তারা মোহগ্রস্ত হল, দেখা দিল লোভ ও ক্রোধ। তাদের আত্মবিরোধ থেকে রক্ষা করবার জন্যে ঈশ্বর পাঠালেন রাজাকে হাতে রাজদণ্ড দিয়ে। দীঘনিকায়ের গল্পেও পরিণাম একই শুধু পথ ভিন্ন। লালসা থেকে এল পরিবার, সঞ্চয়বৃত্তি থেকে সম্পত্তি। পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যে 'মহাজনসম্মত' হয়ে অর্থাৎ সর্বজনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এলেন বৃত্তিভোগী রাজা।[৪]

যূথসমাজকে চূর্ণ করে বর্ণভেদ, ব্যক্তিসম্পত্তি ও রাষ্ট্রশাসনের আবির্ভাব বেদের পৃষ্ঠায়ই প্রতিফলিত হয়েছে। এ পর্ব প্রাগৈতিহাসিক। কিন্তু নিরাজ সমাজের কল্পনা, নৈরাজ্যবাদী আদর্শ, হাজার হাজার বছর পরেও বিলুপ্ত হয়নি। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের ধর্মশাস্ত্রে মুখবন্ধে এই আদর্শকে স্মরণ করা হয়েছে।

> "পুরাকালে মানুষ ছিল ধর্মপরায়ণ ও অহিংস। পরে তাহারা লোভ এবং হিংসার বশবর্তী হইল। তখন হইল ব্যবহারের (বিচার বিধির) প্রবর্তন" (বৃহস্পতি, ১ ১)।
>
> "যখন মানুষ স্বধর্মে নিবদ্ধ থাকিত এবং স্বভাবত সত্যাচরণ করিত তখন স্বার্থপরতা ও ঘৃণার লেশমাত্র ছিল না—ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল না। মানুষের মধ্য হইতে ধর্মাচরণ চলিয়া যাইবার পর ব্যবহারের প্রবর্তন হইল এবং ব্যবহারের প্রয়োগ ও দণ্ডদানের ক্ষমতা লইয়া নিযুক্ত হইলেন রাজা" (নারদ, ১. ১-২)।

নবম শতকের জৈন দার্শনিক জিনসেনের রচনায়ও এই নিরাজ ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে। বস্তুত ঐতিহাসিক কালের ভেদবৈষম্যের পূর্ববর্তী এরূপ একটি শান্তিময় যুগের পরিকল্পনা ভারতীয় ভাবুকদের বৈশিষ্ট্য নয়। চীনের তাও-

৩ ম্যাকক্রিণ্ডল: শফ-এর ফ্রাগমেন্টস অব মেগাস্থিনিস-এর অনুবাদ, খণ্ড, ৫৬।

৪ মানুষের নৈতিক অধঃপতন থেকে এল লোভ ও ব্যক্তিসম্পত্তি এবং সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য উৎপত্তি হল রাষ্ট্রের,—এ ধারণার পুনরাবৃত্তি করেছেন প্রথম শতকে সেনেকা এবং চতুর্থ শতকে সেন্ট্ অগস্টিন। এঁদের কথার আলোচনা স্থানান্তরে হবে।

বাদীরাও যে এমনি একটা মধুর স্বপ্নের আশ্রয় নিয়েছিলেন তা পূর্বে বলা হয়েছে। গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা এই ধারণার শরিক ছিলেন। ল্যাটিন দেশগুলিতেও এর ছায়া পড়েছে স্যাটার্নেলিয়া নামক উৎসবের মাধ্যমে যাতে করে শত শত বৎসর ধরে হারানো দিনের স্বাধীনতা ও মৈত্রী স্মরণ করা হত।[৫]

ভাবুক তার স্বপ্নকে ভোলেনি। কিন্তু কথা হল একে বাস্তব করে তুলবার, নিরাজ সমাজকে ফিরিয়ে আনবার কোন চেষ্টা হয়েছিল কি? পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক জায়গায় অরাজ বা অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ আছে—অবশ্য এদের নিন্দার সূত্রে। সুতরাং বেদোত্তর কালেও অরাজক সমাজের অস্তিত্ব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহ যে থাকলেও সংখ্যায় ও আকারে এরা ছিল নগণ্য এবং প্রতিবেশী শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির লুব্ধ দৃষ্টি এড়িয়ে টিকে থাকা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক যুগে নিরাজ সমাজের ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী।[৬]

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের সমর্থকরা অরাজক ব্যবস্থার স্বাভাবিক দুর্বলতাকে তাঁদের মতবাদের পিছনে যুক্তি হিসাবে খাড়া করলেন। মানুষের সহজাত প্রাকৃতিক জীবনকে তাঁরা চিত্রিত করলেন সাম্য ও সখ্যের আধাররূপে নয়, দ্বেষ ও দ্বন্দ্বের কুটিল আবর্তরূপে। আদিম মানব বন্য ও হিংস্র, তার একমাত্র লক্ষ্য আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।[৭] প্রাকৃতিক সমাজে তাই দুর্বলের স্থান নেই, সমস্ত অধিকার বলবানের। এখানে চলে মাছের রাজ্যের যুক্তি, যেখানে বড় মাছ ছোট মাছকে গ্রাস করে জীবন ধারণ করে। তাই রাষ্ট্রনীতি ও দণ্ডনীতির গ্রন্থে রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত শুরু হল মাৎস্যন্যায়ের উপকথা দিয়ে। মনুর ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও কামন্দকের নীতিসার সর্বত্র আছে একই কাহিনী—কেমন করে মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতার অবসান ঘটল রাজতন্ত্রের আবির্ভাবে, পরিবার সম্পত্তি ও ধর্ম সুরক্ষিত হল, রাষ্ট্রের বিধানে ত্রিবর্গলাভের

৫ অস্কার জাসি : এনসাইক্লোপীডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সস—'এনার্কিজ্‌ম্‌'।

৬ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল 'হিন্দু পলিটী' গ্রন্থে বলেছেন, "এই গৌরবময় কিন্তু প্রায় অসম্ভব ব্যবস্থা স্থাপন ও চালনা করবার জন্য নিশ্চয় হিন্দু ম্যাট্‌সিনি ও হিন্দু টলস্টয়দের আবির্ভাব হয়েছিল" (৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা)।

৭ প্রাকৃতিক সমাজের দুই বিপরীত চিত্রের সঙ্গে লক্‌ ও হব্‌স্‌-এর দর্শনের মিল লক্ষ্যণীয়।

পথ প্রশস্ত হল। মহাভারতের শান্তিপর্বেও এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বোঝাচ্ছেন যে কাম, অর্থ ও ধর্ম এই ত্রিবর্গের ফল নির্ভর করে রাজদণ্ডের উপর কারণ এর দ্বারাই মানুষের আচরণ নিয়মিত হয় (১৫. ৬৯)। এই প্রত্যয় হল রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি। এর গুরু হলেন শুক্রাচার্য,—যিনি এরিস্টটল-এর সগোত্র, যিনি বললেন—দণ্ডনীতি সকল শাস্ত্রের মূল এবং এর বিচার ও প্রয়োগের মান হল জনকল্যাণ (কামন্দকের নীতিসার, ৩. ৫)।

দণ্ড ও রাষ্ট্রপ্রভুত্বের মতবাদ থেকে এই অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছু কঠিন হল না যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ন্যায় ও নীতিবোধকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। বাতব্যাধি, ভারদ্বাজ, অম্ভীয়গণ এবং সর্বোপরি কৌটিল্য ম্যাকিয়াভেলির ন্যায় প্রচার করলেন যে ব্যক্তিক ও সার্বিক নীতিমান এক নয়। যেহেতু ব্যক্তির মঙ্গল রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যক্তির উপরে, রাষ্ট্রের ন্যায়দণ্ড ব্যক্তির নীতিমান দিয়ে পরিচালিত হবে না।

এই নীতিহীন রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল অরাজক আদর্শে। প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে এই আদর্শবাদীরা দাঁড়াতে পারেনি। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে লোকায়তরা চরম বস্তুবাদ প্রচার করে যেমন অপাংক্তেয় হয়ে গিয়েছিল, রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে উগ্র বিরোধী মত পোষণ করবার জন্য অরাজকদেরও সেই দশা হল। লোকায়তদের মত খণ্ডন করবার জন্য প্রতি-পক্ষরা তাদের যে সব বচনের উল্লেখ করেছেন সেই উদ্ধৃতিগুলি হতে লোকায়-তদের বক্তব্য যাকিছু জানা যায়—তাদের নিজস্ব কোন রচনা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেরূপ দণ্ডনীতির ধারকরা বিপক্ষের নিন্দাবাদ করবার জন্যে অরাজক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—এই কটূক্তি থেকেই জানা যায় যে অরাজক মতবাদটা একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না। জৈন আচারাঙ্গসূত্রে সাতরকম অরাজ-তান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি হল 'অরায়' (অরাজ) যেখানে যাওয়া মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পক্ষে নিরাপদ নয় (২. ৩. ১. ১০)। মহাভারতে বলা হয়েছে সব রকম রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে অধম হল অরাজক দেশ (১২. ৬৭. ৭)। এখানকার দুর্ভোগ অবর্ণনীয়।

> "যে দেশে রাজা নাই সে দেশে লোকেরা অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া ধ্বংস হয়; যাগযজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম বন্ধ হইয়া যায়; মেঘ বর্ষণ করে না; এবং দেবতারা অন্তর্ধান করেন" (১. ১০৫. ৪৪)।

রামায়ণের এক অধ্যায়ব্যাপী বর্ণনা আরও ভয়ানক। অরাজক জনপদ

অভাব ও অনাচার, আপদ ও বিপদের মধ্যে পড়ে উচ্ছন্ন যায়—"এ যেন জলহীন নদী, তৃণহীন অরণ্য, গোপহীন ধেনু" (২. ৬৭. ১০)।

এই বিভীষিকাগুলি নৈরাজ্যবাদীদের দমনে কার্যকরী হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রবাদীরা বেশী লাভবান হয়নি। ভারতীয় সমাজসংস্থা দুই চরম মতবাদের মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্র এখানে এক সর্বশক্তিমান দানবীয় আকার ধারণ করতে পারেনি। তার শক্তি ছিল বহুধা বিকেন্দ্রিত। দেশ জুড়ে ছিল গ্রাম, নিগম, শ্রেণী, সঙ্ঘ—তারা নিজেদের দৈনন্দিন কাজকারবার নিজেরাই চালাত, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হত না—সেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তিরক্ষায় সীমাবদ্ধ। এই আঞ্চলিক ও বৃত্তি-অবলম্বী প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মুক্ত ও স্বাধীন সহযোগিতার পীঠস্থান—কাল্পনিক অরাজক সমাজের ক্ষীণতম প্রতিচ্ছায়া। এদের স্বাধিকারের ওপর রাজশক্তির কোন এক্তিয়ার ছিল না। এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং কুল, বর্ণ, রাষ্ট্র ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হত রাজবিধান দিয়ে নয়, শাস্ত্রবিধান দিয়ে। প্রচলিত লোকধর্মই ছিল ধর্মশাস্ত্রের বিধান এবং এই বিধানকে বলবৎ রাখা ছিল রাজার কর্তব্য। সমাজকে শাসন করত দণ্ড নয় ধর্ম। রাষ্ট্রবাদীরা ধর্মকে দণ্ডের কবলে আনতে চেয়েছিল। তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে এইটুকুই নৈরাজ্যবাদীদের সার্থকতা। তাদের স্বপ্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শনে উত্তীর্ণ হয়নি, বাস্তবে রূপায়িত হয়নি—কিন্তু সমাজের বুকে তাদের প্রভাব স্বাক্ষর রেখে গেছে।

৩। গ্রীস ও পশ্চিম এশিয়া ঃ নগররাষ্ট্র বনাম বিশ্বরাষ্ট্র

"দৈনন্দিন গতানুগতিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ স্বভাবত প্রথম যে গোষ্ঠী রচনা করে তাহা হইল পরিবার।...পরবর্তী বৃহত্তর সংহতি হইল গ্রাম। ইহাই প্রথম সংহতি যাহা একাধিক পরিবার লইয়া গঠিত এবং যাহার উদ্দেশ্য দৈনন্দিন গতানুগতিক প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা বড়।...অবশেষে যখন গুটিকয়েক গ্রাম লইয়া সুসম্পন্ন গোষ্ঠীজীবন গড়িয়া ওঠে তখন আমরা উপনীত হই নগররাষ্ট্রে যাহার মধ্যে গোষ্ঠীজীবন চরম স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে। কিংবা এ কথাও বলা যায় যে যদিও নগররাষ্ট্রের উদ্ভব কেবলমাত্র জীবনের তাগিদে, ইহার অস্তিত্ব উত্তম জীবন যাপনের জন্য।...ইহা স্বতঃসিদ্ধ

যে প্রকৃতির রাজ্যের অন্যান্য বস্তুর মত নগররাষ্ট্রও একটি, এবং মানুষ নগররাষ্ট্রে বাস করিবে ইহাই প্রকৃতির নির্দেশ।"[১]

এরিস্টট্‌ল্‌-এর বচন। মানুষের গোষ্ঠীজীবন সম্প্রসারণের পরিণামে এমন এক সুষ্ঠু আকৃতি লাভ করে যার আশ্রয়ে সে তার জীবনলক্ষ্য খুঁজে পায়, যে লক্ষ্য হল "মহত্তম ও উচ্চতম জীবন অর্জন করা।"[২]

নগররাষ্ট্রের মাধ্যমে সৎ ও সুখী জীবনের কামনা সকলের জন্যে ছিল না। মুষ্টিমেয় জনকয়েক নাগরিকের বাইরে এই কামনার বিস্তার হয়নি। দাস, নারী ও বিদেশীদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। অবশিষ্টদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সততা বিধানের জন্যে ছিল আইনকানুন। এথেনীয়দের জুরী-সভায় ডেমস্থিনিস আইনের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"যাহা ন্যায্য, মান্য ও কার্যকরী আইন তাহাই চায়, তাহারই সন্ধান করে এবং তাহা পাইলে তাহাকে একটি সার্বজনীন নিয়মের আকার দেয় যাহা সকলের কাছে এক ও সমান। আইন তাহাকেই বলে যাহা সকলেরই নানা কারণে মানা উচিত, বিশেষ করিয়া এই জন্য যে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সৃষ্টি ও দান,—যাহা বিজ্ঞজনের প্রস্তাব, স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন, গোটা রাষ্ট্রের এক চুক্তি, যে চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের জীবন-যাপন করা কর্তব্য।"[৩]

"গোটা রাষ্ট্রের চুক্তি," "যাহা সকলের কাছে এক ও সমান" এমন আইনও গ্রীক নগররাষ্ট্রে সৎ ও সুখী জীবনের স্বপ্ন সম্ভব করে তুলতে পারেনি। যে কয়জন ভাগ্যবান নাগরিক অধিকার ভোগ করত তাদের মধ্যেও শ্রেণী-বিরোধের বিষ ছড়িয়ে পড়ে এই আদর্শকে ম্লান করে দিয়েছিল। স্পষ্টবাদী বিপক্ষদল যখন কটাক্ষ করত যে এই বহুবন্দিত আইন ক্ষমতাপন্নের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নয় এবং আইনের বিধানে দুর্বলের কোন অধিকার নেই তখন রাষ্ট্রবাদী দার্শনিকরা অনায়াসে জবাব দিতে পারতেন না। নগরের ভিতরে ছিল অবিরাম অন্তর্বিরোধ। বস্তুত প্রত্যেক নগর ছিল দুই নগরী,—

---

১ পলিটিক্‌স্‌: খণ্ড ১, অধ্যায় ২।

২ পলিটিক্‌স্‌: খণ্ড ৭, অধ্যায় ৮।

৩ জি. এল. ডিকিন্‌সন: দি গ্রীক ভিউ অব্‌ লাইফ, লণ্ডন. ১৯২০, ৭৩ পৃষ্ঠা।

"এক দরিদ্রের, আর এক ধনীর, যারা বাস করে একত্র অথচ সর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।"[৪] এ প্লেটোরই স্বীকারোক্তি যিনি মনে করতেন যে রাজনীতি মানুষকে ভাল করবার কৌশল।

এরিস্টটল্-ও লক্ষ্য করেছিলেন যে ধনী ও দরিদ্র দুই বিরোধী শ্রেণী নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত।[৫] গ্রীক নেতাদের ধারণায় রাষ্ট্র ছিল শ্রেয় ও সর্বময়, তাঁরা এরই মাধ্যমে ধনবৈষম্যের নিরসন কিংবা ধনিক প্রাধান্য কায়েম করতে চেয়েছিলেন—যেমন এথেন্সে সলোন ও স্পার্টায় লাইকার্গাস। প্লেটো তাঁর "রিপাবলিক" গ্রন্থে যে স্বপ্নরাজ্য রচনা করেছেন তাতে শাসকশ্রেণীর হাতে কোন ব্যক্তিসম্পত্তি রাখেননি; তাঁর আশা ছিল শাসকদের নিরাসক্ত যৌথ জীবন ধনসাম্য বিধানের প্রথম পদক্ষেপ হবে। কিন্তু দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্যের নিদারুণ চেহারা চোখের ওপর দেখেও গ্রীক মনীষা রাষ্ট্রের তথা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্লেটোর সাম্যনৈতিক রাষ্ট্রে উৎপাদক শ্রেণীর কোন অধিকার নেই। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকারের চেয়ে রাষ্ট্রের বনিয়াদ সুদৃঢ় করার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গড়া তাঁর কাল্পনিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রের ধুরন্ধররা এবং দার্শনিকরা ধনসাম্য আনতে চাননি; তাঁরা চেয়েছিলেন দ্বন্দ্বপর স্বার্থের একটা আপোসনিষ্পত্তি, একটা বৈধানিক বৈষম্য। কিন্তু আপোসরফা তাঁরা টিকিয়ে রাখতে পারেননি। উগ্র শ্রেণীবিদ্বেষ গ্রীকদের রাষ্ট্রজীবনকে বিস্ফোরণের আঘাতে চুরমার করে দেবার জন্যে যেন সর্বদাই উদ্যত হয়ে ছিল।

এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চাপে যখন নগররাষ্ট্র ভেঙে পড়তে লাগল তখন থেকে দেখা দিল রাষ্ট্রবিরোধী ধ্যানধারণা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শুরু থেকে বিদেশীরা এসে দলে দলে নগররাষ্ট্রে ঢুকতে লাগল। গ্রীক রাষ্ট্রের আত্মসর্বস্ব জীবনে ভাঙন ধরল, গ্রীক সংস্কৃতি ও দর্শনের বন্ধ দরজা খুলে গেল। আগন্তুকরা শুধু গ্রীকদের সমান নাগরিক অধিকার দাবি করল না, তারা বিদ্রোহ করল কূপমণ্ডুক নাগরিক মনোবৃত্তির ও পাঁচিলঘেরা সমাজজীবনের বিরুদ্ধে। তারা নিয়ে এল এক উদার বিশ্বরাষ্ট্রের বাণী যার দরজা দেশ জাতি

৪ রিপাবলিক : ৮, ৫৫১

৫ পলিটিক্স্ : খণ্ড ৬, অধ্যায় ৩।

নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যে অবারিত। এরা 'সিনিক' নামে পরিচিত হল। এই গোত্রের জনক এন্‌টিস্থিনিস (অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪৬-৩৬৬) ছিলেন প্লেটোর সমসাময়িক। এঁর পিতা ছিলেন এথেনীয় নাগরিক আর মাতা থ্রেসের এক দাসী। এঁর শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন প্রাচ্য দেশের আগন্তুক—যথা, থ্রেসের মেট্রোক্‌লস ও হিপারকিয়া, এশিয়াবাসী বায়ন ও ডায়োজিনিস, ফিনিশিয় মেনিপাস। এঁরা সব জারজ বলে গণ্য হতেন এবং এথেন্সে এঁদের নাগরিক মর্যাদা ছিল না। হেরাক্লিসের মন্দিরের নিকটে এই সব বর্ণসঙ্কর অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেদের এক পাঠশালা ছিল। এন্‌টিস্থিনিস ছিলেন এর শিক্ষক। প্রবাদ ছিল যে হেরাক্লিস এখানে পাতালের কুকুর সার্‌বেরাসকে তুলে এনেছিলেন। সেই থেকে মন্দিরের নাম হয়েছিল সাইনসার্জেস বা কুকুরশালা। কুকুরশালার নিকটবর্তী পাঠশালার গুরুশিষ্যদের এথেন্সের কুলজ ছেলেরা ডাকত 'কুত্তার দল' বলে। এন্‌টিস্থিনিসের প্রধান শিষ্য ও উত্তরসূরী ডায়োজিনিস সগর্বে এই নাম গ্রহণ করেন। সেই থেকে এই অপসদ দার্শনিকদের পরিচয় হল সিনিক বা কুত্তার দল নামে।

সিনিকরা প্রেরণা পেয়েছিলেন সক্রেটিস থেকে। সক্রেটিস গ্রীক গণতন্ত্রের কয়েকটি দিক ধরে সমালোচনা করেছিলেন। এঁরা গ্রীক সভ্যতার প্রত্যেকটি অঙ্গ ও অনুষ্ঠানকে ধরে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। সমগ্র পৌরজীবন হল এঁদের আক্রমণের লক্ষ্য,—সম্পত্তি, পরিবার, শাসনব্যবস্থা এবং যা কিছু স্থানগুণে ও নামগুণে শ্রেয় বলে ধর্তব্য কিছুকেই এঁরা রেহাই দিলেন না। এন্‌টিস্থিনিস তাঁর বৈদেশিক রক্তের জন্যে টিট্‌কারি খেয়ে জবাব দিয়েছিলেন "পোকামাকড়ে ভর্তি এটিকার মাটি নিয়ে গর্বিত হবার আমি তো কোন কারণ দেখছি না।" এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রতিও তাঁর কোন মমতা ছিল না। নাগরিকদের তিনি পরামর্শ দিতেন ভোট দিয়ে গাধাকে ঘোড়া বানাতে। তাদের হাসির উত্তরে তিনি বলতেন, "তোমাদের সেনাবিভাগে তো এমন লোক আছে যাদের কোনো সামরিক শিক্ষা নেই অথচ যাদেরকে তোমরা ভোট দিয়ে সেনাপতি বানিয়েছ।"। তাঁর গুরু গর্‌গিয়াস গ্রীকদের নগরপ্রেমকে ঘৃণার চোখে দেখতেন কারণ এ থেকে গ্রীকদের জীবনে এসেছে নগরে নগরে রেষারেষি ও চিরন্তন অন্তর্যুদ্ধের অভিশাপ। সিনিকরাই প্রথম সাম্যবাদী দার্শনিক। লাইক্রোফোর্নি অভিজাতদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতাকে বিদ্রূপ করতেন। এল্‌সিডেমাস মুক্তমানুষ ও দাসের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখতে পারতেন না।

ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র তাঁদের কাছে মনে হল অসহ্যরকম সঙ্কীর্ণ। তাঁরা এর দেয়াল ভাঙবার জন্যে তৈরী হলেন।

তরুণ বয়সে এন্‌টিস্থিনিস থাকতেন পাইরিউস-এ। সেখান থেকে প্রতিদিন পাঁচ মাইল পথ হেঁটে তিনি এথেন্সে আসতেন সক্রেটিসের কথা শুনবার জন্যে। এখান থেকে তিনি পেয়েছিলেন হৃদয়ের মায়া-মমতাকে জয় করে মনকে উদাসীন ও শক্ত করবার শিক্ষা। তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হলেন যে কেবল সক্রেটিসের মতো মনের জোর থাকলেই সৎ হওয়া যায় আর মনের সুখের জন্যে সৎজীবনই যথেষ্ট, আর কিছুর দরকার হয় না। তিনি লিখে গেছেন প্রচুর—রচনাগুলি দশ খণ্ডে সংকলিত; যার জন্যে টাইমন তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "বাজে কথার বাক্যবাগীশ।" তাঁর অধুনালুপ্ত গ্রন্থ "আইন ও কমনওয়েল্‌থ্ প্রসঙ্গে"তে তিনি গ্রীকদের ধোপদুরস্ত নৈতিক সংস্কার ও আদবকায়দার সঙ্গে আদিম বর্বরদের স্বভাবসঙ্গত সুখী জীবনের তুলনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি প্রকৃতিবাদী রুশোর পূর্বসূরী। গ্রীক চিন্তানায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম, যাঁর ধ্যানমানসে ফুটে উঠেছিল অতি পুরাতন নিরাজ সমাজের ছবি, যাতে প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে শাসনহীন বন্য মানুষ ভরা জীবনের আনন্দে বিচরণ করছে। তিনি কল্পনার চোখে দেখতেন যে থ্রেসের বনচারী আদিম লোকেরা তাদের শিকারদেবতা ডায়োনিসাস্-এর ঐতিহ্য বহন করে গহন অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অজিনবাস অর্ধপশুর দল পশুসমাজের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, অথবা সিংহের চামড়া পরে মুগুর হাতে অমিতবিক্রম হেরাক্লিস দেশ-দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে কোথায় অশুভ ও অন্যায় মানুষকে পীড়ন করে তাকে নির্মম আঘাতে নাশ করবার জন্যে। এর কাছে কৃত্রিম হেলেনিক সভ্যতা, বদ্ধ নগরের অচলায়তন!

যত কিছু বেদনা ও অবিচারের বীজ শহরে—তার পোশাক, প্রাসাদ, আইন, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সভ্যতার কারিকুরির মধ্যে। নীতি ও সততা অন্তরের জিনিস এবং তার ব্যাপ্তি বিশ্বময়, বাইরের বিধিবন্ধনে অথবা প্রতিষ্ঠান গড়ে এ জিনিস রাখা যায় না, বরং তাতে এই স্বাভাবিক সম্পদ নষ্ট হয়। উপকথার স্বর্ণযুগে ক্রোনস্-এর নিরাজ রাজত্বে মানুষ ছিল সমান, পশুর মতো যূথবদ্ধ, তাদের চালনা করতেন জ্ঞানী ঋষিরা—যাঁরা সকল মানুষ ও পশুর ভাষা জানতেন। রাষ্ট্র ও তার আইনকানুন বর্জন করে, প্রকৃতির সার্বজনীন

নিয়মের অধীনে এই সহজ জীবন নিয়েই মানুষের থাকা উচিত ছিল—যাকে প্লেটো ঘৃণাভরে বলেছেন শুয়োরের উপযুক্ত জীবন।[৬]

ডায়োজিনিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪০৪-৩২৩)-এর আদি নিবাস ছিল কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সাইনপি নগরে। সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি এথেন্সে এসে বসবাস করেন। এখানে এসে তিনি এন্‌টিস্থিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন যেমন এন্‌টিস্থিনিস পড়েছিলেন সক্রেটিসের পাল্লায়। কিন্তু গুরু শিষ্যটিশু পছন্দ করতেন না। একবার তিনি লাঠি তুললে শিষ্য মাথাটি এগিয়ে দিয়ে বলল, "বসিয়ে দাও, কিন্তু যতক্ষণ আমি মনে করব তোমার কিছু বক্তব্য আছে ততক্ষণ তোমার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবার মত শক্ত কাঠ তুমি খুঁজে পাবে না।"[৭] শিক্ষকের কাছ থেকে নাছোড়বান্দা শিষ্য যে পাঠ পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখছেন—

> "তিনি আমাকে শিখাইয়াছেন যে আমার নিজস্ব বলিতে আছে একমাত্র আমার মনের স্বাধীন চিন্তা।"

ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে ছাঁটাই করে তিনি যৎসামান্যতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন,—কৃচ্ছ্র সাধনের কিছু বাকি রাখেননি। তাঁর পোশাকের মধ্যে ছিল এক কুর্তা, ওটি বিছিয়ে তিনি শুতেন। আর ছিল খাবার জিনিস রাখবার একটি ঝোলা। এতে একটি বাটিও থাকত। একদিন তিনি দেখলেন একটি ছেলে আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে,—বুঝলেন সাদাসিদা জীবনযাপনে ছেলেটি তাঁকে হার মানিয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঝোলা থেকে বাটিটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন (৩৯)। তাঁর হত "ভোজনম্ যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।" তবে আবাস একটা ছিল, সেটি হল মেট্রোউনের একটি গামলা। বিশ্রামের সময়ে তিনি ওটিতে গিয়ে বসতেন। তাঁর ডায়লগ্‌স্ বা কথাবার্তায় তিনি কৃচ্ছ্রতত্ত্বের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে ভোগসুখ বর্জন করে সে অল্পে সুখী হতে অভ্যস্ত হয় এবং প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় তার রুচি থাকে না। কষ্টসহিষ্ণু হয়ে তৈরী হলে মানুষ ভোগসুখে যে সুখ পায় তার চেয়ে বেশী সুখ পায় ভোগ-

৬ রিপাবলিক : ২. ৩৭২।

৭ ডায়োজিনিস লারসিয়াস : লাইভস্ এণ্ড ওপিনিয়নস্ অব্ এমিনেন্ট ফিলসফার্স। অনুবাদ : আর. ডি. হিক্‌স্। লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯২৫। খণ্ড ২, ২৫ পৃষ্ঠা। এ বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠা-নির্দেশ যথাস্থানে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

সুখকে উপেক্ষা করে। অবস্থার ফেরে ভোগীদের যে দুঃখভোগ করতে হয় সরল বিরাগী জীবনে সে বালাই নেই।

নিঃস্ব ও কঠোর জীবন বরণ করেও ডায়োজিনিস তাঁর সাহস ও ব্যক্তিত্ব হারাননি। এ বস্তু কতখানি থাকলে কুলিনদের দেওয়া 'কুকুর' উপাধি হাসতে হাসতে নেওয়া যায় তা অনুমানসাপেক্ষ। শোনা যায় একবার সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার তাঁর সামনে এসে ঘোষণা করলেন, "আমি মহাবীর আলেকজাণ্ডার।" চট করে জবাব এল "আমি সিনিক ডায়োজিনিস।" দাম্ভিক সম্রাট্ নাকি পরে বলেছিলেন, "যদি আমি আলেকজাণ্ডার না হতাম তা হলে ডায়োজিনিস হতে চাইতাম।" (৩৫)

সমকালীন দার্শনিকপ্রবর প্লেটোর বিরুদ্ধে ডায়োজিনিস অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছেন, তিক্ত উপহাসে প্রতিপক্ষকে তিনি জর্জরিত করেছেন যেমন চুয়াংৎসে করেছিলেন মেনসিয়াসকে। একবার প্লেটো আকাদামিতে মানুষের সংজ্ঞা এই বলে নিরূপণ করেছিলেন—"মানুষ এমন এক জীব যার দুটি পা আছে অথচ পালক নেই।" বলে তিনি খুব প্রশংসা পেলেন। ডায়োজিনিস একটি মুরগীর পালক ছাড়িয়ে বক্তৃতার ঘরে নিয়ে এসে বললেন, "এই দেখ প্লেটোর মানুষ।" প্লেটো নাকি তাঁর মানবসংজ্ঞা সংশোধন করেছিলেন, "যার চওড়া নখ আছে," এই কয়টি শব্দ যোগ করে। আর একবার ডায়োজিনিসকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল খেলোয়াড়রা এত বোকা হয় কেন? জবাব এল "কারণ তারা শুয়োরের আর গরুর মাংস দিয়ে তৈরী।" প্লেটো একজন নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন এবং করিন্থের প্রতিযোগিতায় দুবার জয়মাল্য পেয়েছিলেন।

ডায়োজিনিস প্লেটোর সম্বন্ধে বলতেন একটি অনর্গল বাক্যবাগীশ। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্লেটোর টিপ্পনী ছিল সক্রেটিস ক্ষেপে গেলে যা হতেন তাই (৫৫)। বাচাল ও বাতুলের একটা জায়গায় মিল ছিল। দুজনেই সমর্থন করতেন স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর পুরুষদের যৌথ স্বামীত্ব ও পিতৃত্ব।

ডায়োজিনিসের চিন্তা-ভাবনা সাতটি ট্রাজেডী এবং পনেরটি ডায়লগে প্রকাশিত। এর মধ্যে একটি ছিল প্লেটোর রিপাবলিকের পাল্টা রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র। জন্ম ও খ্যাতির অহঙ্কারকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলতেন এগুলি পাপের ভূষণ। দাস ও প্রভুর পার্থক্য তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। তাঁর মতে ধাতুমুদ্রার প্রচলন যত নষ্টের গোড়া। টাকার লোভ দূর করতে হলে

একে তুলে দেওয়া উচিত। লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে টাকার বদলে ভেড়ার হাড় দিয়ে কাজ চলতে পারে যা কেউ জমিয়ে রাখবে না। তাঁর কালাপাহাড়ি মনোবৃত্তি নিয়ে তিনি কোন বিধান ভাঙতে সঙ্কোচ করতেন না। মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি করতে কিংবা যেমন তেমন পশুর মাংস খেতে তাঁর কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। যুক্তি খুব পরিষ্কার। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকল বস্তুর অধিকারী; কারণ সকল বস্তু দেবতাদের সম্পত্তি, দেবতারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের বন্ধু, বন্ধুরা সম্পত্তিকে সমানভাবে ভোগ করে (৭৩)। এই যুক্তি থেকেই যৌথ স্বামীত্ব ও যৌথ পিতৃত্বের তত্ত্ব এসেছে। সাইনপিতে টাকা জাল করার অপরাধে নাকি ডায়োজিনিসের নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। যাঁর কাছে মুদ্রারই কোন মূল্য নেই; সোনা রূপা তামা সীসা যাঁর কাছে এক তাঁর কাছে জাল মুদ্রা কথাটাই অর্থহীন। সুতরাং তিনি যদি তামার চাকতিকে গিনি বলে চালিয়ে থাকেন তাতে নিজের নৈতিক মানদণ্ডে তিনি অপরাধী হননি। তিনি নিজের পরিচয় দিতেন বিশ্বের নাগরিক বলে, বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বই একমাত্র সার্বজনীন রাষ্ট্র এবং তার শাসন চলে সর্বসাধারণের প্রাকৃতিক অধিকারের নিয়মে। হেরাক্লিসের মত স্বাধীন মুক্ত জীবন যাপন করবেন এই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা।

তাঁর স্বাধীনতার ধারণা কেমন ছিল তা তাঁর কথার চেয়ে জীবনকাহিনী থেকে ভাল বোঝা যায়। একবার সমুদ্রপথে ঈজিনায় যেতে তিনি জলদস্যুর হাতে পড়লেন। বন্ধুরা জামিনের টাকা দিয়ে তাঁকে মুক্ত করতে চাইল। ডায়োজিনিস তাঁদের ধমক দিয়ে বললেন সিংহ কখনো যে তাকে খাওয়ায় তার দাস হয় না, বরং যে খাওয়ায় সেই সিংহের দয়ার ওপর থাকে। দস্যুরা তাঁকে বিক্রি করবার জন্যে বাজারে নিয়ে এল, হাঁকদার জিজ্ঞাসা করল সে কি কাজ জানে। পণ্য উত্তর দিল "মানুষের ওপর প্রভুত্ব করা", আর পরামর্শ দিল এমন খরিদ্দারের জন্য হাঁক দাও যে একজন প্রভু কিনতে চায়। জেনিয়াণ্ডিস নামে একজন তাঁকে কিনে নিয়ে গেল এবং সত্যই তাঁকে ছেলেমেয়েদের অভিভাবক ও গৃহকর্তা করে নিযুক্ত করল (৭৭)।

চুয়াংৎসের মত ডায়োজিনিসও মরবার আগে বন্ধুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর দেহ যেন কবর না দিয়ে বাইরে ফেলে রাখা হয় যাতে বন্য পশুরা তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের বন্ধুরাও বন্ধুই হয়, দার্শনিক হয় না। মৃত্যুর পর তারা তাঁর সৎকার করে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং প্রশস্তিবচন লিখলেন—

"কালের ছোঁয়ায় ব্রোঞ্জের মূর্তি পুরানো হয়ে যাবে : কিন্তু ডায়োজিনিস, তোমার গরিমা নিরবধি কালও নষ্ট করতে পারবে না। কারণ একমাত্র তুমিই নশ্বর মানুষকে আত্ম-সন্তুষ্টির শিক্ষা দিয়েছ এবং জীবনের সহজ রাস্তা দেখিয়েছ।"

যাঁদের মাথায় ডায়োজিনিসের পাগলামির ছোঁয়াচ লেগেছিল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন থিবিসের ক্রেটিস। ডায়োজিনিসের উপদেশে তিনি তাঁর চাষের জমি ভেড়ার পাল চরবার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর সব টাকাপয়সা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি কোন ঘরের দরজার বাধা মানতেন না, বাধা ভেঙে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়া ছিল তাঁর অভ্যাস। কয়েক ছত্র কবিতায় তাঁর মনের পরিচয় মেলে—

"একটা দেশের মঞ্চে ছাদের তলায় কি বাস করব ?
সারা পৃথিবী জুড়ে মিনার উঠেছে
তার মধ্যে আমাদের সকলের ঠাঁই।" (১০৩)

তখন নগররাষ্ট্রের সূর্য ম্যাসিডনের পাদমূলে অস্ত যাচ্ছিল। তবুও উদীয়মান বিশ্বরাষ্ট্রের চেতনা ছিল বিদগ্ধসমাজে ব্যঙ্গের বস্তু। কিন্তু পণ্ডিতের সভার এবং বনিয়াদী বিদ্যালয়ের বাইরে এর আসর পড়ছিল দ্রুত। ক্রেটিস্-এর শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন অসাধারণ। তিনি সিনিকদের তত্ত্বকে দার্শনিক রূপ দিলেন। ইনি স্টোইক ঋষি জেনো।

প্লুটার্ক বলেছেন, "আলেকজাণ্ডার তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে সিনিক আদর্শের রাজনৈতিক দিকটা বাস্তবে পরিণত করেছিলেন।"[৮] তা অবশ্য নয়, কারণ সিনিকরা সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তবে তিনি সিনিকদের সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের নীতিকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে গ্রীক ও বর্বর বলে কোন পার্থক্য করা হত না এবং পারসীক ও ম্যাসিডনীয়দের একত্র করে তিনি সর্বজাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়েছিলেন। গণতন্ত্রের পতন এবং একতন্ত্রের উত্থানের ফলে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের নাড়ির যোগ ছিন্ন হল। রাষ্ট্রীয় দর্শনের অবলম্বন হল নগর নয়, নাগরিক। জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিদর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত হল চরম ব্যক্তিবাদ যার প্রচার করলেন স্টোইকরা।

৮ গোম্পারজ্ : গ্রীক থিংকারস্. ২. ১৬১।

সিনিকদের মত স্টোইকরাও ছিলেন প্রধানত এশিয়াবাসী। এঁদের আচার্য জেনো জাতিতে ফিনিশিয়ান। অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬ সালে সাইপ্রাস দ্বীপের কিটিয়ন নগরে তাঁর জন্ম হয়, যার বর্তমান নাম লারনাকা। ফেলেরামের ডেমেট্রিয়াস যখন এথেন্সের শাসনকর্তা ছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৭-০৭) তখন তিনি এই নগরীর একটি স্তম্ভঘেরা প্রাচীরচিত্রখচিত ঘরের অঙ্গনে তাঁর মত প্রচার করতেন। এই বাড়িটিকে বলত স্টোয়া। সেই থেকে জেনোর গোষ্ঠীর নাম হল স্টোইক। তাঁর পরবর্তীরা অনেকে ছিলেন বিদেশী। হেরিলাস এসেছিলেন কার্থেজ থেকে, ক্রিসিপাস সাইপ্রাস থেকে, দ্বিতীয় জেনো ও এন্টিপেটর আনাটোলিয়ার টারসাস থেকে, পসিডনিয়াস সীরিয়ার এপামিয়া থেকে, আর ডায়োজিনিস টাইগ্রিসের তীরে সৈলুসিয়া থেকে।

স্টোইক দর্শনের মূলে আছে এক ভগবৎ-তত্ত্ব। ঈশ্বর পরম প্রজ্ঞান ও পরম প্রকৃতি। তাঁর সত্তা তেজোময়। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আছে ঐশ্বরিক তেজের এক ক্ষুদ্র কণিকা যা তার জীবনের আলো। ভাগবত সত্তা সকলের মধ্যে সমানভাবে বিধৃত, এই সত্তার আলোক মানুষেরই প্রজ্ঞান ও প্রকৃতির আলোক। এই আলোকে যারা পথ চিনে নেয় তারা যাত্রা শেষে বিশ্বের আধার ঐশ্বরিক তেজোময় সত্তায় ফিরে যায়।

এই ভগবৎ-তত্ত্ব থেকে এল ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্ব, নৈতিক আদর্শ এবং চরিত্রমান যার প্রভাব হয়েছিল মূল তত্ত্বের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। প্লেটো ও এরিস্টট্‌ল্‌-এর বিরুদ্ধে স্টোইকরা এই মত নিয়ে এলেন যে সকল জ্ঞানের আদি উৎস ব্যক্তি। ব্যক্তির মন বাহ্য ঘটনার অনুভূতি নিয়ে সজ্ঞান হয় কিংবা স্বকীয় বুদ্ধি দিয়ে চিন্তাভাবনার জ্ঞানলাভ করে। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিপাদ্য হল যে ব্যক্তির ভালমন্দ নির্ভর করে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার এবং নিজের আচরণ প্রকৃতির নিয়মে পরিচালনা করবার ক্ষমতার ওপর। আদিতে প্রকৃতির নিয়ম ছিল স্বাভাবিক বৃত্তির তাগিদে চলা। পরে যখন স্বাভাবিক বৃত্তিকে সংযত করবার জন্যে উন্নত জীবে বুদ্ধির বিকাশ হল তখন এই বুদ্ধিমান জীবদের বেলা বুদ্ধির নিয়মে চলাই হল প্রকৃতির নিয়মে চলা। খাঁটি স্টোইক বিশুদ্ধ বুদ্ধির আলোতে কর্তব্যের পথ দেখতে পায় এবং দেখবার পর কোন কিছুই তাকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না;—তা হৃদয়ের আবেগই হোক আর বাইরের বাধা-বিঘ্নই হোক।

এই বিবেকবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল এক সমাজদর্শন যা স্টোইকদের

ঐশ্বরিক ধারণা ও নৈতিক চেতনার চেয়েও গ্রীক মনোভাবের প্রতিকূল। গ্রীকরা ছিল জাতিসর্বস্ব, তাদের বিশ্ব-প্রতীতি ছিল না। পক্ষান্তরে স্টোইকরা ব্যক্তিবাদী হয়েও হলেন বিশ্ববাদী। কারণ ব্যক্তি ও বিশ্বে কোন বিবাদ নেই। আত্মপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যেহেতু প্রজ্ঞান বিশ্বব্যাপী ঐশ্বরিক জিনিস সে হেতু একজনের প্রজ্ঞানলব্ধ বিচার অপরের থেকে পৃথক্ হতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মূলত একই রকমের কারণ তাঁদের ইচ্ছা এক, অধিকার সমান। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামাজিক ব্যক্তিও বটেন কারণ বুদ্ধির ব্যাপ্তি সারা সমাজ জুড়ে। সমাজ যখন বুদ্ধির ওপর অধিষ্ঠিত তখন যতদূর বুদ্ধির বিস্তার সমাজেরও বিস্তার হবে ততদূর। সমগ্র মানবজাতি প্রজ্ঞানের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। ব্যক্তিপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির অবিভাজ্য অংশ। যা সার্বজনীন নিয়মে নিষিদ্ধ অর্থাৎ সকল লোকের বুদ্ধির কাছে যা হেয় এমন কাজ বুদ্ধিমান ব্যক্তি করেন না। এই কর্তব্যবোধই সততা এবং এই কর্তব্যপালনই সুখ। যখন কর্মের মধ্যে ব্যক্তির অন্তরাত্মা ও বিশ্বের বহিরাত্মার মিলন হয় তখনই স্বাদ পাওয়া যায় পরম আনন্দের।

সুতরাং প্রকৃতিপরায়ণ জীবন হল বুদ্ধিপরায়ণ জীবন, সৎ ও সুখী জীবন। সততাই সুখ কারণ সততা জীবনকে দেয় সামঞ্জস্য, সঙ্গতি। এই বাণী স্টোইক দর্শনের সারমর্ম। যেমন আলঙ্কারিক এথেনিউস এঁদের সম্বোধন করে বলেছেন—

> "ধন্য তোমরা যারা স্টোয়ার পাঠ আয়ত্ত করেছ
> আর তোমাদের দিব্য পুঁথিতে পরিবেশন করেছ
> জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, শিখিয়েছ মানুষকে
> মনের সততাই পরম বরণীয়
> সে দেবীর হাতে লোকের ও নগরের জীবন
> উঁচু দেওয়াল ও দরজার চেয়ে সুরক্ষিত।" (১৪৩)

প্রকৃতির বন্ধন অনন্ত। অপর যা কিছু বন্ধন যেমন রাষ্ট্রের বন্ধন, তা অবান্তর ও গৌণ, তাদের বিচার যোগ্যতার মাপকাঠিতে। প্রকৃতির নিয়ম থেকে উদ্ভব কর্তব্যের, এর দাবি মৌলিক। রাষ্ট্রের আইন থেকে আসে বাধকতা, এর মূল্য প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। প্রজ্ঞানী ও নীতিবান ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্র অপরিহার্য বস্তু নয়।

এই প্রকারে রাজনীতি হল ন্যায়ের নীতি ও প্রকৃতির নীতি থেকে স্বতন্ত্র।

স্তায়বান মানুষ শাসনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। সৎ ব্যক্তি সৎ নাগরিক থেকে পৃথক্ এবং গরীয়ান। "মহত্তম ও উচ্চতম জীবন" লাভের উপায় রাষ্ট্র নয়, স্তায়ধর্ম। স্তায়সঙ্গত পথে চলে মানুষ তার ব্যক্তি-জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, প্রকৃতির নিয়মের অধীনে এক বিরাট বিশ্বসংসারে সে পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে হয় বিশ্বনগরের নাগরিক।

বস্তুত স্টোইকদের বিশ্বনগর নগরও নয় রাষ্ট্রও নয়। পলিস্ বা নগররাষ্ট্রের মত কস্‌মপলিসের কাজ রাজশাসন ও রাজদণ্ডের জোরে চলে না। এ প্রজ্ঞানের সাম্রাজ্য যাতে কারও ওপর কেউ কর্তৃত্ব করে না। এতে স্বেচ্ছাচার ও অনাচার চলে না। রাজত্ব না থাকলেও এতে অরাজকতা নেই। দায়িত্ববোধ, আত্মসংযম ও নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা এর কাজ চলে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই এগুলোকে মেনে নেন। স্বাভাবিক আত্মমর্যাদার বশে তাঁকে যুক্তিবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ কামনা বাসনা দমন করতে হয়। পদার্থ জগতের ও মানব সমাজের বিধায়ক যে পরম কর্তৃত্ব, একমাত্র তার কাছেই তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষা সমর্পিত।

এন্‌টিস্থিনিস ও ডায়োজিনিসের চেয়ে জেনো নৈরাজ্যবাদের আরো সুসঙ্গত ব্যাখ্যান দিলেন। তাঁর অধুনালুপ্ত রিপাবলিক প্লেটোর রিপাবলিকের প্রতিবাদ। প্লেটো চেয়েছিলেন এক যুথবদ্ধ অভিজাত গোষ্ঠীর শাসনাধীনে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র। জেনোর প্রজাতন্ত্রে শাসন নেই। এই প্রজার রাজ্যে অবাধ মুক্তি ও সাম্য মানবপ্রকৃতির আদিম সততা ফিরিয়ে এনেছে এবং তার মারফৎ বিশ্বমানবের মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। প্লুটার্ক জেনোর নৈরাজ্যবাদ সম্বন্ধে বলেছেন—

> "তিনি বলতেন আলাদা আলাদা নগররাষ্ট্র, তাদের স্বকীয় বিচার-ব্যবস্থা যা অপর সকলের থেকে আলাদা—এর কোন মানে নেই। সবাই হবে পরস্পরের দেশওয়ালি ভাই। সকলের হবে এক জীবন এক বিধি, যেমন নিরীহ পশুর পাল সাধারণ নিয়মের বশবর্তী হয়ে ইচ্ছামত চরে বেড়ায়।"[১]

আসল রাষ্ট্র হল নিখিল জগত। এর আইন প্রকৃতির বা প্রজ্ঞানের সহজ

---

১ এনসাইক্লোপীডিয়া অব্ সোস্তাল সায়েন্সেস : আর্নেস্ট বার্কার—'স্টোইক্‌স্'।

নিয়ম। প্রত্যেক বুদ্ধিমান নরনারী এর নাগরিক। সীরিয়ার কবি মেলিয়াজার এই ভাবনার শরিক ছিলেন—

"আমি সীরিয়াবাসী এতে অবাক্ হবার কি আছে? হে বিদেশী!
মাতৃভূমি একটিই আছে যেখানে সকলের বাস, সে নিখিল জগত:
একই পিতার সন্তান আমরা, সে হল মহাশূন্য।"

জেনোর অভিযান কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। ধর্ম, পরিবার, স্কুল কলেজ, মুদ্রা ইত্যাদি যাবতীয় চিরাচরিত প্রথা ও প্রতিষ্ঠান তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। আদর্শ নগরীর কোন মন্দির ও মূর্তির দরকার নেই কারণ তাদের যত কিছু শিল্পসৌকর্য তা মানুষের উপযুক্ত, দেবতার নয়। বিবাহ ও পারিবারিক জীবন, আইন ও আদালত, বেচাকেনার জন্যে মুদ্রা এখানে এসবের প্রয়োজন নেই। স্কুল কলেজের মামুলি কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাও এখানে অনাবশ্যক। এখানে পুরুষ এবং নারীতে কোন পার্থক্য নেই এবং উভয়ের পোশাক এক রকম। প্লেটো এবং সিনিক ডায়োজিনিসের মত জেনোরও মত ছিল যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাজে স্ত্রীরা হবে সার্বজনীন, এর মধ্যে সাময়িকভাবে ইচ্ছামত যে যার সঙ্গী-সঙ্গিনী বেছে নেবে। এই প্রথায় ব্যভিচার ও যৌন বিদ্বেষ দূর হবে এবং পিতাদের মনে সন্তান নির্বিশেষে বাৎসল্য জন্মাবে।

জেনোর কথা ও কাজে তফাৎ ছিল না। তাঁর অ হেলেনিক সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে তিনি নিজের জীবন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। "এশিয়াবাসীর কাল চামড়া নিয়ে" তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, এথেন্সের নাগরিক মর্যাদা তিনি গ্রহণ করেননি। দাসদের তিনি নিজের মত দেখতেন। এথেন্সের নাগরিকরা তাঁকে যে ভাবে বর্ণনা করেছে তাতে তাদেরই বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে। তাদের ব্যঙ্গচিত্রে ইনি নাদুসনুদুস, গোদা-পা, রোদে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বিশ্বনিন্দুক টাইমন বলছেন—

"এক ফিনিশিয়কেও আমি দেখেছি; সে এক বুড়ির মত নিজের গুমরে মশগুল, সব কিছু তার চাই; কিন্তু তার বাক্যজালের চক্করগুলো ছিঁড়ে গেছে এবং একটি তানপুরার চেয়ে তার বেশী বুদ্ধি নেই।"

কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি এথেনীয়দের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, যা সিনিকরা পাননি। ব্রোঞ্জের মূর্তি গড়ে সোনার মুকুট পরিয়ে তাঁকে তারা

সম্মান করেছিল। শিষ্য জেনোডোটাস তাঁকে অভিহিত করেছিলেন "নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার নিষ্পাপ পূজারী" বলে। এই স্তুতির সঙ্গে এথেন্সবাসীরা সুর মিলিয়েছিল।

ক্রিসিপাস ভিন্ন[১০] জেনোর অপর শিষ্যরা তাঁর মত চরমপন্থী ছিলেন না। তাঁরা মন্দির, স্কুল, আদালত, পরিবার, টাকা পয়সা ইত্যাদি প্রাচীন প্রথাকে উড়িয়ে দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা গুরুর সাম্যবাদকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর ভেদ স্বীকার করেননি। তাঁরা প্রভু ও দাস, নর ও নারীকে সমান চোখে দেখেছেন; বিবাহকে তাঁরা মেনেছেন —কিন্তু দম্পতির সম-অধিকারের ভিত্তিতে।

সিনিক ও স্টোইকদের সবগুলি রচনা হারিয়ে গেছে। এঁদের টুকরো টুকরো ভাবনা ও মতবাদ কুড়িয়ে নিতে হয় অন্যদের, বিশেষ করে বিবাদী-পক্ষের উদ্ধৃতি থেকে। ভারতীয় লোকায়ত ও অরাজকীদের মত এঁদেরও অনেক বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। স্টোইকদের এপেথিয়া-নীতি হল শান্ত স্থির মন নিয়ে সব জিনিস দেখা। বিপক্ষদল এই নীতিকে বিকৃত করে হতাশাবাদ বলে প্রচার করল। তারা প্রচার শুরু করল যে স্টোইকরা জীবনের আনন্দ ভুলে গিয়ে আত্মনাশা নিরাশাকে আঁকড়ে ধরেছে। এই থেকে প্রাচ্য বৈরাগ্য ও নিয়তিবাদ কথাটার সূত্রপাত। কিন্তু পৌরজীবনের পেগেন আনন্দ তখন কোথায়? গ্রীসের নগর শেষ হয়ে গিয়েছে, রোমেরও প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে। বনিয়াদী বিদগ্ধরা অতীতের রোমন্থনে নিমগ্ন। পক্ষান্তরে স্টোইকরা বাস্তব জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে মনের শান্তি খুঁজেছেন, সিনিকদের পাগলামিগুলোকে তাঁরা সংযম করেছেন। তাঁদের ঐতিহ্য সমর্পিত হল সাম্রাজ্যযুগের রোমক ভাবুকদের হাতে। স্পেন থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল।

রোমান স্টোইকরা এপেথিয়ার অর্থ করলেন নিরাশা নয়, নির্বেদন, আত্মার শক্তিতে বেদনা থেকে মুক্তি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের স্পেনীয় দার্শনিক সেনেকা

---

১০ তাঁর "শাসন প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে ক্রিসিপাস পত্নী ও সন্তানের যৌথত্ব কীর্তন করেছেন। এক বিষয়ে তিনি গুরুকে ছাড়িয়েছেন,—পুরুষকে মাতা ও কন্যার সঙ্গে মিলনের অনুমতি দিয়ে। মানুষের শব ভক্ষণেও তাঁর নিষেধ ছিল না।

আত্মহত্যাও সমর্থন করেছেন। নিজের মন যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তাহলে দুঃখজয়ের শক্তি থাকে না, সেই সঙ্কটকালে শেষ হয়ে যাওয়াই শুভ। পূর্বসূরীদের মত সেনেকার চোখেও ছিল এক আদিম অপাপবিদ্ধ স্বর্ণযুগের মায়া। মানুষের লোভের কালিমায় সোনার দীপ্তি মলিন হয়ে গেল। লোভকে দমাবার জন্য এল রাষ্ট্র, লোভের শেষ নেই, তাই রাষ্ট্রও কায়েম হয়ে রইল।[১১] ভ্রষ্ট মানবচরিত্র শাসন করবার জন্যেই রাষ্ট্র,—এর জন্ম ও স্থায়িত্ব দুই-ই অস্বাভাবিক।

প্রবলপ্রতাপ সীজারের সাম্রাজ্যে বাস করে কী আর বলবেন তিনি? বিপ্লবী ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিয়ে মেনে নিতে হল রাষ্ট্র, বলতে হল যে রাষ্ট্রের আইন দিয়ে সৎ জীবন লাভ করা সম্ভব। যদিও বা প্রভুশক্তি বিভ্রান্ত হয়, স্টোইক নির্বিকার চিত্তে সহ্য করবে, স্থিতধী সমাহিত হবে আত্মার সত্তায়। বাস্তব জীবনে যতই বৈষম্য থাক না কেন, সকলেই প্রকৃতির প্রজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, সে রাজ্যে যার বাস সে ভেদবৈষম্যের অশান্তি থেকে মুক্ত।

রোম সাম্রাজ্যের ইমারতে যখন ফাটল ধরেছে, সীজারের শান্তিনীড় যখন ঝড়ের ঝাপটায় কম্পমান, তখন স্টোইকের সন্ত্রস্ত চিত্ত যে কাল্পনিক সমতার স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় খুঁজবে তা আর বিচিত্র কী? থাকুক সমাজে কুটিলতা, অন্তরে অন্তরে ফুটে উঠুক সাম্যের আকাশকুসুম—সৌভ্রাত্রের লীলাকমল। দাস এপিক্‌টেটাস ও সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস শরিক হলেন এই কল্পরাজ্যের, মনের বসতি স্থাপন করলেন এক শ্রেণীহীন আত্মিক সমাজে, যেখানে জ্ঞান ও সততা এক হয়েছে, আর সৎ ও জ্ঞানী যেখানে ভ্রাতৃসম্বন্ধে মিলিত।

স্বপ্নচারী স্টোইকের বৈরাগ্য ও সাম্যবাদ রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়নি। এই স্বপ্নের কাজল লেগেছিল একজনের চোখে যাঁর স্বপ্ন হল বাস্তবের দিশারী। স্টোইক আদর্শের দায় এসে পড়ল তাঁর অনুবর্তী দার্শনিক-দের হাতে।

১১ মহাভারতে বর্ণিত রাজতন্ত্রের জন্মকথা ঠিক এইরূপ।

মধ্যযুগ

৪। খ্রীষ্টান জগত : ঈশ্বরের রাজ্য

রোমান স্টোইকদের হাতে নৈরাজ্যবাদের রূপান্তর হল। খ্রীষ্টপূর্ব আদর্শ-বাদীরা বাস করতেন স্বপ্নের নন্দনকাননে, যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টানরা আশ্রয় নিলেন বিশ্বাসের দুর্গে। লাওৎসে থেকে জেনো পর্যন্ত প্রাচীনরা ছিলেন সহজিয়া, রূপনগরের অধিবাসী, নিরঞ্জন দেবতার উপাসক। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর উত্তর-সাধকরা হলেন তপশ্চারী, ধর্মরাজ্যের নাগরিক, পরমপিতা ঈশ্বরের পূজারী। দুই যুগের সন্ধিকার রোমান স্টোইক সেনেকা।

সেনেকা ও যীশুখ্রীষ্ট জন্মেছেন প্রায় একই সময়ে। তাঁদের জীবনে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু জীবনদর্শনে কিছু মিল ছিল যার দাম দিয়েছিলেন তাঁরা জীবন দিয়ে। যীশুখ্রীষ্টের মতো সেনেকার মৃত্যুও এক অবিস্মরণীয় মর্মান্তিক কাহিনী। কর্সিকায় নিঃসঙ্গ নির্বাসনকালে সেনেকা যখন আটটি বৎসর কাটিয়েছিলেন একটির পর একটি ট্র্যাজেডী রচনা করে, তখন তিনি ভাবতে পারেননি যে তাঁর নিজের ট্র্যাজেডীর কাছে ওগুলো তুচ্ছ হয়ে যাবে।

বালক নিরোর মা সম্রাট ক্লডিয়াসের দ্বিতীয় পত্নী এগ্রিপিনা স্বপ্ন দেখছেন তাঁর পুত্র হবে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার। তাকে গড়ে তুলবার জন্যে চাই একজন এরিস্টটল্। তিনি সেনেকাকে নিয়ে এলেন নির্বাসন থেকে। রোমে এসে দার্শনিক পাঁচ বছর রইলেন ভাবী সম্রাটের শিক্ষক হয়ে, তারপর পাঁচ বছর সম্রাটের মন্ত্রী ও রাষ্ট্রচালক রূপে। ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তিনি অগাধ ধন সঞ্চয় করলেন। নিন্দুকরা প্রশ্ন তুলল দার্শনিকের কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য কোথায়? সেনেকা বললেন দার্শনিকের কাছে অভাব ও প্রাচুর্য দুইই সমান, যখন যেটা আসে সেটাকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন। সত্যিই টাকা জমিয়েও তিনি কোনদিন টাকার গোলাম হননি। তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না। ভস্মীভূত রোমের পুনর্নির্মাণের কাজে তিনি তাঁর বিত্তের অধিকাংশ দান করেছিলেন। ৬২ সালে ছেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন, লিখলেন অমর গ্রন্থ "এপিস্‌চুলি মরেলিস্" বা "পত্রাবলী"। চিঠিগুলি একজন ভোগবাদী বন্ধুর উদ্দেশে লেখা। এতে গাওয়া হয়েছে

আত্মহত্যার প্রশস্তি। জীবনকে দোষ দিয়ে লাভ কি? "ইহাত' কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকাইয়া রাখে নাই।"

নিয়তি শুনল কথাগুলো। নিরোর দূত এল সেনেকার কাছে রাজদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে। সেনেকা জবাব দিলেন রাজনীতিতে তাঁর কোন আগ্রহ নেই এবং নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য সামলাতে তিনি ব্যস্ত। দূত গিয়ে প্রভুকে জানাল যে অভিযোগ শুনেও সেনেকার চেহারায় ভয় অথবা দুঃখের কোন দাগ পড়ল না। নিরো আদেশ করলেন তাঁকে নিজ হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। সেনেকা এবারও ধীরভাবে শুনলেন সম্রাটের কথা—ছুরি দিয়ে কাটলেন মণিবন্ধের শিরা। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি স্ত্রী পলিনাকে সান্ত্বনা দিলেন, সেক্রেটারীকে ডেকে লেখালেন রোমানদের প্রতি তাঁর বিদায়বাণী। তারপর বাসনা হল মরবেন সক্রেটিসের মতো,—এক গ্লাস বিষ আনিয়ে পান করলেন। পলিনা সহমরণের সঙ্কল্প করে নিজের হাতের শিরায় ছুরি চালালেন। কিন্তু নিরোর আদেশ ছিল তাঁকে মরতে দেওয়া হবে না। ডাক্তার উপস্থিত ছিল। সে মণিবন্ধ বেঁধে দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করল। সেনেকা মুক্তি পেলেন। দণ্ড ভোগ করলেন পলিনা।

পাঁচ বছর ধরে কেমন করে সেনেকা নিরোর মন্ত্রীত্ব করেছিলেন সে এক রহস্য। একজন বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতায় সমাহিত, আর একজন ভোগ ও বিলাসিতায় অনুরক্ত। এমন আমূল বৈষম্যের মধ্যে সাম্রাজ্যের কাজ চালিয়ে যাওয়া একমাত্র স্টোইক দর্শনের গুণেই সম্ভব। বাস্তব জীবনে অসঙ্গতি দেখলে স্টোইক কল্পলোকে উড়ে যায় সেখানে খুঁজে পায় সঙ্গতি সমাধান, যেমন পেয়েছিলেন দাস এপিকৃটেটাস ও সম্রাট অরেলিয়াস, সমাজের দুই প্রান্ত থেকে এসে মিলেছিলেন এক কল্পনার অলকায়।

অনুমান ৫০ সালে ফ্রিজিয়ার হিরাপলিস নগরে এক দাসীর গর্ভে এপিকৃটেটাসের জন্ম হয়। অনেক হাতবদলের পর অবশেষে তিনি মুক্তি পান এবং রোমে এসে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি এলেন এপিরাস-এর নিকোপোলিস নগরে এবং একটি পাঠশালার অধ্যক্ষ হয়ে বসলেন। এখানে তিনি যে পাঠ দিতেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করে "ডায়াট্রিবাই" বা "কথামালা" নামে প্রকাশ করেন তাঁর অন্যতম শিষ্য আরিয়ান যিনি পরে আলেকজাণ্ডারের ইতিবৃত্ত লিখে যশস্বী হন। সেনেকার "পত্রাবলী"র সঙ্গে "কথামালা" এক সুরে বাঁধা। এর মূল প্রতিপাদ্য আত্মার মুক্তিই আসল। যে

স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মিক সত্তায় অচলপ্রতিষ্ঠ, বাইরের জীবনের ওঠাপড়া তার কাছে নিরর্থক। ডায়োজিনিস দাস হয়েও মুক্ত, সক্রেটিস কয়েদী হয়েও স্বাধীন, আর নিরো সম্রাট হয়েও দাস। এপিক্‌টেটাস সক্রেটিসের সঙ্গে সিনিক ও স্টোইক-দের তত্ত্ব মিলিয়ে তাঁর নিরাজ নগরের স্বপ্নসৌধ রচনা করলেন।

> "সক্রেটিসকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত 'আপনার নিবাস কোথায়?' তাহা হইলে তিনি কখনো এমন জবাব দিতেন না, 'আমি এথেনীয়' কিংবা 'আমি করিন্থীয়', সর্বদাই বলিতেন 'আমি পৃথিবীর'। দার্শনিকরা ঈশ্বর ও মানুষের আত্মীয়তা সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকেন তাহাতে কোন সত্যতা থাকিলে আমাদের সক্রেটিসের রাস্তায় চলা ভিন্ন আর কি করণীয় থাকিতে পারে?" (১।৯।১-২)[১]

যারা বিশ্বনগরের নাগরিক ক্ষুদ্র নাগরিক জীবনে তাদের কোন স্থান নেই।

> "জিজ্ঞাসা করিতে পার রাষ্ট্রজীবনে সিনিক কোন কাজ করিবে কিনা। মূর্খ! তুমি কি সিনিকদের কর্মক্ষেত্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সার্বজনীন ক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছ? তুমি কি চাও যে কেহ এথেন্সে গিয়া সরকারী টাকাকড়ির হিসাবপত্র লইয়া বসুক, যখন তাহার উচিত রোমান-করিন্থীয়-এথেনীয়-নির্বিশেষে সকল লোকের সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং তাহাদের সরকারী তহবিলের হিসাব-নিকাশ লইয়া নয়, লড়াই ও আপস লইয়া নয়,—আলোচনা করা উচিত তাহাদের সুখ দুঃখ, সফলতা ও বিফলতা, দাসত্ব ও মুক্তি এই সব প্রসঙ্গ লইয়া?" (৩।২২।৮৩-৮৪ ; বার্কার ৩১৬)।

নারীর যৌথত্ব সম্বন্ধে এপিক্‌টেটাস ডায়োজেনিস ও জেনোর মত চরমপন্থী ছিলেন না। ভোজের আসরে যেমন ভোজ্যসম্ভার সকলের জন্যে, কিন্তু প্রত্যেকে পায় পরিবেশিত অন্ন, কেউ অন্যের থালার ওপর লোভ করে না; সমাজে মেয়েদের ওপর ভোগদখলও তেমনি (২।৪।৮-১০ ; বার্কার ৩১৬)।

ঈশ্বরের স্তুতিতে এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে এপিক্‌টেটাস খ্রীষ্টানদের সমগোত্রীয়। মানবতার ধর্মে তিনি যীশুখ্রীষ্টের চেয়েও অগ্রগামী—তিনি দাসত্বপ্রথা ও প্রাণদণ্ডের নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে অপরাধ মানসিক

---

১ কথামালা। আর্নেস্ট বার্কার: ফ্রম আলেকজাণ্ডার টু কনস্টেনটাইন (কথা-সংগ্রহ)। অক্সফোর্ড, ১৯৫৬। ৩১৩ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

রোগের লক্ষণ—তার শাস্তি না হয়ে চিকিৎসা হওয়া দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে তিনিও ছিলেন আত্মহত্যার সমর্থক। যা শুভ ও সুন্দর তাকে ঢেকে যখন কুৎসিত অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসে তখন মৃত্যুই শ্রেয়, কারণ সৎ লোকের কাছে মৃত্যু অতি অকিঞ্চিৎকর।

সেনেকা ও এপিক্‌টেটাসের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস। তিনি নির্বিকার স্টোইক চিত্তের আর এক দৃষ্টান্ত। তখন জার্মান উপজাতিরা ড্যানিয়ুব নদী পেরিয়ে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে হানা দিচ্ছে। সম্রাট তাদের রুখবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। সারাদিন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করে রাত্রে শিবিরে এসে তিনি লেখেন তাঁর "টা আই অটন" বা স্বগতোক্তি। দিনান্তে সেনাধ্যক্ষ হন দার্শনিক :

> "মাকড়সা একটা মাছি ধরিতে পারিলে মনে করে সে একটা মস্ত কাজ করিয়াছে। একই ভাবনার উদয় হয় একটা খরগোসকে শিকার করিলে…কিংবা স্যামার্শিয়ানদিগকে বন্দী করিতে পারিলে। …ইহারা সবাই কি দস্যু নয়?" (১০।১০)

দার্শনিকের বিশ্বনগর প্রজ্ঞানের রাজ্য, জ্ঞানীর মানসলোকে তার অধিষ্ঠান।

> "যদি সর্বসাধারণের বোধশক্তি থাকে তবে বুদ্ধিবৃত্তিও সাধারণ বৃত্তি যাহার বলে আমরা সকলে বুদ্ধিমান জীব। তাই যদি হয় তাহা হইলে বুদ্ধির যে অংশ আমাদিগকে বলিয়া দেয় কি করিতে হইবে আর কি করা চলিবে না তাহাও সকলের মধ্যে বিদ্যমান। তাহা হইলে আইনের বিধানও তাই। যদি বিধান সর্বসাধারণের হয় তাহা হইলে আমরা সবাই এক রাষ্ট্রের নাগরিক। তাই যদি হয় তাহা হইলে নিখিল বিশ্ব যেন এক রাষ্ট্র বা নগর। এমন আর কি রাষ্ট্রসংস্থা আছে যাহার সমান অংশীদার সমস্ত মানব জাতি? সার্বজনীন এই রাষ্ট্র বা নগর হইল মূল যাহা হইতে আমরা পাইয়াছি আমাদের বোধশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আইনের বিধান।" (৪।৪; বার্কার ৩১৯-২০)।

কিন্তু এই মায়াময় কল্পনালোকের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক কি? অত্যন্ত বাস্তব এ সাম্রাজ্য কি জ্ঞানীর ধ্যানলোকের বহির্ভূত? তা নয়। ব্যক্তি যেমন বিশ্বপ্রকৃতির একটি বিন্দু, সাম্রাজ্য তেমন প্রজ্ঞান রাজ্যের একটি কণিকা। যদি পার্থিব রাষ্ট্রে মানুষ সত্যভ্রষ্ট হয়, সত্যনিষ্ঠ আত্মা তাতে কাতর

হয় না, সে প্রজ্ঞানের নিঃসীম নীলিমায় পাখা মেলে পাড়ি দেয়। সে আত্মা নিয়তির উত্থানপতনে বিচলিত হয় না, সে অন্তহীন কালাকাশ জুড়ে বিধৃত, "বস্তুর আবর্তনের সঙ্গে সেও হয় আবর্তিত" "অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সে হয় একাত্ম" (১১।১)।

সম্রাট যখন একদিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত অন্যদিকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন এমন সময়ে বুঝতে পারলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তিনি অন্নজল ত্যাগ করলেন। ষষ্ঠ দিনে পরম প্রশান্তির মধ্যে তাঁর প্রাণবিয়োগ হল।

এশিয়া ও ইয়োরোপের সঙ্গমে যে মাটিতে সিনিক ও স্টোইকদের ফসল ফলেছিল সেই মাটিতেই বীজ বুনলেন নাজারেথের যীশুখ্রীষ্ট, সেই লেভান্টের জলে বাতাসে নতুন ফসল উঠল। রোমান স্টোইকরা পূর্বতনদের সাম্যবাদকে অব্যাহত রেখে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিটমাট করে ফেললেন। এই নবরূপে স্টোইক-বাদ খ্রীষ্টান দার্শনিকদের হাতে সমর্পিত হল। যীশুখ্রীষ্ট প্রচার করলেন সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী, প্রতিবেশীর হিতের জন্যে বিত্ত উৎসর্গ করার নির্দেশ। তাঁর বিখ্যাত বচন "ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে" (লিউক ১৭।২০) স্টোইকদের আত্মার স্থিরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনী যুবকের প্রতি তাঁর উপদেশ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গের সম্পত্তি পাবে তুমি (ম্যাথু ১৯।২১)। গরীবদের প্রতি তাঁর আশ্বাস যে ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই (লিউক ৬।২০)। কাউট্স্কী প্রমুখ অনেকের মতে যীশুখ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যদের চার্চ ছিল কম্যুনিস্ট, সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর সভ্যরা সব কিছু একসঙ্গে ভোগ করত।

> "তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে অভাবগ্রস্ত ; কারণ যাহাদের জমিজমা অথবা ঘরবাড়ি ছিল তাহারা সব বেচিয়া দিয়া বিক্রির টাকা আনিয়া গুরুর পায় রাখিত : এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন মত জিনিসপত্র বিতরণ করা হইত" (অ্যাক্ট্স্ ৪।৩৪—৩৫)।

যে সব স্বার্থপর ধনীরা উদ্বৃত্ত অর্থ বিলিয়ে না দিয়ে সঞ্চয় অথবা ভোগ করে কোন কোন ধর্মগুরু তাদের চোর বলে গালি দিতে কসুর করেননি। সেণ্ট জেম্স্-এর বাক্যবাণ প্রুধোঁর চেয়েও ধারাল। প্রুধোঁ সম্পত্তিকে

২ কমিউনিজ্ম্ ইন সেণ্ট্রাল ইয়োরোপ ইন দি টাইম অব দি রিফর্মেশন, লণ্ডন ১৮৯৭।

বলেছেন চৌর্য। জেম্‌স্‌ সাম্যবাদকে চার্চের দেওয়ালের বাইরে নিয়ে এসে সামাজিক ধনবৈষম্যের ওপর নিক্ষেপ করলেন।

> "ধর তোমাদের সভায় যদি একজন আসে সোনার আংটি ও সুন্দর পোশাক পরিয়া আর যদি একজন দীন দরিদ্র লোক আসে মলিন বেশে, তোমরা সসম্মানে সুন্দর পোশাক পরা লোকটিকে বলিবে 'আসুন, এই উত্তম আসন পরিগ্রহ করুন'; আর গরীব লোকটিকে বলিবে 'ঐখানে দাঁড়া কিংবা আমার পাদানির নীচে বস্‌'।… শোন আমার প্রিয় ভাইরা! এই পৃথিবীতে যাহারা দরিদ্র কিন্তু বিশ্বাসে ধনী তাহাদিগকেই কি ঈশ্বর তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন নাই, যে রাজ্য তাঁহার ভক্তদের জন্য প্রতিশ্রুত?" (জেম্‌স ২।২-৫)
>
> "ওহে ধনীরা! যাও, তোমাদের উপর যে দুর্গতি আসিতেছে তাহার জন্য কান্নাকাটি কর। তোমাদের ধনদৌলত দূষিত, তোমাদের সাজসজ্জা কীটদষ্ট, তোমাদের সোনারূপা হৃতশ্রী।… তোমরা শেষ দিন পর্যন্ত সঞ্চয় করিয়াছ। তাকাইয়া দেখ! যে মজুররা তোমাদের ক্ষেতের ফসল তুলিতেছে অথচ যাহাদিগকে তুমি বঞ্চনা করিয়াছ তাহারা আওয়াজ তুলিতেছে। ফসল-তোলা বঞ্চিত মজুরদের আওয়াজ পৌঁছিয়াছে সেবাওথ-এর প্রভুর কানে" (৫। —৪)।
>
> "সুতরাং ভাইরা! প্রভুর আগমনের অপেক্ষায় ধৈর্য ধর। দেখ না, চাষী অপেক্ষা করে জমির মূল্যবান ফসলের জন্য, যতদিন সে না পায় প্রথম ও শেষ বর্ষণ ততদিন সে ধৈর্যধারণ করে। তোমরাও ধৈর্য ধর; হৃদয়কে স্থির কর; কারণ প্রভুর আগমনের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে" (৫।৭—৮)।

বাইবেল-এ এ ধরনের বিপ্লবাত্মক উক্তি অবশ্য ব্যতিক্রম। যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রথম শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন রক্ষণশীল। সেণ্ট পীটার ও সেণ্ট পলের মতবাদে উগ্র সাম্যবাদের স্থান ছিল না। দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্টের লেখনীতে সম্পত্তির সমর্থন ভারি চমৎকার :

> "(সম্পত্তি বর্জনের অপেক্ষা) কত বেশী কার্যকরী তার বিপরীত কাজ? যদি কাহারও যথেষ্ট পরিমাণ অর্জিত সম্পত্তি থাকে তাহা হইলে সে একাধারে পুনরায় সম্পত্তি অর্জনের চেষ্টা ও কষ্ট হইতে

মুক্ত হইবে এবং যাহারা সাহায্যের যোগ্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে। যদি কাহারও কিছু না থাকে তাহা হইলে ভাগ বাটোয়ারার জন্য পৃথিবীতে থাকিবে কি? প্রভুর যে অন্যান্য সুন্দর উপদেশ, এই মতবাদকে (সম্পত্তি বিলোপ ও সাম্যবাদ) তার বিরোধী এমন কি তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া আর কি মনে করা যায়?

কেমন করিয়া লোকে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিবে, তৃষ্ণার্তকে জল দিবে, নগ্নকে বস্ত্র দিবে, গৃহহীনকে আশ্রয় দিবে যদি শুরুতেই সকলেরই এই সব বস্তুর অভাব থাকে?"[৩]

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও সমাজবিপ্লবী ছিলেন না। যতই তিনি সমাজসাম্য কামনা করুন না কেন বিত্তহীন নিরাজ সমাজ তিনি চাননি। রাষ্ট্র, ব্যক্তি-সম্পত্তি ও দাসপ্রথা তিনি পছন্দ না করলেও মেনে নিয়েছেন। সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, বরং যারা ঈশ্বরের রাজ্য আচমকা দখল করতে চায় তাদের তিরস্কারই করেছেন (ম্যাথু ১১/১২)। নিজের অন্তর শুচি কর, লোভ ও হিংসা ত্যাগ কর, তখন আর আইন অথবা রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। যীশু নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। নাগরিক জীবন থেকে তিনি প্রস্থান করেছিলেন আত্মিক জগতে, রাষ্ট্র থেকে ঈশ্বরে। রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল রাষ্ট্রের প্রতি উপেক্ষা।

কিন্তু এই উপেক্ষার মধ্যেই ছিল কম্যুনিজম ও এনার্কিজম-এর বীজ। তাঁর জীবন, মৃত্যু ও বাণী নির্ভুল ভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে জীবনের আত্মিক বিকাশের পথে সরকারী আইন ও শাসন একেবারে অবান্তর। সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে তিনি চাননি। যখন ফ্যারিসীরা তাঁকে এইরূপ সংঘর্ষে জড়াতে চেয়েছিল তিনি এই বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন 'সীজারের যা পাওনা তাহা সীজারকে দাও, ঈশ্বরের যা প্রাপ্য তাহা ঈশ্বরকে দাও' (ম্যাথু ২২/২১)। এর অর্থ পার্থিব শাসন ও ঐশ্বরিক শাসন উভয়ের সহ-অস্তিত্ব সম্ভব। তা হলেও শেষেরটির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পার্থিব শাসনের উৎপত্তি পাপ থেকে। আদিতে স্বর্গোদ্যানে প্রথম মানবমিথুন ছিল নির্মল নিষ্পাপ। তাদের স্খলনের পর থেকে এল শৃঙ্খল, শাসন। মানুষের অনাচার বন্ধ করবার জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন হল—মানুষের হীন বৃত্তিগুলো

৩ কি ডিভে স্যালভেটুর ১৩, বার্কার ৪২৮।

দমন করা হল তার কাজ। যার জন্ম ও অস্তিত্ব পাপে, পাপের অবসানের সঙ্গে সেই নিকৃষ্ট সংস্থার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয় শতকে তার্তুলিয়ান যীশুর কথাটির অভিনব ব্যাখ্যা করে বললেন যে পার্থিব রাষ্ট্র ঐশ্বরিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমান স্তরে থাকবে এ তিনি মোটেও বলতে চাননি। পার্থিব রাষ্ট্র ইতর জনের জন্যে—যারা জীবনের নিকৃষ্ট জিনিসগুলো নিয়ে ব্যস্ত—এই ইংগিতই তিনি করতে চেয়েছেন।

> "তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, যে টাকার উপর সীজারের ছাপ আছে তাহা দিতে হইবে সীজারকে, যে মানুষের উপর ঈশ্বরের ছাপ আছে তাহা দিতে হইবে ঈশ্বরকে। ইহার অর্থ লোকে সীজারকে দিবে টাকা আর ঈশ্বরের কাছে সম্প্রদান করিবে নিজেকে। নতুবা সবই যদি সীজারের হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের জন্য থাকিবে কি?" (ডে আইডললেট্রিয়া সি ১৫; বার্কার ৪৫৬)

সেণ্ট পীটার ও সেণ্ট পল তাঁদের পত্রাবলীতে দাসদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রভুদের সেবা ও মান্য করতে। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবিধানের বিরোধিতা করা দূরে থাকুক সেণ্ট পল তার প্রতি আনুগত্যই কামনা করেছেন। কারণ রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে খ্রীষ্টান নাগরিক ঈশ্বরের আদেশই পালন করে।

মোটের ওপর নিউ টেস্টামেণ্টে দেখা যায় নরম ও গরম দুই চরম মতবাদের একটা আপস-রফা। রাষ্ট্র, ব্যক্তিসম্পত্তি ও দাসপ্রথা এতে স্বীকৃত। তবে রাষ্ট্রের শাসন হবে ন্যায়পরায়ণ, সম্পত্তি ব্যয় হবে দরিদ্রের সেবায়, দাসদের প্রতি করতে হবে সদয় ব্যবহার। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ মতবাদের ভিতরে ছিল বিপ্লবের বীজ যা অঙ্কুরিত হয়ে ফল প্রসব করেছিল দেড় হাজার বছর পরে।

ক্রমশ খ্রীষ্টান ধর্ম রাষ্ট্র ও জাতির গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। খ্রীষ্টানদের সামনে উপস্থিত হল দেশ ও জাতির চেয়ে এক মহত্তর সত্তা, দেশপ্রেম ও রাজভক্তির চেয়ে এক গভীরতর অনুরক্তি। এর সামনে যাবতীয় জাগতিক ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়, মানুষের মূল্য হয় মানুষ হিসাবে। সেণ্ট পল বলেছেন:

> "ইহুদী কিংবা গ্রীক বলিয়া কিছু নাই, দাস কিংবা মুক্ত বলিয়া কিছু নাই, পুরুষ কিংবা স্ত্রী বলিয়া কিছু নাই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের কাছে তোমরা সবাই এক" (গ্যালেশিয়ানদের প্রতি পত্র ৩।২৮)।

সেণ্ট অগস্টিনের ঈশ্বরের নগর 'সকল ভাষার তীর্থযাত্রীদের মিলনক্ষেত্র'। কথাগুলো যেন স্টোইকদের প্রতিধ্বনি। খ্রীষ্টান শাস্ত্রকারদের চোখে নামল স্টোইকদের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন। প্রকৃতির বিধানকে ঈশ্বরের বিধানে প্রবর্তন করে তাঁরা এই স্বপ্ন রেখে গেলেন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রকৃতিবাদীদের জন্যে। স্বর্ণযুগে মানুষ ছিল নিষ্পাপ। তারপর হল অধঃপতন। তার স্বভাব পাপবিদ্ধ হলেও যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহে সে ফিরে যেতে পারে আদিম শুদ্ধ সত্তায়। যে ঈশ্বরের রাজ্য অতীতে বিদ্যমান ছিল ভবিষ্যতে তার আবির্ভাব খুবই সম্ভব।

সেণ্ট অগস্টিন (৩৫৩-৪৩০) তাঁর "ডে সিভিটাটে ডাই" বা "ঈশ্বরের নগর" নামক গ্রন্থে সেনেকার প্রকৃতিবাদকে দৈবরাগে রঞ্জিত করে পরিবেশন করেছেন। আদমের প্রথম পাপ থেকে মানুষের পতন হল, এল পাপবৃত্তি, পিছনে পিছনে এল অনাচার, অমঙ্গল, জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা। পাপকে সংযম করে যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে শাসনের প্রয়োজন হল।[৪] শাসনের দায় নিল রাষ্ট্র—'পৃথিবীর নগর'। যার জন্ম ও স্থায়িত্ব মানুষের বিকারে তা কখনো শুভ হতে পারে না। কিন্তু এ এক অতি-আবশ্যক অশুভ যা বর্জন করাও যায় না। ন্যায়বিচার ও শান্তিরক্ষার জন্যে রাষ্ট্র,—এতেই তার সমর্থন। 'ন্যায়বিচার যদি না থাকে তা হলে রাজ্যশাসন আর দস্যুবৃত্তিতে তফাত কি?' (৪/৪) রাজা ও দস্যু উভয়ে সমান লোভী, একই প্রকারে তারা লুঠের মাল ভাগ করে, শুধু রাজার কোন ভয়ভাবনা নেই, দস্যুর আছে শাস্তির ভয়!

'পৃথিবীর নগরের' ওপর অধিষ্ঠিত 'ঈশ্বরের নগর',—স্টেটের ওপর চার্চ, যার হাতে আছে মানুষের ধর্মমোক্ষের দায়। ঈশ্বরের নির্দেশে ঐহিক বিধান 'পৃথিবীর নগরের' ওপর বর্তিত,—চার্চ রাষ্ট্রকে ভার দিয়েছে সৎ খ্রীষ্টান জীবনের উপযোগী পার্থিব পরিবেশ রচনা করবার। রাষ্ট্রকে স্বীকার কেন, সমর্থন না করে চার্চের তখন গত্যন্তর ছিল না। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা দরকার ধর্মপ্রচারের জন্যে, আরো বেশী দরকার সম্পত্তির ওপর আক্রমণ রুখবার জন্যে। চার্চের হাতে তখন প্রচুর বিত্ত—প্রথম ধর্মগুরুদের আমলের সরল নিষ্কাম জীবনযাত্রা আর নেই। খ্রীষ্টের বৈরাগ্যবাদের সঙ্গে এই বৈশ্যবৃত্তির সামঞ্জস্য কোথায়? সেণ্ট অগস্টিন চেষ্টা করলেন বৈষম্যের মীমাংসা করতে। তিনি বললেন প্রাকৃতিক জীবনে সম্পত্তি ছিল সার্বজনীন কিন্তু প্রত্যেকের অধিকার

৪ শুধু সেনেকার লেখায় নয়, মহাভারতেও রাষ্ট্রের জন্ম কাহিনী এইরূপ।

ছিল প্রয়োজন মত যৌথ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করবার। অবশিষ্ট অংশ থাকত সকলের জন্যে। তিনি এবং তাঁর সমকালের তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিসম্পত্তি ও যৌথ-সম্পত্তি ঠিক এর কোনটারই পক্ষ গ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগত অভাব মেটাবার মত যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। আবার সেই সঙ্গে আছে উদ্বৃত্ত বিত্ত সাধারণের হিতার্থে ব্যয় করবার দায়িত্ব। এমন কি ভিক্ষাদানও দাক্ষিণ্য নয়, এ নিছক ন্যায়ধর্ম, নিজের উদ্বৃত্তটুকু যৌথভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেওয়া।

আদিম প্রাকৃতিক বা ঈশ্বরিক সমাজের সমতা ও সৌভ্রাত্রের কীর্তনে যে নীতিকথার সূত্রপাত তার সমাপ্তি হল রাষ্ট্র, চার্চ ও সম্পত্তির বন্দনায়। দাসপ্রথা, যুদ্ধ এবং সভ্যজীবনের যত কিছু উপসর্গ সমস্ত সমর্থন লাভ করল। শাস্ত্রকাররা রাষ্ট্র ও সমাজবৈষম্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। খ্রীষ্টান দর্শনে প্রকৃতিবাদের সংস্করণ হল। যে প্রকৃতির নিয়ম ছিল স্থান কাল নির্বিশেষে অনাবিল বিশুদ্ধ, যে নিয়ম অন্তরের সংযমে বাইরের শাসনে নয়, মানুষের পতনের পর সে নিয়ম হল আপেক্ষিক, তার বন্ধন হল বাহ্য, প্রয়োজনসাপেক্ষ, রাষ্ট্র, সম্পত্তি ও দাসপ্রথা এল প্রকৃতির স্বাক্ষর নিয়ে।

এই সূত্রের একটি মাত্র নিপাতন দেখা যায়। প্রাচী ও প্রতীচীর সঙ্গম-তীর্থ আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রীষ্টান দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য মিস্টিসিজম-এর মিশাল হল। চার্চের ঐকতানে নস্টিকদের সুর মিলল না। এঁদের একমাত্র ধ্যান হল ঈশ্বরলাভ—ব্রত হল যোগ, সন্ন্যাস ও ইন্দ্রিয় সংযম। এঁদের মধ্যে কারপোক্রেটিস নামে একজন আরও বেসুর গাইলেন। তিনি বললেন অনাসক্তি ও কৃচ্ছ্রসাধন দিয়ে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। বাস্তব জগতের সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে মুক্ত হও, আস্বাদন কর এর আনন্দ। ওল্ড টেস্টামেণ্টের ভগবান জিহোভা হলেন ডেমুর্গস—নিকৃষ্ট ও স্বৈরাচারী দেবতা। তাঁর খামখেয়ালে দশ আজ্ঞার নৈতিক শাসন মানুষের ওপর অরোপিত হয়েছে। খাঁটি নস্টিক এই নৈতিক বিধান মানবে না—নিকৃষ্ট দেবতার প্রতি তার কোন আনুগত্য নেই। কারপোক্রেটিস ও তাঁর পুত্র ইসিডোরাস উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মহিমা কীর্তন করে নূতন ভাগবত রচনা করলেন।

"এই নববিধানের খ্রীষ্টান ধর্মে প্লেটোর প্রভাব সুগভীর। এতে নস্টিকবাদের বৈপরীত্যের ধারণাগুলি পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে। এতে দেখান হয়েছে যে

ভালমন্দ কেবল খামখেয়ালীর হুকুম, অত্যাচারী বিশ্ব-শাসকরা এগুলো মানুষের ওপর চাপিয়েছে। এই অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছেন যীশু। অন্যদের মত তিনিও ছিলেন মানুষ, কিন্তু তাঁর আত্মার পবিত্রতা ছিল অসাধারণ। তাই উর্ধ্বলোকে যা তিনি দেখেছেন তা স্মরণ রাখতে পেরেছেন এবং সেই উর্ধ্বলৌকিক শক্তির বলে বিশ্ব-শাসকদের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন। যে সকল আত্মা তাঁর পথের দিশারী তারাও সেই শক্তির অধিকারী, তারা যীশুর চেয়েও উচ্চতর স্তরে উঠতে পারে। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে নানা স্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাই মৃত আত্মার হয় পুনর্জন্ম। কিন্তু শক্তিমান আত্মা এক জীবনেই সকল অনুভূতির মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে নিম্নতন বিধান থেকে মুক্ত হতে পারে।"[৫]

কারপোক্রেটিস বিদ্রোহীদের আহ্বান করলেন রাষ্ট্র, আইন, নীতিশাস্ত্র ও সম্পত্তির শৃঙ্খল ভাঙবার জন্যে। তাঁর নষ্টিকগোষ্ঠী সিনিক ও স্টোইকদের মত নৈরাজ্যবাদী যদিও তাঁদের রাষ্ট্র-বিরোধিতার যুক্তি ছিল কিছু স্বতন্ত্র। সিনিক ও স্টোইকদের মত এঁদেরও কয়েকটি ছিন্নপত্র ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। এঁদের সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা পাওয়া যায় প্রতিবাদীদের রচনায়। চার্চের গুরু আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্ট, ইরেনিউস, ইউসেবিয়াস ও এপিফেনিয়াস সবাই এঁদের নিন্দায় পঞ্চমুখ। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে এই অনাচারীরা ভালমন্দর পার্থক্য দূর করতে চায় এবং এদের আসক্তি নিরঙ্কুশ যৌন রমণে। আক্রমণ যে বাক্যবাণে আবদ্ধ ছিল না তাতে সন্দেহ নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার অরাজকীরা কয়েক বছরের নির্যাতনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

যীশুখ্রীষ্ট যখন সীজার ও ঈশ্বরের এক্তিয়ার মেপে দিচ্ছিলেন—সেই সময়ে সেনেকাও অবতারণা করলেন দুই রাজ্যের প্রসঙ্গ—সিভিটাস্ ডাই এবং সিভিটাস্ হিউম্যানা।

> "আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে দুটি পৃথক যৌথরাজ্যের ধারণা। একটি মহান এবং যথার্থ সার্বজনীন সমাজ দেবতা ও মানুষ লইয়া। ইহাতে আমাদের দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না এবং ইহার সীমানা আমরা মাপি শুধু সূর্যের উদয়াস্ত দিয়া। অন্যটি হইল সেই সমাজ

৫ এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স্, ১৯২০ : ই. এফ. স্কট : নস্টিসিজ্ম্।

> যাহাতে ঘটনাচক্রে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি। যেমন এথেন্স, কার্থেজ কিংবা অন্ত কোন নগর যাহা সকল লোকের নহে, মাত্র কয়েকজন লোকের" (ডে অটিও ৪।৩১ ; বার্কার ২৩৪)।

তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে অরিগেন এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে ঈশ্বরের প্রাকৃত নিয়ম এবং মানুষের কৃত্রিম নিয়ম দুয়ের মধ্যে গণ্ডি টেনে প্রথমটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন।

> "সুতরাং আমাদের সামনে দু'রকমের বিধান আছে। একটি প্রকৃতির বিধান যাহা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত, অন্যটি নগররাষ্ট্রের লিখিত আইন। যেখানে লিপির বিধান ঈশ্বরের বিধানের পরিপন্থী নহে সেখানে নাগরিকদের ইহাকে তাহাদের প্রকৃতির বহির্ভূত বলিয়া বর্জন না করাই উচিত। কিন্তু যখন প্রকৃতির বিধান, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিধান লিপির বিধানের বিরুদ্ধে নির্দেশ দিতেছে তখন স্থির হইয়া শোন তোমার অন্তরের বাণী - শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায় ও লিখনকে বিদায় দাও, আসল শাস্ত্রকার ঈশ্বরের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দাও, তাঁহার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন কর তাহাতে বিপদ, দুঃখ ও অপযশ যা আসে আসুক" (কঁত্রা কেল্‌সাম ৫।৩৭ ; বার্কার ৪৪২)।

পরের শতকে সেণ্ট অগস্টিন পার্থিব ও ঈশ্বরিক দুই রাজ্যের অবতারণা করলেন। পরবর্তী ধর্মনায়কদের হাতে খ্রীষ্টানজগত ও মানবজগতের সমীকরণ হল। এই অভেদ অদ্বৈত বিশ্বসমাজের প্রভু যীশু, পৃথিবীতে তাঁর প্রতিভূ চার্চের গুরু পোপ। পোপ রাষ্ট্রনায়ক এবং ধর্মনায়ক। কিন্তু ধর্মনায়ক নিজ হাতে রাজদণ্ড ধারণ করেন না—এ দণ্ড তিনি রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেছেন। বাহ্যত রাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও মূলত ধর্মতন্ত্র থেকেই এর উৎপত্তি।

"বাস্তব আকারে রাষ্ট্রের উদ্ভব পৃথিবী থেকে, চার্চের মত স্বর্গ থেকে নয়। চার্চের পূর্বেও রাষ্ট্র ছিল, চার্চের বাইরেও রাষ্ট্র আছে—রাষ্ট্রের সে সত্তা পতিত মানবের স্খলিত চরিত্র থেকে উদ্ভূত। সুতরাং তার জন্মকালিমা মুছে ফেলবার জন্য এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত মানবসমাজের এক বৈধ অংশ হিসাবে তাঁর সম্পত্তি লাভ করবার জন্যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন চার্চের কাছ থেকে সনদ লাভ করা। এই হিসাবে রাষ্ট্রশক্তি চার্চ থেকে তার আসল

সত্তা লাভ করেছে এবং রাজা মহারাজারা চার্চ থেকে পেয়েছেন শাসন করবার অধিকার।"*

এই সূত্রের প্রধান ভাষ্যকার পোপ সপ্তম গ্রিগরী। তাঁর মতে রাজশক্তির উৎস শয়তান। কুলোকের মনে যে স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতার লোভ তা থেকে এর উৎপত্তি। এমন বহু লোক আছে যাদের মনে ঈশ্বরের বিধান মানবার মত ধর্মভাব নেই। তাদের শাসন করবার জন্তেই রাষ্ট্র। যখন সকলে খ্রীষ্টানভাবে অনুরঞ্জিত হবে তখন রাষ্ট্রের আর দরকার হবে না, চার্চের মাধ্যমে ঐহিক ব্যাপারের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রের পক্ষে ক্রেসাস, ওখাম প্রমুখ নৈয়ায়িকরা প্রতিবাদ করলেন—চার্চ ও স্টেট ঈশ্বরের দুই তরবারি; স্টেট চার্চের অধীন নয়; এদের কাজ পৃথক এবং এরা পৃথকভাবে ঈশ্বরের কাছে দায়ী। এঁদের যুক্তি টিকল না। কারণ তাহলে কি সমাজ জীবটি এক দু মাথাওয়ালা দৈত্য বিশেষ? টমাস একুইনাস প্রচার করলেন চার্চ নিখিল মানবজাতির একতার প্রতীক, এ 'আত্মিক রাষ্ট্র'। যে চার্চ এক এবং অদ্বিতীয় তার শাসন ও বিধান অসপত্ন, দেশ জাতি নির্বিশেষে সকল খ্রীষ্টান এই সার্বভৌম ধর্মসমাজের অধিবাসী। এই দর্শনের প্রেরণায় চার্চ আত্মার জগত থেকে ভ্রষ্ট হয়ে লৌকিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল। এরই প্রতিক্রিয়া উইক্লিফ ও হাস্-এর বিদ্রোহ, রিফর্মেশনের বিপ্লব—যার প্লাবন থেকে নিঃসৃত হল ধর্মনিষ্ঠ মুক্তিপিপাসুর স্বপ্নসাধ, চার্চের লৌকিক প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করে তার স্থানে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য স্থাপন করবার কল্পনা।

মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের দ্বন্দ্ব নিরাজবাদী ও রাষ্ট্রবাদীর দ্বন্দ্ব নয়, দুই প্রভুত্বলোভী লৌকিক সজ্মশক্তির দ্বন্দ্ব। খ্রীষ্টান ধর্মোন্মাদনার চরম অবস্থায় চার্চ স্টেটকে আত্মসাৎ করে ফেলেছিল। যাজক ও হাকিম উভয়ের ক্ষমতা চার্চের করায়ত্ত হয়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মবিশ্বাসের যুগে নৈরাজ্যবাদীর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে স্টেটের বিরুদ্ধে নয়, চার্চের বিরুদ্ধে।

চার্চ থেকে সরল যৌথ জীবনযাপনের রেওয়াজ উঠে যাবার পর সাম্যবাদের আদর্শ আশ্রয় পেল খ্রীষ্টান মঠগুলিতে। ষষ্ঠ শতকে বেনেডিক্টাইন সম্প্রদায়ের

* অটো গীর্কি: পলিটিক্যাল থিয়োরিজ অব দি মিড্‌ল্ এজেস্। অনুবাদ: এফ. ডব্লিউ. মেট্‌ল্যাণ্ড। কেম্ব্রিজ, ১৯৫১। ১২-১৩ পৃষ্ঠা।

মধ্যে এই আদর্শের উজ্জীবন হল। তারপর থেকে চার্চের ভেতরে ও বাইরে সাম্যবাদের আন্দোলন ঘনিয়ে উঠল। ১২০০ সালের কাছাকাছি ফ্রান্সের এল্‌বিজেন্সিয়ান বিদ্রোহীরা ধনসাম্যের দাবি নিয়ে আওয়াজ তুলল, চার্চ, পোপ ও তাদের সম্পত্তিকে খ্রীষ্টদ্রোহী বলে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের আর এক ঘাঁটি হল বোহেমিয়া। এখানে সরল ধর্মজীবনের সঙ্গে সাম্যবাদের আদর্শ মিশিয়ে হাস্ চার্চের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। প্রাগে বিদ্রোহীদের প্রথম জয়লাভের পর তাদের একদল ট্যাবর নগরে এক নূতন চার্চের পত্তন করল। খ্রীষ্টের উপদেশ মত নিষ্ঠাবান জীবনযাপন হল এদের ব্রত। ক্যাথলিক চার্চের পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রিয়াকাণ্ড সব বাতিল করে এরা রাখল কেবল ব্যাপটিজম্ ও কম্যুনিয়ন। এদের বিশ্বাস ছিল যে যীশু আবার ফিরে আসবেন, পৃথিবীতে স্থাপন করবেন তাঁর রাজ্য, সে রাজ্যে থাকবে না চার্চ, রাষ্ট্র ও সম্পত্তি, থাকবে না মানুষের গড়া বিধি-নিষেধ, রাজস্ব, বিবাহ। শেষে খ্রীষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করার তর সইল না। ট্যাবরাইটরা তাদের স্বর্গীয় স্বপ্নরাজ্য গড়বার কাজে নেমে পড়ল।

এদের মধ্যে আবার দেখা দিল এক চরমপন্থী দল। পীটার চেল্‌চিকী (১৩৯০-১৪৬০) নামে একজন কৃষাণ দার্শনিক টলস্টয়ের মতো উগ্র শান্তিবাদ ও নৈরাজ্যবাদ প্রচার করলেন। "তিনি বিত্তবান ও ক্ষমতাপন্নদের আক্রমণ করলেন, যুদ্ধ ও প্রাণদণ্ডকে হত্যা বলে নিন্দা করলেন এবং এক সমান সমাজের ছবি তুলে ধরলেন যেখানে প্রভু ও ভূমিদাস নেই, কোন প্রকার আইনকানুন নেই। শিষ্যদের তিনি বললেন খ্রীষ্টানধর্মকে নিউ টেস্টামেণ্টে যেমনটি পেয়েছ ঠিক সেইভাবে নাও, শুধু সাবালককে ব্যাপটাইজ বা শুদ্ধ কর, পৃথিবী ও পার্থিব রীতিনীতি থেকে ফিরে এস, ত্যাগ কর শপথগ্রহণ শিক্ষা শ্রেণীভেদ ব্যবসায়ী বৃত্তি ও নাগরিক ধর্ম, বরণ করে নাও দারিদ্র্য, বর্জন কর সভ্যতা ও রাষ্ট্রকে, জমির ফসল তুলে সংস্থান কর জীবিকার।"[৭] এঁর চেয়েও উগ্র এক গোষ্ঠী ছিল। তারা চাইত নির্বসন দিগম্বর হতে এবং বিবাহ প্রথা তুলে দিয়ে নারীদের যৌথভাবে ভোগ করতে।

মতভেদের মীমাংসা করতে গিয়ে ট্যাবরাইটদের দুই দলে লড়াই লেগে

৭ উইল ডুরান্ট: দি রিফর্মেশন, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৭; ১৭০ পৃষ্ঠা। ভ্লাডিমির নোসেক: স্পিরিট অব্ বোহেমিয়া, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭। ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।

গেল। শান্তি ও মুক্তির পূজারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উপলক্ষে উপস্থিত হল আইনকর্তা শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে। চেল্‌চিকীর শিষ্যরা ১৪৫৭ সালে "চার্চ অব্‌ দি ব্রাঁদারহুড" বা চলতি কথায় "মরেভিয়ান ভ্রাতৃদল" নামে এক নূতন গোষ্ঠী গঠন করল। দশ বৎসর পরে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তারা নিউ টেস্টামেন্টের সরল কৃষিজীবিকা গ্রহণ করল। রিফর্মেশন যুগের ত্রিশ বার্ষিক যুদ্ধে তারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেল—যে কজন অবশিষ্ট ছিল তারা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এদের কয়েকটি ছোট ছোট শাখা এখনও ইয়োরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

প্রটেস্ট্যাণ্ট বিদ্রোহের আঘাতে চার্চের গৌরব ধূলিসাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর দরিদ্র কৃষাণদের বুকে আশার আলো জ্বলে উঠল। এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল চার্চ ও স্টেট, রাষ্ট্রশাসনে যাজকের প্রভাব ছিল এত ব্যাপক ও গভীর যে একটির ওপর আঘাত সংক্রামিত হল অপরটির ওপর, ধর্মদ্রোহ রাষ্ট্রদ্রোহে উৎক্রান্ত হল। নিউ টেস্টামেণ্ট পড়ে শোষিত কৃষাণ জানতে পারল আদিম চার্চের সাম্যবাদের কাহিনী, তার চোখেও লাগল নতুন যুগের মায়া - যখন কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না, দুনিয়াটা হবে কৃষাণ মজুরের, চলবে ঈশ্বরের বিধান। বিপ্লবীরা এই স্বপ্নরাজ্যের মনোরম ছবি এঁকে চাষী মজুরের মধ্যে ছড়াতে লাগল, বঞ্চিতের বুকে জমা হল বারুদের স্তূপ।

১৫২০ সালে পূর্ব স্যাক্সনীর জ্বিকাউ-তে প্যাস্টর হয়ে এলেন টমাস মুন্‌ৎসার। সেখানে বাস করতেন নিকোলাস স্টর্শ নামে একজন চার্চদ্রোহী তন্তুবায়। মুন্‌ৎসার তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেন। মুন্‌ৎসারের সম্মতিক্রমে স্টর্শ "বোহেমিয় ভ্রাতৃদলের" অনুকরণে এক নয়া চার্চের পত্তন করলেন। শুরু হল রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার। ক্যাথলিক চার্চ বরদাস্ত করল না মুন্‌ৎসার ও স্টর্শ জ্বিকাউ থেকে বিতাড়িত হলেন। স্টর্শ লুথারের ঘাঁটি ভিটেনবার্গে গিয়ে প্রচার আরম্ভ করলেন। লুথার তখন অজ্ঞাতবাসে। সনাতনীদের চেয়ে বিপ্লবীরা সংস্কারকের বড় শত্রু। লুথার দেখলেন এদের বাড়তে দিলে তাঁর মত তলিয়ে যাবে। তিনি বেরিয়ে এসে কয়েকটি জোর ভাষণ দিয়ে স্টর্শের আন্দোলন দমন করলেন।

মুন্‌ৎসার পালিয়ে এলেন প্রাগে, সেখান থেকে গিয়ে থুরিঞ্জিয়ার আল্‌স্টেড

নগরে বসলেন এবং এক সাংঘাতিক মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ঈশ্বরের পথ থেকে যারা বিচ্যুত তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, তাদের নিপাত করতে হবে। "তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদও পোষণ করতেন এবং বিশ্বাস করতেন, যে জমিদাররা জলের মাছ, আকাশের পাখি ও মাটির ফসল সমাজকে ভোগ করতে দেয় না তারা চুরি না করার আদেশ লঙ্ঘন করছে।"[৮] তিনি জনতাকে আহ্বান করে বললেন যাজক, রাজন্য ও পুঁজিপতিদের উৎখাত করে এক যৌথ সমাজ স্থাপন কর যেখানে "সমস্ত দ্রব্য সর্বসাধারণের এবং বিলি হবে সময়মত যার যার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে"। আল্স্টেড্ থেকেও তিনি বহিষ্কৃত হলেন—কোথাও আশ্রয় না পেয়ে তিনি দেশে দেশে আগুন ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন।

এ আগুনকে ধরবার জন্যে সমিধ্ সঞ্চিত হয়ে ছিল। থুরিঞ্জিয়ার স্বাধীন নগর বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ম্যুলহাউসেন। সেখানে কারখানার মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠেছে। হাইন্‌রিশ ফাইফার নামে এক সন্ন্যাসী মঠ ছেড়ে এসে এখানে বসেছেন। পৌরসভা দখল করবার জন্যে তিনি মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। মুন্‌ৎসার আশপাশের কৃষাণদের নিয়ে জোট বাঁধলেন। মণিকাঞ্চন সংযোগ হল। দু'জনে মিলে পৌরসভা থেকে অভিজাত ও যাজকদের তাড়িয়ে স্থাপন করলেন এক "ইটার্ন্যাল কাউন্সিল" বা "শাশ্বত সভা"। ম্যুলহাউসেনে প্রবর্তিত হল এক সাম্যবাদী ধর্মতন্ত্র। কিছুদিনের মধ্যে দুই নায়কের মধ্যে মতভেদ হল; মুন্‌ৎসার কয়েক মাইল দূরে ফ্রাঙ্কেনহাউসেন নগরে এসে নিজের মনোমত ধর্মরাজ্য গড়তে লাগলেন। ইত্যবসরে হেসি, ব্রান্‌স্‌উইক ও স্যাক্সনীর রাজন্যরা একত্র হয়ে নগর অবরোধ করলেন, মুন্‌ৎসারকে বন্দী করে হত্যা করলেন (মে ১৫২৫)। তারপর ম্যুলহাউসেনের পতন হল। ফাইফার ধরা পড়লেন। ধর্মরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনায়কদের জীবনান্ত হল।

ইতোমধ্যে বিদ্রোহের আগুন সংক্রামিত হল দক্ষিণ জার্মানীতে। স্টুলিঙ্গেন থেকে শুরু করে দিকে দিকে চাষীরা মাথা তুলে দাঁড়াল, জমিদার ও যাজকদের খাজনা বন্ধ করে দিল। ১৫২৫ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রতিনিধিরা মেমিঙ্গেন নগরে সম্মিলিত হয়ে বারো দফা দাবির এক দলিল তৈরী করল।

---

৮ কেম্ব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রী, খণ্ড ২, দি রিফর্মেশন, ১৯০৭। ১৮৬ পৃষ্ঠা। সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুধোঁর বিখ্যাত উক্তি কিছু নতুন কথা নয়।

"প্রথমত আমাদের বিনীত আবেদন ও প্রার্থনা এবং আমাদের ইচ্ছা ও সঙ্কল্পও বটে যে ভবিষ্যতে আমাদের এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে যে গোটা সমাজ মিলিয়া প্যাস্টরকে নির্বাচন ও নিয়োগ করিবে এবং তাহাকে বরখাস্ত করিবার অধিকারও সমাজের থাকিবে।

"দ্বিতীয়ত যেহেতু ওল্ড টেস্টামেণ্টে চার্চের খাজনা বিহিত হইয়াছে এবং নিউ টেস্টামেণ্টে তাহা সমর্থিত হইয়াছে সেহেতু আমরা ন্যায্য পরিমাণ শস্য খাজনা দিব, কিন্তু বিধিসঙ্গতভাবে··· আমরা চাই ভবিষ্যতে এ খাজনা সংগ্রহ করিবে সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত চার্চের প্রভোস্ট; উহা হইতে প্যাস্টর নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য একটা সামান্য অংশ পাইবে বাকিটা সেই গ্রামের অকিঞ্চন ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে···

"তৃতীয়ত এ পর্যন্ত এ প্রথা চলিয়া আসিয়াছে যে আমরা লোকের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইয়াছি, এবং ইহা মর্মান্তিক, কারণ খ্রীষ্ট তাঁহার মূল্যবান রক্ত দিয়া আমাদিগকে মুক্ত ও ক্রয় করিয়াছেন ···সুতরাং ইহা শাস্ত্রসম্মত যে আমরা মুক্ত এবং আমরা তাহাই হইব · আমাদের নির্বাচিত ও নিযুক্ত শাসকদের কাছে (আমাদের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত) সকল ন্যায্য ও খ্রীষ্টীয় ব্যাপারে আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত থাকিব, এবং আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে যথার্থ এবং সত্যকার খ্রীষ্টান হিসাবে তাহারা সানন্দে আমাদিগকে ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন অন্যথায় যীশুর বাণী হইতে দেখাইবেন যে আমরা ভূমিদাস···"

অন্য দফাগুলিতে মৃত্যুকর, বেগার খাটনি, জমির অত্যধিক ভাড়া, জমিদার কর্তৃক এজমালি মাঠের বাজেয়াপ্তি ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সর্বশেষ দফায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে যদি শাস্ত্রবচন থেকে দেখান যায় যে দাবিগুলি অসঙ্গত তাহলে প্রত্যেকটি দাবি প্রত্যাহৃত হবে।[৯]

জুরিক থেকে জ্বিংলির অনুবর্তী প্রটেস্ট্যাণ্টরা এসে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। দলিলের মুসাবিদায় তাঁদের হাত ছিল। লুথারও সনদটিকে

৯ মার্টিন লুথার: রচনাবলী, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৪৩। খণ্ড ৪। ২১০-১৩ পৃষ্ঠা।

সংবর্ধনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাবধান করেও দিলেন—আন্দোলন যেন হিংসার পথে না যায়। কিন্তু চাষীরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে; পিছন ফিরলে কপালে অসীম নির্যাতন। নরমপন্থী নেতাদের সরিয়ে দিয়ে তারা বিদ্রোহ করল। মোহন্তদের মঠ লুঠ করে, জমিদারদের দুর্গ জালিয়ে দিয়ে, একটির পর একটি শহর দখল করে তারা যাজক-অভিজাতদের জুলুমতন্ত্র উচ্ছেদ করতে লাগল। অনেক জায়গায় কাজকারবার চালাবার জন্যে চাষীসঙ্ঘ বা কমিউন গঠিত হল।

ভূমিদাসদের যে এতবড় স্পর্ধা হতে পারে তা মালিকরা ভাবতে পারেনি। যখন তাদের চৈতন্য হল তারা আর সময় নষ্ট করল না। লুথার ফতোয়া দিলেন বিদ্রোহীদের পশুর মতো হত্যা করবার জন্যে—এ কাজে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট-এর এক বিচার, এক কর্তব্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জার্মানীতে চাষীর রক্তে মুক্ত সমাজের স্বপ্ন নিমজ্জিত হল।

"খুব কম করে ধরলেও গোটা জার্মানীতে নিহতদের সংখ্যা হবে এক লক্ষ। বিজেতাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি সংযত করতে একটিমাত্র বিবেচনা ছিল—সে হল এই আশঙ্কা যে যদি তারা আত্মসম্বরণ না করে তাহলে তাদের দাসত্ব করবার জন্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। মারগ্রেভ জর্জ ভ্রাতা ক্যাসিমিরকে লিখেছিলেন 'যদি সব চাষীকে মেরে ফেলা হয় তাহলে আমরা আমাদের খাদ্য যোগাবার জন্যে কোথায় আর চাষী পাব?' ক্যাসিমিরকে সতর্ক করবার দরকার ছিল। ভুর্জবার্গ-এর নিকটে কিট্‌জিঙ্গেন-এ তিনি উনষাটজন নগরবাসীর চোখ উপড়েছিলেন এবং অন্য সকলকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে এদের চিকিৎসা অথবা অন্য কোন প্রকার সাহায্য দানে নিরস্ত করেছিলেন। যখন চাষীদের বর্বরতার নজির দেখিয়ে ভাইন্‌স্‌বার্গের আঠারজন নাইটের হত্যার কথা বলা হয় তখন প্রশ্ন করা যেতে পারে জার্মান রাজন্যরা সভ্যতার কোন স্তরে এসে পৌছেছিলেন।"[১০]

[১০] কেম্ব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রী, খণ্ড ২, ১৯১ পৃষ্ঠা:

ভাইন্‌স্‌বার্গের হত্যার ব্যাপারটা এই। ১৫২৫ সালের ১৬ই এপ্রিল চাষীরা এই শহর ঘেরাও করে। এখানকার কাউণ্ট ছিলেন একটি অত্যাচারী দানব। চাষীদের একদল প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দরবার করতে গেল। তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে তিনি হত্যা করলেন। কিছুদিন পরে নগরে ঢুকে চাষীরা চল্লিশজন রক্ষীকে হত্যা করল। কাউণ্ট, তাঁর স্ত্রী ও ষোলজন নাইট বন্দী হলেন।

জার্মানীর কৃষাণ-বিদ্রোহের এক বৎসর আগে সুইজার্ল্যাণ্ডে এনাব্যাপটিস্ট আন্দোলনের অভ্যুদয় হল। আন্দোলনের নামকরণ হয়েছে বিপক্ষদের হাতে। এনাব্যাপটিজ্‌ম্ শব্দের অর্থ পুনর্ব্যাপটিজম্ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শুদ্ধিকরণ। বস্তুত এনাব্যাপটিস্টরা তা চাইত না। খ্রীষ্টান সন্তানকে শিশুকালে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করার পর থেকে সে হল প্রকৃত খ্রীষ্টান, এই ছিল চলতি প্রথা। এনাব্যাপটিস্টরা মনে করতো এটা একটা অর্থহীন প্রহসন। অবোধ শিশুর শুদ্ধিকরণের কোন মানে হয় না। জন্মেই কেউ খ্রীষ্টান হয় না কিংবা চার্চের এলাকায় আসে না। ধর্মবিশ্বাস গঠিত হলে, পবিত্র জীবন যাপনের অঙ্গীকার করলে তবেই খ্রীষ্টান হওয়া এবং চার্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। শুদ্ধিস্নানের আচার অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে। পরিণত বয়স না হলে খ্রীষ্টান হওয়ার মতো বিচারবুদ্ধি জাগতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধি একবারই হয়, সে সাবালক কালে; এনাব্যাপটিস্টরা চাইত সাবালক-শুদ্ধি, পুনঃশুদ্ধি নয়। শিশুদের শুদ্ধি করে চার্চ একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে—এতে প্রবেশ করবার জন্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস আবশ্যক হয় না। আসল চার্চ গঠিত হবে অল্পসংখ্যক সাধককে নিয়ে যারা পরিণত বয়সে আত্মার আলোক পেয়ে খ্রীষ্টান হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিভিন্ন মতাবলম্বী এনাব্যাপটিস্টদের এই হল একমাত্র যোগসূত্র। সনাতন চার্চের কর্তৃত্ব তারা মানল না। ব্যক্তির বিবেকের ওপর চার্চের শাসন চলবে না। আচারে ও বিশ্বাসে ধর্ম হবে নিঃশাসন, বিবেক হবে অবন্ধ। এখানে রাষ্ট্রেরও কোন এক্তিয়ার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করবে। পুরোহিত কিংবা হাকিম, মঠ-মন্দির কিংবা আইন-আদালত—কেউ আত্মা ও ঈশ্বরের মাঝে সালিসি করতে পারে না। একমাত্র মধ্যস্থ হলেন যীশু। অনেকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করত তিনি আবার ফিরে এসে পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন।

বিদ্রোহী নায়ক ররব্যাক দুই সারি চাষীকে বর্শা হাতে দাঁড় করিয়ে হুকুম দিলেন সতেরজন পুরুষ বন্দীকে ওর মাঝ দিয়ে যেতে যেতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাউন্ট ও কাউণ্টেস সর্বস্ব দিয়ে কাউণ্টের প্রাণভিক্ষা করলেন। বিদ্রোহীরা শুনল না। বর্শার আঘাতে জর্জরিত কাউণ্টের মৃত্যুর দৃশ্য কাউণ্টেসকে দাঁড় করিয়ে দেখান হল। প্রতিশোধ নেওয়ার পর বিদ্রোহীরা তাঁকে এক মঠে পাঠিয়ে দিল। বেলফোর্ট ব্যাক্স্. পেজেণ্ট্স্ ওয়ার ইন জার্মানী, লণ্ডন, ১৮৯৯। ১১৮-৩০ পৃষ্ঠা।

এর বাইরে এনাব্যাপটিস্টদের ধ্যান-ধারণা কোন নিশ্চিতি লাভ করতে পারে নি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ছিল নানা মত। কেউ কেউ চার্চ এবং সরকারের অধীনে কোন পদ গ্রহণ না করলেও সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করত না। উগ্রপন্থীরা এরূপ নিষ্ক্রিয় অসহযোগে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন সরকারী আইন বা হুকুম কিংবা কোন ধর্মীয় ফতোয়া জারি হলে তা তারা অমান্য করত। যেমন যুদ্ধের ডাক এলে তারা সাড়া দিত না—কারণ যুদ্ধকে তারা পাপ বলে মনে করত। তারা সাক্ষ্য দেবার সমন এলে শপথ নিত না কারণ আদালতের বিচার তাদের কাছে ছিল অবৈধ। তারা সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করত না এবং সমস্ত বিত্ত যৌথভাবে ভোগ করতে চাইত। কেহ কেহ মেয়েদেরও যৌথ বিত্তের পর্যায়ে ফেলত। "অন্যায়কে বাধা দিও না"—যীশুর এই বাণী বীজমন্ত্র করে অনেকে সর্ববিধ বলপ্রয়োগের নীতিকে বর্জন করে চলত। তাদের কাছে সরকারী ও সরকার-বিরোধী উভয়বিধ জবরদস্তি ছিল অন্যায়।[১১] পক্ষান্তরে অনেকে কেবল আমলাতন্ত্র, শপথগ্রহণ, যুদ্ধবিগ্রহ, ব্যক্তিসম্পত্তি ও শিশুশুদ্ধি বাতিল করে নিষ্ক্রিয় থাকতে প্রস্তুত ছিল না। চার্চ ও রাষ্ট্রের নিগ্রহ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তারা অস্ত্রধারণ করল। প্রটেস্ট্যাণ্টদের প্রভাব ছিল প্রধানত জমিদার ও ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যে। এনাব্যাপটিস্টরা আসন পাতল ইতর জনের সমাজে। স্বভাবত ইতর লোকের দাবিদাওয়া এদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল, ধর্মসংস্কারের আন্দোলনের মোড় ফিরল সমাজ-বিপ্লবের দিকে। এনাব্যাপটিজ্‌ম্-এর উর্বর জমিতে প্রথম সমাজবাদের ফসল ফলল।

১৫২৪ সালে মুন্‌ৎসার এবং ওয়াল্ডশাট্-এর ব্যাল্‌থাজার হুব্‌মায়ার এসে মিললেন জুরিকের কন্‌রাড গ্রেবেল ও ফেলিক্স্ মাঞ্জ-এর সঙ্গে, জুরিকে "ভ্রাতৃদল" নামে প্রথম এনাব্যাপটিস্ট গোষ্ঠী গঠিত হল। এর নৈতিক কার্যক্রম হল সাবালক-শুদ্ধি, খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব, চার্চ ও রাষ্ট্রের সংস্রব ত্যাগ এবং সুদ, রাজস্ব, সামাজিক কর্তব্য, শপথগ্রহণ ও চার্চের খাজনা বর্জন। এঁদের নেতা গ্রেবেল ছিলেন উচ্চবংশীয়। প্রথমে তিনি জ্বিংলির শিষ্য ছিলেন। পরে তিনি দেখলেন আসলে প্রটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক চার্চে কোন তফাত নেই—দুটিই

১১ এরা টলস্টয়ের দর্শনের মুখবন্ধ রচনা করে গেছেন।

অনুষ্ঠানসর্বস্ব এবং জাগতিক ব্যাপার নিয়ে লিপ্ত। তিনিই প্রথম আনলেন সাবালক-শুদ্ধি এবং খাঁটি খ্রীষ্টানদের নিয়ে আধ্যাত্মিক চার্চ গড়বার ধারণা। হুব্‌মায়ার ছিলেন বিদ্বান ও সুলেখক। তিনি পনেরটি সুচিন্তিত প্রচারপত্র রচনা করে গেছেন। শিশু-শুদ্ধির খণ্ডনে লেখা "দি খ্রীশ্চিয়ান ব্যাপটিজ্‌ম্‌ অব বিলীভার্স" (১৫২৫) এর মধ্যে অন্যতম এবং প্রচারের দিক দিয়ে সবচেয়ে সার্থক। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে অকাট্য যুক্তির অবতারণা তিনিই প্রথম করেছেন। সম্পত্তির যৌথকরণে তাঁর মত ছিল না, ব্যক্তির অবাধ অধিকারও তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন ধনীর উচিত দরিদ্রের সঙ্গে ধন ভাগ করে নেওয়া কারণ তারা বস্তুত সম্পত্তির মালিক নয়, রক্ষক মাত্র।

লুথারের মত জ্বিংলিও দেখলেন এ আন্দোলন অরাজকতা আনবে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ধর্মকর্ম সব ভেসে যাবে। জুরিকের কাউন্সিলে তিনি নগর থেকে এদের বহিষ্কার করবার এক আদেশনামা পাস করালেন। কৃষাণ-বিদ্রোহের ব্যর্থতা পারিষদদের সাহস বাড়িয়ে দিল। তারা মাঞ্জ, গ্রেবেল ও হুব্‌মায়ারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করল। তাঁদের খাবার জন্যে বরাদ্দ হল শুধু রুটি ও জল 'যাতে ঐখানে তারা মরে পচে।' গ্রেবেল সেভাবেই প্রাণ দিলেন (১৫২৬)। মাঞ্জ (১৫২৭) এবং হুব্‌মায়ারের স্ত্রীকে (১৫২৮) তারা জলে ডুবিয়ে মারল। কন্‌স্ট্যান্স-এ হাটসের নামে এই গোষ্ঠীর আর একজন শির দিলেন কিন্তু শির নোয়ালেন না। ব্লাউরক নামে অপর একজনকে পথে পথে বেত্রাঘাত করে নির্বাসন দেওয়া হল। হুব্‌মায়ার মত প্রত্যাহার করে মুক্তি পেলেন, প্রত্যাহারকে আবার প্রত্যাহার করলেন এবং প্রচার করতে গেলেন অগ্‌স্‌বার্গ ও মরেভিয়ায়। অনুসৃত পশুর মত স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি লিক্‌টেন্‌স্টাইনের লর্ডদের কৃপায় নিকল্‌স্‌বার্গে আশ্রয় পেলেন। অষ্ট্রিয়া, জার্মানী ও সুইজার্ল্যাণ্ডের নানান জায়গা থেকে পলাতক ও নির্বাসিতরা এখানে এসে জড় হতে লাগল। অষ্ট্রিয়ার সরকার জানতে পেরে লর্ডদের আদেশ দিল ধর্মদ্রোহী দেশদ্রোহী হুবমায়ারকে সমর্পণ করবার জন্যে। লর্ডরা আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস পেলেন না। আট মাস কারাগারে আবদ্ধ রাখার পর ভিয়েনার সরকার হুব্‌মায়ারকে পুড়িয়ে মারল (মার্চ ১৫২৮)।

এর আগেই আন্দোলন দক্ষিণ জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অগ্‌স্‌বার্গ, টাইরল ও ষ্ট্রাসবুর্গ হুব্‌মায়ার ও হান্স ডেঙ্ক-এর প্রচারে মেতে উঠেছিল।

১৫২৮ সালে সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ পুনঃশুদ্ধির অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়ে এক ফতোয়া জারি করলেন। পর বৎসর স্পেয়ারের ডায়েটে এই ফতোয়া সমর্থিত হল। ১৫৩০ সালে অগস্‌বার্গের ডায়েটে প্রটেস্ট্যাণ্টরাও আন্দোলনকে রুখবার জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা করল।

এর পর যে নিরঙ্কুশ বর্বরতার তাণ্ডব শুরু হল তা অবর্ণনীয়। সিবাস্‌শিয়ান ফ্রাঙ্ক নামে একজন সমসাময়িক নিরপেক্ষ লেখক মন্তব্য করেছেন যে ১৫৩০ সালের মধ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল দু হাজার লোক। "যাদের বিশ্বাস ছিল শিথিল তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত প্রত্যাহার করান হল তারপর তাদের মুণ্ডপাত করে আগুনে পোড়ান হল। যারা মত প্রত্যাহার করল না তাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হল।…অন্যান্য জায়গায় যে ঘরে তারা সর্বদা সভা করত এবং পরস্পরে ভাব বিনিময় করত সেই ঘরে তাদের পুরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।… একটি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েকে কিছুতেই মত প্রত্যাহার করান গেল না; … যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হয়েছিল তাতে সে অপরাধী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে মনে প্রাণে ও চেহারায় সে ছিল নিষ্পাপ নির্দোষ। প্রত্যেকে তার হয়ে জীবন ভিক্ষা করল। ঘাতক তাকে বাহুতে তুলে নিকটে একটি ঘোড়ার জলের চৌবাচ্চায় নিয়ে গেল এবং তাকে জলের নীচে চেপে ধরল যতক্ষণ না দম বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়; তারপর প্রাণহীন দেহটি বার করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।"[১২]

হল্যাণ্ডে এনাব্যাপটিস্ট গোষ্ঠীর স্রষ্টা মেল্‌শিয়র হফম্যান। তিনি ছিলেন অশিক্ষিত, এক পশম-ব্যবসায়ীর কর্মচারী। কিন্তু বাইবেল-এর বিদ্যা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। প্রথমে তিনি ছিলেন লুথারের ভক্ত। ক্রমে মতভেদ উপস্থিত হল। ১৫২৯ সালে তিনি স্ট্রাসবুর্গে এসে এনাব্যাপটিস্টদের দ্বারা পরিশুদ্ধ হলেন। তারপর তিনি হল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচার শুরু করলেন যে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ১৫৩৩ সালে স্ট্রাসবুর্গে অবতরণ করে নিজ হাতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করবেন। এই 'নয়া জেরুজালেমে' তাঁর নিজের ভূমিকা হবে প্রফেট ইলায়াসের মত। প্রভুর আবির্ভাবের আয়োজন করবার জন্যে তিনি স্ট্রাসবুর্গে এলেন। সেখানে

১২ লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে : হিস্ট্রী অব দি রিফর্মেশন ইন জার্মানী। অনুবাদ, সারা অস্টিন। লণ্ডন, ১৯০৫, ৭২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

যীশুর অগ্রদূত গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। দশ বৎসর পরে বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল।

আন্দোলন হত্যা ও নির্যাতনে প্রশমিত হল না বরং উত্তর ও পূর্ব জার্মানীতে প্রসারিত হল। হুট নামে মুনৎসারের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত একজন চরমপন্থী ব্যক্তি-সম্পত্তিকে আঘাত করলেন, হুব্‌মায়ারের প্রভাব থেকে মরেভিয়াকে মুক্ত করে, সেখানে যৌথ সম্পত্তির আদর্শ প্রচার করলেন। তিনি এবং তাঁর অনুচররা অস্টারলিজ্‌-এ একটি কমিউনিস্ট আশ্রম স্থাপন করলেন। সেখানে চাষ-আবাদ হত সামুদায়িক ভাবে। কৃষি ও কারুশিল্পের উপকরণ সমাজের কর্মচারীরা কিনে বিলি করত। আয়ের কিছু অংশ জমিদারকে ভাড়া দেওয়া হত, বাকিটা প্রয়োজন অনুসারে সকলকে ভাগ করে দেওয়া হত। যৌথ সমাজের অঙ্গ ছিল পরিবার নয়—চারশ থেকে দু হাজার পর্যন্ত লোক নিয়ে এক এক আবাসঘর, যাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল এক এক রান্নাঘর, ধোপাখানা, স্কুল, হাসপাতাল ও পানশালা। মায়ের দুধ ছাড়বার পর শিশুরা একসঙ্গে প্রতিপালিত হত, কিন্তু এক বিবাহের প্রথা পরিত্যক্ত হয় নি।[১৩] ত্রিশ বার্ষিক যুদ্ধের সময়ে সম্রাটের এক ফতোয়ায় (১৬২২) এই সমাজটি উৎসন্ন হল। এর সভ্যদের বাধ্য করা হল ক্যাথলিক ধর্ম কিংবা নির্বাসন দুটোর একটা বেছে নিতে। যারা নতি স্বীকার করল না তারা কেউ গেল রুশে, কেউ বা হাঙ্গারীতে।

যারা বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে রাজী ছিল না তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল,—হয় অত্যাচার সহ্য করতে করতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, নয় ত' স্বধর্ম রক্ষার জন্যে প্রত্যাঘাত করা। জন ম্যাথিস নামে হারলেমের এক রুটিওলা, হফ্‌ম্যানের মন্ত্রশিষ্য, দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে ধীরভাবে অপেক্ষা করে 'নয়া জেরুজালেম' পাওয়া যাবে না, তাকে জোর করে আনতে হবে। তিনি নিজে আসন্ন ধর্মযুগের এনক হয়ে বসলেন এবং প্রতিবেশী প্রদেশগুলোকে দীক্ষিত করবার জন্যে বারোজন ধর্মদূত পাঠালেন। এর মধ্যে ছিলেন জ্যান বকেলসন নামে লেডেনের এক তরুণ-

১৩ উইল ডুরাণ্ট : দি রিফর্মেশন, ৩৯৮ পৃষ্ঠা। বর্তমানে ইস্রেলে ঠিক এই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সেখানকার কিব্যুৎসগুলি ৪০০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত চাষী অথবা চাষীকারিগরের এক একটি গোষ্ঠী। তারা বাস করে একসঙ্গে এবং তাদের শিশুরাও বাপ-মার কাছে থাকে না।

বয়স্ক দর্জি। পরে তিনি জন অব লেডেন নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ, সুবক্তা, দৃঢ়চেতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালী। মুন্‌ৎসারের লেখা পড়ে তাঁর বিশ্বাস জন্মাল। চব্বিশ বছর বয়সে ম্যাথিসের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি ওয়েস্টফেলিয়ার সমৃদ্ধিশালী জনবহুল রাজধানী মুনস্টারে ধর্মপ্রচার করতে গেলেন।

মুনস্টার ছিল চার্চের অধীন, একাধারে এর লর্ড ও বিশপ ছিলেন ফ্রান্জ ফন্ ওয়াল্‌ডেক্। কিন্তু ধর্মকর্মের বদলে এখানে গড়ে উঠেছিল শিল্প ও বাণিজ্য। নগরের কাজ চালাত একটি নির্বাচিত পৌরসভা, তাতে ছিল ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্য। কৃষাণ-বিদ্রোহের পর থেকে এখানে শ্রমিক শ্রেণী মাথা তুলতে লাগল। এদের নেতৃত্ব নিলেন লুথারের প্রাক্তন চেলা প্যাস্টর বার্নহার্ড রথম্যান। তিনি ওলন্দাজ এনাব্যাপটিস্টদের সাহায্য চাইলেন। প্রথমে এলেন জন অব লেডেন, তারপর ম্যাথিস নিজে। তিনজন মিলে বিশপের ফৌজকে বিতাড়িত করে নগর দখল করলেন। নির্বাচনের ব্যবস্থা হল। এনাব্যাপটিস্টরা পৌরসভা করায়ত্ত করল। পরম উল্লাসের মধ্যে বিপ্লবীরা ঘোষণা করল বহুদিনের স্বপ্নসাধ ঈশ্বরের রাজ্য বা নয়া জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠা (১৫৩৪)।

এদিকে বিশপ হেসির রাজন্য ফিলিপের সাহায্য নিয়ে নগর অবরোধ করলেন। আশঙ্কা হল জার্মানীর অন্যান্য রাজন্যও তাঁর সাহায্যে আসবেন। পৌরসভা সুদীর্ঘ অবরোধের জন্যে প্রস্তুত হল। অবিশ্বাসীদের তারা নগর ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। তারপর পৌরসভাকে সরিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিল এক জনরক্ষা সমিতি। ম্যাথিস শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। জন অব লেডেন হলেন সর্বাধিনায়ক। তাঁর নির্দেশে প্রবর্তিত হল এক সমাজবাদী ধর্মরাজ্য। যুদ্ধের প্রয়োজনে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হল, আর নয়া জেরুজালেমকে রক্ষা করবার জন্যে জাগিয়ে তোলা হল ধর্মের উন্মাদনা। জন অব লেডেন হলেন 'ইস্‌রেলের রাজা' আর জনরক্ষা সমিতির সভ্যরা খেতাব নিলেন 'ইস্‌রেলের দ্বাদশ যূথের জ্যেষ্ঠমণ্ডলী'।

মুনস্টারের এই নয়া জেরুজালেম সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হয়েছে। অনেকে কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এরা আইন, আমলা, সম্পত্তি ও বিবাহ তুলে দিয়ে অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়েছিল। পুরাতন

আইন ও আমলাতন্ত্র বাতিল হয়েছিল সন্দেহ নেই। সম্পত্তির ওপর মালিকের অধিকার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল বটে তা বলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়নি। নির্ধনদের অন্নবস্ত্র যোগাবার জন্যে তিনজন ডীকন নিযুক্ত হয়েছিল; আর ধনিকদের বাধ্য করা হয়েছিল তাদের উদ্বৃত্ত ধন সাধারণের জন্যে দান করতে। নগরের ভিতরকার চাষের জমি পারিবারিক লোকসংখ্যার অনুপাতে পরিমাপ করে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কেবল মণিমুক্তা সোনা-রূপা ও যুদ্ধের লুণ্ঠনের সামগ্রী আসত যৌথ ভাণ্ডারে।[১৪]

কামাচার ও ব্যভিচারের স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নেই। মাতলামি ও জুয়া খেলার শাস্তি ছিল কঠিন। বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যভিচারের দণ্ড ছিল মৃত্যু। তবে অনেক সমর্থ পুরুষ পালিয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে একটা যৌন সমস্যা দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয়। জনরক্ষা সমিতি বাইবেল-এর নজির দেখিয়ে আদেশ জারি করলেন বেওয়ারিশ মেয়েরা হবে 'এয়োস্ত্রীদের সঙ্গিনী'—অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষদের রক্ষিতা ও ভোগ্যা। সম্ভবত অধিকাংশ নারী নিঃসঙ্গ ও নিঃসন্তান জীবন যাপনের চেয়ে এই অবস্থাকে খারাপ মনে করেনি। সবাই এই বৈপ্লবিক সংস্কারকে গ্রহণ করতে পারল না। রক্ষণশীলরা বিদ্রোহ করে রাজাকে বন্দী করল। কিন্তু অনতি-বিলম্বে তারা রাজভক্তদের হাতে পরাস্ত ও ধ্বংস হল। জন নিষ্কণ্টক হয়ে নিজেই বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাঁর আর যাই দোষ থাকুক তাঁর শাসন যে জনপ্রিয় ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাজার হাজার লোক তাঁর আদেশে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল এবং এদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারী ও বালকের সংখ্যা ছিল বেশী। নগররক্ষায় নারীদের অবদান ছিল অমূল্য। অত্যাচারী ও ব্যভিচারী বলে জনের যতই দুর্নাম রটুক না কেন 'ইস্রেলের রাজা'র ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গুণ অবিসংবাদিত।

নগর ঘিরে যতই অবরোধের ফাঁস আঁট হতে লাগল ততই সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে লাগল রাজার মুঠোয়। একতন্ত্রের সমর্থনে রাজা ও পরিষদরা এনাব্যাপটিস্ট ধর্মবিশ্বাসের নূতন টীকা রচনা করলেন। যীশুখ্রীষ্টের রাজ্য তো লৌকিক নয় আধ্যাত্মিক, তার নির্ভর অস্ত্র ও শাসনের ওপর নয়, আত্মার শুদ্ধির ওপর,—এই সন্দেহ ভঞ্জন করবার জন্যে তাঁরা এক অভিনব তত্ত্ব

১৪ কার্ল কাউট্স্কী: কমিউনিজম্ ইন সেন্ট্রাল ইয়োরোপ। ২৭০ পৃষ্ঠা।

আবিষ্কার করলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের অভ্যুদয় হবে দুঃখ দুর্দশার ঘনঘটার মধ্যে,—তার অবসানে পৃথিবীতে আসবে যীশুর রাজ্য আনন্দে সমুচ্ছল ও গৌরবে সমুজ্জল যা তিনি বিশ্বস্ত শিষ্যদের নিয়ে সহস্র বর্ষ ধরে উপভোগ করবেন। এই সহস্রবার্ষিক স্বর্ণযুগের পূর্বাহ্নে মুনস্টার রাজ্যকে দুঃখবরণ করতে হবে। এই অবরোধ ঈশ্বরের পরীক্ষা,—এ থেকে তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে। পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করবার আগে মরুভূমির পথে হিব্রু যাত্রীদের কত ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছিল কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল! প্রফেটরা কি একজন রাজচক্রবর্তীর আগমন বার্তা ঘোষণা করেন নি?[১৫] এই নব্য দর্শনের বদল 'ইস্‌রেলের রাজা' হলেন 'সারা বিশ্বের সম্রাট', সাজসজ্জায় চালচলনে আনলেন চোখ-ধাঁধানো জৌলুষ ও জাঁকজমক। অবিরাম লোকদেখানো সমারোহের আবর্তে পড়ে সম্রাটের মাথা ঘুরে গেল। ক্ষমতার মোহে সকল দেশে সকল যুগে স্বৈরাচারীর যা হয়, সেই অমোঘ ঐতিহাসিক পরিণাম নেমে এল 'বিশ্বপতি' জন অব লেডেনের ওপর।

এদিকে মুনস্টারের তরঙ্গ নগরের প্রাচীর ডিঙিয়ে সারা জার্মানীতে আলোড়ন তুলল। শাসকদল সচকিত হল। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্টরা হাত মিলিয়ে শক্তি সমাবেশ করল। ১৫৩৫ সালের এপ্রিল মাসে মুনস্টার অবরোধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে সমস্ত জার্মানীর ওপর একটি কর ধার্য হল। বিশপ ওয়ালডেক নগরে রসদ প্রবেশ করবার সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিলেন। দুর্ভিক্ষ আসন্ন দেখে জন নির্দেশ দিলেন যাদের ইচ্ছা হয় তারা নগর ছেড়ে চলে যাক। অনেকে এই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করল এবং বিশপের সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারাল। এদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে নগরে প্রবেশ করবার একটা সহজ রাস্তা দেখিয়ে দিল। এই পথে বিশপের ফৌজ এসে অনশনক্লিষ্ট নগররক্ষীদের ওপর চড়াও হল। তাদের আর আত্মরক্ষা করবার সামর্থ্য ছিল না। নগর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার আশ্বাস পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করল (জুন ১৫৩৫)। অস্ত্র ত্যাগ করা মাত্র তাদেরকে সদলবলে হত্যা করা হল। ঘরে ঘরে তল্লাশ করে বিজেতারা অবশিষ্ট চারশতজন পলাতককে বার করে এনে বধ করল। জন অব লেডেন ও তাঁর দুইজন সহকারীকে ধরে এনে তারা বধ্যভূমিতে দণ্ডের

১৫ লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে: হিস্ট্রী অব দি রিফর্মেশন ইন জার্মানী, ৭৪৪ পৃষ্ঠা।

সঙ্গে আবদ্ধ করল, গরম সাঁড়াশি দিয়ে টেনে টেনে তাদের দেহের মাংস ছিঁড়ল। পোড়া মাংসের দুর্গন্ধ যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন তারা তাদের জিভ টেনে উপড়ে ফেলল। অবশেষে ঘাতক তাদের বুকে ছোরা বসিয়ে শেষকৃত্য সমাপন করল।

লুথারের অঙ্গুলিসংকেতে জার্মানীর ওপর এক করাল বিভীষিকার অগ্নিপাত হল। ধর্মদ্রোহীদের মধ্যে যারা ছিল সংগ্রামশীল ও অটলবিশ্বাসী তারা নিহত অথবা নির্বাসিত হল। যারা ছিল শান্তিপ্রিয় তাদেরও নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার সীমা রইল না। অনেকে মত প্রত্যাহার করল। কেহ কেহ ক্যাথলিক চার্চে যোগ দিল। যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল তারা ছোট ছোট মিস্টিক সম্প্রদায় গঠন করে শান্ত হয়ে বসল। স্বর্ণযুগের সাম্যবাদ ও নৈরাজ্য-বাদকে যীশুর জন্যে তুলে রেখে, চার্চ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে তারা ধর্মেকর্মে মনোনিবেশ করল। মেন্নো সাইমন্‌স্ নামে এদের একজন আশাহত বিশ্বাসীদের দলবদ্ধ করে নূতন পথে পরিচালনা করলেন। যীশুখ্রীষ্ট নিজে নির্দেশ দিয়েছিলেন সরকারী আদেশ শিরোধার্য করতে। মেন্নোনাইট সম্প্রদায় বিদ্রোহের নীতি বর্জন করে বাধ্যতার নীতি গ্রহণ করল। হল্যাণ্ড ও রুশে গিয়ে এরা চাষ আবাদ নিয়ে বসল। এদের যৌথ খামারগুলি ছিল দেখবার মত। ১৮৭৪ সালে এদের একদল আমেরিকার দক্ষিণ ডাকোটায় বসতি স্থাপন করল। এখনও সেখানে এরা শ্রেণীহীন গোষ্ঠীজীবন রক্ষা করে চলেছে। এরূপ আর একটি সম্প্রদায় আছে হুটেরাইট ভ্রাতৃদল নামে। এদের গুরু জেকব হুটের ছিলেন সুইস্ এনাব্যাপটিস্ট। ১৫৩৬ সালে ইন্‌স্‌ব্রুকে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। এরা গিয়ে বসল উক্রেন, ক্যানাডা ও স্পেনে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এনাব্যাপটিস্ট ঐতিহ্য বহন করল ইংলণ্ডের যুদ্ধ বিরোধী কোয়েকাররা আর আমেরিকার সাবালক-শুদ্ধিতে আস্থাবান ব্যাপটিস্টরা।

যোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদে মধ্য ইয়োরোপ জুড়ে যে ঝড় উঠেছিল তাতে অনেক বিপ্লবী চিন্তানায়কের নাম হারিয়ে গেছে। এদের মধ্যে একজন দক্ষিণ জার্মানীর সিবাস্‌শিয়ান ফ্রাঙ্ক (১৪৯৯-১৫৪৩)। তিনি স্ট্র্যাসবুর্গে এসে বসবাস করছিলেন। হিউম্যানিস্ট নেতা ইরাসমাসের উদ্যোগে ১৫৩২ সালে তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ছিলেন মিস্টিক মানবপ্রেমিক—সব রকম চার্চ বা সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী। এনাব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়কেও তিনি বাদ দেননি। যীশুর শিষ্য এপস্‌ল্‌দের পর থেকে চার্চ খ্রীষ্টবিরোধী

কার্যকলাপে কলুষিত হয়েছে—একে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তুর্ক ও হীদেনদের মধ্যে মত ও বিশ্বাসের যেটুকু স্বাধীনতা আছে লুথারের চার্চে তাও নেই। সম্প্রদায় গড়তে গেলেই স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আসল চার্চ অদৃশ্য অবাস্তব, বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের আধ্যাত্মিক মিলনতীর্থ, সেখানে ভক্তকে পথ দেখায় অন্তরোত্থিত ঈশ্বরের বাণী। সিবাস্‌শিয়ানের উল্লেখযোগ্য রচনা "ক্রনিকা" (১৫৩১) বাইবল্‌-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা ইতিহাস এবং "প্যারাডক্সা" (১৫৩৪) স্বাধীন চিন্তার পাঠ। তাঁর চার্চ-বিরোধী তীব্র মন্তব্যগুলি প্রজ্ঞানযুগের ভলতেয়রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়, সমসাময়িক নৈতিক মানের তুলনায় চরিত্রবান। কিছু কিছু লোকের ও কোন কোন গোষ্ঠীর পাগলামি ও বাড়াবাড়ির জন্যে সমস্ত আন্দোলনের ওপর কলঙ্ক পড়েছে। এনাব্যাপটিস্টদের মারাত্মক দুর্বলতা ছিল একতার অভাব। সিবাস্‌শিয়ান ফ্রাঙ্ক বলেছেন এমন দুটি গোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া যাবে না যারা সব বিষয়ে একমত। এদের মধ্যে এমন কোন চিন্তানায়কের উদ্ভব হয়নি যাঁর হাতে অসংলগ্ন নীতি ও বিশ্বাসগুলি একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শনে উত্তীর্ণ হতে পারত। ফলে বিশৃঙ্খল ভাবনার সঙ্গে অন্তরের বাণী ও দিব্যদৃষ্টি তালগোল পাকিয়ে কতকগুলি উদ্ভট বিশ্বাসের সৃষ্টি হল। ধর্মান্ধতার পিছনে যখন অস্ত্র ও সংঘশক্তি এসে দাঁড়াল তখন প্রস্তুত হল সর্বনাশের রাস্তা। ক্ষমতার পেছনে পেছনে এল আত্মকলহ—মতভেদগুলো প্রকট হয়ে উঠল। সম্পত্তির যৌথকরণ, যীশুর পুনরাবির্ভাব, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর ওপর ছিল বিপরীত মত। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে এনাব্যাপটিস্টরা ছিল চরম ব্যক্তিত্বপরায়ণ। রাষ্ট্রশাসনকে সরিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার পত্তন করতে হলে যে সমাজবোধ ও যৌথসত্তার প্রয়োজন এনাব্যাপটিস্টদের চিন্তায় ও সংগঠনে সে জিনিস ছিল না।

তত্ত্বের দিক দিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা নৈরাজ্যবাদী নয়। তারা রাষ্ট্রকে বিনাশ করতে চায়নি, যদিও মুন্‌স্টারের বিপ্লবীরা এর অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাটাই করে দিয়েছিল। সেনেকা ও যীশুর মত তারা মনে করত যে রাষ্ট্র মন্দ লোকের শাসনের জন্যে একটা অপরিহার্য অন্যায় বস্তু যার সঙ্গে সৎ লোক বা খাঁটি খ্রীষ্টানদের কোন সম্পর্ক নেই। এনাব্যাপটিস্টরা আমলাতন্ত্র ভাঙতে যায়নি। তাদের বিবেক সায় না দিলেই তবে তারা আমলাদের নির্দেশ অমান্য

করত। তারা সরকারী কাজ নিত না কারণ এ প্রকার পদগৌরব খ্রীষ্টান ভ্রাতৃসম্বন্ধের পরিপন্থী। তারা প্রাণদণ্ডের বিরোধী ছিল কারণ মানুষের জীবন তাদের কাছে ছিল মূল্যবান এবং প্রাণদণ্ডে অপরাধ দূর হয় এ তারা বিশ্বাস করত না। যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল একই কারণে। যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড খ্রীষ্টান জনোচিত নয় এবং এতে কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তারা শপথ নিত না কারণ এটা অন্তরের জিনিস। আনুষ্ঠানিক শপথের কোন মূল্য নেই। জোর করে নেওয়ান শপথে কেউ বাধ্য থাকে না—তাতে শুধু ভণ্ডামি প্রশ্রয় পায়।

যদিও এনাব্যাপটিস্টরা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে চায়নি তবুও এদের আপত্তি-গুলো যে কোন রাষ্ট্রকে অচল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমলাতন্ত্র, দণ্ডবিধি, শপথের ওপর নির্ভরতা এগুলি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্র বৈষ্ণব হয়ে বসতে পারে না। সর্বোপরি যে রাষ্ট্রের জন্ম পাপে, যার দেহে পাপের ছাপ তার মর্যাদা কোথায়? যদি রাজকার্য সৎ খ্রীষ্টানের অযোগ্য হয়, যদি কেবল অসৎ লোকের জন্যে থাকে এ কাজ, তাহলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এ রাষ্ট্রকৃত্যই বা থাকবে কোথায়? বরং দুষ্ট লোকের হাতে রাজধর্ম হবে এর বিপরীত। সুতরাং এনাব্যাপটিস্টরা রাষ্ট্রকে সরাসরি বিলোপ করতে না চাইলেও তাদের মতগুলি রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক।

সনাতনীদের অত্যাচারে ধর্মদ্রোহীরা হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। যে ঈশ্বরের রাজ্য ছিল অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, তা যখন হিংসার পথে মর্তলোকে নেমে এল তখন তার সঙ্গে আর সনাতনীদের চার্চের সঙ্গে কোন মৌলিক পার্থক্য রইল না। যেমন কেলভিনের জেনেভা ছিল ঈশ্বরের নগরী, খ্রীষ্টান সাধুদের তীর্থস্থান, কঠোর ধর্মীয় শাসনে নিয়ন্ত্রিত, যেখানে বিরুদ্ধবাদী-দের ধরে পুড়িয়ে মারা হত, বিপ্লবীদের স্বপ্নরাজ্য নব জেরুজালেম কায়েম হলে তার চেহারাও অন্যরকম হত না। সনাতন ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে গিয়ে এনাব্যাপটিস্টরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতই জুলুম ও জবরদস্তির জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ল, যে হিংসা ও বলপ্রয়োগ ছিল তাদের নীতিবিরুদ্ধ তার আবর্তে পড়ে আন্দোলন নীতিভ্রষ্ট হল।

রাষ্ট্রের ন্যায় ব্যক্তিসম্পত্তি সম্বন্ধেও তাদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল। কারও কারও সাম্যবাদের আদর্শ ছিল যীশুর শিষ্যদের আমলের আদিম চার্চ, যেখানে উপার্জক স্বেচ্ছায় সকলের হিতার্থে বিত্ত সমর্পণ করত। মরেভিয়াতে

এনাব্যাপটিস্টদের এরূপ অনেক যৌথ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। অস্টারলিজেও ছিল কৃষি গোপালন ও কারুশিল্পে পারদর্শী হুটপন্থীদের প্রকাণ্ড কমিউন,—মুন্স্টারের পতনের পর এগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। অনেকের সাম্যবাদ ছিল আরো উগ্র,—যার ভিত্তি খ্রীষ্টানজনোচিত প্রেমধর্মে নয়, মানুষের স্বাভাবিক মৌলিক অধিকারে। তাদের সমাজতন্ত্র ছিল বাধ্যতামূলক যেখানে সকলের বিত্ত সমাজ করায়ত্ত করেছে—কারও অনুগ্রহের দানের ওপর সে নির্ভর করে না। সকলে আবার এই চরমপন্থা পছন্দ করত না। অনেকে সম্পত্তিকে ঈশ্বরের ট্রাস্ট বা ন্যাস বলে গণ্য করত। মালিক বস্তুত সম্পত্তির ন্যাসপাল;—'সম্পত্তি জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে ঈশ্বর মালিককে এই শর্তে আবদ্ধ করেছেন।

অনেক এনাব্যাপটিস্ট ছিল তেজারতি কারবারের বিরোধী। যেহেতু কেউ সম্পত্তির মালিক নয়, সেহেতু টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া অন্যায়। টাকা ধার দেওয়া উচিত লাভের জন্যে নয়, ঋণীকে সাহায্য করবার জন্যে। কারও অভাবের সুযোগ নিয়ে লাভ করা অতি নীচ কাজ। অনেকে চার্চকে খাজনা দিতে গররাজী ছিল। যার তার কাছ থেকে আদায় করা টাকায় ধর্ম রক্ষা হয় না। ধার্মিকরা স্বেচ্ছায় যা দেয় তা দিয়েই ধর্মাচরণ সম্ভব।

এনাব্যাপটিস্টদের ক্রান্তিযজ্ঞ রক্তগঙ্গায় ডুবে গেলেও তাদের সাধনা নিষ্ফল হয়নি। তাদের একাধিক নীতি আজকের সমাজ মঞ্জুর করে নিয়েছে। বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা আধুনিক লোকায়ত রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। প্রাণদণ্ড অনেক দেশের দণ্ডবিধিতে আজ আর নেই। যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি-আন্দোলন আজ আর কল্পনাবিলাসী বায়ুগ্রস্তদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিন্তু নৈরাজ্যবাদ ও সাম্যবাদ আজও দূর দূরান্তে—মুষ্টিমেয় স্বপ্নচারীর ধ্যানলোক থেকে তা মরলোকে অবতরণ করল না।

প্রজ্ঞানযুগ

প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইয়োরোপে ষোল ও সতের শতকে যে ধর্মীয় সংগ্রামের আগুন জ্বলেছিল তাতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম-সাম্রাজ্য পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে নূতন রাষ্ট্রবিন্যাসের ভিত্তিস্থাপন হল, ইয়োরোপের রাষ্ট্রীয় মঞ্চে আবির্ভূত হল পোপের এবং পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কুক্ষিমুক্ত জাতীয় রাষ্ট্র। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় জাতীয় রাষ্ট্রের অগ্রগতি এবং রাষ্ট্রশক্তির বিস্তার। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল নূতন রাষ্ট্রবাদ। ধর্মরাষ্ট্রের দাবী ছিল তার ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত। জাতীয় রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল লৌকিক ভিত্তির ওপর। মানুষের আহ্বানে মানুষের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে, ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। সুতরাং রাষ্ট্র অসপত্ন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রজাপুঞ্জের অবিসংবাদী আনুগত্যের অধিকারী। এই দর্শনকে আশ্রয় করে দেড় শ' বছরের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে উঠল সর্বশক্তিমান, জনগণের হর্তাকর্তা, ভাগ্যনিয়ন্তা।

ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের অনুসন্ধান শুরু হল। উচ্চারিত হল রাষ্ট্রবিধানের প্রতিকূলে ব্যক্তি-অধিকারের বাণী, রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে জনগণের স্বাধীন সত্তার কথা। আরম্ভ হল রাজদণ্ড ও জনশক্তির সংঘর্ষ। হল্যাণ্ডে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট একতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের তিনটি খণ্ডযুদ্ধ। সংঘর্ষের চূড়ান্ত মীমাংসা হল ফরাসী বিপ্লবে। সর্বগ্রাসী একতান্ত্রিক শাসনের জায়গায় এল গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-অধিকারের আদর্শ।

সতের-আঠার শতকের জনবিদ্রোহ ছিল প্রধানত রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহীদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে,—তাঁরা রাষ্ট্রের আশ্রিত ধর্ম, বিত্ত এবং স্থিতস্বার্থকেও আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয় নি। বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্রে জনগণের অধিকার কিছু কিছু স্বীকৃত হলেও ধর্ম সম্পত্তি ও শ্রেণীস্বার্থ দূর হল না। সর্বত্রই এরা বহাল রইল, কোথাও পুরাতন, কোথাও নূতন মূর্তিতে। সুতরাং আবার শুরু হল তীর্থযাত্রা

সাম্য ও স্বাধীনতার অন্বেষণে। ধর্মবিপ্লব আঘাত করেছিল চার্চের কর্তৃত্বকে, রাষ্ট্রবিপ্লব রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে। জনগণের বুকে এ দুই বিপ্লব যে আশা জাগিয়ে তুলেছিল তা এর দ্বারা পূর্ণ হয় নি। ধর্মীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এসেছিল উগ্রপন্থী এনাব্যাপটিস্টরা। তেমনি রাষ্ট্রীয় মুক্তির স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য জ্যাকবিন দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এনার্কিস্টরা। প্রটেস্ট্যান্টরা এক নূতন ধর্মীয় শাসনের অবতারণা করেছিল। জ্যাকবিনরা প্রবর্তন করল এক নূতন সম্পত্তি প্রথা ও শ্রেণী-বিন্যাস। এনার্কিস্টরা নিয়ে এল সর্বনাশা সংহারমন্ত্র। রাষ্ট্রের পোষ্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্ম, বিত্ত ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হল।

এই প্রকারে ফরাসী বিপ্লবের আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে আঠার-শতকের উপান্তে মুক্তিপিপাসু এনার্কিস্ট মতবাদের জন্ম হল। সমকালীন প্রজ্ঞানবাদের আবহাওয়ায় লালিত এনার্কিজম প্রাচীন যুগের স্বপ্নসাধ ও মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস বর্জন করে ন্যায়শাস্ত্রে অধিষ্ঠিত বিচারসিদ্ধ সমাজদর্শনে উত্তীর্ণ হল। প্রজ্ঞানশীল নৈরাজ্যবাদের প্রথম দার্শনিক ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম গডউইন।

৫। ইংল্যাণ্ড : উইলিয়ম গডউইন (১৭৫৬—১৮৩৬)

কেম্ব্রিজশায়ারের উইজবেক নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত যাজক পরিবারে উইলিয়ম গডউইনের জন্ম হয়। বাড়ির শুষ্ক ধর্মীয় আবহাওয়া এবং শুচিবায়ুগ্রস্ত পিতার আচরণ তাঁকে ছেলেবেলা থেকে উন্নাসিক করে তুলেছিল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হল যাজকবৃত্তিতে পিতার যশ প্রতিপত্তি তিনি ম্লান করে দেবেন। পিতার বৃত্তি গ্রহণও করলেন তিনি। কিন্তু ১৭৮১ সালে অকস্মাৎ রুশো এল্‌ভেটিয়াস ও ভি হলব্যাক-এর লেখা পড়ে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর সন্দেহ এল। পর বৎসর যাজকবৃত্তিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি লণ্ডনে গিয়ে বসলেন এবং সাময়িক পত্রে এটাসেটা লিখে কষ্টে জীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। এমন সময়ে ১৭৮৯ সালে ঘটল ফরাসী বিপ্লব। তার বিদ্যুৎস্পর্শে গডউইনের জীবন ও চিন্তার মোড় ঘুরে গেল।

অথচ গডউইন সমকালীন চরমপন্থীদের মত উৎসাহ ও আনন্দে আত্মহারা হন নি। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মনের সংশয় প্রকাশ করেছেন—

"বহু লোক একত্র জড় হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রবৃত্তি জাগ্রত

হয়, জনতার সেই উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জবরদস্তির শাসনকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও নিন্দা করিতে কসুর করি নাই। বুদ্ধির সুস্পষ্ট আলোক অথবা হৃদয়ের উন্নত ও উদার অনুভূতি হইতে যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন আসিতে পারে আমি কেবল তাহাই চাহিয়াছি।"[১]

প্রথম হতেই তাঁর চিন্তা ছিল বস্তুবিমুখ এবং প্রজ্ঞানমুখী। কিন্তু এক অনাগত স্বর্ণযুগের স্বপ্নে ডুবে থাকবার মত মানুষও তিনি ছিলেন না। তখন বার্কের "রিফ্লেকশন্‌স্ অন দি ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন" প্রকাশিত হয়েছে (১৭৯০)। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তিনি যে বিষোদ্গার করেছেন প্রতিক্রিয়াশীল টোরী সরকার তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। পর বৎসর গডউইন এবং কয়েকজন সহযোগীর উদ্যোগে প্রকাশিত হল টমাস পেন-এর "রাইট্‌স্ অব ম্যান।" "রিফ্লেকশন্‌স্"-এর পাল্টা আক্রমণে বামপন্থীদের আরও গুটিকয়েক প্রচারপত্র বেরুল। কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ও বিত্তাধিকারে যে মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান এর কোনটিতেই তার নিরসনের চেষ্টা ছিল না। গডউইন স্থির করলেন তিনি এই অভাব পূরণের জন্য একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করবেন। কোন নীতি ও সূত্র আশ্রয় করে একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠিত হতে পারে তা হবে এই গ্রন্থের আলোচ্য। ষোল মাস বসে লেখার পর বই একটি দীর্ঘ শিরোনামা নিয়ে উপস্থিত হল—"এন এনকোয়ারী কনসার্নিং পলিটিক্যাল জাস্টিস এণ্ড ইট্‌স্ ইনফ্লুয়েন্স অন জেনারেল ভারচু এণ্ড হ্যাপিনেস"। লেখার শুরুতে তিনি ছিলেন বামপন্থী প্রগতিবাদী, লেখার শেষ দিকে হয়ে উঠলেন সর্বশাসনাস্তক নৈরাজ্যবাদী।

গডউইন দেখতে পেলেন সমাজের বুকে যে দুঃখবেদনা জমে উঠেছে ভোট দিয়ে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কিংবা খাজনার হার কমিয়ে তার প্রতিকার হবে না। আসল গলদ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, বিশেষ করে সম্পত্তিপ্রথা যে অসম সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তার মধ্যে। এদিকে ইংরাজ বামপন্থীদের নজর পড়ে নি। অথচ এই বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সরকারী শাসন ও স্বৈরাচার। মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে ঢেলে সাজতে হবে এবং তার জন্য রাষ্ট্র ও তার আনুষঙ্গিক কোন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে রেহাই দেওয়া চলবে না।

১ জর্জ উড্‌কক : উইলিয়ম গডউইন, লণ্ডন ১৯৪৬, ৩৪ পৃষ্ঠা।

মানুষে মানুষে সম্বন্ধ কেমন করে ন্যায়ের ভিত্তিতে গড়ে তোলা যায় সকল সমস্যার গোড়ায় হল এই প্রশ্ন। জীবনের প্রধান কাম্য সুখ। সকল মানুষের মুখে সুখের পাত্র তুলে ধরা—এই হল ন্যায়ধর্ম। বুদ্ধিমান ও নীতিবান ব্যক্তি যে সুখের আস্বাদ পায় তার সঙ্গে ভোগীর ক্ষণিক ও অনিশ্চিত সুখের তুলনা হয় না। ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত আচরণের দ্বারা মানুষ পরস্পরকে দিতে পারে এই পরম সুখ, দিয়ে নিজেও যথার্থ সুখী হতে পারে। সুতরাং আসল কথা সকলকে ন্যায়বান হতে হবে, কোন ত্যাগ বা আদর্শের খাতিরে নয়, নিছক সুখভোগের তাগিদে। ন্যায়ের বিধান নির্ণয় করবার উপায় মাত্র একটি,—নিজের বিচারশক্তিকে খাটানো।

সমাজ ও আইনের বিধান খাঁটি ন্যায়ের বিধানের পরিপন্থী। আমাদের সমাজজীবনে ছেয়ে আছে এমন সব নীতিবোধ ও নিয়মকানুন যার সঙ্গে ন্যায়ধর্মের সঙ্গতি নেই, যা বস্তুত অন্যায়।

প্রথম, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। ন্যায়ের বিধান বলে প্রত্যেককে নিজের মত ভালবাসবে। মানুষে মানুষে কোন তফাৎ করা চলবে না। অবশ্য গুণের মর্যাদা দিতে হবে। গুণ ও যোগ্যতা নির্বিশেষে কেহ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বা উপকারী বলে—সে মা হোক বা স্ত্রী হোক, কৃতজ্ঞতাবশে তার পক্ষপাতিত্ব করতে হবে এ অন্যায় ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়, প্রতিশ্রুতি পালন। কথার দামের চেয়ে ন্যায়ের দাম বেশী।

> "যদি আমার বিত্তের প্রতিটি পয়সা, আমার সময়ের প্রতিটি ঘণ্টা, আমার মনের প্রতিটি চিন্তা অমোঘ ন্যায়ের সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা হইলে এই সব ব্যয় করিবার মত কিছুই প্রতিশ্রুতির এক্তিয়ারে থাকে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে আমরা কথা দিই বা না দিই, আমাদের ন্যায়ের শাসন মানিতেই হইবে।" (পৃঃ ১৫১)

তৃতীয়, শপথ গ্রহণ। সরকারী চাকরিতে শপথ নেওয়া, আদালতে শপথ নেওয়া এসব ভণ্ডামি। শপথ পালনের সঙ্গে ন্যায় ধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই। সৎ লোক শপথ না নিলেও সৎ, অসৎলোক শপথ নিলেও অসৎ—শপথ নিয়ে কারও চরিত্রের উন্নতি হয় না। চতুর্থ, দেশপ্রেম। বুদ্ধিমান ন্যায়বান ব্যক্তি নিজের দেশের জন্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণের চেয়ে বেশী কিছু চাইতে পারে না।

> "সমাজ তৈয়ারী হইয়াছে সভ্যদের কল্যাণ সাধনের জন্য, কীর্তি অর্জন করিয়া ইতিহাসের পাতায় চমক লাগাইবার জন্য নয়। সত্য কথা

বলিতে গেলে দেশের প্রতি ভালবাসা একটা মিথ্যা মায়াজাল যাহা জনসাধারণের উপর বিস্তার করিয়া একদল তঞ্চক নিজেদের কূট অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে খুশিমত কাজে লাগায়।" (৫১৪-১৫)

গডউইনের অভিধানে ন্যায় সততা ও সত্য সমার্থসূচক। সততাই সুখ। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে সে আনন্দ নেই যা আছে মনের বিস্তারে, সকল অভীষ্ট অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ায়। সততা এই নিঃস্বার্থ সুখের আধার। "মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষার নাম সততা" (২৫৫)। মানুষের কল্যাণের পথ, সৎ আচরণের নীতি স্থির হবে বিচার বুদ্ধি দিয়ে। সততা (ভার্চু) এবং সাধুতা (অনেস্টী) করুণা এক জিনিস নয়। সৎ হতে হলে সারা মানবজাতির ভালমন্দ বুঝবার মত শক্তির দরকার, কোন কাজের পরিণামে কি ঘটবে, বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল কতদূর গড়াবে এসব হৃদয়ঙ্গম করবার মত দূরদর্শিতা দরকার। এতদূর চিন্তা করবার ক্ষমতা অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকের নেই তাই সে সৎ হতে পারে না। স্বপ্নবিলাসীরা নিষ্পাপ বর্বর জীবনের যে রঙিন ছবি এঁকেছেন তাতে বাস্তবতার নামগন্ধও নেই। নিষ্পাপ নিরীহ হলেই সৎ হয় না। সততা নেতিবাচক নয়, এর জন্যে চাই বলিষ্ঠ চিন্তাশীল চরিত্র।

"অজ্ঞতা, অসংস্কৃত জীবনের সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অলস অভ্যাস এগুলি যদিও দম্ভ ও ভোগবিলাসের অপেক্ষা কম ক্ষতিকর, তথাপি ইহার মধ্যে সততা একটুও বেশী নাই। সমকালের নির্লজ্জ দুর্নীতি ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি এক বিশুদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সন্ধানে কল্পনার পাখা মেলিয়া উড়িয়া গিয়াছেন নরওয়ের অরণ্যে কিংবা স্কটল্যাণ্ডের শুষ্ক রুক্ষ পার্বত্যভূমিতে। এই কল্পনার জন্ম হতাশা হইতে প্রজ্ঞানশীল দর্শন হইতে নয়।" (৭২)

রুশো বুদ্ধিমান সভ্য মানুষকে অভিসম্পাত করে প্রাকৃতিক জীবনের বন্দনা গেয়েছিলেন। গডউইন প্রাকৃত বর্বরতার মোহ ভেঙে দিয়ে বুদ্ধিমান সভ্য মানুষকে তার মর্যাদার আসনে বসালেন।

প্রজ্ঞান থেকে যে সততার উৎপত্তি তার পথ অবধারিত। প্রজ্ঞানের নির্দেশ নির্বিকল্প অদ্বৈত, সুতরাং সততার পথও এক এবং অদ্বিতীয়। সৎ আচরণে বাছাবাছির সুযোগ নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার অবসর নেই। মানুষ অবস্থার দাস। তার আবার স্বাধীন ইচ্ছা কি ? জাগতিক ঘটনায় যেমন

কার্যকারণ নিয়মের ব্যত্যয় নেই, নীতির সূত্র এবং যুক্তির ধারাও তেমনি নিয়মিত, তার ব্যতিক্রম হবার যো নেই। চিন্তার কাজ যান্ত্রিক, যদিও অজ্ঞান জড়যন্ত্র থেকে সজ্ঞান জীবযন্ত্রের কাজ পৃথক্।

> "আসলে মানুষ সক্রিয় জীব নয়, নিষ্ক্রিয় জীব। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে সে যথেষ্ট উদ্যোগী। তাহার মন খুব পরিশ্রম করিতে পারে যেমন পাহাড় বাহিয়া উঠিবার সময়ে একটা ভারি যন্ত্রের চাকার পরিশ্রম হয়। কঠিন চিন্তার চাপে তাহার দেহ ভাঙিয়া যাইতে পারে। তবু ইহা হইতে তাহার নিষ্ক্রিয়তা অপ্রমাণিত হয় না। এ বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকিলে আমাদের মনে সত্য, ন্যায়, সুখ ও মানবজাতির প্রতি ভালবাসার আলো ক্ষীণ হইয়া যাইবার কথা নয়। আমাদের কাজ-কর্মে থাকিবে দৃঢ়তা ও সরলতা, নিষ্ফল উদ্যমে এবং আফসোসে আমরা নিজেদের ক্ষয় করিব না, শিশুসুলভ অধৈর্যে ব্যস্ত হইব না, সকল ঘটনাকে তাহার পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিব। তারপর এই মতবাদের ভূয়োদর্শন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিবে তাহার হাতে নিজেদের ধীরভাবে ও নিঃশেষে সমর্পণ করিব।" (৩১০)

গডউইনের মতে অপরাধ দণ্ডনীয় নয় কারণ অপরাধীও পূর্বাপর ঘটনার দাস। হত্যার ব্যাপারে আততায়ীর হাতের ছোরার চেয়ে আততায়ীর দায়িত্ব কিছু বেশী নয়। উভয়েই অবস্থার হাতের পুতুল, নিরুপায়। কার্যকারণের নিয়ম এমনই অব্যর্থ যে জীবনে ব্যক্তির অধিকার বলে কোন বস্তু নেই। অধিকার বলতে বোঝায় বাছাই ও বাতিল করবার সুযোগ। ইচ্ছা হলে আমি এ কাজ করব, ইচ্ছা না হলে করব না, এর জন্যে আমাকে দূষণীয় হতে হবে না—এই হল অধিকার। কিন্তু এমন স্বাধীন বাছবিচারের অবকাশ কোথায়? ন্যায়ের ও যুক্তির নির্দেশ অনন্য, তার বাইরে কোন অধিকার থাকতে পারে না। যদি একজনের মুক্ত হবার অধিকার থাকে অপরের তাকে দাস বানাবার অধিকার নেই। যদি একজনের অপরকে শাস্তি দেবার অধিকার থাকে তাহলে অপরের শাস্তি এড়াবার অধিকার নেই। যদি আমার টাকায় কারও অধিকার থাকে তবে সে টাকা রাখবার অধিকার আমার নেই। সর্বত্র অধিকার স্থির হচ্ছে ন্যায়ের বিধানে, কারও স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। বুদ্ধিমান ন্যায়বান মানুষ অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, এবং কর্তব্য কোন

অধিকারকে স্বীকার করে না। অপর পক্ষে সমাজেরও ব্যক্তির ওপর কোন অধিকার নেই। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে তার নিজের বিবেচনায়, সমাজের নির্দেশে নয়।

> "কিন্তু তার মানে কি এই যে ব্যক্তির অধিকার আছে সৎ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করিবার কিংবা সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বলিবার ?" (১১৯)

সততার অবলম্বন বুদ্ধি, আইন কানুন নয়। হাকিমের শাসনে দুষ্কর্ম বন্ধ হয় না। অসৎ লোকের আইন কানুন এড়িয়ে চলবার ফিকির জানা আছে। তার দুষ্কর্ম রোধ করবার জন্যে সরকার গুপ্তচর লাগাবে। যদি কেউ কর্তব্যের খাতিরে গুপ্তচরবৃত্তি করে তাহলে সরকারী আইনের প্রয়োজন নেই। আর যদি কর্তব্যবোধ না থাকে তাহলে কাউকে দিয়ে এই কাজ করাতে হলে তাকে কোন প্রলোভন দেখাতে হবে। "তাহা হইলে এ উপায়ে তুমি যে দুষ্কর্ম বন্ধ করিবে তাহা অপেক্ষা যে দুষ্কর্ম প্রচার করিবে তাহা কি বেশী বিপজ্জনক নয় ?" (৫৮৭)

শাস্তি দিয়ে যেমন অসততা থামানো যায় না, তেমন পুরস্কার দিয়ে সততা বাড়ানো যায় না।

> "পুরস্কার বিতরণ করিতে গেলেই সেখানে ভুল, ষড়যন্ত্র ও পক্ষপাতের আশঙ্কা রহিয়াছে। আর তাহা হইলে সততার সমর্থনের বদলে তার বিনাশের ব্যবস্থাই পাকা হইবে। ইহা হইতে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে ? ইহা ছাড়া পুরস্কার দেওয়া উন্নতি সাধনের অতি দুর্বল উপায়। যেখানে সততা আছে সেখানে কোন পুরস্কার পর্যাপ্ত নয়। যেখানে সততার আবরণ ছাড়া আর কিছু নাই, পুরস্কার সেখানে গিয়া পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এই প্রকারে বাহিরের ইতর লোভ ও মোহের তাগিদে অন্তরের বোধশক্তি নিয়ত বিভ্রান্ত হয়।" (৫৮৭)

সৎ ও অসৎ, সত্য ও মিথ্যা এদের প্রভেদ কিছু জটিল নয়। সহজ বুদ্ধিতে এদের পার্থক্য বোঝা যায়। অন্যায়, অসৎ ও অসত্যের পরিচয় পেতে দেরী হয় না। এদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবেই। এদের পরিণাম যে অশুভ তা জানা যাবেই। মিথ্যা স্বভাবত ক্ষীণজীবী। সত্যের ধর্ম নিজেকে বিস্তার করা। তার পথে বাধা সৃষ্টি করে বাইরের আইন কানুন আর শাস্ত্রকারদের কচকচি। এই

সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে মেলে ধর, সত্যের জয় হবে অবশ্যম্ভাবী।

সত্যের জয়যাত্রায় তাড়াহুড়া নেই, সে ধীরগতি দীর্ঘসূত্রী। জোর জবরদস্তি করে তাকে এগিয়ে নেওয়া যায় না। সে তোমার কাছে কাজ চায় না—সে নিজের কাজ নিজেই বোঝে। সে শুধু চায় তুমি তাকে প্রকাশ কর, প্রচার কর। সত্যের রূপ মেলে ধর, মানুষের বুদ্ধির দুয়ারে তাকে পৌঁছে দাও তাই যথেষ্ট।

> "আমি হিংসা দ্বারা মানুষের বিধানকে বদলাইতে চাই না, আমি যুক্তি দ্বারা মানুষের ভাবনাকে বদলাইতে চাই। দল পাকানো আমার কাজ নয়। আমার কাজ সত্যকে প্রচার করা, আর মানুষের অন্তরে তার ধীর অগ্রগতির অপেক্ষা করা।" (৮৮১)

শেষে একদিন যখন সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে তখন সকল বন্ধন আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। সারা মানবজাতির জাগ্রত চেতনার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কোন দুশমনের থাকবে না।

বলপ্রয়োগ সর্বত্র অবৈধ, সৎ উদ্দেশ্য হলেও। মানুষের বুদ্ধিতে আবেদন করে তাকে পথ দেখাতে হবে, জোর জবরদস্তি করে নয়। শহীদ হওয়া বা আত্মবলিদানও একরকম জুলুম। লোককে আমার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিভ্রান্ত না করে যুক্তি দিয়ে বোঝান উচিত। দীর্ঘকাল ধরে সত্যের সেবা করে আমি যে দান রেখে যাব আত্মদানের ক্ষণিক চাঞ্চল্যের দান তার কাছে কিছু নয়।

সরকারের আইন জবরদস্তির আইন। আইন করবার অধিকার সমাজের নয়। সহজ আইন লেখা আছে প্রকৃতির খাতায়, সরকারী দপ্তরে নয়। মানুষের কাজ প্রকৃতির আইনকে আবিষ্কার করা, মতলব মত আইন প্রণয়ন করা নয়। প্রজ্ঞান একমাত্র আইনকর্তা। প্রকৃতির আইনে কত বৈচিত্র্য, কত রূপান্তর! মানুষ তার বিস্তরমান প্রজ্ঞান নিয়ে এই বৈচিত্র্য ও রূপান্তরের পিছনে ছুটে চলেছে। আর সরকারী আইন সেখানে এনে হাজির করেছে শাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি, সচল সমাজকে অচল করে রেখেছে, সমস্ত বৈচিত্র্যকে এক ছাঁচে ঢালাই করেছে। মানুষের বহুবিধ আচরণের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আইনশাস্ত্র এক দুর্বোধ্য জটিলতায় এসে দাঁড়িয়েছে।

> "সাধারণ লোকে যাহাতে জানিতে পারে কিসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা চলিবে এই উদ্দেশ্যেই প্রথম আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আর আজ সারা ইংল্যাণ্ডে এমন একজন আইনজ্ঞ মিলিবে না যিনি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে আইনশাস্ত্র তাঁর আয়ত্ত। এ এক গোলকধাঁধা যাহার শেষ নাই।" (১৬৯)

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আইন করে সম্ভব নয়, সরকারী শাসনের জোরেও সম্ভব নয়। সরকারের হুকুম মানলেই ন্যায়ের জয় হবে এ বড় তাজ্জব কথা। সরকার প্রজার বুদ্ধির কাছে আবেদন করে না, প্রজার ওপর জোর খাটিয়ে সে শাসন চালায়। প্রজার আনুগত্য শাসনের জবরদস্তির প্রতি আনুগত্য, নিজের বুদ্ধির প্রতি নয়।

"নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে যখন আমি দক্ষিণ দিকে যাইতে চাই তখন একটা বন্য জন্তু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি উত্তর দিকে দৌড়াইতে বাধ্য হই। সরকারের বিধান সমর্থন না করিলেও যে আমি তাহা মানিতে বাধ্য হই, ইহাও সেই প্রকার।" (১৭১)

মানুষের মন ও সরকারী শাসন বিপরীত-ধর্মী। মন গতিশীল, সরকার স্থাণু। সরকার চায় আমাদের চিন্তা করবার দায় থেকে মুক্ত করে জড়ভরত বানাতে। সে চায় আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি, ন্যায়অন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়ে আইন মানব, শপথ নেব। নিজের চিন্তাশক্তি অপরের হাতে তুলে দেবার পর কারও আর মনুষ্যত্ব থাকে না।

"মানুষ যখন নিজের বোধশক্তির পরামর্শ নেয় তখন সে পৃথিবীর অলঙ্কার। যখন সে বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়া অন্ধ বিশ্বাস ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের বশবর্তী হয় তখন সে সকল জন্তুর চেয়ে অনিষ্টকারী।··· আত্মসমর্পণ করিবার মুহূর্তে সে হইয়া দাঁড়ায় তাহার পরিচালকের হীন অভিসন্ধি সার্থক করিবার হাতিয়ার। আর তারপর যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন অন্যায় নৃশংসতা ও স্বৈরাচারের প্রলোভন সে এড়াইতে পারে না।" (১৭৪)।

যে অন্যায় ও মিথ্যা স্বভাবত ক্ষীণজীবী সরকার তাদের বাঁচিয়ে রাখে এই প্রকারে। আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলি সরকারের অনুগ্রহে চিরস্থায়ী হয়। যেমন আমাদের চার্চ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান। সরকারী টাকায় একদল ভাড়াটিয়া লোক জনসাধারণকে ভাঁড়িয়ে ধর্মের পথে চালন করবে, মানুষের সুখশান্তি নষ্ট করবার এমন সুন্দর ফন্দি আর কার মাথায় আসতে পারে?

> "রুটি খাইয়া ঈশ্বরের মাংস খাইতেছি, মদ খাইয়া ঈশ্বরের রক্তপান করিতেছি, এই সব ধারণা এতদিন ধরিয়া রাজত্ব করিতে পারিত না যদি না ইহার পিছনে থাকিত সরকারী কর্তৃত্ব। কয়েকজন যাজকজ্যেষ্ঠ ষড়যন্ত্র করিয়া এক বৃদ্ধকে পোপ নির্বাচন করিল আর নির্বাচনের পরমুহূর্ত হইতে তিনি হইলেন বিশুদ্ধ ও পবিত্র,—এতদিন ধরিয়া মানুষ এ বিশ্বাস পোষণ করিত না যদি না ইহাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য দান দাক্ষিণ্য ও রাজপ্রাসাদের ব্যবস্থা হইত।" (৭০)

মানুষের ঘাড়ে সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে না চাপিয়ে তাকে নিজের বিচারবুদ্ধির হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে সে ঠিক সত্যের পথ চিনে নেবে।

তাহলে সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ কি? প্রজার সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কি? আমরা শুনে আসছি সরকার প্রজাপালনের জন্য। কেহ জোরজুলুম করে সমাজে শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে গেলে সরকার তাকে দমন করবে। তার উদ্দেশ্য হিংসাকে হিংসা দিয়ে দমন করা। কিন্তু হিংসা অন্যায় মানুষ করে বিচারের ভুলে। বিচারের ভুল বুঝিয়ে ভেঙে দেওয়া যায়, জোর করে শোধরান যায় না। মানুষ অবস্থার ফেরে পড়ে অপরাধ করে, আততায়ী তার হাতের ছোরার মতই অবস্থার দাস। পরিবেশকে না বদলিয়ে অপরাধীর শুভবুদ্ধিকে না জাগিয়ে দণ্ডবিধি বিভীষিকার আশ্রয় নেয়। এর মানে নিজের অক্ষমতা জাহির করা।

> "দণ্ডদাতা যদি তার যুক্তি দিয়া আমাকে তাহার মন মত গড়িয়া লইতে পারিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় তাহাই করিত। সে দেখাইতে চায় তাহার যুক্তিগুলি সারবান বলিয়া আমাকে সে শাস্তি দিতেছে। আসলে তাহার যুক্তি অসার বলিয়া সে শাস্তির আশ্রয় লয়।" (৭০৪)

আবার কখন কখন করুণা দেখিয়ে সরকার শাস্তি মকুব করে। এ আরও যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি অপরাধ সমাজের ক্ষতিকর হয় তাহলে ক্ষমা অন্যায়, যদি তা না হয় তাহলে শাস্তি ছিল অন্যায়।

> "আমাকে শুধু তাহাই দাও যাহা না দিলে তোমাকে অন্যায় করিতে হয়। ন্যায়বিচারের বেশী কিছু চাওয়া আমার পক্ষে এবং তার বেশী কিছু দেওয়া তোমার পক্ষে সমান অসম্মানজনক।" (৭৮৫)

ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধির ফলে জেলখানাগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে 'অসৎ কাজের শিক্ষাশালা'। অবশ্য অপরাধীকে সংশোধন করতে কিংবা অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। তার পক্ষে সমাজের স্বার্থ ও শুভবুদ্ধিই যথেষ্ট।

সমাজ ও রাষ্ট্র এক নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল পরস্পরের সাহায্যের জন্যে। তখন তারা বোঝেনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক তাদের ওপর শাসন করবে। এই শাসন যত নষ্টের মূল। মানুষের অগ্রগতি ও স্বাধীন চিন্তা শাসনের চাপে রুদ্ধ। শিক্ষা, যা সর্ববিধ উন্নতির মূল তাকেও আয়ত্ত করে রাষ্ট্র সকল মানুষের সমীকরণ করতে চায়। মধ্যযুগের চার্চ ও স্টেটের চুক্তির চেয়ে জাতীয় সরকার ও জাতীয় শিক্ষার এই চুক্তি আরো ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্রের আর এক অপকীর্তি কথায় কথায় যুদ্ধ ঘোষণা। যাতে সাধারণ মানুষের কোন স্বার্থ নেই এমন সামান্য ঘটনায় পরস্পরের জীবন নেবার জন্যে গোটা জাতিকে উস্‌কে দেওয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের কাজ। গুটিকয়েক লোকের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য গোটা দেশটা রক্তে ভাসিয়ে দেওয়া এদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সরকার একটি অপগ্রহ। মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে এ দখল করে বসেছে। মানুষের চেতনা বিকশিত হবার সাথে সাথে যাতে এই অপগ্রহ দূর হয় তাই আমাদের করতে হবে।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের স্বরূপ কিছু আলাদা নয়। যথার্থ গণতন্ত্রে প্রত্যেকে আত্মসচেতন, প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে চলে এবং কারও সঙ্গে কারও ভেদ বৈষম্য নেই। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে আমরা বুঝে নিয়েছি প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা। পার্লামেণ্টারী প্রথা আদৌ গণতান্ত্রিক নয়। আলোচনা তর্কবিতর্ক খুবই ভাল। তাতে বুদ্ধি খোলে। কিন্তু যখন সকল আলোচনার নিষ্পত্তি হয় ভোটের দ্বারা সংখ্যার জোরে তখন সভ্যদের চরিত্র রসাতলে যায়। যারা অন্যায় ও অযৌক্তিক বলে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল প্রস্তাব পাস হওয়া মাত্র তাদের তা মেনে নিতে হয়, তার প্রয়োগে সাহায্য করতে হয়। সিদ্ধান্ত যখন ভোটের ওপর নির্ভরশীল হয় তখন আলোচনায় সত্যনিষ্ঠা থাকে না, জানবার সন্ধান করবার প্রবৃত্তি থাকে না। বক্তার লক্ষ্য থাকে সভ্যদের খেয়ালখুশির ওপর তাদের উত্তেজিত করে স্বপক্ষে আনবার দিকে। ফলে সত্যসন্ধিৎসার জায়গায় আসর জাঁকিয়ে বসে হৈ-চৈ,

গালাগালি। সকলেই তালে থাকে বিপক্ষের ওপর এক হাত নেবার। অবশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠরা আইন পাস করে, সত্য দেশছাড়া হয়।

কেনই বা জাতিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা,—একশ্রেণী অন্যের হয়ে ভাববে আর তর্ক করবে অপর শ্রেণী এদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নেবে? প্রতিনিধি-ব্যবস্থা চলতে পারে যদি নির্বাচক যথেষ্ট সজাগ হয়, যদি তার প্রতিনিধিকে সর্বদা আপনার বোধশক্তি দিয়ে প্রভাবিত করতে পারে এবং প্রতিনিধি অযোগ্য হলে তাকে বরখাস্ত করতে পারে। কিন্তু যে এত আত্মসচেতন তার নিজের ভালর জন্যে অপরের ওপর নির্ভর করবার দরকার কি?

গণতন্ত্র বহুর রাজত্ব, অর্থাৎ হুজুগের রাজত্ব। ব্যক্তি বুদ্ধিমান আর সমাজ নির্বোধ। তা যদি না হবে তবে যত মনীষার সৃষ্টি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ব্যক্তির হাতে হল কেন? সমাজ কেন দর্শনের বই লেখেনি, নীতিশাস্ত্র রচনা করেনি? চিরকাল নূতনের সন্ধানে বেরিয়েছে ব্যক্তি, তার ইঙ্গিতে চলেছে সমাজ। সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ভুলে যখন সমাজের তোয়াজ করে তখন তার অধঃপতন আরম্ভ হয়।

> "কেহ যদি সমাজের নামে কাজ করিতে যায় তখন সে নিজের চারিত্রিক তেজ ও কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একদল চেলাকে তাহার সামলাইয়া চলিতে হয়, সর্বদা চেলাদের মতলব বুঝিয়া তাহাদের নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিতে হয়। এইজন্য আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে অত্যন্ত চরিত্রবান প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক জীবনের মেছোহাটায় নামিয়া পড়িবার পর অশালীন জননেতায় পর্যবসিত হইয়াছেন।" (৫৭৩)

গণতন্ত্রকে বাতিল করলেও গডউইন তার সারমর্ম সাম্য ও স্বাধীনতাকে সযত্নে রক্ষা করেছেন। সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর গড়ে উঠবে ন্যায়ের সম্পর্ক।

বৈষম্যবাদীরা বলে মানুষ পরস্পর সমান হতে পারে না, অসমতা স্বভাবদত্ত। এর উত্তর, বর্তমান বৈষম্য স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। যখন বিত্তবিভাগ ও রাষ্ট্রশক্তি ছিল না তখন সকলে প্রায় এক স্তরের মানুষ ছিল। এখনও যে অসমতা খুব বেশী তা নয়।

> "আমরা এক প্রকৃতির ভাগীদার। যে সব কাজ একজনের উপকারে লাগে তাহা অপরেরও উপকারে লাগে। আমাদের বৃত্তি ও

অনুভূতিগুলি একজাতীয়, সুতরাং আমাদের সুখ দুঃখ একই প্রকারের। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান, বুদ্ধি দ্বারা তুলনা করিতে বিচার করিতে এবং মীমাংসায় পৌঁছাইতে পারি। সুতরাং যে উন্নতি একজনের কাম্য তাহা অন্যেরও কাম্য।" (১০৬-৭)

অনেকে আশঙ্কা করে যে সাম্য স্থাপন করতে গেলে স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিতে হবে, সকলকে দাস বানিয়ে এক ছাঁচে ঢালাই করতে হবে। এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। মানুষকে ভেড়ার পালের মত খোঁয়াড়ে পুরে আর একসঙ্গে মাঠে চরিয়ে সাম্য আসবে না। সাম্য আনবার জন্যে কোন রকম শাসনের প্রয়োজন নেই, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করবার দরকার নেই। যে প্রজ্ঞানের অগ্নিকণা সকলের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান তাকে জ্বালিয়ে দিলে, তার আলোয় সকলে পথ চিনে নিলে কোন শাসনের প্রয়োজন হবে না। সাম্য ও স্বাধীনতায় কোন অসঙ্গতি থাকবে না।

এ অজুহাতও শোনা যায় যে সকলে স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার দোষে কোন কোন জাতির দাসভাব নাকি এত প্রবল যে তাদের মুক্ত করা যায় না। এ যুক্তি কপট। দেশ ও হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যের চেহারা বদলায় না। যা ইংল্যাণ্ডে সত্য তা আফ্রিকায় সত্য। কষ্টের চেয়ে আরাম সবাই পছন্দ করে—কেহ আরামের চেয়ে কষ্ট বেশী চায় কিনা এই তত্ত্ব উদ্ধার করতে বিজ্ঞানী ভূগোল ও তাপমাত্রার খোঁজ নিতে যায় না। স্বাধীনতা ভাল না দাসত্ব ভাল এই তত্ত্বের খোঁজে ভূগোল নিয়ে গবেষণা করা তেমনি হাস্যকর। যখন কর্তারা বুঝিয়ে দেন যে তাঁদের শাসন না মানলে মূর্খ জনসাধারণ পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে তখন থেকে দাসত্বের সূচনা হয়। দাসত্বের থেকে দাসভাব আসে যেমন সুস্থ লোককে পাগলা গারদে পুরে রাখলে সে পাগল হয়ে যায়।

ন্যায় ও সত্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা সম্পত্তিপ্রথা।

"কোন বস্তুর,—যেমন একখণ্ড রুটির উপর সম্পত্তিগত অধিকার কার? উহার প্রয়োজন যাহার সবচেয়ে বেশী, উহা পাইলে যাহার সবচেয়ে উপকার হইবে তাহার।" (৭৮৯-৯০)

একজন বিলাসিতায় ও প্রাচুর্যে ডুবে থাকবে আর একজন হাড়ভাঙা খাটুনিতে দেহপাত করেও অভাবে দিন কাটাবে, একজন যৌথভাণ্ডারে কোন

কিছু না দিয়ে আলস্যে সময় নষ্ট করবে আর একজন বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করবার অবসর পাবে না, এর চেয়ে অসম ও অন্যায় আর কিছু নেই।

> "আমার যাহা আছে তাহা যদি আমার ব্যবহারে লাগে তবে তাহা আমার সম্পত্তি। আমার যাহা আছে তাহা আমার পরিশ্রমের উপার্জন হইলেও যদি আমার ব্যবহারে না লাগে তবে তাহা রাখায় আমার অধিকার নাই।" (৮৫৭)

সম্পত্তি ধনী দরিদ্র উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। বিলাসিতায় ও আলস্যে ধনী তার চিন্তাশক্তি, কর্মশক্তি ও মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, যা যথার্থ মূল্যবান তা ভুলে সে তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আর দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার লোভে কিংবা অত্যাচারের ভয়ে তার বিবেক ও ব্যক্তিত্ব ধনীর হাতে তুলে দেয়, ধনীর দাসত্ব বরণ করে নেয়। ধনী ও দরিদ্র কেহই বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সৎপথে চলতে পারে না।

সম্পত্তি ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক শাসন ব্যবস্থা। আইন কানুন, রাজস্বের হার ধনীর সুবিধামাফিক গড়া হয়। কিন্তু রাষ্ট্রশাসন ভেঙে দিয়ে, সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এই বৈষম্য দূর করা যাবে না। মানুষের কল্যাণচেতনা যখন এই বৈষম্য সম্বন্ধে সজাগ হবে তখন এ কলঙ্ক দূর হবে। ধনী তখন সম্পত্তির ওপর অধিকার খাটাবে না, সম্পত্তিকে তার ন্যাস বলে গণ্য করবে। সে বুঝবে একটি পয়সাও তার খুশিমত খরচ করবার অধিকার নেই, তার ভাণ্ডার থেকে সকলকে ন্যায্য পাওনা দিতে হবে। শুধু সম্পত্তি নয়, মালিক নিজেও জনকল্যাণে নিবেদিত। তার বুদ্ধি, শক্তি, সময়, সামর্থ্য সকলই এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সর্বসাধারণের সুখসুবিধার বিস্তার হয়।

কারও কারও ভয় আছে যে এ সাম্যব্যবস্থা বেশীদিন টিকবে না। স্বার্থপর লোকেরা সমাজের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে আবার সম্পত্তি দখল করে বসবে।

> "ধরা যাক আমরা একটা সমাজের পত্তন করিয়াছি যেখানে সকলের প্রয়োজন মিটাইবার মত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে, যেখানে সকলে পরস্পরকে জানাইয়া দিতেছে কাহার কি চাই, কাহার কি চাই না। এখানে তৎক্ষণাৎ নিজের জন্য কিছু জমাইবার তাগিদ দূর হইয়া যায়। দুর্ঘটনা, পীড়া ও বার্ধক্যের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ এই সমস্ত দাবীর সারবত্তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই এবং সকলেই ইহা মানিয়া লইতে

> অভ্যস্ত। কয়েকটি নশ্বর জিনিস ছাড়া আর কিছু আমি বেশী পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারিব না। যেহেতু বিনিময়ের কোন রেওয়াজ নাই সেহেতু যাহা আমি ভোগ করিতে পারিব না তাহা রাখিয়া আমার বিত্ত বাড়িবে না।" (৮৩৬)

বিত্তের বৈষম্য দূর হলে সমাজের চেহারা বদলে যাবে। অনাবশ্যক বাহুল্য ও অপচয় বন্ধ হলে পরিশ্রম কমবে। শ্রমিকের জীবনে আসবে অবসর, স্ফূর্তি, মানসিক বিকাশের সুযোগ। প্রতিভা নিযুক্ত হবে মানুষের সেবায়, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তারে। ধনীর কৃপণ দানের ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে না। সরকারী চাকুরে, সিপাই, পেয়াদা, কেরানী, জহুরী, দালাল ইত্যাদি পরগাছা ব্যবসায়ীরা সমাজ থেকে উঠে যাবে। অনাবশ্যক ভোগের উপকরণ বাড়ান হবে না। জীবন হবে সাদামাটা নির্লোভ। প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, সুতরাং প্রাথমিক বৃত্তি হবে কৃষি। বছরের অধিকাংশ সময়ে চাষীর কাজ থাকে না। এই সময়টা সে যদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করে তাহলে গোটা সমাজের অভাব মিটবে। বর্তমানে বিশ জনের মধ্যে একজন পরিশ্রম করে জীবনের রসদ যোগাবার জন্য আর উনিশজন সে রসদ ভোগ করে। যদি এই পরিশ্রম সকলকে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে শ্রমিকের পরিশ্রম কমে হবে বিশ ভাগের একভাগ। এখন যদি তার কাজ হয় দশ ঘণ্টা তখন হবে আধ ঘণ্টা। বাকি সময় সে নিজের মনের খোরাক যোগাতে ও অপরের সেবায় ব্যয় করতে পারবে।

চাকরি করে বেতন নেওয়া, অবসর গ্রহণের পর পেন্সন নেওয়া এও সম্পত্তির মালিকানার মত দূষণীয়। কারণ এখানেও লোভ এসে সেবাবৃত্তির জায়গা নেয়। অবশ্য সবাইকে বাঁচতে হবে। তার জন্যে দরিদ্র জনসাধারণের তহবিল থেকে টাকা না নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া ভাল।

> "যদি একজনের সাহায্যে না কুলায় তাহা হইলে অনেকে তাহাকে সাহায্য করুক। ইউডেমিডাস তাঁহার মৃত্যুর সময়ে একজন বন্ধুকে কন্যার জীবিকার ভার আর একজনকে জননীর জীবিকার ভার দিয়া গিয়াছিলেন। সে জীবদ্দশায় এই পন্থা অবলম্বন করুক, নিজের জীবিকার দায় গরীব মানুষের উপর না চাপাইয়া যে উদার বন্ধুরা ভার বহন করিতে প্রস্তুত তাহাদের কাছে হাত পাতা—ইহাই খাঁটি খাজনা আদায়ের পদ্ধতি।" (৬৭৮)

সম্পত্তির যুক্তি বন্ধুত্ব ও বিবাহের ওপরও প্রযোজ্য। নিজের ব্যক্তিসত্তা সকলকে বিলিয়ে না দিয়ে কারও প্রতি পক্ষপাত করা অন্যায়। বিবাহের বন্ধন ন্যায় অন্যায়ের দিকে না তাকিয়ে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কায়েম রাখতে চায়। এতে ধরে নেওয়া হয় যে দুজন লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষায় চিরকাল মিল থাকবে, একবার যাকে পছন্দ হয়েছে তাকে বরাবর ভাল লাগবে। এর মত ধাপ্পাবাজি আর নেই। বিবাহ অতি নিম্নস্তরের একচেটিয়া সম্পত্তি প্রথা। সম্পত্তিহীন সমাজ হবে বিবাহবন্ধনমুক্ত।

> "এ অবস্থায় নরনারীর সম্পর্ক হইবে অন্য যে কোন বন্ধুত্বের সম্পর্কের মত। · যে নারী তাহার গুণপনা দ্বারা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করিবে আমি তাহার সান্নিধ্যলাভে যত্নবান হইব।·· তারপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করিবে রমণসুখ উপভোগ করিবার জন্য নয়, প্রজনন কার্য উচিত বলিয়া। কিভাবে তাহারা এ কাজ করিবে তাহা স্থির হইবে যুক্তি ও কর্তব্যের নির্দেশে।" (৮৫১-৫২)

সম্পত্তি ও সরকারকে উচ্ছেদ করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে আশ্রয় করে এক নূতন সমাজের ইমারত উঠবে। সার্বভৌম কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্র দূর হয়ে আসবে বিকেন্দ্রিত বেসরকারী বন্দোবস্ত যেখানে কারও ওপর কারও শাসন চলবে না। প্রথমত জাতীয় রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত গ্রাম ও জেলার হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। এরা নিজেদের আইন কানুন নিজেরা গড়বে—আইন হবে যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত। এরা একটি অস্থায়ী জাতীয় সভা নির্বাচন করবে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে সভার ডাক পড়বে—যেমন গ্রাম ও জেলাগুলির বিবাদের নিষ্পত্তি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ। প্রথম প্রথম সভার হাতে কিছু ক্ষমতা থাকবে। ক্রমে ক্রমে ক্ষমতা কমে আসবে। সভা হবে সার্বজনীন প্রয়োজনে সহযোগিতার ক্ষেত্র। তারপর এক সময়ে জাতীয়তার গণ্ডিও উঠে যাবে। মানুষ হবে এক নিরাজ বিশ্বগণতন্ত্রের স্বাধীন নাগরিক।

> "এই পাশবিক যন্ত্র যা মানবজাতির সমস্ত অন্যায়ের চিরন্তন উৎস,··· যার সত্তায় জড়াইয়া আছে বহুবিধ অপকার, যা একেবারে উচ্ছন্নে না গেলে কোন প্রকারে দূর হইবে না,—সেই রাষ্ট্রশাসন যেদিন বিলুপ্ত হইবে সেই শুভদিনটিকে মানবজাতির প্রত্যেকটি কল্যাণকামী কি আনন্দের সঙ্গেই না সংবর্ধনা করিবে!" (৫৭৮-৭৯)

অরাজকতার সঙ্গে একটা বিভীষিকার ধারণা জড়িত আছে। রাষ্ট্রশাসন না থাকলে চারদিকে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হবে—এমন একটা আশঙ্কা অনেকেই পোষণ করে। যদি তা ঘটেও স্বেচ্ছাচারী শাসনের যূপকাষ্ঠে যতলোক বলি হয়েছে অরাজকতায় ততলোক মরতে পারে না। বস্তুত প্রথম প্রথম কিছু প্রাণহানি ও রক্তপাত ঘটলেও ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়। নাশকর্তার পাগ্‌লামি বেশীদিন থাকে না।

কিন্তু ধ্বংসের অরাজকতা থেকে ন্যায় ও প্রজ্ঞানের নৈরাজ্য স্বতন্ত্র বস্তু। মানুষের চিন্তাভাবনার এক আমূল বিপ্লবের ওপর এর প্রতিষ্ঠা। এখানে কারও কোন অভাব নেই, লোভ নেই, সকলেই তুষ্ট। হিংসা নেই তাই যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে না। অপরাধ নেই তাই আদালত উঠে গেছে। কেহ টাকা জমায় না। মজুর তার শ্রমফল পুরোপুরি ভোগ করে।

> "এই সমাজে মানুষ হইবে নির্ভীক, কারণ তাহারা বুঝিবে তাহাদের জীবন লইবার জন্য কোথাও আইনের ফাঁদ পাতা নাই। সে হইবে সাহসী, কারণ প্রত্যেকেই তাহার পরিশ্রমের ন্যায্য পুরস্কার পায় এবং একের অপরিমিত ভোগবিলাসের জন্য অন্যকে ধরাশায়ী করা হয় না। ঈর্ষা ও ঘৃণা দূর হইবে কারণ এই হীন-বৃত্তির উৎপত্তি অন্যায় হইতে। প্রত্যেকে প্রতিবেশীর কাছে সত্য কথা বলিবে কারণ মিথ্যাকথা বলিবার অথবা ধাপ্পা দিবার কোন প্রলোভন থাকিবে না। মনের শক্তি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত হইবে কারণ সমস্ত কিছু হইবে ইহার পরিপোষক ও সহায়ক। বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে অবর্ণনীয়··" (৪৭১-৭২)

তারপর কল্পনার পাখি পৃথিবীর আকাশ ছাড়িয়ে অজানা নভোমণ্ডলে পাড়ি দিয়েছে।

> "যখন ধরাতল আর অধিক লোকসংখ্যা বহিতে চাহিবে না তখনকার মানুষ প্রজনন বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ কর্তব্যের বিচারে ইহা নিষিদ্ধ এবং ভুল করিয়া তাহারা কিছু করে না। অধিকন্তু তাহারা বোধ হয় অমর হইবে। সমাজ হইবে বয়স্কদের, শিশু ও বালকবালিকা থাকিবে না। জন্মমৃত্যু ও পুরুষ-পরম্পরার গতি শুদ্ধ হইবে এবং সত্যকে প্রতি তিরিশ বছর অন্তর নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে না।" (৮৭১)

সংক্ষেপে বলতে গেলে গডউইনের ন্যায়সূত্র এই রকম দাঁড়ায়। ন্যায়ের লক্ষ্য সাধারণের সুখবিধান। এ সুখ লভ্য নিঃস্বার্থ কর্তব্যপালনে। ধর্ম, আইন, সরকার ও সম্পত্তি তার প্রতিবন্ধক। স্বাধীনতা ও সাম্য হবে ন্যায়-সম্মত সমাজের বনিয়াদ। এ সমাজ গড়তে হলে রাষ্ট্রশাসন ও সম্পত্তিপ্রথা তুলে দিতে হবে—বলপ্রয়োগ করে নয়, দল গঠন করে নয়, বিচার ও সমালোচনা করে। মানুষ নির্বোধ নয়। অন্যায় অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও সরকারী জুলুমের চাপে তার স্বাভাবিক বিচারশক্তি বিহ্বল হয়ে আছে। এ শক্তির উদ্বোধন করা বিপ্লবীর কাজ। এ কাজ ধৈর্যসাপেক্ষ। যখন প্রজ্ঞানশীল ন্যায়বোধ জাগরিত হবে তখন রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিধান ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, আসবে সাম্য ও স্বাধীনতার নিরাজ গণতন্ত্র। শাসনের অভাবে গণতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খলতায় মগ্ন হবে না। কারণ মানুষের শাসনের জায়গায় আসবে সত্য ও প্রজ্ঞানের অমোঘ নির্দেশ।

গডউইনের বই ঠিক সময় মত বেরুল। তখন ফরাসী বিপ্লবের হাওয়ায় দেশ গরম, লণ্ডনের অলিগলিতে উগ্রপন্থীদের আখড়া। গডউইনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রীসভায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা উঠল। প্রধান মন্ত্রী পিট তাচ্ছিল্য করে বললেন তিন গিনি দামের বই গরীবরা কিনে পড়বে না এবং তা থেকে বিপ্লব ঘটবার কোন ভয় নেই।[২] গরীবরা যে চাঁদা তুলে এ বই কিনবে এবং ক্লাস করে পড়বে এ তিনি ভাবেন নি। যা হোক টোরী সরকার বেপরোয়া দমননীতি চালাতে লাগলেন। সাহিত্য ও সংবাদ-পত্রের মাথার ওপর দেশদ্রোহের পরোয়ানা খাঁড়ার মত ঝুলতে লাগল। বিচারের প্রহসন করে কাউকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে দাঁড়াল নিত্যকার ব্যাপার। গডউইন দমলেন না। একটি প্রচারপত্রে তিনি এই ব্যাজবিচারের মুখোশ খুলে দিলেন। বামপন্থীদেরও তিনি ছেড়ে কথা কইলেন না। রাজ-নৈতিক সম্মেলন ও ভাষণের অধিকার সঙ্কোচন করে পার্লামেণ্টে যখন কয়েকটি বিল আনা হল তখন তিনি দু পক্ষকেই ধিক্কার দিলেন। দলের খাতিরে মত বিসর্জন তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তিনি বামপন্থী আন্দোলন

২ কেগান পল: উইলিয়ম গডউইন, হিজ ফ্রেণ্ডস এণ্ড কনটেম্পোরারিজ, ১৮৭৬, খণ্ড ১, ৮০ পৃষ্ঠা।

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বাম সমিতি লণ্ডন করেসপণ্ডিং সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হল।

গডউইনের দর্শনের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাঁর জীবনী। বই বিক্রির টাকায় কয়েক বছর বেশ স্বচ্ছলতায় কাটল। তিনি স্মৃতিকথায় লিখলেন, "আমি এ বিষয়ে সজাগ ছিলাম যে একটি পেনিও নিজের জন্য খরচ করিব না যদি না আমি বুঝি ইহা আমাকে যোগ্যতর জনসেবক করিয়া

তিন চার বছরের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর আস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাঁর বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন কমতে ও শত্রুর সংখ্যা বাড়তে লাগল। এণ্টিজেকবিন রিভিউ নামক রক্ষণশীল পত্রিকায় বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ নিয়ে অত্যন্ত অশ্লীল ও নির্দয় আক্রমণ চলল। শেষে যখন গডউইন নিজে বিয়ে করে বসলেন এবং এমন একজনকে করলেন যাঁর অতীত জীবন এবং রাজনৈতিক মতবাদ তাদের কাছে ছিল সমান নিন্দনীয় তখন তারা কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

পলিটিক্যাল জাসটিস পুস্তকে গডউইন যৌন আসক্তিকে গ্রহণ করেছেন, বিবাহকে বর্জন করেছেন। অবাধ যৌন মিলন তিনি চাননি—এটা শত্রুদের অপপ্রচার। তিনি বলেছেন প্রজ্ঞান ও কর্তব্যের খাতিরে বংশ বিস্তার হবে, রমণসুখের জন্যে নয়। স্ত্রীসঙ্গের প্রয়োজন তিনি যথেষ্ট অনুভব করতেন। বই বেরুবার বছর ছয় সাত আগে তিনি এক বোনকে ঘটকালিতে লাগিয়েছিলেন। বোন এক পাত্রী স্থিরও করেছিল কিন্তু পাত্রের পছন্দ হল না। পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘটকীও খারিজ হল। গডউইন স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন দৈত্যপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে। কিন্তু তাঁর জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় কোন কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হল না।

অবশেষে তিনি আবদ্ধ হলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী প্রগতিবাদী লেখিকা মেরী উল্‌স্টোনক্রাফ্‌ট্‌-এর সঙ্গে। এই মহিলার ভাগ্য প্যারিসে একজন আমেরিকানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটি মেয়েও হয়েছিল। গডউইনের সঙ্গে কয়েকমাস পূর্বরাগ চলবার পর তিনি সন্তানসম্ভবা হলেন। গডউইন তাঁকে বিবাহ করলেন। স্মৃতিকথায় গডউইন লিখেছেন তাঁরা সব

৩ জর্জ উডকক: উইলিয়ম গডউইন, ১০১-২ পৃষ্ঠা।

সময়ে একসঙ্গে থাকেন না—মাঝে মাঝে তাঁরা স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ বরণ করে নেন। একটি পত্রে মেরী তাঁকে লিখছেন:

> "বাড়ির আসবাবের মধ্যে স্বামী একটি দরকারী অংশ, অবশ্য যদি সে একটা বিদঘুটে বস্তু না হয়। আমি মনেপ্রাণে চাই তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে থাক, কিন্তু আমি চাই না তুমি সব সময়ে আমার কনুইএর কাছে থাকবে, যদিও এই মুহূর্তে থাকলে খুব মন্দ লাগত না।"[৪]

কয়েকমাস পরে প্রসবের সময়ে তাঁর মৃত্যু হল। এক তুমুল বজ্রপাতে যেন গডউইনের জীবন খান খান হয়ে গেল। একদিকে মন অবসন্ন অন্য দিকে ঘর বিশৃঙ্খল। তিনি বুঝলেন পারিবারিক ও দাম্পত্য প্রেম বুদ্ধি ও কর্তব্যের শুষ্ক বন্ধনে বাঁধা পড়ে না। সাথীহারা মন ও লক্ষ্মীহীন ঘর, এদিকে দুটি শিশু ও বালিকা—এ নিয়ে দিন কাটানো কঠিন হয়ে উঠল। আবার সঙ্গিনীর জন্য মন চঞ্চল হল। স্থানে স্থানে বিমুখ হয়ে শেষে যে ঘাটে তিনি তরী ভিড়ালেন তিনি দুই সন্তানের জননী, এক অশিক্ষিতা বিধবা, স্ত্রীসুলভ আমোদপ্রমোদে আসক্ত। তিনি বলতেন প্রথম পরিণয়ের পর থেকে সাগরস্নান ও জলকেলির বিহার-বিলাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। এই বিবাহে গডউইনের পারিবারিক অশান্তি বাড়ল বৈ কমল না।

গডউইনকে কেবল নিজের বেলায় বিবাহ সম্বন্ধীয় মতবাদ গিলতে হয় নি। গডউইনের গুণমুগ্ধ তরুণ কবি শেলী পত্নী হ্যারিয়েটকে ছেড়ে দার্শনিকের কন্যা মেরীর প্রতি অনুরক্ত হলেন। দুজনে যখন উধাও হলেন তখন আবার চারদিক থেকে এক পশলা কুৎসাবর্ষণ হল। গডউইন শেলীর ওপর চটে গেলেন। শেলীর পুত্রকে রেখে হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করে স্বামীর পথ মুক্ত করে দিলেন। শেলী মেরীকে বিবাহ করলেন তবে গডউইনের রাগ পড়ল, জামাই শ্বশুরের মিলন হল।

এদিকে নতুন গৃহিণী স্বামীকে আর একটি সন্তান উপহার দিলেন। আয় নেই অথচ পাঁচটি মুখের অন্ন যোগাতে হয়। গডউইন একটির পর একটি নাটক আর প্রবন্ধ লিখে চললেন কিন্তু তাতে না আসে পয়সা, না হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। বাড়িভাড়া বাকি পড়তে লাগল। শেষে বাড়িওয়ালা

৪ ফোর্ড কে ব্রাউন: লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, লণ্ডন, ১৯২৬, ১২৫ পৃষ্ঠা।

তাঁকে রাস্তায় নামিয়ে দিল। বন্ধুবান্ধবদের অনুকম্পায় একটা আশ্রয় জুটল। ১৮৩২ সালে পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন পাস হবার পর যখন হুইগদল সরকার হাতে পেল তখন তারা পুরানো দিনের বিপ্লবী চিন্তানায়ককে ভুলল না। সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে গডউইন একটি সৌখিন সরকারী চাকরি পেলেন যাতে কোন কাজ করতে হবে না। চল্লিশ বছর আগে সরকারী বেতনভাতার বিরুদ্ধে যখন তিনি কলম চালিয়েছিলেন তখন কি জানতেন যে তাঁর জরাজীর্ণ কপালের ওপর নিয়তি এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ এঁকে দেবে?

গডউইন লিখেছেন অনেক কিন্তু তাঁর পরিচয় একটি পুস্তকে। এই গ্রন্থই তাঁকে খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু যেমন অকস্মাৎ তিনি উঠেছিলেন তেমন অকস্মাৎ পড়ে গেলেন। বিদগ্ধসমাজ তাঁকে এমনই ভুলে গেল যে পলিটিক্যাল জাসটিস প্রকাশের আঠার বছর পরে তিনি জীবিত আছেন শুনে শেলী বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। বিপক্ষের লোকেরা অবিরাম কাদা ছিটিয়ে প্রচার করতে লাগল যে দার্শনিক একটা জঘন্য অসম্ভব মতবাদকে চালাবার জন্যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। কিন্তু কেবল এদের অপপ্রচারে তাঁর খ্যাতি ঢাকা পড়েছিল বললে ভুল হবে। গডউইন নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। তাঁর প্রতিভা প্রধান রচনার পর আর অগ্রসর হল না। সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, তিনি তার সঙ্গে তাল রাখতেও পারলেন না। যখন সহযোগীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে কলম ধরেছিল তখন তিনি বাজে নাটক প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখবার মত ব্যক্তিত্বগুণও তাঁর ছিল না। তাঁর কথাবার্তা ছিল নীরস, চালচলন ছিল উদ্ভট, ব্যবহার আত্মম্ভরী। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে অথবা তাঁর সংসর্গে কেউ আনন্দ পেত না। তাঁর অন্যতম এক বিদগ্ধ সুহৃদ মন্তব্য করেছেন: "বৈঠকে বসলে হয় গডউইন নিজে ঘুমিয়ে পড়েন না হয় অন্যদের ঘুম পাড়িয়ে দেন।"[৫]

গডউইনের তত্ত্বকে দুদিক দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে—এক ভবিষ্যৎ সমাজের নকশা হিসাবে, আর বর্তমান ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা

---

৫ উইলিয়াম হেজলিট: দি স্পিরিট অব দি এজ, সম্পাদনা—ডব্লিউ. সি. হেজলিট, লণ্ডন, ১৯০৬, ৪২ পৃষ্ঠা।

হিসাবে। অন্যান্য আদর্শবাদীর মত তিনিও রঙিন চশমা পরে ভবিষ্যতের ছক এঁকেছেন। কেবল তাঁর সত্যযুগ আরও আসন্ন নিকটবর্তী। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পুরুষের মধ্যে সরকার সম্পত্তি যুদ্ধ ও আইন আদালত উঠে যাবে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে বুদ্ধির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকল সমস্যা মিটে যাবে, সাধ আহ্লাদ আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব এমন কি যৌন বাসনাও বিলীন হয়ে যাবে। ন্যায় ও সততার প্রতিষ্ঠা হবে শুধুমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তির সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকে—কোন প্রকার নৈতিক ও আত্মিক প্রেরণার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের জৈবিক দাবী মিটে গেলে তুষ্ট থাকবেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে এ সকল বস্তুর সংস্থান হবে অনায়াসে। নিজের চেষ্টায় নিজের ব্যবস্থা করে নিয়ে তিনি উদ্বৃত্ত সময় সমাজকল্যাণে নিয়োগ করবেন।

কিন্তু কেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এত অল্পে তুষ্ট হবেন? তাহলে বিজ্ঞানের কাজ কি? মানুষের প্রয়োজনের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে আর তার যোগান দিচ্ছে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার। মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকাকে গডউইন বুঝতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন বিজ্ঞানের বলে প্রত্যেকে অপরের সহযোগিতা না নিয়ে নিজের নিজের রসদ যোগাতে পারবে, জীবিকার প্রয়োজনে কাউকে যৌথ উদ্যোগের ওপর নির্ভর করতে হবে না, প্রত্যেকে হবে স্বাবলম্বী। আসলে বিজ্ঞানের কাজ ঠিক এর বিপরীত। বিজ্ঞান ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়ে ক্রমশ মানুষের পরস্পর-নির্ভরতা ও সহযোগিতার আসর বাড়িয়ে চলেছে। গডউইনের ছিল সহযোগিতায় আতঙ্ক। তাঁর আশঙ্কা ছিল জীবিকার জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে ব্যক্তিকে সমাজ গ্রাস করে ফেলবে।

গডউইনের যুক্তিবাদ ও নির্দেশবাদে একটা মস্ত বড় অসঙ্গতি রয়েছে। বইয়ের সূচনায় তিনি বলেছেন যে মানবমনের মুক্তিসাধন করে তার পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা সরকারের আয়ত্ত। মানুষের চরিত্র সামাজিক পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকার সমাজপরিবেশ বদলিয়ে মানুষের চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত করতে পারে। লিখতে লিখতে তাঁর বিশ্বাস বদলাল। বইয়ের শেষ দিকে তিনি বললেন বর্তমান অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখবার জন্য প্রধানত সরকারই দায়ী। সুতরাং সংস্কারের দায় তিনি তুলে দিলেন প্রজ্ঞানশীল দার্শনিকের হাতে। এখন চিন্তা ও কর্ম যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার

সৃষ্টি হয় তা হলে দার্শনিকই বা এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন? অবস্থার ফেরে পড়ে লোকে নরহত্যা করে, হত্যাকারী তার ছোরার মতই পরাধীন;—এ যদি সত্য হয় তা হলে দার্শনিকও তাঁর তত্ত্ব রচনা করেন পরিবেশের তাগিদে, তিনি তাঁর কলমের মতই অবস্থার দাস,—এও তেমন সত্য। পরিবেশ প্রতিকূল হলে দার্শনিকের মুখ দিয়েই বা সত্য কথা বেরুবে কেমন করে, আর যদিও বা বেরোয় তা হলে সে কথা পরিবেশের শাসন এড়িয়ে মানুষের বুদ্ধির দরজায় ঘা দেবে এমন ভরসা কোথায়?

গডউইন কেন্দ্রায়িত জাতীয় রাষ্ট্রের জায়গায় যে স্বাতন্ত্র্যশীল গ্রাম ও জেলা-পঞ্চায়েতের প্রস্তাব দিয়েছেন তাও তাঁর যুক্তির সঙ্গে খাপ খায় না। বিধানসভায় ভোটের দ্বারা সিদ্ধান্তে আসার বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি ক্ষুদ্রতর সভার ওপরও প্রযোজ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতেও সভ্যদের হুজুগের কাছে আত্মসমর্পণ করবার এবং কুসংস্কারে আবেদন করবার সম্ভাবনা থাকবে। আর যদি সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে তর্কবিতর্ক শেষ হবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় কি? অবশ্য গডউইন হয়তো বলবেন যুক্তির নির্দেশ যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হলে এবং সকলে যুক্তির পথে এলে মীমাংসাও হবে এক, সর্বসম্মত।

গডউইনের সংজ্ঞায় মানুষ হবে প্রজ্ঞানের যন্ত্র, তার স্নেহমমতার বাষ্প বুদ্ধির তাপে শুকিয়ে যাবে। সত্য ও ন্যায় যদি নিছক প্রজ্ঞানের ওপর দাঁড়াতে না পারে তা হলে দয়া ভালবাসা কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তির ঠেকা দিয়ে তাকে দাঁড় করাতে তিনি রাজী নন। তাঁর কল্পনার মানুষকে তিনি বহু উচ্চে প্রজ্ঞানের যে সূক্ষ্মলোকে তুলে ধরেছেন তার নাগাল বাস্তব মানুষ পায় না। সেই সূক্ষ্মলোকে আকাশচারীর পক্ষসঞ্চালনও একদিন ব্যর্থ হয়ে ওঠে, তখন সে ভূমিসাৎ হয়। আশাহত আদর্শবাদী সেদিন আদর্শের প্রহসনে পর্যবসিত হয়। সে ঋণ করে শোধ করে না, প্রেম করে বিবাহ করে না, আর তার আকাশে ফুল ফোটানর প্রয়াস দেখে লোকে টিটকারি দেয়। গডউইনের দশা প্রায় এইরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গডউইনের সমালোচনায় হেজ্‌লিট বোধ হয় তাঁর কথা স্মরণ করেই লিখেছিলেন: "কাগজ-কলমের বীরপুরুষ বাস্তবে ভ্যাগাবণ্ডে পরিণত হতে পারে।"[৬]

৬ দি স্পিরিট অব দি এজ, ৩০ পৃষ্ঠা।

গডউইন তাঁর কোন কোন ভুল ধরতে পেরেছিলেন এবং পলিটিক্যাল জাসটিস-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে ও অন্যান্য গ্রন্থে ভুল সংশোধন করেছিলেন। বুদ্ধির পাশে হৃদয়বৃত্তিকে তিনি জায়গা দিয়েছিলেন; স্বীকার করেছিলেন যে কর্মের উৎস হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধির কাজ কেবল বিভিন্ন কাম্য বস্তুর যাচাই করা এবং তাদের লাভ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় খুঁজে বার করা। আগে তিনি বলেছিলেন সার্বিক কল্যাণ কামনার কাছে পারিবারিক স্নেহভালবাসা উৎসর্গ করতে 'হবে। এখন বুঝলেন যে এক নৈর্ব্যক্তিক আদর্শকে ধরে কেহ হাসি ও প্রীতি বিতরণ করতে পারে না। কাছে থাকার দরুন যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের প্রতি হৃদয়বৃত্তির পক্ষপাতিত্ব খুব স্বাভাবিক।

আর বিবাহ সম্বন্ধে তিনি কি রকম কেঁচে গণ্ডূষ করেছিলেন তাঁর প্রেমপত্র-গুলি তার নজির। ১৭৯৮ সালে প্রথম পত্নীবিয়োগের পরে তিনি এক কন্যাকে কামনা করে লিখছেন :

> "কৌমার্য মনকে সংকীর্ণ ও পঙ্গু করে এবং জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়গুলি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখে।…দাম্পত্য প্রেম, সন্তান বাৎসল্য—ইহারাই পারে হৃদয়ের তালা খুলিতে, অন্তরকে মেলিয়া ধরিতে, ইহারা প্রমিথিউসের আগুন যার ছোঁয়া না লাগিলে আমরা স্বকীয় সম্ভাবনায় ফুটিয়া উঠিতে পারি না।"[৭]

দার্শনিকের হৃদয়ের তুষার কখন প্রমিথিউসের আগুনে গলতে শুরু করেছে কে তার খবর রাখে? কার গরজ পড়েছে এই ছাইপাঁশগুলো এবং পলিটিক্যাল জাসটিস-এর পরিশুদ্ধ সংস্করণ পাঠ করে দার্শনিকের প্রতি একটু সদয় হবে? কারণ তাঁর যশের সূর্য তখন পশ্চিমের যাত্রী। সুতরাং গডউইন তাঁর মত বদলালেও দুর্মুখেরা তাদের মত বদলাল না।

গডউইন তাঁর যশের চেয়ে বেশীদিন বাঁচলেন এইটেই তাঁর বড় দুর্ভাগ্য। কিন্তু নিন্দা ও লাঞ্ছনা তাঁর যশ নষ্ট করলেও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলতে পারে নি। শিক্ষাব্যবস্থা, বিবাহ, অপরাধ ও দণ্ডবিধির ওপর তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ভাবীকালের সমাজ-সংস্কারকদের পাথেয় হয়ে রইল। সম্পত্তি, ধর্মসংস্থা, রাষ্ট্রশাসন ও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের যে যুক্তিসঙ্গত সমালোচনা তিনি করেছিলেন, উনিশ শতকের নিরাজ সমাজবাদীরা সকলেই তার পুনরাবৃত্তি

৭ ফোর্ড কে. ব্রাউন, লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৪০ পৃষ্ঠা।

করলেন। শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবে কোন দার্শনিক ন্যায়ের আদর্শের চেয়ে বড় যুক্তি দিতে পেরেছে? প্রতিপক্ষের আক্রমণের জবাবে তিনি লিখেছিলেন :

> "মানুষের অন্তর যাহা কল্পনা করিতে পারে, মানুষের হাত তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার মত শক্তি রাখে।...আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পৃথিবীর উপর অধিকতর সততা এবং উদারতর ন্যায়ের দিন নামিয়া আসিবে।"[৮]

যাঁরা নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, সকল যুক্তি ও তথ্যবিন্যাসের উপসংহারে তাঁরা এই প্রত্যয়কেই ঘোষণা করেছেন।

গডউইনের তত্ত্ব দুটি অতিশয়তার দোষে দুষ্ট—এক ব্যক্তিসর্বস্বতা, আর এক প্রজ্ঞান-পরায়ণতা। তাঁর নিজের যুক্তি তাঁর দর্শনের ওপর প্রয়োগ করলে বলতে হয় এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না,—তাঁর দর্শন ছিল দেশকাল দ্বারা প্রভাবিত। সে যুগে ইংল্যাণ্ডের সমাজে বণিক ও অভিজাতদের প্রভুত্ব খর্ব করে পুরোভাগে আসছিল ধনিক ও শিল্পপতিরা। এই সমাজবিবর্তনের ছাপ পড়ল গডউইনের জীবনে ও রচনায়। উগ্রমত পাতি বুর্জোয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি রূপ দিলেন। শিল্পবিপ্লব এক প্রচণ্ড আঘাত হানল অল্প মূলধনের চাষী কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ওপর। প্রকাণ্ড যন্ত্রশিল্প ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যে সরকার এগিয়ে এল না। ছোট ছোট কাজকারবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ল। ধনিকরা শাসন সংস্কার করে পার্লামেণ্ট দখল করবার জন্যে আন্দোলন করতে লাগল। আর মধ্যবিত্তরা হল চরমপন্থী। টমাস পেন ও গডউইন এই দলের। সংস্কারবাদ ও নৈরাজ্যবাদ উভয়ের নৈতিক মূল এক জায়গায়—সে হল ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ ও সর্বময় মুক্তি বিধানের আদর্শ। সংস্কারবাদীদের গুরু লক্ বলেছিলেন সম্পত্তিতে আছে মালিকের প্রাকৃতিক অধিকার,—শিষ্যরা এই প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করবার জন্যে রাষ্ট্রশক্তিকে একেবারে বাতিল করল না। রাষ্ট্রের কাজ হল ধনিকের জীবন ও বিত্তের নিরাপত্তা বিধান। স্বল্পবিত্ত ও বিত্তহীনের পক্ষ থেকে নৈরাজ্যবাদী সম্পত্তির অধিকার অস্বীকার করল। সে চাইল স্বাধীন আত্মসর্বস্ব চাষী-কারিগরদের এক সাম্যব্যবস্থা, যেখানে সকলের সুখ, স্বাধীনতা ও

---

৮ ফোর্ড কে ব্রাউন : লাইফ অব উইলিয়ম গডউইন, ১৭২ পৃষ্ঠা।

জীবিকা সুরক্ষিত এবং কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে সরকার ও আইনের প্রয়োজন নেই।

সুতরাং নৈরাজ্যবাদী ধনিকের যন্ত্রশিল্প থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল অতীতের সরল ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে। সে চোখ মেলে দেখল না বিপুল-উৎপাদনী কারখানার ভিতরে যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠছে যা অবলম্বন করে জাগছে সর্বহারার শ্রেণীচেতনা আর সমাজবাদী চিন্তাভাবনা। কাজেই গডউইনের ব্যক্তিসর্বস্ব নৈরাজ্যবাদ কেবল যে ধনিকদের হাতে লাঞ্ছিত হল তা নয়, মজুর শ্রেণী এবং সমাজবাদীদের কাছেও এর আদর হল না।

কিন্তু যে তথ্য ও যুক্তির সম্ভার তিনি পরিবেশন করলেন উনিশ শতকের মুক্তিসন্ধানী মনীষার তা উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না। গডউইনের অবদান দুইজন লোকের মাধ্যমে যুগমানসে সমর্পিত হল। একজন কবি শেলী আর একজন সমাজবাদী রবার্ট ওয়েন। শেলীর কাব্যপ্রতিভার উৎস খুলে দিয়েছিল গডউইনের দর্শন। প্রমিথিউস আনবাউণ্ডে তাঁর নিরাজ চিত্র রূপেরসে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শেলীর কুইন ম্যাবকে বলা হয় পদ্যে 'পলিটিক্যাল জাসটিস'। গডউইনের দর্শনে হৃদয়বৃত্তির যে অভাব ছিল তা পূরণ করলেন শেলী। তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে সহযোগিতার ধর্ম জুড়ে দিয়ে আর একটি ফাঁক পূরণ করলেন ওয়েন। গডউইনের নৈরাজ্যবাদ আর ওয়েনের সমাজবাদ গিয়ে পড়ল ফরাসী দার্শনিক প্রুদঁর হাতে। উভয়ের সমন্বয় হল। তখন থেকে সমাজবাদী ভাবনা দুই ধারায় প্রবাহিত হল,—একটি মুক্তিপন্থী, যার ভাবুক প্রুদঁ, বাকুনিন ও ক্রপটকিন, আর একটি শাসনপন্থী যার উদ্গাতা মার্ক্‌স্, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন।

৬। ফ্রান্স: পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ (১৮০৯—৬৫)

ফরাসী বিপ্লবের পর ইয়োরোপের আসরে নেপোলিয়নের দক্ষযজ্ঞ চলল। দেড়শ বছরের রাষ্ট্রবিন্যাস লণ্ডভণ্ড করে, বংশগত রাজমুকুট ও রাজদণ্ড ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ করে তিনি চারদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। ইয়োরোপের জাতীয়তা স্বাধীনতার সংগ্রামে রুখে দাঁড়াল। এই জনশক্তির আঘাতে নেপোলিয়নের পতন হল। রাজরাজন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনরভিষেক করলেন। পনের বছর ধরে তাঁদের শাসনের চাপে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। ১৮৩০ সালে পারীর

রাজপথে আবার বেরিয়ে এল বিক্ষুব্ধ জনতা, বুরবোঁ রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ল, দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও জনবিদ্রোহ সংক্রামিত হল। বেলজিয়াম হল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে মুক্ত হল। কিন্তু ইয়োরোপের ওপর প্রতিবিপ্লবী শাসনের বজ্রমুঠি শিথিল হল না। অবশেষে ১৮৪৮ সালে এল হিসাব নিকাশের পালা। পারীর বিস্ফোরণের আগুন ইয়োরোপের নগরে নগরে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। বিধাতার রুদ্রদণ্ড নেমে এল পুরাতন বিধানের ওপর। ইতিহাসের মোড় ঘুরল। আরম্ভ হল জাতীয়তা ও স্বাধীনতার যুগ।

১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই যুগটির পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা নেই। এ যুগ সংঘাত ও বিপ্লবের যুগ—এযুগে প্রাচীন ও নবীন, দীর্ঘদিনের স্থিতস্বার্থ ও জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধের নেশায় মেতেছে—সারা পৃথিবী তোলপাড় করে ঝড় তুলেছে, কাঁপন লাগিয়েছে আমেরিকা থেকে চীন পর্যন্ত। বিপ্লবের লীলাভূমি ফ্রান্সে এই ঝড়ের সূত্রপাত, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পারীর গণ-অভ্যুত্থানের ফলে অর্লিয়ানিস্ট রাজতন্ত্রের পতন ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের পত্তন হল। প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে জন্ম নিল শিল্পবিপ্লবের দান নূতন এক সমাজদর্শন,—স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে ও লুই ব্লাঁক সমাজবাদী বিধানের নকশা রচনা করলেন। স্বাধীনতা ও জাতীয়তার মন্ত্র দিলেন ম্যাট্‌সিনি, তার সংগ্রাম চালনা করলেন গ্যারিবল্‌ডি, কসাথ। নৈরাজ্যবাদের বাণী উচ্চারণ করলেন প্রুদঁ, ম্যাক্‌স্ স্টার্নার ও বাকুনিন। নিয়তির এমনই পরিহাস, যে দর্শনে এঁদের এবং কার্ল মার্ক্‌সের হাতে খড়ি জার্মান দিকপাল হেগেলের কাছে—তিনি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্তব করে গেছেন। বোধ হয় তাঁর দ্বান্দ্বিক নিয়মকে প্রমাণ করবার জন্যেই হেগেলবাদ তার প্রতিবাদের জন্মদান করল। কিন্তু হেগেলের এই প্রতিবাদী শিষ্যদের মধ্যেই বা কতটুকু সামঞ্জস্য ও মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ম্যাক্‌স্ স্টার্নার ব্যতীত অন্যান্য নৈরাজ্যবাদী ও সমাজবাদীরা সর্বপ্রথম ব্যক্তিসম্পত্তিকে আক্রমণ করল। নৈরাজ্যবাদীরা আরও অগ্রসর হয়ে তাদের বাক্যবান প্রয়োগ করল ধর্ম, নীতি ও রাষ্ট্রের ওপর। কিন্তু তাদের আসল ও মৌলিক লক্ষ্য হল সম্পত্তি। কারণ সম্পত্তিই যাবতীয় বৈষম্যের মূল, ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার দুরত্যয় বিঘ্ন। শিল্পবিপ্লবের পর এই বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। শিল্পপতিরা বেপরোয়াভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে চলেছে। রাষ্ট্র তাদের তাঁবেদার। তাদের শোষণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর ভর করে।

সরকার যে বিত্তবান শ্রেণীর একটি হাতিয়ার এ কিছু নতুন কথা নয়। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদীদের অনেক আগে এরিস্টট্‌ল্‌ থেকে এডাম স্মিথ পর্যন্ত বিত্তবান শ্রেণীর দার্শনিকরা এই তিক্ত সত্য স্বীকার করে গেছেন।

> "সরকারী শাসন যে পরিমাণে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য গঠিত হইয়াছে, সে পরিমাণে আসলে ইহার কাজ দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীকে রক্ষা করা, অথবা যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই তাহাদের হাত হইতে যাহাদের সম্পত্তি আছে তাহাদিগকে রক্ষা করা।"

এ উক্তি মার্ক্‌স্‌ অথবা বাকুনিনের নয়, নূতন ধনবিজ্ঞানের স্রষ্টা বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রী এডাম স্মিথের[১], ১৭৭৬ সালের লেখা। সত্তর বৎসর পরে প্রুদঁ, মার্ক্‌স্‌ ও বাকুনিন শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে এই মন্তব্যেরই বিস্তার করেছেন।

১৮০৯ সালের পনেরোই জানুয়ারী ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্তে বেসাঁসঁ শহরের উপকণ্ঠে গ্রাম্য পরিবেশে পিয়ের জোসেফ প্রুদঁর জন্ম হয়। পিতার ছিল সামান্য মদ চোলাইর ব্যবসা, মা এককালে ছিলেন রাঁধুনি। শৈশব কাটল জুরার মাঠে ও জঙ্গলে। "বারো বৎসর আমার জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে গ্রামে, গরু চরান বা ঐরকম ছোটখাটো কাজে।" ছেলেবয়সের স্মৃতিতে কায়েম হয়ে বসল মাটির টান। "প্রায়ই জুন মাসের উষ্ণ প্রভাতে আমি কাপড়চোপড় খুলে ফেলে ঘাসের শিশিরে গড়াগড়ি দিতাম।" ছেলে মানুষ হল প্রকৃতির কোলে, তার জীবনবোধ বদ্ধমূল হল চাষীর নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রায়।

তারপর এল শহরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অভাব অনটন। গ্রামের গরীব ছেলে বেসাঁসঁর কলেজে ভর্তি হল, বেতন মাপ হল কিন্তু বই কিনবার পয়সা নেই। সে খবর কে রাখে? বই জোটে না তাই পড়া হয় না, ক্লাসে শাস্তি পেতে হয়। এদিকে বাপ মা অনাহারে। উনিশ বৎসর বয়সে কলেজ ছেড়ে প্রুদঁ এক ছাপাখানায় চাকরি নিলেন। এখন থেকে তাঁর লেখার বাতিক দেখা দিল। ১৮৩০ সালে শুরু হল তাঁর ভবঘুরের যাত্রা। "পকেটে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, পিঠে একটা ঝোলা, আর আমার দর্শনের পাণ্ডুলিপি, এই সম্বল করে আমি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে বেরিয়ে পড়লাম।" পথে পথে

১ ওয়েল্‌থ্‌ অব নেশন্‌স্‌, খণ্ড ২, ২০৭ পৃষ্ঠা।

ছাপাখানায় কাজ করে খাওয়াপরা জুটত। অবসর পেলেই পড়াশুনা করতেন, কারণ সাধ ছিল নিজের ভবিষ্যতকে অন্যভাবে তৈরী করবার। বছর কয়েক পরে দেশে ফিরে নিজে ছাপাখানা খুললেন। বেশীদিন এ ব্যবসা চলল না। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী এবার মুখ তুলে চাইলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর রচনার গুণে বেসাঁসঁর কলেজ থেকে প্রুদঁকে তিন বছরের জন্য একটা বৃত্তি দেওয়া হল। এই উপলক্ষে নানা জনের কাছ থেকে অভিনন্দন এল। উত্তরে প্রুদঁ তাঁর সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা করলেন যে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন আপন সগোত্র দুর্গত শ্রেণীর কল্যাণের জন্যে। এ প্রতিশ্রুতি তিনি কোনোদিন ভোলেন নি। নিজের সাহিত্যপ্রতিভা ও রচনাশক্তি বিকিয়ে তিনি আরামে জীবন কাটিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি বেছে নিলেন জন্মসঙ্গী দারিদ্র্যকে এবং আজীবন লড়লেন দরিদ্রের হয়ে।

প্রুদঁ ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান নীতিবান সৎ ব্যক্তি। তাঁর লেখা সর্বত্র সংযত, মার্জিত ও নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু মার্ক্‌স্ ও বাকুনিনের মত তাতে গা-এর ঝাল নেই। ১৮৪৯ সালে একটি প্রবন্ধে ফ্রান্সের একনায়ক লুই নেপোলিয়নের সমালোচনা করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়। জেলে থাকতে তিনি একটি বিত্তহীন যুবতীকে বিবাহ করেন। বেরিয়ে আসার কিছু পরে আবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রস্তুত হল। প্রুদঁ বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলেন। ১৮৬৩ সালে রাজবন্দীদের ওপর সম্রাটের রোষ প্রশমিত হলে তিনি দেশে ফিরলেন। তাঁর দেহ তখন ভাঙতে শুরু করেছে। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ১৮৬৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী পোয়াসীতে প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর বাহুবন্ধনে তাঁর প্রাণবিয়োগ হল।

প্রুদঁর প্রধান এবং প্রথম রচনা—কেস্‌ক্ লা প্রপ্রিয়েতে ? (১৮৪০) অর্থাৎ "সম্পত্তি কি ?"—বইয়ের নামকরণ প্রশ্নে, মুখবন্ধ উত্তরে—উত্তর, সম্পত্তি চোরাই মাল। বুর্জোয়া বন্ধুদের চমক ভাঙতে ১৮৪৬ সালে বেরুল হেগেলের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে সম্পত্তিগত অর্থনীতির বিচার—সিস্‌তেম দে কঁত্রাদিক্‌শিয়ঁ একনমিক ("অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারা") নামক পুস্তকে। ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের সময়ে দুইটি পুস্তিকায় তিনি নির্বিত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা দিলেন। কারাবাসের অবকাশে তিনি লিখলেন লে কঁফেসিয়ঁ দ্য রেভ্‌ল্যু-শিয়নের ("বিপ্লবীর আত্মজীবনী," ১৮৪৯) এবং ইদে জেনেরাল দ্য লা রেভ্‌ল্যুশিয়ঁ ও দিজ্‌ নোভিয়েম সিএক্‌ল্ ("উনিশ শতকের মূল আদর্শ,"

১৮৫৯)। ১৮৫৮ সালে তিন খণ্ডে বেরুল চার্চদ্রোহী তাঁর বৃহত্তম গ্রন্থ— দ্য লা জুস্‌তিস্‌ দাঁ লা রেভল্যুশিয়ঁ এ দ লেগলিজ ("বিপ্লব এবং চার্চের ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে")। ১৮৬৩ সালে দ্যু প্র্যাঁসিপ ফেদেরাতিফ ("ফেডারেশনের নীতি") পুস্তিকায় নিরাজ সমাজের রূপরেখা আঁকা হল। তাঁর শেষ গ্রন্থ দ্য লা কাপাসিতে পলিতিক দে ক্লাসে জুভরিয়েরে ("শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র-নৈতিক শক্তি") তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হল। এতে তিনি ভবিষ্যতের রচয়িতা জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণীকে আশীর্বাদ জানালেন।

প্রুদঁ আত্মজীবনীতে বলছেন হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ থেকে তিনি কি সূত্র উদ্ধার করেছেন—

> "যে কোনো তত্ত্বকে তাহার শেষ পরিণাম পর্যন্ত লইয়া গেলে দেখা যায় যে তাহা এক অসঙ্গতিতে উপনীত হইয়াছে। তখন এ তত্ত্বকে অসত্য ও খণ্ডিত বলিয়া মানিতে হইবে এবং এই অসত্য যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়া থাকে তবে তাহাকেও কৃত্রিম ও কাল্পনিক বস্তু বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

এই নাশাত্মক নিয়ম জীবন ও গতির নিয়ম। একে ধরেই জীবনপথে এগিয়ে যেতে হবে। এই নিয়মটি সমাজসমস্যার চাবিকাঠি, এই নিয়ম খাটিয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজ-ব্যাধির ধন্বন্তরী। এই অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি সমাজের আসল রোগ সম্পত্তিপ্রথার উপচারে অগ্রসর হলেন। দ্বন্দ্ববাদে কল্পনাবিলাসের জায়গা নেই। সমাজ একটা যন্ত্র নয় যা বুদ্ধি খাটিয়ে মেরামত করে চালানো যাবে। সমাজ জৈবধর্মী, তার জীবন নিরন্তর গতিশীল।

> "এই ধারণা যদি আমরা শ্রমসংগঠনে প্রয়োগ করি তাহা হইলে অর্থশাস্ত্রী ও সমাজবাদী কাহারও সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। অর্থশাস্ত্রী বলে শ্রম ঠিক ঠিক সংগঠিত হইয়া গিয়াছে, সমাজবাদী বলে শ্রমকে আদর্শ মাফিক সংগঠন করিতে হইবে। বস্তুত শ্রম ক্রমশ সংগঠিত হইয়া চলিয়াছে।"[২]

ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তির ওপর যে অর্থনৈতিক কাঠাম তৈরী হয়েছিল বনেদী অর্থশাস্ত্রীদের ধনবিজ্ঞান ছিল তার পক্ষে ওকালতি। আর সমাজবাদীরা

২ কঁত্রাদিক্‌শিয়ঁ একনমিক, খণ্ড ১, ৪৫ পৃষ্ঠা।

চাচ্ছিল ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদ করে ধনবৈষম্যের নিরসন এবং সামাজিক ধনবিজ্ঞানের প্রবর্তন.। প্রুদঁ এদের কারও পক্ষপাতী ছিলেন না।

যে সম্পত্তিকে প্রুদঁ চোরাই মাল বলে আক্রমণ করলেন, তাকেই আবার মুক্তির দিশারী বলে অভিনন্দন করলেন। এই হেঁয়ালিটা বোঝা কিছু কঠিন নয়। মালিক যখন কোন কাজ না করে আয়ের অধিকারী হয়, তখন বস্তুত সে অপরের পরিশ্রমের রোজগারের ওপর ভাগ বসায়। জমি ও পুঁজি কিছু উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদন করে শ্রম। যখন জমিদার ও পুঁজিপতি লাভের অংশ দাবি করে তখন তারা কিছু চায় যার বদলে কিছু দেয় না। এটাই হল অনর্জিত আয় বা চোরাই মাল। সম্পত্তি হল,

> "অপরের উদ্যোগ অথবা মেহনতের ফল ভোগ করিবার এবং সেই ফলকে নিজের খুশিমত বেচাকেনা করিবার অধিকার।"[৩]

নিজের শ্রমফলের ওপর প্রত্যেকের দাবি অবিসংবাদিত, প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের শ্রমফল বাজারে ইচ্ছামত বিনিময় করবার। মেহনত করে যে যা গড়েছে কিংবা সঞ্চয় করেছে সে তা ভোগ করবে, দান করবে, বিক্রি করবে যেমন তার খুশি এই বিত্তাধিকার স্বাধীনতার গোড়ার কথা। এ হিসাবে সম্পত্তি মুক্তির দিশারী।

মজুরের পরিশ্রমের আয় কেমন করে মালিকের পকেটে যায়? একক ব্যক্তির মেহনতের ওপর যৌথ উদ্যোগের যে উদ্বৃত্ত আয় সেটি চুরি করে,— মালিক যাকে বলে মুনাফা।

> "বহুলোকের এককালীন সংঘবদ্ধ উদ্যম হইতে যে বিরাট শক্তির উদ্ভব হয় তাহার দাম সে কিছু দেয় না। দু-শ' মজুর লুক্সরের প্রকাণ্ড মূর্তিটিকে কয়েক ঘণ্টায় তুলিয়া ফেলিতে পারে, যাহা একজন মজুর দু-শ' দিনেও পারিবে না। ধনিকের হিসাব মত উভয় ক্ষেত্রেই মজুরি হইবে সমান।"[৪]

মজুর মনে করে সে তার কাজ মত মজুরি পেল। আসলে সে পেল কাজের আংশিক মূল্য।

এর পর প্রুদঁ সমাজবাদীদের ধরলেন। সম্পত্তি অর্জন, প্রতিযোগিতা,

৩ প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ১, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৪ প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ৯, ৯৪ পৃষ্ঠা।

ভোগ, এসব মানুষের মজ্জাগত প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তিগুলি ধনসৃষ্টির উৎস। এ উৎস সমাজবাদীরা বুজিয়ে দিতে চায়।

"শ্রমবিভাগ, যৌথশক্তি, প্রতিযোগিতা, বিনিময়, বিত্ত, এমন কি স্বাধীনতা ইহারাই হইল আসল অর্থনৈতিক শক্তি, ধনসৃষ্টির উপাদান। ইহারা মানুষকে অপরের দাস বানায় না, পরন্তু উৎপাদককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তাহার পরিশ্রম লাঘব করে, তাহার উৎসাহ জাগাইয়া তোলে, তাহার উৎপাদনকে দ্বিগুণ করে।"[৫]

এই অর্থনৈতিক প্রথা ও প্রবৃত্তিগুলোকে নষ্ট করা সমাজবিপ্লবীর কাজ নয়, এদের অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করা তার কাজ। তার কাজ এদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা।

"এই অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি, যাহার শক্তি এত ফুলিয়া উঠিয়াছে সেগুলিকে দমন করার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাহাদের পরস্পরে একটা ভারসাম্য আনা। ইহা সম্ভব হইবে সেই নিয়মের বলে যাহা অনেকেই ভাল করিয়া জানে না বা বোঝে না—যে বিপরীত বস্তু পরস্পরকে বিনাশ করা দূরের কথা, বরং তাহাদের বিপরীত স্বভাবের জন্যই পরস্পরকে রক্ষা করে।"[৬]

খুব সহজ তত্ত্ব। বাড়ির খিলান ও গম্বুজ তৈরী হয় ভিন্নমুখী ভারের সমন্বয় করে—বিপরীত ভার পরস্পরকে ঠেকিয়ে রাখে, কেহই ভূমিসাৎ হয় না। বলবিদ্যার এই নিয়ম সমাজেও বলবৎ।

সমাজবাদী চায় সব বৈপরীত্য নিঃশেষ করে যৌথ উদ্যোগের প্রবর্তন। তার মানে স্বাধীনতার সৎকার।

"সামুদায়িকতার অর্থ প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী এবং অক্ষম ও সক্ষম, তরুণ ও বৃদ্ধ সকলের কদর সমান। ইহাতে অসাম্য দূর হয় বটে কিন্তু অযোগ্যতা ও অক্ষমতা প্রশ্রয় পায়।"[৭]

সুতরাং ব্যক্তিসম্পত্তির মত যৌথসম্পত্তিও বর্জনীয়।

"হেগেলের ছকে ফেলিয়া বলিতে গেলে সমাজবিকাশের প্রথম পর্যায়ে

৫ ইদে জেনেরাল, ৯৫ পৃষ্ঠা।

৬ দ্য লা জুসতিস, খণ্ড ১, ২৬৫-৬৬

৭ ইদে জেনেরাল, ৮৯ পৃষ্ঠা।

আসে যৌথ সত্তা, এটি হইল থীসিস বা ভাব; ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসে ব্যক্তি-সম্পত্তি, এটি হইল এন্টিথীসিস বা প্রতিভাব। সমাধানে পৌছাইবার আগে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তৃতীয় পর্যায়ের সিন্‌থেসিস বা সদ্‌ভাবটিকে।"[৮]

এই সিন্‌থেসিস বা সমন্বয়টি কী? বিত্ত থাকবে শ্রমের স্বাধীনতা ও বিনিময়ের অধিকার নিয়ে। কিন্তু বিত্তের আনুষঙ্গিক যে অনর্জিত লাভের দাবি তা বাতিল হবে। নিজের শ্রমফল ভোগ করবার অধিকার হবে সম্পত্তির মর্ম। একে অন্যের চাহিদা মেটাবে, পরস্পরের সাহায্যের জন্যে গড়ে উঠবে বিনিময় প্রথা, সম্পত্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের এই হল সমাধান। ব্যক্তিসম্পত্তি নয়, যৌথসম্পত্তি নয়,—ব্যক্তি অধিকার ও সহযোগিতা এতে হবে সমাজদ্বন্দ্বের নিরসন—যাকে প্রুদঁ বলেছেন ম্যুতুয়ালিতে।

সমস্যাটা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক নয়। রাষ্ট্রবিপ্লবে এর সমাধান নেই। তাই ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লব প্রুদঁর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। এ যেন অকালপ্রসূত ভ্রূণ সন্তান। কিন্তু একে এড়িয়ে যাবারও যো নেই। এতদিন চলেছে কেবল সমালোচনা ও দার্শনিক তত্ত্বকথা। এবার বিপ্লবের তাড়ায় কাজের রাস্তা খুঁজতে হল, আবিষ্কার করতে হল এমন কর্মপন্থা যাতে ধনবৈষম্য দূর হয়।

প্রুদঁ বের করলেন বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনা। তিনি দেখালেন এতদিন সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে এর মারফত ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে মালিকের ক্ষমতা বর্তায় বলে। বিনিময়ের মধ্য দিয়েও যে বৈষম্য আসতে পারে এবং প্রধানত আসে তা কেউ খেয়াল করেনি। বিনিময়ের মাধ্যম হল মুদ্রা। যে কোনো উৎপাদনের কাজে মুদ্রার দরকার। মূলধনের জন্যে চাই সুদ, জমি ও যন্ত্রের জন্যে চাই ভাড়া, সব দিতে হয় মুদ্রায়। এই প্রকারে মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় অনর্জিত আয়ের বাহন, পরস্বভোগের হাতিয়ার। মুদ্রার এই পাপবৃত্তি যদি দূর করা যায়, যদি শ্রমিক বিনা সুদে পুঁজি ও বিনা ভাড়ায় জমি পায় তাহলে সে তার পরিশ্রমের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারে এবং পুঁজিপতি তাতে ভাগ বসাতে পারে না।

বিনিময় ব্যাঙ্কের কাজই হবে এই। এই ব্যাঙ্ক উৎপাদনকারীকে বিনা

৮ প্রপ্রিয়েতে? অধ্যায় ১, ২০২ পৃষ্ঠা।

সুদে ধার দেবে। চলতি ব্যাঙ্ক পুঁজিবাদীদের ঘাটি। এর কাজ পণ্যের বদলে কিছু বাটা রেখে মুদ্রা অথবা হুণ্ডি দেওয়া এবং এই বাটার আয় ব্যাঙ্কের মূলধনের অংশীদারদের মধ্যে বিলি করা। বিনিময় ব্যাঙ্কের কোন মূলধন ও অংশীদার থাকবে না এবং এ কোন লাভ করবে না। পণ্যের বদলে এই ব্যাঙ্ক দেবে হুণ্ডি কিংবা নোট যা মুদ্রায় রূপান্তরিত করা যাবে না। নোটগুলি ব্যাঙ্কের মক্কেলদের মধ্যে বিনিময় হবে এবং কারেন্সি নোটের মত চলবে। মক্কেলদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকবে যে তারা তাদের পণ্যের দাম বাবদ এই নোট নিতে আপত্তি করবে না। ব্যাঙ্ক সাধারণত পণ্যের বদলে নোট দেবে, দাম স্থির হবে উৎপাদনের খরচ ও মেহনতের অনুপাতে। কেউ যদি নূতন কারবার অথবা কারখানা খুলতে চায় তাহলে ব্যাঙ্ক তাকে কিছু আগাম টাকা কিংবা নোটও দিতে পারবে, পরে তার উৎপন্ন পণ্য নিয়ে এই ধার উসুল করবে। এইরূপে কারবারিরা বিনা সুদে মূলধন পাবে। মূলধনের অভাবে উৎপাদককে ধনিকের দাসত্ব করতে হয় কিংবা তাকে মোটা হারে জমি ও যন্ত্রের ভাড়া দিতে হয়। বিনিময় ব্যাঙ্কের সাহায্যে সে নিজে যন্ত্র কিনে তার মালিক হতে পারবে এবং নিজের মেহনতের রোজগার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবে।

মূলধন প্রত্যেকের আয়ত্তের মধ্যে এলে কোন উদ্যোগী লোককে বেকার থাকতে হবে না। পণ্যের ন্যায্য বিনিময় এবং উৎপাদকদের স্বাধীন চুক্তি, এই হবে বাজারের রেওয়াজ, শ্রম ও পুঁজি এক পাত্রে এসে মিলবে, শোষণ ও শ্রেণীভেদ দূর হবে। সমাজ হবে শাসনমুক্ত, স্বাবলম্বী।

পরিকল্পনাটি সুন্দর, কিন্তু এতে কিছু গলদ আছে, যা রচয়িতার নজরে পড়েনি। তিনি দেখেছেন বিনিময় নোটে বিক্রেতাদের মস্ত সুবিধে যে এতে বাটা নেই। ব্যাঙ্ক নোট বাটা নেয়। ব্যাঙ্ক নোটের সুবিধের দিকটা তিনি দেখেন নি। ব্যাঙ্ক নোট ইচ্ছামত মুদ্রায় ভাঙানো যায়। সুতরাং ব্যাঙ্ক নোট লেনদেনের ব্যাপারে সকলেরই গ্রাহ্য। বিনিময় নোট মুদ্রায় ভাঙানো যায় না। এ কেবল ব্যাঙ্কের মক্কেলদের কাছে গ্রাহ্য। কাজেই এর চলাচল নির্ভর করে মক্কেলদের সচ্ছলতার ওপর। তাদের কারবারে মন্দা পড়লে বিনিময় নোটের কদর কমে যাবে। তাই ব্যাঙ্ক নোটের মত বিনিময় নোটের ওপর জনসাধারণের আস্থা আসতে পারে না। আরও একটা কথা আছে। মূলধন তৈরী হয় এবং সমাজের ধনবৃদ্ধি হয় সঞ্চয় থেকে। তার মানে সম্পদের সৃষ্টি

বাড়ানো দরকার, ভোগ কমিয়ে উদ্বৃত্ত সম্পদ জমিয়ে আবার উৎপাদনে খাটানো দরকার। এই প্রকারে সমাজের বিত্ত বৃদ্ধি পায়। এর আয়োজন না করে কেবল বিনিময়ের সুবিধা ও ঋণের সুযোগ দেবার জন্যে নোট ছাড়লে বাজার ফেঁপে উঠবে, জিনিসপত্রের দাম চড়বে।

এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও বিনিময় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনায় একটা খুব কাজের কথা আছে—সে হল পারস্পরিক ঋণের ব্যবস্থা। জনসাধারণের টাকায় ব্যাঙ্ক চলে। ব্যাঙ্ক একজনের টাকা গচ্ছিত রাখে, সে টাকা লগ্নি করে আর একজনের কাছে। ধার দেয় একজন আর একজনকে, ব্যাঙ্ক শুধু মধ্যস্থ। অংশীদারদের দেওয়া মূলধন একটা অতিরিক্ত নির্ভর, আপৎকালের ভরসা।

এখন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতা কি তুলে দেওয়া যায় না? বিলক্ষণ যায়। সমবায় সমিতি দোকানদারকে বাদ দিয়ে সভ্যদের বিনা লাভে জিনিস যোগায়। তেমন সমবায় ঋণ সমিতি ব্যাঙ্ককে বাদ দিয়ে সভ্যদের বিনা সুদে ধার দিতে পারে। এতে বেশী মূলধন লাগবে না। সভ্যদের চাঁদায় কাজ চলে যাবে এবং ব্যাঙ্কের দায় হবে সভ্যদের যৌথ।

"উনিশ শতকের বিপ্লবের মূল আদর্শ" গ্রন্থে প্রুদঁ সরাসরি এই সমবায় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব দিলেন। সে ১৮৫১ সালে, বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা বানচাল হবার পর। ১৮৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী, প্রুদঁ বাঁক দ্যু প্যেপ্‌ল্ বা 'জনতা ব্যাঙ্ক' নাম দিয়ে তাঁর কল্পনাকে রূপায়িত করলেন। মূল পরিকল্পনার কিছু কিছু অঙ্গ অবশ্য বাদ দিতে হল। কিছু মূলধন শেয়ার ছেড়ে যোগাড় করতে হল, শতকরা দুই হারে সুদ ধার্য হল এবং কয়েকটি মাত্র জিনিসের লেনদেনে বিনিময় নোট চালু হল, বাকি জিনিসগুলির বেচা-কেনায় মুদ্রা বহাল রইল। এই সঙ্কুচিত পরিধির মধ্যেও ব্যাঙ্কের কাজ চলল না। ১১ই এপ্রিল কারাগমনের আগে প্রুদঁ ব্যাঙ্কের পাট তুললেন। মুদ্রার বদলে বিনিময় নোটের পরিকল্পনার এইখানেই সমাপ্তি।

প্রচলিত অর্থে প্রুদঁ আদৌ সমাজবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি ব্যক্তিবাদী। তিনি খুঁজেছেন এমন একটা সমাধান যাতে কারও স্বাধীনতা খর্ব না হয় অথচ সকলের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ঠিক থাকে, যাতে সবাই স্বাধীনভাবে ও ন্যায্যভাবে আপন আপন কাজ নিয়ে লেনদেন করতে পারে, প্রত্যেকে যা দেয় ঠিক তার সমান পায়, কারও কোনো একাধিকার অথবা

মধ্যস্বত্ব নেই। এই হল প্রুধঁর ম্যুতুয়ালিতে বা সহযোগী স্বেচ্ছাতন্ত্র যেখানে যৌথসমাজের কোনো রকম জোর জুলুম খাটে না।

এই বন্দোবস্তে রাষ্ট্রশাসনের কোনো জায়গা নেই। সমাজ দ্বন্দ্বে ভরপুর। কত বিরোধী অধিকার দাবিদাওয়া পরস্পরকে ঠেকিয়ে রেখেছে এবং আপোসে এসেছে, তাদের সংঘাত থেকেই এসেছে সমন্বয়। অধিকারের রক্ষাকর্তা অধিকার নিজেই। রাষ্ট্রের উদ্যত মুষ্টির কি প্রয়োজন?

এইখানেই প্রুধঁর সঙ্গে সমাজবাদীদের বিবাদ। শ্রমিক তার শ্রমের পূর্ণ ফল ভোগ করবে এবং এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সংস্কার হবে—এ বিষয়ে উভয়ে একমত। কিন্তু লুই ব্লাঁক প্রমুখ সমাজবাদীরা চাইতেন রাষ্ট্রের আওতায় এই পরিবর্তন আনতে। আর প্রুধঁ চাইতেন জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত উদ্যোগে এই সংস্কার আপনি আসুক। বিপ্লবের লক্ষ্য জনকল্যাণ নয়, জনমুক্তি স্বাধীনতা। সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হলে যেমন শোষণ চলে, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তেমন শাসন চলে। দুয়েরই উচ্ছেদ করা বিপ্লবীর লক্ষ্য।

১৮৪৮-এর বিপ্লবে রাজতন্ত্র উচ্ছন্ন হল, প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হল কিন্তু বিপ্লব দায়মুক্ত হল না। তার যে প্রতিশ্রুতি নূতন সমাজসম্পর্ক, স্বাধীন জীবনযাত্রা তা পূর্ণ হল না। প্রুধঁ তখন "প্যেপ্‌ল্" বা "জনতা" পত্রিকার সম্পাদক এবং গণপরিষদে সাইন জেলার প্রতিনিধি। অস্থায়ী সরকার প্রথমেই সর্বসাধারণকে ভোটাধিকার দিল। সবাই যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রুধঁ বললেন এ বিধান প্রতিবিপ্লবী। প্রজাতন্ত্রীরা তো অবাক, বিপ্লবী প্রুধঁ বলে কি? পরে "বিপ্লবের মূল আদর্শ" পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে তাঁর উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। গণভোটে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হল প্রতিক্রিয়াশীল দলের লোক, যারা সবরকম সমাজসংস্কারের বিরোধী। কারণ ভোটের পরি-চালনা ছিল এদের হাতে।

সেকি প্রজাতন্ত্র বেশীদিন টিকল না। ফ্রান্সের আকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন, গণভোটের জোরে প্রজাতন্ত্র ভেঙে দিয়ে প্রথমে হলেন একনায়ক তারপর সম্রাট। এই ভুঁইফোঁড় জনপ্রিয় সম্রাটকে লক্ষ্য করে প্রুধঁ লিখলেন "জনতাকে দিয়ে মিথ্যাচার করাবার শ্রেষ্ঠ উপায় সার্ব-জনীন ভোটাধিকার।" প্রভুভক্তির দাস্যভাব জনতার অস্থি মজ্জায়। তিনি প্রায়ই বলতেন, "বাস্তবপক্ষে জনতার চেয়ে অগণতান্ত্রিক আর কিছু নয়।" সুতরাং আইন ও বিধানের বেড়া দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। বিপ্লবের

পরাক্ষে গণপরিষদ যখন প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করছিল, তখন প্রুদঁ দাঁড়িয়ে বললেন্‌ঃ

> "আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি ইহাতে আমার অসমর্থনীয় বিধি আছে বলিয়া নয়, ইহাতে আমার সমর্থনীয় বিধি নাই বলিয়াও নয়। আমি সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছি কারণ ইহা একটি সংবিধান।"

গডউইন্‌ের মত তিনিও মনে করতেন সংবিধান মাত্রই দুষ্ট, পরিত্যাজ্য। ফ্রান্সের তথাকথিত উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

> "শুরুতে যতই জনপ্রিয় হউক, সরকার সর্বত্র দরিদ্র অশিক্ষিত জনতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন শ্রেণীর পক্ষ লইয়াছে।"[১]

সমাজে বিপ্লব সাধন করা রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো কালে সম্ভব নয়। রাষ্ট্র-জীবনের দুই বিপরীত প্রেরণা মুক্তি ও শৃঙ্খলা। বিপ্লব চায় প্রথমটি, সরকার চায় দ্বিতীয়টি। সরকার তার স্বভাবধর্মবশত বিপ্লবী হতে পারে না। আদিমতম নৃপতির রাজ্যাভিষেক থেকে ১৭৮৯ সালে মানবাধিকারের ঘোষণা পর্যন্ত যাবতীয় বিপ্লব ঘটেছে জনতার উদ্দীপনায়। সরকার শুধু বাধা দিয়েছে, পীড়ন করেছে। সরকার চিরকাল রক্ষণধর্মী। জনতা বিপ্লবকামী। স্বেচ্ছায়, স্বচেষ্টায় তারা যখন বিপ্লব আনবে তখনই বিপ্লব সার্থক হবে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব এনেছেন কয়েকজন উপরতলার নেতা। তাঁরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন এবং বিপ্লব পঞ্চত্ব পেয়েছে।

সে কালের রাষ্ট্রচিন্তায় যে দুটি ইষ্টমন্ত্র ছিল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র—তার কোনোটিতে প্রুদঁর কোনো মোহ ছিল না। ম্যাট্‌সিনির জাতীয়তার আবেদনে সারা ইয়োরোপের তরুণ জেগে উঠেছিল, প্রুদঁর রক্তে কোনো ঢেউ লাগেনি। হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের ওপর জারের অত্যাচারে তাঁর বিবেকবুদ্ধিতে আঁচড় পড়েনি। কারণ তাঁর মতে জাতীয়তার নেশা বড় মারাত্মক। আজকের নির্যাতিত পরাধীন জাতি কাল স্বাধীন হয়ে বসলে এক কেন্দ্রান্বিত রাষ্ট্র গঠন করবে এবং নির্যাতনে হাত পাকাবে। তার চেয়ে বরং ঢিলেঢালা অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য ভাল যার অধীনে অনেক জাতি উপজাতির বাস। ফ্রান্সে যে বহু

১ ইদে জেনেরাল; ১১৯ পৃষ্ঠা

ফ্লেমিং, জার্মান, ইটালীয় ও বাস্ক জাতির লোক আছে এও মন্দ নয়, এদের জন্যে ফ্রান্স জাতিসর্বস্ব হতে পারে না। বহুজাতির শিথিল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত আছে তার ভাঙনের বীজ এবং জনতার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা।

রাষ্ট্রের বিকল্প এই প্রতিষ্ঠানের রূপটি কী? "আত্মজীবনী" এবং "ফেডারেশনের নীতি" এই দুই পুস্তকে প্রুদঁ নিরাজ সমাজব্যবস্থার ছক এঁকেছেন। সমাজের যে সকল কাজকারবার সরকারী তত্ত্বাবধানে চলছে সেগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেমন যেখানে দরকার তেমন সেখানে আঞ্চলিক সভা গড়ে উঠবে, তারা স্থানীয় কাজকর্ম চালাবে—বৃহত্তর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনমত উচ্চতর সভা গড়ে তুলবে। কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অর্থ, বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত কাজের দেখাশুনা এখন সরকারী দপ্তর থেকে হয় সব তদারক করবে জনসাধারণ অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সরকারী কর্মচারী কিংবা সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি কোথাও থাকবে না। শৃঙ্খলা ও পরিচালনা থাকবে, বৈধানিক কর্তৃত্ব উঠে যাবে।

কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির পরিচালনার জন্য সমব্যবসায়ীরা নিজ নিজ সংঘ গড়ে তুলবে। সংঘের থাকবে আলোচনা সভা ও কার্যকরী সভা, মাথার ওপর থাকতে পারে একজন নির্বাচিত সচিব। এরাই সব কাজ চালাবে। কি দরকার সরকারী কৃষি দপ্তর ও বাণিজ্য দপ্তরের? খনি ইজারা দেওয়া, রেলগাড়ি চালানো, খাল কাটা, রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি সব আসবে জনসভার এক্তিয়ারে। এ সকল ব্যবসায়ের ও জনহিতের কাজ সরকারের হাতে থাকা মানে কতগুলো ঠিকাদার, সুদখোর ও ফাটকাবাজের পকেটে টাকা ঢালা যে টাকা খেটে খাওয়া মজুরের পাওনা।

জনশিক্ষা বিভাগে শিক্ষকরা নির্বাচিত ও নিযুক্ত হবে পৌরসভা বা অঞ্চল সভা থেকে। ডিগ্রী দেবে বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন সেনাবিভাগে রেওয়াজ আছে তেমন শিক্ষাবিভাগেও যোগ্যতা হবে উন্নতির সোপান। নীচের ক্লাসে পড়িয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তবে শিক্ষক কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করবার সুযোগ পাবে।

অর্থদপ্তরটিকে লোকায়ত্ত করার যুক্তি আরো জোরাল। যে কোন কাজ চালাতে হলে টাকার দরকার এবং টাকা যোগায় করদাতা। যারা টাকা

দেয় তাদের হাতেই জমাখরচ থাকা উচিত, যারা টাকা ওড়ায় তাদের হাতে নয়। অর্থাৎ আয়ব্যয়ের নীতি ঠিক করবে দেশ, সরকার নয়। জনতার অর্থভাণ্ডার থেকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরিয়ে দিলে অপচয়, ঘাটতি এবং দুর্নীতি অনেক কমে যাবে।

জনস্বার্থের কাজগুলি পৃথকভাবে সংগঠিত হবার পর তাদের নির্বাচিত প্রধানরা এক যুক্তসভায় মিলিত হবে। এই যুক্তসভা রাষ্ট্রসভার জায়গা নেবে। এর কাজ হবে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগ রক্ষা করা। এর ওপর গোটা দেশের নির্বাচিত একটি জাতীয় সভাও থাকতে পারে—যার কাজ হবে আইন প্রণয়ন, হিসাব পরীক্ষা, আন্তর্বিভাগীয় বিবাদের নিষ্পত্তি। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন আছে স্বাধীনতা ও লোকায়ত্ত সংগঠন অন্যদিকে তেমন আছে দায়িত্বশীলতা ও কেন্দ্রীকরণ। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই বিধান হবে রাষ্ট্রবিধানের চেয়ে শক্তিশালী।

ফেডারেশন বা যুক্তকরণের নীতির ওপর নির্মিত এই হল প্রুদঁর নিরাজ সমাজের স্বপ্নসৌধ। ছোট ছোট আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্বেচ্ছাকৃত সংযোজনে গাঁথা হবে বৃহত্তর কেন্দ্র—সুদৃঢ় লোকভিত্তির ওপর দাঁড়াবে সমাজব্যবস্থার শীর্ষচূড়া। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পুরোধা জিরোঁদ্যাঁ দলের কাছ থেকে পাওয়া এই বিকেন্দ্রন ও স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনাকে প্রুদঁ একটি নিঃশাসন নিরাজ সমাজের চেহারা দিলেন।[১০] এই রূপায়ণকে আশ্রয় করে অগ্রসর হল উনিশ শতকের নৈরাজ্যবাদ।

ফয়েরব্যাক প্রমুখ হেগেলের জার্মান শিষ্যদের মত প্রুদঁ চার্চকেও আক্রমণ করলেন। তিনি চাইলেন ঐশ্বরিক নয়, মানবিক ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র। বেসাঁসঁর কার্ডিন্যাল আর্কবিশপের উদ্দেশে লেখা "বিপ্লব ও চার্চের ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে" বইতে তিনি চার্চকে দাসত্বের শিক্ষাগার বলে ধিক্কার দিলেন। পৃথিবীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা দূরে থাকুক, ধর্ম এক তুরীয় আদর্শবাদের নামে ধনের যারা স্রষ্টা তাদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে এসেছে। পাপের আতঙ্কে

১০ জিরোঁদ্যাঁ দলের চিন্তানায়ক ভার্জিনো ও ব্রিসো এই পরিকল্পনার স্রষ্টা। এঁরা নৈরাজ্যবাদী ছিলেন না। ব্রিসো তাঁর "রেশের্শে ফিলজফিক স্যুর ল দ্রোয়া দ্য প্রপ্রিয়েতে দাঁ লা নাত্যুর" নামক পুস্তকে সম্পত্তিকে চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন—যে সুন্দর কথাটা প্রুদ'র কলমে এসে চিরস্মরণীয় হল। লেকী : ডেমোক্রাসী এণ্ড লিবার্টি, খণ্ড ২, সোশ্যালিজম্।

খ্রীষ্টানরা মানবজীবনকে ভেবেছে অশুচি, সহজ প্রবৃত্তিকে তারা দমন করেছে, শ্রমকে তারা বিধাতার অভিশাপ বলে অপমান করেছে। "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছি এবং বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি মানুষে।" খ্রীষ্টানদের ধর্ম "জনতার দারিদ্র্য, লোকের হতাশা এবং দাসদের অবনতির পরিচয়।" "খ্রীষ্টান ধর্মের যুগ মানবজাতির পতনের যুগ।" খ্রীষ্টানদের সন্ন্যাসবাদ ও যৌন দমন নারীর অমর্যাদা করেছে, বিবাহকে যথাযোগ্য সম্মান দেয় নি। খ্রীষ্টান ধর্মের দার্শনিক দোসর হল পরমাদ্বৈতবাদ। প্রুদঁ তাঁর বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে এক অধ্যায় জুড়ে এর অপপ্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন।[১১]

৫ এতদিন সমাজ নৈতিক প্রেরণা পেয়েছে লোকোত্তর বাণী ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থেকে। ফরাসী বিপ্লব এই বুজরুকির মুখোশ খুলে দিয়েছে।

> "ভাল ও মন্দ, যার পার্থক্য আমরা আগে চলতি ছকে ফেলিয়া স্থির করিতাম, এখন তা অস্পষ্ট ও নিরাকার, দুটা বাঁধাধরা বুলি বই আর কিছু নয়। অধিকার, কর্তব্য, নীতিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি যার কথা প্রার্থনাসভায় ও বিদ্যালয়ে ফলাও করিয়া বলা হয়, সেগুলির এখন কাজ নিরালম্ব বাক্যজাল বিস্তার, অসার কল্পনাবিলাস এবং প্রমাণহীন সংস্কারকে আবরণ করা।"[১২]

প্রুদঁ ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তা থেকে মুক্ত এক লৌকিক নীতিমানের সন্ধান করছিলেন। তিনি এর উৎস খুঁজে পেলেন বিপ্লবের দেওয়া সামাজিক ন্যায়নীতির মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) মানুষকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছে—এক নূতন ন্যায়ের বিধান এনেছে যা মানবমূল্যে অধিষ্ঠিত। এর ইঙ্গিতকে অনুসরণ করে সমাজের সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই মানবিক নীতিমানকে প্রবর্তন করতে হবে।

প্রুদঁর রামরাজ্যে যে যার খুশিমত কাজ বেছে নেবে। বাজারে অবাধ বিনিময় চলবে—বিনা লাভে। কাজের পরিমাণ হবে বিনিময়ের হার। সমান পরিশ্রমের মাল সমানে সমানে বিনিময় হবে। যেখানে যে পণ্যের দরকার সেখানে সে পণ্য অবাধে চলাচল করবে, চাহিদা ও সরবরাহ সমান হবে। উৎপাদক-গোষ্ঠীগুলি সমস্বার্থে মিলিত হবে, বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করে তাদের

১১ এই পরমাদ্বৈতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রুদঁর গুরু হেগেল।

১২ দ্য লা জুসতিস, খণ্ড ১, ৭০ পৃষ্ঠা।

দিয়ে আন্তর্গোষ্ঠিক কাজ চালাবে। সরকারী শাসন হবে অবান্তর। রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থনৈতিক জীবনে মিশে যাবে। ধর্মীয় ব্যাপার লোকায়ত ব্যাপার থেকে পৃথক থাকবে। সমাজ নিজের চলৎশক্তিতে চলবে, সেনাবল বিচারশালা ও আমলাতন্ত্র দিয়ে তাকে চালাতে হবে না।

কেমন করে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব হবে? ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে আসবে পরিবর্তন। জোর জবরদস্তি করে, হিংসাত্মক কাজের দ্বারা আচমকা সমাজের চেহারা বদলে দেওয়া যায় না। এই পরিবর্তন সাধনেই বিপ্লবের সার্থকতা, শুধু রক্তগঙ্গা বওয়ালে বিপ্লব হয় না।

> "বিপ্লব জৈবশক্তির বিচ্ছুরণ। সমাজের অন্তঃস্থল হইতে তার বহুল নরনারীর মাধ্যমে ইহা প্রকাশিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ এবং ক্রমগামী হইলেই তবে ইহা সমর্থনীয়। জোর করিয়া বিপ্লব ঘটানো জোর করিয়া বিপ্লব দমানোর মতই জুলুমবাজি।"[১৩]

গডউইনের মত প্রুদঁরও বিশ্বাস ছিল যে ইতরজনের মনে বুদ্ধির আলো জ্বলে উঠলে আপনিই পরিবর্তন আসবে, বিপ্লবের ভার তারা নিজ হাতে নেবে।

> "সমাজ ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে চালিত হয়, যে নিয়ম অনিবার্য ও অবধার্য, প্রজ্ঞান অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই নিয়মের স্বরূপ আমাদের সামনে মেলিয়া ধরে। এ নিয়ম মানুষ গড়ে না, বা এ নিয়ম তাহার নির্দেশে সমাজে আরোপিত হয় নাই।"[১৪]

সুতরাং প্রজ্ঞানের দুর্বার গতিকে রুখবার সাধ্য কোন সরকারের নেই। মানুষ যতই বুদ্ধির বলে সমাজের নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারে ততই সে এই নিয়ম খাটিয়ে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ প্রভুতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নিরাজ মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। সরকারের আসনে বসে প্রজ্ঞান তার আধিপত্য নিয়ে।

> "যে কোন সমাজে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব সেই সমাজের বিচারবুদ্ধির স্তরের বিপরীত অনুপাতে ওঠানামা করে।…ঠিক যেমন ন্যায়ের নিশ্চিত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার

১৩ কফেসিয়ঁ, ৬১ পৃষ্ঠা।

১৪ ইদে জেনেরাল, ২৮১ পৃষ্ঠা।

অধিকার পিছাইয়া যায় এবং অবশেষে সমাজসাম্যে বিলীন হয়, তেমনি মানুষের খেয়ালের রাজত্ব প্রজ্ঞানের রাজত্বকে পথ ছাড়িয়া দেয়।...মানুষ যেমন ন্যায়ের সন্ধান করে সাম্যে, সমাজ তেমন শৃঙ্খলা খোঁজে নৈরাজ্যে।"[১৫]

সমাজ শিশু অবস্থায় ছিল প্রভুনির্ভর, প্রাপ্ত বয়সে হবে আত্মনির্ভর। সকলের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হবার পরও কিছু সমাজবিরোধী লোক থাকতে পারে। তাদের শাসন করবে জনমত। আবার চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্যে নিয়ম মত শাস্তি পেতে হবে।

"চুক্তিবদ্ধ হইয়া তুমি স্বাধীন মানুষের সমাজের সভ্য হও। তোমার কিংবা তাহাদের যে কোনো পক্ষে চুক্তির খেলাপ হইলে সে অপরের কাছে দায়ী হইবে এবং এই দায়ের পরিণাম নির্বাসন ও মৃত্যুও হইতে পারে।"[১৬]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই লক্ষ্য—প্রভুসমাজের স্থানে নিরাজ সমাজের অবতারণা। সুন্দর একটি সংবিধান রচনা করে রাজশক্তি ও ব্যক্তি-অধিকারের মধ্যে গণ্ডি টেনে দেওয়া, রাষ্ট্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে রাষ্ট্রকৃত্য ভাগ করে দেওয়া, এ কাজ নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ রাষ্ট্র ও তার সমস্ত উপসর্গকে সমূলে উৎপাটন করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুক্তির বিজ্ঞান, শাসনবিজ্ঞান দাসত্বের বিজ্ঞান, তাকে যে নাম দিয়েই ঢাকবার চেষ্টা কর না কেন। "শাসনহীন শৃঙ্খলার মধ্যে সমাজের চরম বিকাশ।"

গডউইন অরণ্যে রোদন করে গিয়েছিলেন, প্রুদঁ বিফল সংগ্রামে শক্তিপাত করে গেলেন। রাষ্ট্রের বিশাল ইমারত থেকে একটি ইটের টুকরাও তিনি খসাতে পারেন নি। কালধর্ম ছিল তাঁর বিপক্ষে। সে যুগের প্রচণ্ড বিপ্লবী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম, জাতিবিদ্রোহ চমকলাগানো রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাত, এতে তাঁর কোনো নেশা ছিল না। অথচ সে যুগের আশা ভরসা এসবের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে। এদিক দিয়ে প্রুদঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। "অর্থ নৈতিক দ্বন্দ্ব", যে বইয়ের বিকল্প নাম দিয়েছিলেন তিনি "দারিদ্র্যের দর্শন" তাতে তিনি দারিদ্র্য সমস্যার

১৫ প্রপ্রিয়েতে ? ৫, ২২।
১৬ ইদে জেনেরাল, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

সমাধান করতে চেয়েছিলেন সমাজের ও উৎপাদনের দ্বান্দ্বিক শক্তিগুলির সামঞ্জস্য করে। এই তত্ত্বকথাটিকে তিনি বাস্তব আকার দিতে পারেন নি, আদর্শের অনুগামী প্রত্যক্ষ কর্মপদ্ধতি দিতে পারেন নি। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কার্ল মার্ক্স্ তাঁর পুস্তকের কঠোর সমালোচনা করলেন। প্রুদঁর "দর্শনের দারিদ্র্য" তার অমূল্য তত্ত্ব নিয়ে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেল, মার্ক্স্-এর "দারিদ্র্যের দর্শন" তার নিষ্ঠুর শ্লেষের ধারে স্মরণীয় হয়ে রইল।

মার্ক্স্-এর মত প্রুদঁ একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধনিকশ্রেণীর দিন ফুরিয়ে এসেছে। সংখ্যায়, কীর্তিতে, প্রতিভায়, সব দিক দিয়ে এরা ক্ষয়িষ্ণু। এ বিশ্বাস যে কত ভ্রান্ত তা পরবর্তী একশ বছর ধরে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প কী দ্রুতগতিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে, এই প্রগতির যারা বাহক তাদের সামনে যে কত সম্ভাবনা, গডউইনের মতো প্রুদঁও ছিলেন এ বিষয়ে অন্ধ। উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি দরদে তাঁদের বাস্তব দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সাম্যবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পজিটিভিস্ট্রা ঠিকই বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সমাজকে কেন্দ্রায়িত কর্তৃত্বের আওতায় নিয়ে যাচ্ছে। প্রুদঁর ভরসা ছিল উৎপাদকরা সম্মিলিত হলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করতে পারবে। কেমন করে আয়ত্ত করবে, কেমন করে উৎপাদনে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে, বলপ্রয়োগ ছাড়া কি উপায়ে মূলধন ও যন্ত্র তাদের হাতে আসবে এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কার্যকরী ধারণা ছিল না। শিল্পযুগের উৎপাদনে যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন তা যোগানো বিনিময় ব্যাঙ্ক বা সমবায় ব্যাঙ্কের সাধ্য ছিল না। প্রুদঁর যুগটা ছিল লড়াইয়ের যুগ, লড়াই না করে কোনো পাওনা আদায় হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রুদঁ লড়াইকে এড়িয়ে ভাবনার পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকতে চেয়েছিলেন। সঙ্কটের সময়ে বসে থাকলে তলিয়ে যেতে হয়। মধ্য উনিশ শতকের প্রচণ্ড রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝাপটায় প্রুদঁও তলিয়ে গেছেন।

গডউইন ও প্রুদঁর মূল্যবিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সমাজ নিষ্পাপ, রাষ্ট্র যত নষ্টের মূল। প্রুদঁ রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে সমাজকে আত্মনির্ভর করতে চেয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কাজ চালাবার জন্যে গণভোটে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আনতে চেয়েছেন। বণিক সংঘ যেমন গণতান্ত্রিক প্রথায় ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা এবং নিজেদের যৌথ কাজকর্ম চালিয়ে যায়, তেমন রাষ্ট্রকৃত্যও লোকায়ত্ত হয়ে স্বাধীন সংঘশক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে, তাতে

সরকারের দুর্নীতি ও নিপীড়ন বন্ধ হবে—এই ছিল তাঁর ধারণা। রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে এমন স্বশাসিত জনসংঘ সকল দেশে আছে, সর্বত্র জেলায় জেলাসভার নগরে পৌরসভার শাসন অল্পবিস্তর স্বায়ত্ত। সরকারী বিভাগে যে দুর্নীতি, অপচয় ও অত্যাচার চলে এদের মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এগুলো গণতান্ত্রিক সরকারের ছোট সংস্করণ। যে দেশে যেমন মানুষ সে দেশে তেমন সরকার, তেমন জনসংঘ, তেমন পৌরসভা। কাঠাম বদলালে মানুষ বদলায় না, প্রশাসনের সংস্কার হয় না। গডউইন ও প্রুদঁ উভয়ের বিশ্বাস ছিল যে বুদ্ধির বিকাশ হলে সব দোষ শুধরে যাবে। আঠার শতক ও আদি উনিশ শতক প্রজ্ঞানের যুগ। বুদ্ধির ওপর আদর্শবাদীর অসীম নির্ভরতা যুগধর্মের গুণ। বুদ্ধি দিয়ে যে চরিত্র তৈরী হয় না, স্বার্থ ও অধিকারের চেতনা জন্মালেই যে সহযোগবৃত্তি জেগে ওঠে না, বুদ্ধিসর্বস্ব দার্শনিকের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। গডউইন ও প্রুদঁ আদর্শ দিয়েছেন, পথ দেখাননি, প্রতিমা গড়েছেন তাতে প্রাণসঞ্চার করেননি। তাঁরা বোঝেননি যে মুক্ত শুদ্ধ সমাজগঠনের জন্যে বুদ্ধির অতিরিক্ত আরো কিছু মসলার দরকার।

আদর্শ সমাজবিন্যাস হিসাবে এনার্কি শব্দের প্রয়োগ প্রুদঁর কলমে প্রথম নয়, তাঁর আগে গডউইন এই শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। বরং প্রুদঁর এনার্কি একটু ফিকে, গডউইনের মত তিনি আইন ও আইনসভাকে একেবারে খারিজ করতে পারেননি। যে মনমাতানো বুলির জন্যে প্রুদঁ অমর হয়ে আছেন—"সম্পত্তি চোরাই মাল" তাও তাঁর মৌলিক নয়, তার মর্মার্থ পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া।[১৭] তথাপি নিঃসন্দেহে তিনি আধুনিক নৈরাজ্যবাদের জন্মদাতা। গডউইনের দায় বহন করবার মত দার্শনিক ইংল্যাণ্ড অথবা ইয়োরোপে ছিল না। তিনি তাঁর চিন্তাধারার বিস্তার করবার জন্যে কোনো শিষ্য গড়ে যাননি। প্রুদঁ এমন একজন লোককে দীক্ষিত করে গেলেন যাঁর কথায় এবং কাজে মানুষকে মাতিয়ে তুলবার শক্তি ছিল। ইনি উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বাকুনিন। মুক্ত নিরাজ সমাজ বহুধা বিস্তৃত ছোট ছোট গ্রামসভা ও পৌরসভার সন্নিবেশে গড়ে উঠবে, এই বীজমন্ত্র তিনি গ্রহণ করলেন। প্রুদঁর "বিপ্লবের মূল আদর্শ" থেকে তিনি পাতার পর পাতা তাঁর নিজের প্রচার

১৭ প্রুদঁর আগে ব্রিসো এবং তাঁর আগে এ ধরনের কথা বলে গেছেন নিউ টেস্টামেন্টে সেণ্ট জেম্‌স্ এবং জার্মানীর চাষীযুদ্ধের নেতা মুনৎসার।

পুস্তিকাগুলিতে আহরণ করেছেন। প্রুদঁর আদর্শ তিনি নিয়েছেন, তাঁর নির্ধারিত উপায় তিনি নেননি, শান্তিপূর্ণ নিরামিষ সংগ্রামে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের পাঠও বাকুনিন পেয়েছিলেন প্রুদঁ ও মার্ক্‌স্ থেকে। বাকুনিনের বন্ধু হারৎজেন তাঁর আত্মকথায় কার্ল ভগ্‌ট্-এর একটি গল্প উদ্ধৃত করেছেন। প্রুদঁ ও বাকুনিন হেগেলের ফেনোমেনলজি নিয়ে আলোচনায় বসেছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় দেখে ভগ্‌ট্ ক্লান্ত মনে বাড়ি চলে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি বাকুনিনের ঘরে এসে দেখেন চিম্‌নীর পোড়া ছাইগুলোর পাশে বসে দুই বন্ধু তাঁদের আলোচনা শেষ করছেন।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ প্রসঙ্গে মার্ক্‌স্‌ও প্রুদঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন ১৮৪৪ সালে পারীতে। আবার এই দ্বন্দ্ববাদ নিয়েই উভয়ের দ্বন্দ্ব শুরু হল। মার্ক্‌স্ বলতেন প্রুদঁ জার্মান জানতেন না তাই হেগেলের তত্ত্ব তিনি হজম করতে পারেননি। প্রুদঁকে তিনি পাতি বুর্জোয়া বলে গালাগালি দিলেন। মার্ক্‌স্-এর সমালোচনার নমুনা :

> "তিনি হইতে চান সমন্বয়, হইয়াছেন বিভ্রান্তির সমাবেশ। তিনি চান বৈজ্ঞানিক হইয়া বুর্জোয়া ও প্রলিতারিয়দের উর্ধ্বে উড়িতে, আসলে তিনি ধন ও শ্রম, অর্থনীতি ও সাম্যবাদ উভয়ের মাঝে অবিরাম দোদুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়া ("দর্শনের দারিদ্র্য")।"

কিন্তু মার্ক্‌স্ স্বীকার না করলেও ঐতিহাসিক প্রুদঁর প্রতি তাঁর দেনার হিসাব ভুলবেন না। যে বই নিয়ে তিনি নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করেছেন সে বইয়ের তত্ত্ব তিনি বেপরোয়াভাবে ধার করেছেন। অবাধ বাণিজ্যের নামে যে শ্রমিক শোষণ চলেছে, নিজের শ্রমমূল্য লাভ করবার অধিকার যে প্রত্যেকের থাকবে, আর শ্রমমূল্য যে হবে ন্যায্য বিনিময়ের হার এসকল হক কথা মার্ক্‌স্-এর আগে শুনিয়েছেন প্রুদঁ, যা "ক্যাপিট্যাল"এর পাতায় পাতায় বহু তথ্য সম্ভারে বিস্তারিত।

প্রুদঁর মৃত্যুর কিছু আগে পারীর ষাটজন শ্রমিক কর্মী প্রজাতন্ত্রী দল থেকে বেরিয়ে এসে একটা ইস্তাহার প্রচার করে। প্রুদঁ দেখলেন যে শ্রমিকশক্তি এতদিন বুর্জোয়া নেতৃত্বের পিছনে পিছনে চলেছে, এবার তাদের চৈতন্য হয়েছে, এবার দেখা দিয়েছে যথার্থ প্রলিতারিয় নেতৃত্ব। তাঁর শেষ গ্রন্থ "শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি" এদের লক্ষ্য করে লেখা। পারীর শ্রমিকদের সিদ্ধান্তকে তিনি 'উনিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে স্বাগত জানালেন।

"শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিদগ্ধ মনের অভাব নাই, এবং যথেষ্ট পরিমাণে আছে যাহারা নেতৃত্ব লইতে পারে···যে সব উকিল, সাংবাদিক, লেখক, চক্রান্তকারী ও সুবিধাবাদী এতদিন ইহাদের ভোট লইয়া আসিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা ইহারা বিশগুণ যোগ্য এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত।"[১৮]

শ্রমিক আন্দোলনের ওপর প্রুদঁর প্রভাব এই বই থেকে বর্তিয়েছে। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে ফরাসী শ্রমিক প্রতিনিধিরা সরকারী হস্তক্ষেপ ও প্রলিতারিয় একনায়কত্বের বিরোধিতা করল, বিনা সুদে ধার ও সমশ্রমমূল্যের হারে বিনিময় প্রথার দাবি পেশ করল। বাকুনিনের বহিষ্কারের পর আন্তর্জাতিক থেকে প্রুদঁর ভাবধারাও অপসৃত হল। শতাব্দীর শেষে যখন ফার্নাঁদ পেলুতিয়ে ও জর্জ সরেল শ্রমিকদের নিয়ে সিণ্ডিক্যালিজম-এর মতবাদ খাড়া করলেন এবং সমাজবাদীদের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করলেন তখন শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াদের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার কাজে তাঁরা প্রুদঁর যুক্তিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

৭। জার্মানী: ম্যাক্স্ স্টার্নার (১৮০৬-১৮৫৬)

প্রুদঁর সমসময়ে রাইন নদীর অপর পারে হেগেলের আর এক শিষ্য নৈরাজ্যবাদের দিগদর্শন রচনা করেছিলেন। আদিকাল থেকে নৈরাজ্যবাদীদের তথা বামপন্থী হেগেলীয়দের দর্শনের উপজীব্য ছিল মানবতা, সমাজপ্রতীতি। এই হেগেলীয় নৈরাজ্যবাদীর সুর তাদের সঙ্গে মিলল না। একলা পথের যাত্রী এই জাবালি কেবল ঈশ্বর ও রাষ্ট্রকে বাতিল করে ক্ষান্ত হলেন না। যাবতীয় সামাজিক নীতি বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে নেতি নেতি করে তিনি উপনীত হলেন এক নির্বিকল্প আত্মসর্বস্বতায়।

১৮০৬ সালের পঁচিশে অক্টোবর ব্যাভেরিয়ার বাইরয়েট শহরে জোহান কাস্পের স্মিট-এর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে হেগেলের অন্যান্য ভক্তদের মত তিনিও ধর্ম ও দর্শন নিয়ে মেতে উঠলেন। তখন তিনি বার্লিনের একটি মেয়ে স্কুলের শিক্ষক। ১৮৪৫ সালে তিনি লিখলেন একখানি চমক-লাগানো বই—"ডের আইন্‌টসিগে উন্ট্ জাইন আইগেনটুম," অর্থাৎ অহং ও তার

১৮ কাপাসিতে পলিতিক, ৮৭ পৃষ্ঠা।

নিজস্ব।[১] লেখক আত্মগোপন করলেন ম্যাক্স্ স্টার্নার এই ছদ্মনামে, এই নামেই অতঃপর তিনি পরিচিত হলেন। বইটি বিদগ্ধমহলে বোমার মত ফেটে পড়ল, কিন্তু বেশী কিছু ভাঙাচোরা করতে পারল না; পটকার মত আওয়াজ তুলে ধোঁয়া ছড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শতাব্দীর শেষে যখন নিরাজ চিন্তাধারার আদর বাড়তে লাগল সে সময়ে স্টার্নারের ভক্ত জার্মান কবি জন হেনরী ম্যাকে তাঁর জীবনী লিখলেন ও দর্শনের প্রচার করলেন। স্টার্নারের আরও গুটিকয়েক রচনা আছে, কিন্তু গডউইনের মত তাঁরও পরিচয় একখানি গ্রন্থে। অত্যন্ত অভাব ও দারিদ্র্যের ভেতর তাঁর জীবন কেটেছে। ১৮৫৬ সালে ছাব্বিশে জুন বার্লিনে চরম দুর্দশার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের ওপর যবনিকাপাত করেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানীর রাজ্যগুলি যখন গণতান্ত্রিক ও একতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে দোদুল্যমান তখন হেগেল লিখলেন তাঁর যুগান্তকারী "ফিলসফি অব রাইট" (১৮২০) এবং "ফিলসফি অব হিস্ট্রী" (১৮৩১)। তিনি বললেন রাষ্ট্র এক নির্বিকল্প চিৎসত্তা যাতে বুদ্ধিমান ও নীতিবান ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে এক হয়ে যায়। বিশ্বপ্রজ্ঞান মূর্ত হয়েছে রাষ্ট্রে। যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রজ্ঞানের অংশী রাষ্ট্রকে মান্য করে সে নিজেরই প্রজ্ঞানশীল সত্তাকে মান্য করে এবং যথার্থ মুক্তির স্বাদ পায়—যে মুক্তির আধার বিশ্ব-প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানের পরম বিকাশ হয়েছে প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রে, রাজা ও প্রজা সেখানে এক সমাজলক্ষ্যে একাত্ম হয়েছে—স্বভাব-আনুগত্যে প্রজা হয়েছে স্বাধীন মুক্ত। তর্কের যুক্তিজালে বোনা ন্যায়শাস্ত্রের উর্ননাভ হেগেলের মুক্তি বাস্তব জীবনের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে গ্রাস করে এল দানবীয় দুঃশাসন রাষ্ট্র।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সততা প্রমাণ করল তাঁর গুরুমারা শিষ্যের দল—বাম হেগেলীয়দের হাতে প্রজ্ঞানবাদের রূপান্তর হল বিপ্লববাদে। হেগেলের অভিধানে মুক্তি প্রজ্ঞানের আধেয়, প্রজ্ঞানের মতই আকাশস্থ বায়ুভূত। এরা শূন্যচারী মুক্তিকে নামিয়ে আনল মাটিতে, সমাজ রাষ্ট্র ধর্ম ইত্যাদি লৌকিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে। মানুষ সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, অজ্ঞানের বাঁধন ছিঁড়ে সে হবে প্রজ্ঞানশীল। কিন্তু এ মুক্তি একাগ্র রাষ্ট্রানুগত্য দ্বারা লভ্য নয়, এর জন্যে চাই সমাজনিষ্ঠ কর্মপরতা, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১ নামটার ঠিক বাংলা হয় না। "ব্যক্তি ও তার স্বত্ব" এমনও তর্জমা করা যায়।

এই দলের চিন্তানায়ক ছিলেন ফয়েরব্যাক, আর প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ব্রুনো বাউয়ার। এঁরা জনকয়েক বার্লিনের হিপেল রেস্তরাঁয় এসে আড্ডা জমাতেন—আড্ডার নাম ছিল 'ডি ফ্রাইয়েন' অর্থাৎ 'দি ফ্রী' বা যারা মুক্ত। এখানে মানবাত্মার মুক্তির পথে যত কিছু বাধা সমস্তের তীক্ষ্ণ সমালোচনা হত, চার্চ স্টেট কম্যুনিজম্ ক্যাপিট্যালিজম্ কিছু বাদ যেত না। ইস্কুলের মাস্টার মশায়টি নিয়মিত আড্ডায় হাজিরা দিতেন আর চুপচাপ এক কোণে বসে থাকতেন। তর্ক শুনতে শুনতে তাঁর মাথায় এক দুর্বুদ্ধি এল। তিনি স্থির করলেন এই ছিদ্রান্বেষীদের তত্ত্বে ছিদ্রসন্ধান করবেন, সমালোচকদের ওপর এক সর্বনাশা সমালোচনার মূষল হানবেন। এই মূষলই হল "ডের আইণ্টসিগে"।

'মুক্ত' তাত্ত্বিকরা ধর্ম রাষ্ট্র ও জাতীয়তাকে বাতিল করেছিলেন কারণ এগুলো মিথ্যার মায়াজাল ছড়িয়ে মানুষকে আবদ্ধ করে। এগুলির পরিবর্তে তাঁরা আনলেন সত্য প্রেম ন্যায় মানবতা ইত্যাদি আদর্শ। স্টার্নার বললেন এই গালভরা কথাগুলিও মিথ্যার মায়াজাল, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শিকল পরাবার কারসাজি। যারা মানুষের প্রেমে বিগলিত তারাই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, এ বিষয়ে ধর্মধ্বজী ও মানবতাবাদীর মধ্যে কোন তফাত নেই। স্টার্নারের ব্যাখ্যানে অগস্টিনের ঈশ্বর আর ফয়েরব্যাকের মানুষ উভয়ই সমান মিথ্যা ও স্বাধীন ব্যক্তির সমান শত্রু।

মানুষ মুক্তির পিয়াসী, কিন্তু এমনি পরিহাস যে সে মুক্তির নামে শিকল ছিঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিকল বরণ করে। এক স্বর্গ চূর্ণ করে সে আবার গড়ে নূতন স্বর্গ। গ্রীকদের স্বর্গ বিনাশ করেছে ইহুদীরা, ইহুদীদের স্বর্গ খ্রীষ্টানরা, খ্রীষ্টানদের স্বর্গ প্রোটেস্ট্যাণ্টরা। এক স্বর্গ যায় আর এক স্বর্গ আসে।

যে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ছিল দেবলোকে সে আজ মরলোকে নেমে এসেছে সত্যি, আজ তার সিংহাসন মানুষের বুকে। আজ সবার উপরে মানুষ সত্য। মানবপ্রেমিকের স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সত্য হতে চলেছে—মানুষ নাকি পেয়েছে মুক্তির দিশা।

বর্তমান যুগে মানুষের মুক্তি-আন্দোলন তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে—প্রথম রাষ্ট্রীয়, দ্বিতীয় সামাজিক, তৃতীয় মানবিক।

রাষ্ট্রীয় আন্দোলন মানুষকে মানুষের শাসন থেকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়েছে।

সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব, একের ওপর অন্যের অধিকার অন্যের রাজত্বের অবসান করেছে রাষ্ট্রীয় মুক্তি। প্রত্যেক নাগরিক অপরের হাত থেকে স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকে হয়েছে রাষ্ট্রের দাস। সে এই অর্থে স্বাধীন যে তার ও রাষ্ট্রের অন্তরালে কোন মধ্যস্থ নেই, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। একজনের ওপর অন্যজন হুকুম চালাতে পারে না, সকলের ওপর আছে একমাত্র আইনের হুকুম।

> "কিন্তু যদ্যপি সকলে আইনত সমান হইয়াছে তথাপি সকলের স্বত্ব সমান হয় নাই। দরিদ্রের প্রয়োজন ধনীকে, ধনীর প্রয়োজন দরিদ্রকে। দরিদ্রের দরকার ধনীর ধন, ধনীর দরকার দরিদ্রের শ্রম। কেহ কাহাকেও মানুষ হিসাবে চায় না, চায় দাতা হিসাবে,—মালিক বা অধিকারী হিসাবে, তাহার কিছু দিবার আছে বলিয়া। কাজেই যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া সে মানুষ। আর এই অধিকারগত বিষয়বস্তুতে মানুষ অসমান।
>
> সুতরাং সামাজিক মুক্তিবাদ সিদ্ধান্ত করে কাহারও কোন বস্তুতে অধিকার থাকিবে না, ঠিক যেমন রাষ্ট্রীয় মুক্তিবাদ বলে কেহ হুকুম চালাইতে পারিবে না। অর্থাৎ ইহাতে যেমন হুকুম করিবার ক্ষমতা বর্তায় কেবল রাষ্ট্রে, উহাতে তেমন বিত্ত ও শ্রমের অধিকারী হয় শুধু সমাজ।"[২]

এই প্রকারে ক্ষমতা ও বিত্ত হয় নৈর্ব্যক্তিক। রাষ্ট্র হয় হুজুর, সমাজ হয় মালিক।

> "সর্বময় প্রভুর নিকট, নির্বিকল্প আদেষ্টার নিকট আমরা সমান হই,—সমান ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যক্তিত্বহীন। সকল বিত্তের মালিকের কাছে আমরা সকলে হই ভ্যাগাবণ্ড। এখন একজনের কাছে আর একজন ভ্যাগাবণ্ড, নিঃস্ব। তখন পরস্পরের এই হিসাব চুকিয়া যায়। আমরা সকলে একসঙ্গে নিঃস্ব হইয়া যাই। কম্যুনিষ্ট সমাজে আবদ্ধ হইবার পর আমরা 'একদল ভ্যাগাবণ্ড' বলিয়া নিজেদের অভিহিত করিতে পারি।" (১৫৪)

---

২ ইগো এণ্ড হিস ওন, অনুবাদ এস. টি. বাইংটন ; নিউ ইয়র্ক, ১৯০৭, ১৫৩ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

বাকি বৈষম্যটুকু মুছে ফেলে মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করবার কাজ সমাধা করে মানবিক মুক্তিবাদ। সমাজবাদ সকলকে শ্রমদানে বাধ্য করেছে। সবাইকে খেটে খেতে হবে। কিন্তু অবসরটার কি হবে? সেটা কি যে যার খুশিমত ব্যয় করতে পারবে? নিজের স্বার্থে? মানবপ্রেমিক বলল তা নয়। অবসর নিবেদিত হবে মানবিক লক্ষ্যে। অবসর আরামের জন্যে নয়, পরার্থে উৎসর্গ করবার জন্য।

> "মানবতাবাদী যে বিশ্বসমাজের আশ্বাস দেয় তার সার্বজনীন নিয়ম এই যে কোন ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হইবে না। যাহাতে আছে কোন ব্যক্তিগত ছাপ তাহার কোন দাম থাকিবে না। এখানে যাহা কিছু মহত্ত্ব তাহা মানবতায়, যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহা ব্যক্তিত্বে। প্রথমটিতে আছে ঈশ্বর, দ্বিতীয়টিতে শয়তান। রাষ্ট্রে যেমন স্বাধীন নাগরিকের মূল্য হারাইয়া গিয়াছে, নিঃস্ব সমাজে যেমন বিত্ত ও শ্রমের মালিকানা ডুবিয়া গিয়াছে, তেমন বিশ্বমানবের সমাজে যাহার যাহা কিছু স্বকীয়তা বিশিষ্টতা তাহা মুছিয়া গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।...ইচ্ছা সমর্পিত হইয়াছিল রাষ্ট্রে, কিন্তু সমর্পিত হইয়াছিল সমাজে; এখন মত সমর্পিত হইল সাধারণ মানুষে, ব্যক্তিমত ডুবিয়া গেল সর্বগ্রাসী জনমতে।" (১৬৮-৬৯)

এই প্রকারে মুক্তির অভিযাত্রী একের পর এক বন্ধন বরণ করে। অবশেষে তার চারদিক ঘিরে থাকে এক নিশ্ছিদ্র চক্রাকার অবরোধ। মানুষের মুক্তি, জাতির মুক্তি মানে ব্যক্তির দাসত্ব। এথেনীয়রা তাদের স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে তাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল।[৩] অধীনতার শিকল ছেঁড়া যায়, মুক্তির শিকল ছেঁড়া যায় না।

> "রাষ্ট্রীয় মুক্তির অর্থ রাষ্ট্র মুক্ত, ধর্মীয় মুক্তির অর্থ ধর্ম মুক্ত, বিবেকের মুক্তির অর্থ বিবেক মুক্ত। ইহা দ্বারা বুঝায় না যে আমি রাষ্ট্র ধর্ম ও বিবেক হইতে মুক্ত। ইহার অর্থ আমার মুক্তি নয়, যে সকল শক্তি আমাকে শাসন ও দমন করিতেছে তাহাদের মুক্তি। ইহার অর্থ রাষ্ট্র ধর্ম বিবেক যাহারা আমার প্রভু তাহারা মুক্ত। রাষ্ট্র ধর্ম

---

৩ সক্রেটিস।

ও বিবেক এই প্রভুরা আমাকে দাস বানায়—যাহা তাহাদের মুক্তি তাহা আমার দাসত্ব।" (১৪০-৪১)

আসলে স্বাধীনতার নিজের কোন দাম নেই। নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার কাজে স্বাধীনতাকে খাটাতে পারলে তবেই তার দাম। যে মুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না তার বেলা মুক্তি একটি নিরর্থক অনুমতি। লোকে মুক্তি চায় নিজের জন্য, কখন বা সে স্বেচ্ছায় বন্ধনও বরণ করে। প্রেমিক ভালবাসার বন্ধনে বন্দী হয় তার প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্যে। মুক্তি বন্ধন উভয় কামনার উৎস যখন আমি স্বয়ং, তখন মুক্তিকে ছেড়ে আমার অহমিকার শরণ নিই না কেন?

"মুক্তির বাণী তোমাদিগকে শিখায় স্বাধীন হও, সকল বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হও। ইহা শিখায় না তুমি কে। মুক্ত! মুক্ত! এই আহ্বানবাণী শুনিয়া তুমি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছ আর স্বাধিকার হইতে মুক্ত হইতেছ, নিজ সত্তাকে বিসর্জন দিতেছ। আর আত্মবাদ তোমাকে ডাক দিতেছে নিজের কাছে, বলিতেছে 'আপনাতে ফিরিয়া এস।' মুক্তির দৌলতে তুমি অনেক কিছু হইতে মুক্ত হও আর এক নূতন পীড়ন তোমার উপর চাপিয়া বসে। · আপন মানুষ আজন্ম মুক্ত, তার শুরু হইতেই মুক্তি। আর মুক্ত মানুষ হইল স্বপ্নাবিষ্ট সম্মোহিত উৎসাহী যে মুক্তি খুঁজিয়া ফেরে।" (২১৫)

মুক্তি হাত পেতে পাওয়া যায় না, জোর করে নিতে হয়। তাহলেই মুক্তিকে নিজের কাজে লাগানো যায়। তখন মুক্ত মানুষ হয় আপন মানুষ—স্বপ্রতিষ্ঠ। জনমুক্তি একটা ফাঁকা কথা কারণ জনতার কোন জোর নেই। নীরো ও নেপোলিয়নের মত অহঙ্কারীর এক ফুৎকারে জনমুক্তি উড়ে যায়।

"মুক্তি পাওয়া মানুষ মুক্ত দাস বৈ কিছু নহে—একটা ছাড়া কুকুর যেমন শিকল টানিয়া টানিয়া চলে সেই প্রকার। সে স্বাধীনতার পোশাক পরা বন্দী, ঠিক যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভ।" (২২০)

ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ নৈতিক শাসনের আওতায় এসেছে। নাস্তিক প্রুধঁও এক চিরন্তন নৈতিক নিয়মের সন্ধানে হাতড়ে ফিরেছেন। ঈশ্বরের পবিত্র আসনে বসেছে সততা। ধর্মধ্বজী ও নীতিবাগীশ উভয়ে সমান উন্মাদ। একবিবাহ, অখণ্ড পরিবার, সন্তানবাৎসল্য অতি পবিত্র

প্রথা, আর ভ্রাতাভগ্নীর সঙ্গম পাশবিক, 'অবিবাহিতদের যৌনমিলন ব্যভিচার! যৌন দমন পরম ধর্ম! দেহের কামনাকে উপবাসী রেখে সতীত্ব জাহির করায় কি বা মহিমা! 'এক হাজার শুচিশুদ্ধা শুষ্কা কুমারীর চেয়ে একটি লাস্যময়ী রমণীকে কে না পছন্দ করে?' (৮০)

পুরাকালে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করত মানুষ, এখন করে নীতি ও বিশ্বাস। এ কর্তৃত্ব আরো কড়া। আগে ছিল রাজার প্রতি ভয়ভক্তি, এখন এসেছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র ও আইনের বনিয়াদকে কেউ ভাঙতে যায় না। পিতামাতার শাসন থেকে সন্তান মুক্ত হতে চেয়েছে, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে মুক্ত হতে সাহস করে না। নিয়ম ও প্রথাকে ভাঙা সহজ, নীতি ও সংস্কারকে ভাঙা সহজ নয়—আর এরাই নিয়ম ও প্রথার প্রাণ।

খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের জিম্মাদার ছিল চার্চ। রিফর্মেশনের পর এর জিম্মাদার হয়েছে ব্যক্তির বিবেক। সকল পীড়নের চেয়ে কঠোর বিবেকের পীড়ন। আর একে কেউ অমান্য করতে সাহস পায়নি।

> "প্রোটেস্ট্যাণ্টবাদ মানুষের উপর আনিয়াছে গোয়েন্দা পুলিসের শাসন। 'বিবেক' নামক গোয়েন্দা মনের যাবতীয় গতিবিধির উপর আড়ি পাতিয়া আছে। সকল চিন্তা ও কাজ বিবেকের এখ্‌তিয়ারে অর্থাৎ পুলিসি হেফাজতে। যে মানুষকে ছিঁড়িয়া স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বিবেকে দুই টুকরা করিতে পারিয়াছে সেই হইল প্রোটেস্ট্যাণ্ট।" (১১৫)

অথচ বিবেকের শাসনে পদে পদে অসঙ্গতি। খুন ও চুরি দূষণীয়। কিন্তু যে পরহিতে খুন ও চুরি করে লোকে তাকে ধিক্কার দেয় না। অথচ রাষ্ট্রের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সেখানে অন্যায় কাজ মানে বেআইনী কাজ আর ন্যায় মানে আনুগত্য। কাজেই দেখা যায় বদমাস লোকের মন্ত্রী হতে বাধা নেই আর সাধু ব্যক্তি সংবিধানের নিন্দা করলে তাকে জেল খাটতে হয়।

> "আমি ভালোমন্দের তফাৎ বুঝি না। কাকে বলে ভাল, কাকে বলে মন্দ? আমার ভাবনা আমাকে লইয়া, আর আমি ভালও নই, মন্দও নই। আমার কাছে কোনটারই অর্থ নাই।" (৬)

নীতিশাস্ত্রের বিধান—'মিথ্যা কথা বলিতে নাই।' স্বার্থবুদ্ধিও তাই বলে

কারণ মিথ্যাবাদী সকলের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, সে সত্যি কথা বললেও তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কাজেই নীতিহীন স্বার্থপর লোকও সাধারণত সত্য কথাই বলে। তা বলে সে যখন গুপ্তচর হয়ে শত্রুর শিবিরে ঢুকবে তখনও কি সে সত্যি কথা বলবে? অতএব কথা সত্য-মিথ্যার ধার ধারে না, ধার ধারে কথার মালিকের। যে সত্যের ভক্ত, সে নিজের শত্রু, তার মিথ্যা কথা বলবার মুরোদ নেই। কার্যত দেখা যায় সত্যের প্রতি অন্ধ ভক্তি কারও বড় একটা নেই, সকলেই আধা ভক্ত। তাই সাধারণভাবে মিথ্যা বলা আর শপথ নিয়ে মিথ্যা বলা দুয়ে গুরুতর পার্থক্য। সাধারণ মিথ্যা কথা ক্ষমা করা যায়, শপথের অবমাননা ক্ষমার অযোগ্য! শত্রু যদি গুপ্তচরকে ধরে শপথ নিতে বাধ্য করে তাহলে সে কি সব ফাঁস করে দেবে? সে কি শত্রুকে ধাপ্পা দেবে, না কাপুরুষের মত সত্যি কথা বলে প্রাণ দেবে?

নীতিশাস্ত্রের আর এক বিধান—'সবাইকে ভালবাসিবে'—পিতামাতাকে, দেশকে, স্বজাতিকে ও মানুষকে। ভালবাসতে হবে হুকুম মেনে। ভালবাসা পাত্রের পাওনা এবং বাসতে আমি বাধ্য। এ ভালবাসা তো আমার নয়, আমি দিই না, পাত্র আমার কাছ থেকে ভালবাসার খাজনা আদায় করে নেয়। আমি যাকে ভালবাসতে পারি না আমার ভালবাসা পাবার অধিকার তার কেমন করে আসতে পারে? একজনকে ভালবেসে তার সুখের জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি—সেও তো আমার সুখের জন্যে। সব দিয়ে মন ভরে যায়, প্রেমের এই আত্মনিবেদনেই আত্মতৃপ্তি। সর্বস্ব দিয়েও যা নিজস্ব তা থাকে। প্রেমিক যখন নিজেকে ভুলে যায় তখন সে বিকারগ্রস্ত। মানুষকে যে আমি ভালবাসি, সে ভালবেসে সুখ পাই বলে, নিঃস্বার্থভাবে কিংবা নীতির শাসন মেনে নয়।

> "যখন আমি নিজের স্বার্থ বুঝিয়া আত্মসচেতন হইয়া ভালবাসি, যখন আমি কর্তা পাত্র কর্ম, আমার ভালবাসার বিষয়—তখনই আমার ভালবাসা আমার নিজস্ব হয়। আমার বিষয়ের কাছে আমি কিছু ধারি না, ইহার প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই; ঠিক যেমন আমার চোখের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই। তাহা সত্ত্বেও আমি যে খুব সাবধানে ইহাকে রক্ষা করি সে আমার নিজের জন্য।" (৩৯০)

সত্যের জন্যে কেন প্রাণ দেব? ন্যায়ের জন্যে কেন সব বিসর্জন দেব?

কেন তামিল করব ভালবাসার হুকুম? 'সত্য ন্যায় ও ভালবাসার জন্যে আমি, না আমার জন্যে সত্য ন্যায় ও ভালবাসা? আমার চেয়ে বেশী দাম আমি কাকেও দিই না।

> "দৈব বস্তু দেবতার এখ্‌তিয়ার, মানবিক জিনিস মানুষের এখ্‌তিয়ার। আমার মাথাব্যথা দৈব কিংবা মানবিক বিষয় লইয়া নয়, আমার মাথাব্যথা অতি সহজ সরল আমাকে লইয়া। এবং এই আমি একটি সাধারণ সত্তা নই। আমি সকল হইতে স্বতন্ত্র—যাহা আমার তাহাও স্বতন্ত্র।" (৬)

শুধু নীতিশাস্ত্র নয়, পণ্ডিতরা চিন্তাভাবনাকেও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। দার্শনিক দেকার্ত বলেছেন—'আমি ভাবি তাই আমি আছি।' আমার ভাবনায় আমার অস্তিত্ব। আমি কেবল ভাবুক মন—আমার দেহটা কিছু নয়। প্রকৃতির বেলাও তাই। সেখানেও এক শাশ্বত নিয়ম বা প্রজ্ঞান পরম সত্তা। ভাবনার জন্ম হয়েছিল ব্যক্তি ও তার বস্তুবোধ থেকে, এখন ভাবনাই হল আধার, ব্যক্তি ও বস্তু হল আধেয়। হেগেলের দর্শনে পরম প্রজ্ঞান স্বৈরশাসনের শিখরে আরোহণ করিল, চিৎশক্তি হল সর্বগ্রাসী, ঐশ্বরিক ভাবনায় বিলীন হল ব্যক্তি ও বস্তু।

কি তাজ্জব কথা! সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু নির্বোধ দৈনন্দিন ঘটনা ও আচরণগুলি অতিমাত্রায় বাস্তব।

> "ঠিক এই জন্য তাহাকে দার্শনিক বলা চলে না, যাহার চক্ষু পার্থিব বস্তুর প্রতি সদা উন্মুক্ত, যাহার দৃষ্টি অবাধ পরিচ্ছন্ন, দুনিয়া সম্বন্ধে যাহার বিচার অভ্রান্ত, যে দুনিয়াকে দুনিয়া বলিয়াই, বিষয়কে বিষয় বলিয়াই জানে, এক কথায় যে সব জিনিসকে দেখে নেহাৎ গদ্যময় ভাবে। দার্শনিক বলা যায় তাহাকে যে পৃথিবীতে দেখে ও দেখায় স্বর্গ, লৌকিকে অলৌকিক, ভৌতিকে দৈব। প্রথম জনের আছে কেবল ইতর চেতনা, আর যে দৈবকে জানে এবং দৈবের কথা বলিতে পারে তাহার চেতনা বৈজ্ঞানিক। এই কারণে বেকনকে দার্শনিক জগত হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল।" (১১১)

দার্শনিকরা বস্তুজগতকে উল্‌টিয়ে করেছে ভাবজগত। হৃদয়ের ভাব প্রেম, হৃদয়ে প্রেম থাকুক আর না থাকুক। চিন্তার ভাব সত্য, তা চিন্তা যতই কেন না বিভ্রান্ত হোক।

সম্প্রতি অচল চিন্তা ও সচল চিন্তার মধ্যে তফাত বের করার রেওয়াজ হয়েছে। আসলে তফাত কিছু নেই। উভয়েই সত্যের পূজারী। স্থির বোদ্ধা সত্যকে আঁকড়ে থাকে, অস্থির সন্ধানী সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। সত্য মাত্রই স্থাণু। সত্যার্থীর সচল চিন্তা এই অচলায়তনে বন্দী হবার জন্যে ছুটে চলেছে। সে মনে করে তার চিন্তা সকল সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিচারী। যদি থাকে কারও এমন মুক্ত বুদ্ধিসর্বস্ব চিন্তা তা হলে সে চিন্তার দাস। আমি চিন্তার নই, চিন্তা আমার। চিন্তা ব্যক্তির কর্ম। আমি ভাবনায় ডুবে থাকতে পারি, নির্ভাবনায় বসে থাকতেও পারি। একে মুক্ত চিন্তা বলে না, বলে আমার চিন্তা। ভাবনার আরম্ভ চিন্তাকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে, এর লক্ষ্যও চিন্তা নয়, লক্ষ্য আমি, আমার খেয়াল, খুশি। চিন্তা আমার কাজ, আমার অধীন—যা আমি পেতে চাই তা আমি চিন্তা করি।

> "আলাদা করিয়া দেখিতে গেলে সকল সত্যই মৃত, শব। যে হিসাবে আমার ফুসফুস জীবিত সে হিসাবে সত্য জীবিত। ফুসফুসের জীবন নিরূপিত হয় আমার জীবনীশক্তি দিয়া, তেমন সত্যেরও। সত্য সব্জি ও আগাছার মত বস্তু, সব্জি না আগাছা সে বিচার আমার।··· সত্যের সেবা করা আদৌ আমার ইচ্ছা নয়। আমার কাছে সত্য শুধু আমার ভাবুক মস্তিষ্কের খাদ্য, যেমন আমার পাকস্থলীর খাদ্য আলু অথবা আমার সামাজিক হৃদয়ের খাদ্য এক বন্ধু।" (৪৭৩)

ফরাসী বিপ্লবের আগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীর প্রজা। অভিজাত, যাজক, কারিগর ইত্যাদি সকলে ছিল যে যার গোষ্ঠীর অধীন, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল গোষ্ঠীর মারফত। গোষ্ঠীগুলি মর্যাদা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর তৃতীয় শ্রেণী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌলীন্য নষ্ট করে দিল, সব মিলে হল এক জাতি, জাতির নির্বিকল্প প্রভু হল জাতীয় রাষ্ট্র। গোষ্ঠীর মধ্যস্থতা রইল না, ব্যক্তি হল রাষ্ট্রের নাগরিক। তার কোন বৈশিষ্ট্য থাকল না, তার ব্যক্তিত্ব ডুবে গেল রাষ্ট্রের সার্বিকতায়। সকলের সমান অধিকার—তার মানে কারও স্বাতন্ত্র্য নেই। সকলে রাষ্ট্রের বশংবদ। তফাত এই যে আগে সে ছিল ব্যক্তির তাঁবেদার, এখন সে হয়েছে আইনের তাঁবেদার। ব্যক্তি মুক্ত হল না, মুক্ত হল নাগরিক, মানবজাতির অন্যতম একজন মানব।

যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষণ রাষ্ট্র আছে আইন না থাকলে রাষ্ট্রও নেই। আর লোকে মানলেই আইন আছে, না মানলে নেই। যার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে সে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় আইনের তোয়াক্কা করে না। সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি যাতে কারও কোন স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে। কোথাও তিলমাত্র স্বাধীন চিন্তার বা ইচ্ছার আভাস পেলে সে খড়্গহস্ত। উদারনীতি ও সহনশীলতা রাষ্ট্রের স্বভাববিরুদ্ধ।

> "রাষ্ট্র মাত্রই স্বৈরাচারী—তা শাসক একজন অনেকে কিংবা সকলে যাই হোক না কেন। একে অন্যের উপর স্বেচ্ছাচার চালায়। যখন জনপরিষদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া আইনের রূপ নেয় এবং সেই আইন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তি সেই আইন মানিতে বাধ্য হয়, তখনও তাহা একের উপর অপরের স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়ায়। যদি এমনও ধরা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তি একই ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছে এবং এক সম্মিলিত অভিপ্রায় আইনে মূর্তি পাইয়াছে তাহা হইলেও ব্যাপারটা একই রকম দাঁড়ায়। ইহাতে আমি কি আজ গতকালের ইচ্ছা দ্বারা আবদ্ধ হই না? আমার ইচ্ছা জমিয়া স্থির হইয়া যাইবে। আমার এক মুহূর্তের অভীপ্সা, যাহা আমার সৃষ্টি, সে হইবে আমার আদেষ্টা।...আমি যদি গতকাল নির্বোধ হইয়া থাকি তবে সারা জীবন আমাকে তাহাই থাকিতে হইবে।" (২৫৬-৫৭)

কোন সার্বজনীন আদর্শের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিকে দমন করা, বশ করা, পোষ মানানো, এ ছাড়া রাষ্ট্রের আর কোন লক্ষ্য নেই। তার পরমত সহিষ্ণুতা শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ পরমত তার পক্ষে নিরাপদ। পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে মানুষের ওপর কোন বন্ধন টিকে থাকে না, বাঁধন ছেঁড়া উচ্ছৃঙ্খল তার স্বভাব। তবুও মানুষ বারবার উদ্ভাবন করে নূতন বন্ধন, মনে করে একটি মুক্ত সংবিধান বা গণতান্ত্রিক কাঠাম গ্রহণ করে সে ঠিক বন্ধনটিকে বরণ করেছে। আদর্শবাদীর মস্ত বড় আশা প্রজাতন্ত্রে কোন সরকারী শাসন থাকবে না, থাকবে কেবল কার্যকরী ক্ষমতা যা জনতার হাত থেকে পাওয়া এবং জনতার অধীন। হায় অন্ধ বিশ্বাস! জনতার ভিতর থেকে উদ্ভূত হলেই কি ক্ষমতা জনতার বশীভূত থাকে? মায়ের নাড়িছেঁড়া শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরও কি থাকে মায়ের জিনিস?

মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গড়েনি। রাষ্ট্র আছে আপনার জোরে। সে চায় আমি তার নৈতিক শাসন মানবো, অপরের প্রতি আমার কর্তব্য সে স্থির করে দেবে। সে সমাজের অভিভাবক, সমাজকে আমি কি দেব না দেব সে বিচার তার।

> "আমি আত্মম্ভরি, আমার অন্তরে মানবসমাজের হিত চিন্তা নাই। আমি ইহার জন্য কোন ত্যাগস্বীকার করি না, বরং ইহাকে আমার কাজে লাগাই। আর ইহাকে কাজে লাগাইতে হইলে নিজের খুশিমত গড়িয়া লই, আমার বিষয়ে পরিণত করি। অর্থাৎ ইহাকে আমি ধ্বংস করিয়া ইহার জায়গায় একটি আত্মপরদের সম্মিলন গঠন করি।" (২৩৪)

এ কাজ অসম্ভব নয়। যদি আমি কোন দায় গ্রহণ না করি, কোন আইন স্বীকার না করি, কোন বন্ধনে আত্মসমর্পণ না করি, তা হলে কোথায় থাকবে রাষ্ট্র, কোথায় থাকবে সমাজ? আমি অপরাধী হব। আইন ও অপরাধের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রাষ্ট্রের জবরদস্তির নাম আইন, ব্যক্তির জবরদস্তির নাম অপরাধ। রাষ্ট্রের জবরদস্তিকে উৎখাত করতে হলে অপরাধ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তুমি যখন বল আমি দোষী তখন ধরে নাও তোমার দোষগুণের বিচার নিয়ে আমাকে চলতে হবে। অর্থাৎ সকলের হবে এক লক্ষ্য, এক নৈতিক মান। কোন লক্ষ্য ও মানকে অভ্রান্ত পবিত্র বলে ধরে নিলেই তবে তার ব্যতিক্রম হয় অপরাধ, আর আমি কোন কিছুকে অভ্রান্ত পবিত্র বলে মনে করি না। একজনের বিরুদ্ধে আর একজন বিপক্ষ হতে পারে, অপরাধী নয়। ভাবনা জরাগ্রস্ত হলে আসে অপরাধের ধারণা। মানুষের ভাবনা স্থবির হয়ে গুটিকয়েক অনড় সত্যের অচলায়তনে বসে অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায়।

> "চার্চের ছিল মারাত্মক পাপ, রাষ্ট্রের আছে প্রাণান্তক অপরাধ। চার্চের ছিল ধর্মদ্রোহী, রাষ্ট্রের আছে দেশদ্রোহী। চার্চের ছিল প্রায়শ্চিত্ত, রাষ্ট্রের আছে শাস্তি। এক কথায় ওখানে পাপ এখানে অপরাধ, ওখানে পাপী এখানে অপরাধী। চার্চের পবিত্রতার মত রাষ্ট্রের পবিত্রতারও কি অবসান হবে না?" (৩১৫)

হেগেলের দর্শনে সমাজ জৈবধর্মী। তার দেহ আছে, প্রাণ আছে, চিন্তা-ভাবনা আছে। সমাজের ভাবনা যুগমানস, তা থেকে উত্থিত হয় ব্যক্তির ভাবনা। সমাজচেতনার পরিবেশে লালিত হয় ব্যক্তির চেতনা। বাম

হেগেলীয়রা এ তত্ত্ব অস্বীকার করেনি। কিন্তু কোথায় এ সমাজদেহ আর কোথায়ই বা সমাজচেতনা? আমার নিজের মাথায় ছাড়া আমি তো আর কোথাও কোন চেতনা খুঁজে পাই না। এর ওর তার একটি করে দেহ আছে, ভাবনা আছে, সব মিলে আছে এক গোছা দেহ আর অজস্র ভাবনা, সমাজদেহ ও সমাজমানসের হদিস কোথাও মেলে না। সমাজ জিনিসটাই একটা ধোঁয়াটে কল্পনা যা ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

> "বর,ভয়দাতা এই সমাজ আর এক ভৌতিক মায়া, এক নূতন প্রভু, নূতন 'পরম সত্তা', যাহা আমাদিগকে দিয়া দাসত্ব করাইতেছে, আমাদের আনুগত্য লইতেছে।" (১৬২)

সমাজ আমাকে কিছু দেয় না, দিতে পারে না। সমাজ আছে আমার কাজ আদায়ের জন্যে, আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। আমার যা কিছু বলিদান তা সমাজের কাছে নয়, আমার কাছে, আমার জন্যে। সমাজবাদীরা সমাজকে মনে করে পবিত্র। ধর্মান্ধদের ন্যায় এরাও অন্ধ বিশ্বাসের দাস।

মানবতাবাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়ে করেছে মানবজাতি। এতে ব্যক্তির দাসত্ব আরো কঠোর হয়েছে। রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের চেয়ে বিশ্ব প্রেমিকদের শাসন একটুও শিথিল নয়।

ফয়েরব্যাক বলছেন 'মানুষের কাছে মানুষই পরম সত্তা'। আর ব্রুনো বাউয়ারের বচন 'মানুষ সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।' এই পরম আবিষ্কারটি কি? না—ঐশ্বরিক মানুষ। ধর্মশাস্ত্র বলেছিল ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ফয়েরব্যাক বলছেন মানব ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে, মানুষ ঐশ্বরিক গুণ, ঐশ্বর্য অর্জন করেছে। আগে বলা হত ঈশ্বর প্রেম, এখন বলা হল প্রেম ঐশ্বরিক। অর্থ এক, শুধু শব্দের হেরফের।

ফয়েরব্যাক যখন বলেন মানুষের সত্তা দৈব, ঐশ্বরিক, তখন তিনি মানুষকে সত্তা ও অসত্তায়, সার ও অসারে ভাগ করেন। আমি যতটুকু রক্তমাংসের মানুষ ততটুকু আমি অসার। তা থেকে আমার সারবস্তু দৈবসত্তা বিচ্ছিন্ন।

> "আমি ঈশ্বর নই মানবও নই, পরম সত্তা নই আমার সত্তাও নই। সুতরাং এই সত্তাকে আমি নিজের ভিতরেই দেখি আর বাহিরেই দেখি তাহাতে কিছু আসে যায় না।... ফয়েরব্যাক যদি এভাবে সত্তার স্বর্গীয় ঘরবাড়িগুলি ভাঙিতে থাকেন আর তাহাদের তল্পিতল্পা

সহ আমাদের ঘাড়ের উপর চালান দেন তবে এই ভঙ্গুর দেহগুলি যে ভিড়ের চাপে মারা পড়িবে।" ৪১-৪২)

বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিকদের হাতে আজ ঈশ্বর ধরাশায়ী হয়েছে, কিন্তু মানুষ উঠেছে আকাশে, আরম্ভ হয়েছে মানব-পূজন।

"আমাদের বহির্ভূত স্বর্গলোককে অপসারণ করিয়া বিপ্লবযুগের প্রজ্ঞানীরা তাহাদের কাজ সমাধা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের অন্তর্গত পরলোক এক নূতন স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার স্বর্গ ভাঙিবার ডাক আসিতেছে। ঈশ্বরকে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়—মানুষের, মানবতার কাছে।" ২০২)

ব্যক্তি থেকে তার কয়েকটি স্বভাব ও গুণকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় মানুষ। মানবতাবাদী আমাকে দেখে না, দেখে আমার কয়েকটি গুণকে ও ভাবকে। খ্রীষ্টানদের মত সেও দেহধারী জীবন্ত মানুষকে অবজ্ঞা করে। খ্রীষ্টান আমাকে বাদ দিয়ে দেখে আমার আত্মা, সে আমাকে বাদ দিয়ে দেখে আমার মানবতা।

"মানবতার ধর্ম খ্রীষ্টান ধর্মের সর্বশেষ রূপান্তর। মানবতাবাদ এক ধর্ম, কারণ ইহা আমার সত্তাকে আমা হইতে পৃথক করিয়া আমার উপরে বসায়। অপর ধর্ম যেমন ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বিগ্রহকে আকাশে উঠায় ইহা মানুষকে তেমন মহা উচ্চে স্থাপন করে, যাহা আমার গুণ ও ভাব তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্তা নাম দিয়া আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করায়।…মানবতাবাদ বিশ্বাসে ধর্ম, কাজেও ধর্ম। কারণ, ধার্মিকদের মত ইহাও পরম সত্তা মানুষের নামে গোঁড়ামির আকাঙ্ক্ষী। ইহা বলে 'মানবতার বিশ্বাস একদিন তাহার জ্বলন্ত আবেগ লইয়া দেখা দিবে, যে আবেগকে দমন করিবার সাধ্য কাহারও হইবে না'।"[৪] (২২৯)

এই হল মানুষ, আমাদের সত্তা, আমাদের প্রভু পরম ও পবিত্র।

"মানুষ হইল শেষ অশুভ প্রেতাত্মা, আমাদের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, তাই সর্বাপেক্ষা ছলনাময়, ভদ্রবেশধারী পরম ধূর্ত মিথ্যুক, মিথ্যাবাদের জন্মদাতা পিতা।" (২৪০)

৪ ব্রুনো বাউয়ারের জুডেনফ্রাজ, ৬১ পৃষ্ঠা।

পুরাকালে ঐশ্বরিক বিচার ছিল মানুষের বিচারের ওপরে, এখন মানুষের বিচার এসেছে ব্যক্তির বিচারের ওপরে। মানবিক বিচার বিদ্যা, ব্যক্তির বিচার অবিদ্যা। অথচ এই অবিদ্যাই বাস্তব, কারণ তুমি আমি বাস্তব, তোমার আমার বিচারবুদ্ধিই বাস্তব। এর বাইরে কিছু নেই, কোন বিচারবুদ্ধিও নেই।

কে ভাঙবে এই মায়াপুরী, আত্মার সাম্রাজ্য? তুমি, আমি, অহঙ্কারী ব্যক্তি।

> "বেদী ঘিরিয়া গির্জার খিলান উঠিয়াছে, ইহার প্রাচীর ক্রমশ বাহির দিকে বিস্তারমান। প্রাচীর ঘিরিয়া আছে পূত বিগ্রহকে। তুমি উহার কাছে যাইতে পারিবে না, উহাকে ছুঁইতে পারিবে না। ক্ষুধার পীড়নে চিৎকার করিয়া তুমি সামান্য একটু অশুচি কণার জন্য প্রাচীরের চারিধারে ছুটিয়া বেড়াইতেছ আর তোমার পরিক্রমা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। অবিলম্বে গির্জার দেওয়াল সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিবে আর তুমি বিতাড়িত হইবে শেষ প্রান্তে। আর একপদ অগ্রসর হইলেই পবিত্র গির্জার জয়, আর তোমার রসাতলে পতন। সুতরাং সময় থাকিতে সাহসে ভর করিয়া লম্ফ দাও, প্রাচীর ডিঙাইয়া বেদীমূলে হানা দাও। যদি শুষ্ক কদন্নের আশা ছাড়িয়া দিয়া নৈবেদ্যের পরমান্ন গ্রাস করিতে পার, তাহা হইলে সকল পবিত্র বস্তু তোমার হইবে। ঐ যজ্ঞের হবি পান করিয়া হজম কর তবেই তুমি ঐ পুণ্যগ্রহ হইতে মুক্ত হইবে।" (১২৬-২৭)

তবে কি সামাজিক জীবন বলে কিছু থাকবে না? প্রেম সখ্য সৌভ্রাত্র সব লোপ পাবে? কখনই না। আমি অন্যকে চাই, তাই খুঁজবো বন্ধু, সহচর, সখা। আমি নির্বিকল্প মানুষকে চাই না, চাই ব্যক্তিকে,—একে ওকে তাকে, আমার নিজের দরকারে, আমার কাজ হাসিল করতে।

> "আমি দেখিতে পাই লবণ আমার খাদ্য সুস্বাদু করে তাই ইহা আহার্যে গুলিয়া ফেলি। মাছে আমি রুচি পাই তাই ইহা খাই। তেমনি তোমার মধ্যে আমি এমন কিছু খুঁজিয়া পাইয়াছি যাহা আমার ভাল লাগে, কাজেই তোমাকে আমার সখাত্বে নির্বাচন করিয়াছি।…আমার যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়া আমার কাছে তোমার পরিচয়। তুমি আমার বিষয়, আমার পাত্র এবং তাই আমার সম্পত্তি।" (১৮৩)

এই প্রকারে আত্মপর আত্মপরের সঙ্গ মিলবে যার যার নিজের তাগিদে। সাবালক হবার আগে পুত্র পিতার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, সে পরিবারের অধীন। সাবালক হবার পরে পুত্র স্বাধীন হয় এবং নূতন করে পিতাপুত্রের সম্পর্ক রচিত হয়। পুত্র পুত্রই থাকে পিতা পিতাই থাকে কিন্তু পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব আর তাদের সবটুকু পরিচয় নয়।

ঈশ্বরের ও রাষ্ট্রের বন্দনা আর মানবতা ও মুক্তির কীর্তন উভয়ই মোহগ্রস্ত মনের বাতিক। সত্য, ন্যায়, প্রেম ইত্যাদি ধর্ম যার ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে বলে আমরা মনে করি আসলে সেগুলি বিকারগ্রস্ত মনের উদ্ভট অলীক কল্পনা। আমরা পাগলা গারদের উন্মাদ, নিজের কল্পিত ছায়ামূর্তিগুলিকে নিজের মাথার ওপরে বসিয়ে ভক্তিভরে পূজো করছি—স্বপ্নলোকে বাস করছি আর স্বপ্নদেবতার ভজন করছি।

> "হে মানব! তোমার মাথায় ভূতের নৃত্য চলিয়াছে। তোমার মাথায় ঘুরিতেছে চাকার পর চাকা। কত মহান বস্তু তুমি কল্পনা করিয়াছ, কত রাজ্যের দেবতা আনিয়া হাজির করিয়াছ—এই ভৌতিক জগত তোমাকে ডাক দিতেছে, ইহার মায়া তোমাকে ইশারা করিতেছে। তোমার মাথায় এক বাতিক বদ্ধমূল হইয়াছে।" (৫৪-৫৫)

সিন্ধবাদের ঘাড়ের ওপর দৈত্য চেপে বসেছে, তাকে ঝেড়ে না ফেললে নিস্তার নেই। যখন মানুষ আত্মিক ধারণাগুলিকে ভূমিসাৎ করে নিজের সহজ ইচ্ছায় ফিরে আসবে তখন সে হবে সার্থক। এতদিন সে যার পরিচর্যা করেছে, তখন সে হবে তার পরিচারক।

ভৌতিক সমাজে অধিকার ভিক্ষার দান। সদ্যোজাত শিশুকে যদি বাঁচতে দাও তবে তার বাঁচবার অধিকার আছে, নচেৎ নেই। স্পার্টানরা তাদের শিশুদের এ অধিকারও দিত না, তাই তাদের জীবনের অধিকার ছিল না। অনুগ্রহের দেওয়া অধিকার এক জিনিস, কেড়ে নেওয়া অধিকার অন্য জিনিস। শিশুদের জোর নেই, তাই অধিকার নেই, যে সব জাতি শৈশব অবস্থায় আছে তাদের অধিকারও শিশুর অধিকারের সামিল। শুধু ছাড়পত্র পেলেই অধিকার জন্মায় না, অধিকার খাটাবার মত জোর থাকা চাই।

> "যাহা করিবার তোমার ক্ষমতা আছে তাহা করিবার তোমার অধিকার আছে। আমার সকল অধিকার ও সমর্থন নিজের কাছ

হইতে পাওয়া। যাহা কিছু লইবার এবং করিবার আমার ক্ষমতা আছে আমি তাহারই অধিকারী। যদি আমি, জিউস, জিহোবা অথবা ঈশ্বরকে উৎখাত করিতে পারি তবে সে অধিকার আমার আছে। আর যদি তাহা না পারি তাহা হইলে সর্বদা আমার উপর এই দেবতাদের অধিকার ও ক্ষমতা থাকিবে। আমি অক্ষম বিস্ময়ে তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতার দিকে তাকাইয়া থাকিব, তাহাদের হুকুম তামিল করিব, তাহাদের অধিকার অনুসারে কাজ করিয়া মনে করিব ঠিক করিতেছি—যেমন রুশ সীমান্তরক্ষী পলায়মান ব্যক্তিকে সন্দেহবশে গুলি করিয়া মনে করে সে ঠিক কাজ করিয়াছে, কারণ সে হত্যা করিয়াছে উপরওলার হুকুমে আইনমাফিক। কিন্তু আমি যদি স্বেচ্ছায় হত্যা করি, স্বেচ্ছায় আত্মসম্বরণ না করিয়া, হত্যা অন্যায় এই সংস্কারের ভয়ে নিবৃত্ত না হইয়া, তাহা হইলে সে হত্যায় আমি অধিকারী। যদি আমার কাছে কাজটা ঠিক মনে হয় তবে ইহা ঠিক। হইতে পারে অপরের কাছে কাজটা ঠিক মনে হইবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নয়। সে ভাবনা তাহাদের আমার নয়। তাহারা সাধ্যমত আত্মরক্ষা করুক।" (২৪৭-৪৮)

জন্মগত অধিকার কথাটা খুব চলতি। এটা কি বস্তু? রাজকুমারের সিংহাসনে জন্মগত অধিকার, শ্রমিকের পুত্রের কয়লাখাদে খাটিবার জন্মগত অধিকার, ভিক্ষুক সন্তানের ভিক্ষা করিবার জন্মগত অধিকার আছে বটে। আবার এমন ছেলেও আছে যারা এসব পৈত্রিক অধিকারকে স্বীকার করে না, যারা নিজের অধিকার নিজ হাতে গড়ে। তুমি নিজের জন্মগত অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যতই চিৎকার কর না কেন, এরা এদের অর্জিত অধিকার নিয়ে তোমার ওপর হামলা করবে। যখন বাহুবল এসে অধিকারকে গিলে ফেলে তখন তার কোন চিহ্ন থাকে না।

অধিকার স্থির হয় যার যার আগ্রহ ও ক্ষমতার মাপে। জন্মাধিকার, প্রকৃতিদত্ত অধিকার, সার্বজনীন অধিকার এ-সব ভৌতিক মায়া।

বিত্তাধিকারও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। জোর যার মুলুক তার—অধিকার ও বিত্ত কোন ছার। আমি যে সম্পত্তি দখল করতে পারি সে সম্পত্তির আমি অধিকারী। গরীবদের কি হবে? তারা কি বিত্তের ভাগ পাবে না? তারা আত্মম্ভরিতা হারিয়েছে, নিজের দাম ভুলে গেছে তাই

তাদের দুঃখ ঘোচে না। প্রেম বিলিয়ে, জবরদস্তি ধনবণ্টন করে ধনবৈষম্য যাবে না।

"সকলের বিরুদ্ধে সকলে লড়াই করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবে। দরিদ্ররা মুক্ত ও বিত্তবান হইবে বিদ্রোহ করিয়া।" (৩৪৩-৪৪)

সম্পত্তি প্রথা রদ করা যায় না। ভূতের হাত থেকে সম্পত্তি কেড়ে আপনার করে নিতে হয়। যে আত্মম্ভরি সে সম্পত্তিকে মান্য করে না,—তা ব্যক্তির হোক আর সার্বজনীন হোক। যৌথবিত্ত থেকে আমাকে এক টুকরা ভাগ দেবে আর তাই নিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এ আমার স্বভাব নয়। আত্মম্ভরি দরিদ্রকে বলে না যতদিন না এক অভিভাবক সমিতি বসে সমাজের নামে তোমাদের কিছু খয়রাত করে ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর; বরং বলে যা তোমার চাই তা নিয়ে বসে থাক।

"কম্যুনিস্টরা বলে ন্যায়ত জমি তাহার যে জমি চাষ করে, ফলন তাহার যে ফসল ফলায়। আমি বলি জমি তাহার যে জানে কেমন করিয়া ইহা লইতে হয়, অথবা যে দখলী জমি হাতছাড়া হইতে দেয় না এবং কাহাকেও কাড়িয়া লইতে দেয় না। যদি সে জমি দখল করিয়া বসে তাহা হইলে শুধু জমি তাহার নয় জমির উপর অধিকারও তাহারই এই হইল আত্মপরের অধিকার; অর্থাৎ ইহা আমার পক্ষে ভাল কাজেই ইহা আমার ন্যায্য অধিকার।" (১৪৯-৫০)

কম্যুনিস্টরা আমার ভোগ বরাদ্দ করবে আমার শ্রমের মাপে। আমি যেমন খাটব তেমন পাব। এতে আমি রাজী নই, কারণ আমার ক্ষমতা যোগ্যতা আমার শ্রমশীলতায় সীমাবদ্ধ নয়।

প্রুদঁ ভেবেছিলেন সম্পত্তিকে চৌর্য বলে তিনি খুব হেয় করেছেন। তিনি খেয়াল করেন নি যে সম্পত্তির সঙ্গতি মেনে নিলেই তবে চুরি সম্ভব হয়। সম্পত্তি চৌর্য নয়। সম্পত্তি আছে তাই সম্পত্তি চুরি যায়। প্রুদঁ চান ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক যৌথ সম্পত্তিতে মিলিয়ে দিয়ে প্রত্যেকে তার হিস্সা বুঝে নিক। তার চেয়ে তিনি বললে ভাল করতেন :

"অনেক জিনিস আছে যাহা ভোগ করিতেছে মাত্র জনকয়েক লোক এবং যাহা আমরা অন্যেরা এখন হইতে দাবি করিব। উহা লইয়া লওয়া যাক কারণ সম্পত্তি এই প্রকারেই পাইতে হয় এবং যে বিত্ত হইতে আমরা এখনও বঞ্চিত হইয়া আছি উহার মালিকরা উহা এই

প্রকারেই লইয়াছে। কয়েকজনের অধিকারে থাকার চেয়ে আমাদের সকলের হাতে থাকিলে এই সম্পত্তি বেশী কাজে লাগিবে। সুতরাং সম্পত্তির চৌর্যের জন্য এস আমরা সকলে এক হই।' একথা না বলিয়া প্রুদঁ আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে সমাজ প্রথম হইতে সকল সম্পত্তির আদি ও অবিসংবাদী অধিকারী আর তথাকথিত মালিকরা সমাজবিত্ত চুরি করিয়া বসিয়াছে।"[৫] (৩৩০)

মালিক সম্পত্তি ভোগ করে আইনের কৃপায়। আইন সম্মতি দিলে তবে বিত্তাধিকার লাভ হয়। বস্তুত রাষ্ট্রই বিত্তের মালিক, অধিকারী শুধু ইজারাদার। রাষ্ট্র ভক্ত প্রজাকে জমি ইনাম দেয় আর ক্রুদ্ধ প্রজার জমি বাজেয়াপ্ত করে। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্র সকলকে ধন অর্জনের সমান সুবিধা দেয় বটে, বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা, রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। কার্যত তা নয়। প্রতিযোগিতার জন্যে যে বাস্তব মালমশলা দরকার তা আমার নিজের যোগ্যতায় সংগ্রহ করবার সুযোগ নেই, রাষ্ট্রের থেকে ভিক্ষা করে তা নিতে হবে। আমি বড় কারবারি হতে চাই কিন্তু আমার মাল নেই যন্ত্র নেই। অমুক মালিকের কারখানা থেকে কেড়ে কিংবা চুরি করে নিলেই হয়। কিন্তু রাষ্ট্র তা দেবে না কারণ মালিক তার বর্গাদার। অমুক কলেজের প্রফেসরের চেয়ে আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান বেশী, পড়াইও ভাল। কিন্তু কলেজে আমার জায়গা হবে না কারণ ডিগ্রী নেই।[৬] ডিগ্রী দেবে রাষ্ট্র—তার কাছে দরখাস্ত করে ডিগ্রী পেলে তবে আমার যোগ্যতা বিবেচিত হবে। মানুষে মানুষে সমানে সমানে প্রতিযোগিতায় একজন হারে একজন জেতে তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এখানে তো মানুষের প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা টাকার আর রাষ্ট্রদত্ত দাক্ষিণ্যের।

যারা সর্বহারা তাদের কিছু হারাবার নেই, তাই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হবারও দরকার নেই। বরং মালিকদের অভয়দাতা রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে পারলে তাদের লাভ। রাষ্ট্রই মালিকদের আশ্রয় দিয়েছে আর প্রলিতারিয়দের বঞ্চিত করে রেখেছে। রাষ্ট্র অবশ্য জনসাধারণের, কিন্তু শ্রমিকসাধারণ টাকা ও জমির মালিকদের, অর্থাৎ পুঁজিপতিদের করায়ত্ত। 'শ্রমিক পরিশ্রম করে

৫ স্টার্নার সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রুদঁর মত ঠিকমত উপস্থিত করেন নি।

৬ স্টার্নার ছিলেন স্কুল মাস্টার, তাঁর প্রতিপক্ষ বাউয়ার ছিলেন অধ্যাপক।

ক্রেতার জন্তে যে মাল পয়দা করে তার পুরো দাম সে পায় না।' (১৫১) পুঁজিপতি তাকে তাঁর শ্রমমূল্যের চেয়ে কম মজুরি দেয়। কিন্তু সে অনুগত প্রজা, রাষ্ট্রের আশ্রিত, মোটা খাজনা দেয় তাই অবাধে তার শ্রমিক শোষণ চলে।

শ্রমিক যদি তার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য চায় তাহলে রাষ্ট্র আসবে সালিশি করতে, তাকে ঠাণ্ডা করতে। সে যদি তার সালিশি না মানে এবং বেশী চেয়ে বসে তাহলে রাষ্ট্র 'সিংহের থাবা ও ঈগলের নখ' নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজেই যা নেবার শ্রমিককে জোর করে নিতে হবে। ভালবাসা ও ত্যাগের কীর্তন তো হাজার হাজার বছর ধরে হল। তার ফল হয়েছে আজকের দৈন্যদশা। তবে কেন আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা?

> "শ্রমিকদের হাতে আছে প্রচণ্ড ক্ষমতা। যদি তারা এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিতে পারে তাহা হইলে কিছুতেই তাহাদিগকে রুখিতে পারিবে না। তাহারা শুধু কাজ বন্ধ করুক, উৎপন্ন দ্রব্য নিজেদের বলিয়া মনে করুক, ভোগ করুক …রাষ্ট্র স্থাপিত শ্রমিকের দাসত্বের উপর। শ্রমিক মুক্ত হউক, রাষ্ট্র উচ্ছন্ন যাইবে।" (১৫২)

ব্যক্তিবাদী বিপ্লবী নয়। বর্তমান বিধান ভেঙে দিয়ে এক নূতন বিধান প্রবর্তন করা তার উদ্দেশ্য নয়। তার কোন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক লক্ষ্য নেই। সে বিদ্রোহী, নিজেকে সকলের ওপরে জাহির করবার জন্য তার বিদ্রোহ।

শোনা যায় মানুষ নাকি ইতিহাস গড়ে,—জাতি, শ্রেণী সমাজ জনস্বার্থ ইত্যাদি নাকি ইতিহাসের সারথি। কিন্তু ইতিহাস দেশ ও জাতির যে পতনের কথা বলে সে কীর্তি কাদের? আপন খেয়াল চরিতার্থ করতে উন্মুখ অহঙ্কারীরা ছাড়া আর কারা? অহঙ্কারীর কাছে ত্যাগ নেই। তার আছে এক দুর্জয় কামনা, সকল সাধ-আহ্লাদ তাতে ডুবে যায়। সে স্বার্থপর কিন্তু ইন্দ্রিয়বশ নয়।[৭] কারণ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা বিলাস ব্যসনের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিলাসী আপনার ওপর অধিকার হারিয়ে ফেলে, সে কামাতুর। অহঙ্কারী আত্মপর ব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় আত্মস্থ। সে বিরাগীও নয়। জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরে তুলে সে আকণ্ঠ পান করে জীবনসুধা। মোমবাতি যেমন পুড়ে গেলেই সার্থক, জীবনও তেমনি ভোগে ব্যয় হলেই সার্থক।

৭ ফল্‌কেনবার্গ 'হিস্ট্রী অব মডার্ন ফিলসফি'তে মন্তব্য করেছেন স্টার্নার ছিলেন ইন্দ্রিয়বাদী

"এখন হইতে প্রশ্ন ইহা নহে কেমন করিয়া জীবনকে পাওয়া যাইবে, প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া জীবনকে খরচ করা যাইবে, ভোগ করা যাইবে।" (৪২৭)

তৃণ ও পশুর যেমন কোন লক্ষ্য নেই, আদর্শ নেই তেমন আমিও লক্ষ্যহীন, আত্মপরায়ণ।

"ফুল ফুটিয়া উঠিবার ডাকে সাড়া দিয়া ফোটে না। সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করে, গ্রহণ করে। সে যত পারে মাটির রস শুষিয়া লয়, শূন্য হইতে বাতাস টানিয়া লয়, সূর্যের আলো পান করিয়া লয়। পাখি কোন কর্তব্যের নির্দেশে চলে না। সেও যথাসাধ্য তাহার শক্তি প্রয়োগ করে, গুবরে পোকা ধরিয়া খায় আর প্রাণ ভরিয়া গান গায়।" (৪৩৫)

আর মানুষের বেলা নিয়ম আলাদা। ফুল ও পাখির মত স্বাভাবিক হতে গেলে সে অহঙ্কারী, পাপিষ্ঠ, অমানুষ। মানুষকে ভগবান ভাবা আর পাপী ভাবা একই রকম বিকার। আমরা যা তাই—এর চেয়ে বড় হতে পারি না, হবার দরকারও নেই। ঈশ্বর মানবতা ইত্যাদি কল্পনা সামনে খাড়া করে মানুষকে তার পায় নোয়ানো হয় বলেই সে পাপী।

"লোককে পাপী বলিও না, তাহারা কখনও পাপী নয়। কেবল তুমিই পাপীর স্রষ্টিকর্তা, যে তুমি মানুষকে ভালবাস বলিয়া মনে কর আর মানুষকে পাপের কাদায় ছুড়িয়া ফেল, তাহাদিগকে সাধু অসাধু, মানুষ অমানুষ এই দুই ভাগে ভাগ কর, নিজের ভূতে পাওয়া দাম্ভবৃত্তি দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত কর। কারণ তুমি তো মানুষকে ভালবাস না, ভালবাস মানবতাকে। কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি তুমি কখনো পাপী দেখ নাই, শুধু তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ।" (৪৮১-৮২)

ঈশ্বর নাকি অনির্বচনীয়, অতুলনীয়, বিশুদ্ধ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঈশ্বর নয়, আমিই তাই।

বড়ই ভয়ের কথা! তাহলে সব যে ভেঙে পড়বে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, যে যা খুশি তাই করবে! কে বলল যে যা খুশি তাই করতে পারবে? তুমি আছ কি করতে? আমার বদখেয়ালকে তুমি সহ্য করবে কেন? আত্মম্ভরি তোমাকে খাতির করবে না, কিন্তু তোমার গায়ের জোরকে

খাতির করবে। অহং-এ অহং-এ ঠোকাঠুকি লাগবে, একজন হার মানতে পারে কিন্তু বশ মানবে না।

"ওখানে আমি মানুষের সামনে মানুষের মত মুকাবিলা করি। এখানে আমি যেন একটি স্কুলের ছেলে, সহপাঠীর গায় হাত তুলিয়াছি আর সে তাহার বাপ-মাকে ডাকিয়া তাহাদের আড়ালে লুকাইয়াছে, আমি একটি অসভ্য বাঁদর বলিয়া বকুনি খাইতেছি, কথা বলিতে গেলে শুনিতেছি—'তর্ক করিও না'।" (২৭৮)

অভিভাবকদের শাসন থেকে মুক্ত আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় মিলবে। বিত্তাধিকার পবিত্র অধিকার এ ধারণা দূর হলে সকলে বিত্ত লাভ করবে এবং ব্যক্তিসম্মিলন যার যার অধিকার মেনে নেবে। বিত্ত সমাজের বর্গা বলে গণ্য হবে না। ব্যক্তিকে লাঠি হাতে নিয়ে সম্পত্তি পাহারা দিতে হবে না।

এই স্বেচ্ছামিলনের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের প্রভেদ আছে। জাতীয় ঐক্য মৌমাছির ঐক্য, যেন সকল মাছি চোখ বুজে রানী মাছির পিছন পিছন উড়ছ। যেমন জার্মান জাতির ঐক্যাভিলাষ। একজন জার্মান আর একজন জার্মানকে দেখে ভাবে বিগলিত হয় এর চেয়ে হাস্যকর আর কি আছে?

সমাজ আবদ্ধ স্থাণু, স্বেচ্ছামিলন মুক্ত চলমান। এর যোগসূত্র চুক্তি যে চুক্তি সর্বদা সংশোধনসাপেক্ষ। চুক্তি স্থায়ী হয়ে গেলেই মিলন জমে গিয়ে হবে অচল সমাজ। অবশ্য চুক্তিতেও স্বাধীনতা খর্ব হয়। মিলনের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা নয়। পূর্ণ স্বাধীনতা কে কবে পেয়েছে? আমি কি পাখির মত উড়তে পারি না মাছের মত ডুবসাঁতার কাটতে পারি? মিলনের উদ্দেশ্য আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যা রাষ্ট্র ও সমাজে সম্ভব নয়।

"মিলন আমার নিজের গড়া জিনিস—আমার নমস্য নয়, আমার উপর ইহার কোন আত্মিক প্রভাব নাই, যেমন কোন প্রতিষ্ঠানেরই নাই। আমি যখন নিজের কথাকে দাসখত লিখিয়া দিতে রাজী নই, কথার নড়চড় হইবে না এরূপ আশ্বাস না দিয়া বরং অবিরাম নিজের কথার সমালোচনা করি, তখন আমার সারা ভবিষ্যত একটা মিলনচুক্তিতে গচ্ছিত রাখিব আমার আত্মাকে বন্ধক রাখিব এ আরো অসম্ভব।...আমি যেমন রাষ্ট্র চার্চ ঈশ্বর প্রভৃতি হইতে

আমার নিকট অধিক মূল্যবান তেমন সম্মিলন হইতেও অনেক বেশী মূল্যবান।" (৪১।

ল্যাওৎসের পর এমন সর্বাত্মক বিদ্রোহের বাণী আর উচ্চারিত হয়নি। গডউইন ও প্রুদঁর পদ্মমধুর মৌতাতে পাঠক যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন স্টার্নারের চাবুক খেয়ে তার সুখস্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়, চোখ রগড়ে আবার খুলতে হয় পুরানো পাঠ, যাচাই করতে হয় পরীক্ষিত সত্য, বদ্ধমূল বিশ্বাস। জীবনের ভিত্তি নড়ে যায়, সকল মূল্যবোধের মূলে টান পড়ে। তারপর যখন চারদিক ঘিরে আসে অতল অন্ধকার নাস্তিবাদ, তখন থেমে যায় কম্পন, মন আবার স্থির হয় জীবনবেদের অটল বনিয়াদের ওপর। স্টার্নারের মত শক্ত ওঝাও মাথার ভূত নামাতে পারে না।

এই পরম বিদ্রোহী নিশ্ছিদ্র মহাশূন্যের মাঝে অহং-এর বিন্দু পরিমাণ স্থিতিস্থানের ওপর দাঁড়িয়েছেন নিঃসঙ্গ একাকী। রাষ্ট্র গেল, ধর্ম গেল, চিন্তা ও যুক্তি গেল, সমাজ ও ন্যায়বোধ গেল, গেল কর্তব্য, ভালমন্দর বিচার। 'আমি আমার সর্বস্ব স্থাপন করেছি নাস্তির ওপর'—আমার কাছে আমি ছাড়া সব মায়া। এই ধ্বংসাত্মক শূন্যবাদের ওয়ারিস হয়েছিল রুশ নিহিলিস্টরা।[৮] স্টার্নারের মত এদের শূন্যবাদও বৈপ্লবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

স্টার্নারের খড়্গাঘাত কোন দূষিত সমাজ ও নীতিশাস্ত্রের ওপর নয়, সকল রকম যৌথ সত্তা ও তার আনুষঙ্গিক দায়িত্বের ওপর। তাঁর ধারণা ব্যক্তি আত্মস্থ হলে নীতিশাস্ত্র ও দায়িত্ববোধ লোপ পাবে, সমাজ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে এ ধারণা ঠিক, মন থেকে দূর করে দিলেই এদের অবসান। কিন্তু সমাজের বেলা নয়। জলবায়ু মাটি আকাশ যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য, সমাজ পরিবেশও তাই, একে চাই না বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজের চেহারা বদলায়, সমাজ যায় না। সমাজ ও সমাজধর্মকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির সুখসম্পত্তি দূরে থাক, তার জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদি সমাজ হয় ভৌতিক মায়া তবে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি

৮ উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের যুক্তিবাদী অবিশ্বাসীরা। পরবর্তী বিপ্লবীরা নয়, যদিও নিহিলিস্ট নামে তারাও পরিচিত।

ততোধিক মায়া। হেগেলের নির্বিকল্প চিৎসত্তার মত স্টার্নারের অদ্বৈত পরমাহঙ্কারও এক শূন্যসঞ্চারী ন্যায়ের তত্ত্ব। বাস্তব জগতে এমন সমাজবিরহিত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ কোথায়?

স্টার্নার সমাজের বিকল্পে অবতারণা করেছেন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চুক্তির মিলন। সতত যুধ্যমান আত্মম্ভরিদের সংঘাতে এ মিলন টিকতে পারে না। স্টার্নার চানও না যে মিলন স্থায়ী হোক। কারণ হলেই তা অচল সমাজে পর্যবসিত হবে। তাঁর মিলনচুক্তি অবিরাম পরিবর্তমান, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদের মত তাদের স্থিতি ও বিলয়। সুতরাং 'সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধ' এই আরণ্য রীতিই সেখানে চিরন্তনী। ক্ষণিক মিলন হয় সংঘর্ষে নিমজ্জিত।

তা বলে স্টার্নার কি স্বার্থ ও সম্ভোগের বৈতালিক? তা বললে সুবিচার হবে না। তাঁর অহঙ্কার প্রধানত একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য। সে হল এই যে যাবতীয় কর্মের উৎস অহং, ব্যক্তির মন যা চায় বাইরের বাধা না এলে সে তাই করে। আবার এ মন্তব্যও ঠিক নিরপেক্ষ নয় যে স্টার্নারের অহঙ্কার কেবল চিন্তায় আত্মসচেতনতা ও কাজে আত্মনির্ভরতা এবং 'স্টার্নারের ব্যক্তি গণতান্ত্রিক চরিত্রের।'[১] তার ওপর কারও কোন দাবি নেই। সে অন্যের স্বার্থ দেখে না, অন্যের অধিকার মানে না। তার সহিংস গ্রাসবৃত্তিকে আত্মনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা বললে অল্পোক্তি হয়। স্বাভাবিক মানুষের বেলা এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্যও নয়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে সাধারণ ভাবনাচিন্তার গড্ডালিকা থেকে স্বতন্ত্র হলে তবে ব্যক্তির মনের বিকাশ ঘটে,—ব্যতিক্রমেই ব্যক্তিত্ব, সাধারণে সার্বজনীনতায় নয়। কিন্তু এখানেও দেখি ব্যক্তি এক ভাবপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে না হতে আর একটি আদর্শে আশ্রয় নেয়; এক জীবনসূত্র ছিন্ন করে আর এক সূত্রে বাঁধা পড়ে—সে কখনো ত্রিশঙ্কুর মত মহাশূন্যে ঝুলতে পারে না। স্টার্নারের ব্যক্তিত্ব এক অসম্ভব কল্পনা।

স্টার্নার মধ্য উনিশ শতকের কালাপাহাড়। তাঁর নাশাত্মক দর্শনে গুরুদ্রোহী বাম হেগেলীয়রাও উচ্চকিত হল। এর তীব্র ঝলকের কাছে গডউইন ও প্রুঁদর নৈরাজ্যবাদ হল নিষ্প্রভ, স্তিমিত। এঁরাও ব্যক্তিবাদী—

১ ম্যাক্স এড্‌লার : এনসাইক্লোপীডিয়া অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, 'স্টার্নার, ম্যাক্স'।

কিন্তু এঁদের ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে সমাজের কেন্দ্রে। গডউইনের ব্যক্তি অপরের কল্যাণে সার্থক, প্রুদঁর ব্যক্তি অপরের সঙ্গে সহযোগে সম্পূর্ণ। স্টার্নারের বিধানে জাস্টিস ও ম্যুতুয়ালিতের জায়গা নেই, বিত্তের বিভাগ শ্রমের সংগঠন ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন। সৌভাগ্যের কথা স্টার্নার ছিলেন তার্কিক, প্রুদঁর মত তিনি তাঁর তর্ক নিয়ে কার্যক্ষেত্রে নামেন নি। তিনি কোন গোষ্ঠী তৈরি করেন নি, একজন শিষ্যও নয়। জার্মানীতে মোসেস হেস, কার্ল গ্রুন ও ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মার-এর মারফত যেটুকু অরাজকী চিন্তা প্রচলিত হল তা স্টার্নারের দান নয়, প্রুদঁর কাছ থেকে পাওয়া।

যে ভাববাদী দর্শনের পরাকাষ্ঠা হয়েছিল হেগেলের চিন্তায় তার দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে। জার্মানদের বুকে যে জীবনসম্ভাবনার প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল দ্বন্দ্বমুখর প্রজ্ঞানবাদ নিদারুণ হতাশায় তার পরিসমাপ্তি ঘটছিল। চল্লিশোত্তর দশকে দেশ শত শত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। যে উত্তাল জাতীয়তার তরঙ্গে নেপোলিয়ন ভেসে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় ঐক্যে তা সার্থক হল না। জনতা ভরসা করেছিল জার্মান রাজন্যদের নেতৃত্বে তাদের স্বাধীনতা ও একতার স্বপ্ন সফল হবে। রাজন্যদের কাছ থেকে সে নেতৃত্ব এল না। এই রাজনৈতিক নিরাশার মধ্যে দার্শনিকরা ভাব ও বস্তুর স্বরূপ নিয়ে আত্মহারা হয়ে আছেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্টার্নারের লক্ষ্যহীন

কিন্তু জার্মান মনীষার অপমৃত্যু হয় নি। অসার ভাববিলাসের আবর্ত থেকে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজছিলেন স্ট্রাউস, ফয়েরব্যাক, হেস—এঁরা দিলেন নূতন সমাজ-ব্যাখ্যান, সৃষ্টি করলেন নূতন সমাজমূল্য, জ্বাললেন আশার বাতি।

স্টার্নারের নাম আজ বিস্মৃতির তলে ডুবে গেছে। কয়জন জানে যে লোকটি পৃথিবীকে তুড়ি মেরে জীবনের রসসুধা ওষ্ঠ ভরে পান করতে চেয়েছিল তাঁকে আকণ্ঠ পান করতে হয়েছিল জীবনের বিষ, স্বেচ্ছায় অকালমৃত্যু হয়েছিল তাঁর পরিণাম।[১০] এর চেয়ে দুঃখের কথা তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হল না। এই ভাগ্যহত বিশ্বনিন্দুকের ক্ষুরধার সমালোচনা

১০ চিররুগ্ন হতস্বাস্থ্য নীট্‌শে তাঁর দর্শনে প্রচার করেছিলেন যুদ্ধং দেহি মন্ত্র, আর চিরদরিদ্র স্কুল মাস্টার স্টার্নার করেছিলেন ভোগের ও অহঙ্কারের গুণগান। তর্কযুক্তির পিছনে দার্শনিকের দমিত বাসনা অলক্ষিতে কতখানি প্রভাব ছড়ায় তা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় কি অবদান রেখে গেছে তার পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। কত ছলনাময়ী মিথ্যার ছদ্মবেশ তিনি খুলে দিয়েছেন লজ্জা হলেও তা স্বীকার না করে উপায় নেই। যথা: নিঃস্বার্থ প্রেম, স্বর্গীয় ভালবাসা। ভালবাসা যদি স্বর্গীয় তাহলে আমি কুক্কুটমাংস ভালবাসি কোন প্রবৃত্তিতে? যখন আমি মানুষকে ভালবাসি তখন আমার ভালবাসা নিঃস্বার্থ। যখন কুক্কুট ভালবাসি তখন সে ভালবাসা স্বার্থপর। ভাষা যদি ভাবের প্রকাশ হয় তাহলে এক শব্দ দুই বিপরীত ভাবের বাহন হতে পারে না। কুক্কুটপ্রেম ও মানবপ্রেম সমান না হলেও সমগোত্রীয়।

স্টার্নারের সমালোচনার গুটিকয়েক ইতিবাচক দিকও আছে। বুদ্ধি ও ভালবাসায় আপীল করে সমাজকে যে গড়া যায় না, সমাজের ভেতরে যে আছে আপোসহীন স্বার্থের লড়াই, মুক্তি যে বলহীনের লভ্য নয়- এসব কথা তাঁর মত করে চোখে আঙুল দিয়ে আগে কেউ দেখায় নি। সম্পত্তির অধিকার তিনি মানলেন বটে কিন্তু একে বলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে এর জাত মেরে দিলেন, এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। দরিদ্রদের পরের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, জোর করে তাদের পাওনা কেড়ে নিতে হবে।—এইখান থেকে বাজল শ্রেণীসংগ্রামের রণতূর্য, রচিত হল কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভূমিকা। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ স্বীকার করেছেন স্টার্নারের নাশকতা তাঁদের জন্যে জমি পরিষ্কার করে দিয়েছে। ধনিকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিক-অভ্যুত্থান, সভ্য সমাজেব ভাবালুতার বিরুদ্ধে বাস্তব ইতরচেতনার আত্মঘোষণা, আগামী যুগে যার পরিণতি হল কম্যুনিস্ট ও সিণ্ডিক্যালিস্টদের মাধ্যমে, স্টার্নারের আত্মনির্ভর ব্যক্তি তার এক বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী পূর্বাভাস।

৮। ইয়োরোপঃ মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬)

ইতিহাস তার রঙ্গমঞ্চে কখন কখন এমন এক একটি লোককে এনে হাজির করে যাঁরা যেন এক এক ঝলক বিদ্যুৎ, যাঁদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত দীপ্ত শিখার মত জ্বলন্ত কিন্তু মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করে যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। মাইকেল বাকুনিন এই দলের মানুষ। তিনি ১৮৪৮-১৮৭৮ কালের প্রলয়-নাট্যের নটরাজ। তিরিশ বছর তিনি ইয়োরোপের আকাশ বাতাস তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। তাঁর কল্পনা ও কর্ম ছিল উল্কার মত, বিদ্রোহীর আশার বাতি আর রাষ্ট্রশক্তির বিভীষিকা। কিন্তু এ আগুন উল্কার মতই অকস্মাৎ নিভে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাকুনিনের অগ্নিগর্ভ চিন্তা অন্ধকারে ডুবে গেল।

নিয়তির এক নিষ্ঠুর অভিশাপে বাকুনিনের ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন। ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডি, কসাথ, প্রুধঁ ও মার্ক্স ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। এঁরা বিপ্লবী ভাবনা ও সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয়, এঁরা পেয়েছেন বীরের বরমাল্য লোকোত্তর খ্যাতি। বাকুনিন এ সম্মানে বঞ্চিত, যদিও দুঃসাহসিক চিন্তায় ও কর্মে এবং আদর্শের জন্যে আত্মবলিদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

বাকুনিন লিখেছেন প্রচুর তবু তাঁর চিন্তার থই পাওয়া যায় না। অজস্র ভাবনা মাথায় উজিয়ে উঠত, কাজের তাড়ায় সেগুলিকে গুছিয়ে তোলা হয়ে উঠত না, অসমাপ্ত লেখার মধ্যে থেকে যেত অসঙ্গতি। লেখার চেয়েও তাঁর বক্তৃতা ছিল গরম। কিন্তু তাঁর লিখিত অথবা ভাষিত কথা থেকে তাঁর দর্শনকে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর দর্শনের ভাষ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিরাট বলিষ্ঠ দেহ, প্রকাণ্ড মাথা ঘিরে ঘন অসম্বৃত কেশরাশি, কণ্ঠে বজ্রের নির্ঘোষ— মানুষটি যেন মূর্তিমান বিপ্লব। এক বস্ত্রে দিনের পর দিন দিবারাত্র কেটে যাচ্ছে, কখন হয়ত খোলা আকাশের নীচে রাত্রিবাস, যেদিকে ঝড় সেদিকে তৎক্ষণাৎ তাঁর গতি। যারা সংস্পর্শে আসত তারা এই দুর্দম আত্মভোলা প্রকৃতির প্রভাব এড়াতে পারত না। যারা দূরে থাকত তারা তাঁকে ঘিরে উপকথার ঊর্ণজাল বয়ন করত।

১৮১৪ সালের তিরিশে মে রুশের ভের প্রদেশে প্রেমুখিনো নামক পল্লীগ্রামে এক বর্ধিষ্ণু জমিদারের ঘরে বাকুনিনের জন্ম হয়। পনের বছর বয়সে বাবা তাঁকে সেন্ট পিটার্সবার্গের গোলন্দাজ স্কুলে ভর্তি করে দেন। পাঁচ বছর শিক্ষানবীসির পর তাঁকে পোল্যাণ্ডের একটি ফৌজের অফিসার করে পাঠানো হল। শিবির জীবনের গতানুগত্য ও নিয়মশৃঙ্খলা বেশীদিন তাঁর মেজাজে পোষাল না। একুশ বছর বয়সে কাজে ইস্তফা দিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি মস্কো চলে এলেন দর্শন পড়তে।

রুশের স্বৈরাচারী জার প্রথম নিকলাসের আমলে সকল প্রকার উদার-নৈতিক চিন্তা ও কার্য ছিল নিষিদ্ধ। শুধু নিরামিষ দর্শন চর্চায় কোনো বাধা ছিল না। এই সুযোগে মস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পাঠচক্র জমে উঠেছে,—একটি আলেকজাণ্ডার হার্ৎজেনকে ঘিরে ফরাসী সমাজবাদ নিয়ে, আর একটি নিকলাস স্ট্যাংকেভিচের নেতৃত্বে জার্মান ভাববাদকে অবলম্বন করে। বাকুনিন দ্বিতীয় দলে ভিড়ে পড়লেন। শেলিং ও কাণ্ট পেরিয়ে তিনি ফিক্‌টে এবং হেগেলে এসে আবদ্ধ হলেন। ফিক্‌টে থেকে তিনি শিখলেন যে বিশ্বনিয়মের সর্বোত্তম প্রকাশ মুক্তি, হেগেল থেকে জানলেন ঐতিহাসিক বিকাশ দ্বান্দ্বিক নিয়মের বশ। পাঁচ বছর মস্কোতে কাটিয়ে তিনি দর্শনের উৎসের সন্ধানে এলেন জার্মানী (১৮৪০)। এখানে প্রগতিশীল বিদগ্ধমহলে তখন বাম হেগেলপন্থী লাডভিগ ফয়েরব্যাকের আসর পড়েছে। তাঁর প্রভাব পড়ল বাকুনিনের ওপর যেমন পড়েছিল মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্-এর উপরে। এই দলের অন্যতম প্রচারক ছিলেন আর্নল্ড্ রুগে। বাকুনিন ড্রেসডেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। ১৮৪২ সালে রুগের পত্রিকা "ডয়েশ জারবুশের"-এ বেরুল বাকুনিনের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'ডাই রিএকশ্যান ইন ডয়েশ্‌ল্যাণ্ড'—জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন। চিৎশক্তির অধ্যাত্মতত্ত্ব ছেড়ে তিনি বিপ্লবের দ্বন্দ্ববাদে নেমে পড়লেন।

লেখাটি বেরিয়েছিল জুল্‌স্ এলিসার্ড এই ছদ্মনামে, কিন্তু লেখকের পরিচয় গোপন রইল না। লেখা ও লেখকের ওপর স্যাকসন সরকারের নজর পড়ল। বাকুনিন পালিয়ে গেলেন সুইজারল্যাণ্ড। এখানে তাঁর আলাপ হল উইলহেল্‌ম্ উইট্‌লিং নামে একজন আধা জার্মান নৈরাজ্যবাদী ভবঘুরের সঙ্গে। তাঁর বই "মিত্রতা ও মুক্তির রক্ষাকবচ" পড়ে বাকুনিন মুগ্ধ হলেন, এ থেকে এই কথাকটি তুলে বন্ধু রুগেকে পাঠালেন—

"শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থায় সরকার নেই আছে লোককর্ম, আইন নেই আছে দায়িত্ব, শাস্তি নেই আছে শোধনের উপায়।"[১]

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে উইট্‌লিং-এর সাজা হল। বাকুনিনেরও ডাক পড়ল তাঁর পিতৃভূমি থেকে। বাকুনিন ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সুইস সরকারের হুকুমে বিতাড়িত হয়ে তিনি এলেন পারী (১৮৪৩)। এখানে তাঁর পরিচয় হল প্রুদঁ ও মার্ক্স্‌-এর সঙ্গে—এবং এঁদের দুজনের ভাবনার ছাপ গভীর হয়ে এঁকে বসল তাঁর মনের ওপর।

এখানে এক সভায় পোল বিপ্লবের পক্ষে ওকালতি করার ফলে রুশ সরকার থেকে ফরাসী সরকারের ওপর চাপ এল। বাকুনিনকে আবার তাড়া খেয়ে পারী ছাড়তে হল। তিনি পালিয়ে এলেন ব্রাসেল্‌স্‌, বেলজিয়ামের রাজধানী (১৮৪৭)। অল্পকাল পরে পারীর হাওয়া বদলাল, এল ১৮৪৮ ফেব্রুয়ারীর বিপ্লব। দুর্যোগ-পাগল বাকুনিন চলে এলেন এখানে। পারীর ঝড় যেমন ছুটল পূর্বদিকে, সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বাকুনিন। প্রাগে অনুষ্ঠিত শ্লাভ কংগ্রেসকে মাতিয়ে তুলে তিনি প্রাগের বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজপথে নামলেন। "শ্লাভদের প্রতি আবেদন" (১৮৪৮) পুস্তিকায় তিনি শ্লাভ চাষীদের ডাক দিলেন বুর্জোয়াদের ওপর আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জোরে রুশ অস্ট্রিয়া প্রাশিয়া এই তিন দুরন্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে মোহড়া গড়তে। পরের বছর ড্রেসডেনের জনবিদ্রোহে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। পাঁচদিন সংগ্রামের পর বিদ্রোহীরা পরাস্ত হল। স্যাক্সন্‌ সরকার বাকুনিনকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। ইতোমধ্যে অষ্ট্রিয় সরকার তাঁকে দাবি করলেন প্রাগ বিদ্রোহের শাস্তি দেবার জন্য। তাঁকে হাতে পেয়ে এঁরা আবার অপরাধীকে সমর্পণ করলেন রুশ কর্তৃপক্ষের দাবিতে তাঁদের হাতে (১৮৫১)।

রুশে কয়েদীদের বিভীষিকা ছিল কুখ্যাত পীটার এণ্ড পল দুর্গ। এখানে এসে অন্ধকার নিষ্ফল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বাকুনিনের মন ভেঙে পড়ল। তিনি লিখলেন 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি' নামে এক সুদীর্ঘ পত্র, জারকে জাতির নায়ক হয়ে রুশ বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার জন্য আহ্বান জানালেন, সবিনয়ে নিবেদন করলেন—'যেমন করে উচ্ছৃঙ্খল, পরিত্যক্ত, বিপথগামী পুত্র অপমানিত রুষ্ট পিতার সামনে দাঁড়ায়', তেমন করে তিনিও দাঁড়িয়েছেন

১ ই. এইচ. কার: মাইকেল বাকুনিন, লণ্ডন, ১৯৩৭, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

জারের সামনে ; আর পত্রের পাদনামায় লিখলেন 'অনুতাপী পাপী মাইকেল বাকুনিন।'

আসলে এ নরম সুর নিছক অনুতাপের নয়। এর কিছুটা ছিল ব্যাজস্তুতি, জারের মন ভিজিয়ে মুক্তি পাবার আশায় লেখা। জার খুশী হলেন কিন্তু ভিজলেন না। নিকলাসের মৃত্যুর পর জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অনুতপ্ত বেয়াড়া ছেলেকে সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দিলেন। এখানে চার বৎসর কাটল এবং তাঁর বিয়ে হল। ১৮৬১ সালে একটি আমেরিকান জাহাজে চেপে তিনি পালিয়ে গেলেন জাপান, জাপান থেকে আমেরিকা, আমেরিকা থেকে লণ্ডন।

তখন লণ্ডনে আলেকজাণ্ডার হার্ৎজেন সমাজবাদী প্রচারে ব্যস্ত। বাকুনিন তাঁর সঙ্গে জুটলেন। ১৮৬৩ সালে পোল বিদ্রোহের সময়ে তিনি একদল স্বেচ্ছাবাহিনী সংগ্রহ করে সাগর পাড়ি দিলেন। জায়গায় পৌছবার আগে তাঁর বাহিনী ও পোল বিদ্রোহ খতম হয়ে গেল। একটির পর একটি ধাক্কা খেয়ে বাকুনিন তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে আবার যাচাই করতে বসলেন।

১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের দেশে দেশে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার প্রাণ ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি। এই মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে বাকুনিন বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ব্যর্থতার আঘাতে তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, তিনি দেখলেন এ মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র নয়। জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রাধিকারের দাবি ছেড়ে দিয়ে তিনি এলেন নৈরাজ্যবাদে। "শ্লাভদের প্রতি আবেদন" পুস্তিকায় তিনি সমাজবিপ্লবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। এবার "বিপ্লবের বিতর্কিকা" পুস্তিকায় নৈরাজ্যবাদের আদর্শকে রূপ দিলেন (১৮৬৬)। ১৮৬৭ সালে 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম' নামক সঙ্ঘ গঠিত হল, জেনেভায় তার প্রথম বৈঠক বসল আর বাকুনিন তার ইস্তাহার রচনা করলেন। এই ইস্তাহার "ফেডারেলিজ্‌ম্‌, সোশ্যালিজ্‌ম্‌ এণ্ড এণ্টিথিওলজিজ্‌ম্‌" নামে প্রকাশিত হল (১৮৬৮)। লীগে ছিল বুর্জোয়া মতের প্রাধান্য। তাদের বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে এসে গড়লেন 'ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোশ্যাল ডিমক্রাসী' নামে নতুন এক প্রতিষ্ঠান। ১৮৬৯ সালে এলায়েন্সকে নিয়ে তিনি মার্ক্স্‌-এর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে ঢুকলেন।

পর বৎসর জুলাই মাসে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ায় লড়াই বাধল। বাকুনিন 'একজন ফরাসীর প্রতি পত্র' মারফত ফ্রান্সের শ্রমিক ও কৃষকদের ডাক দিলেন একযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন ও জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে

সমাজবিপ্লব সাধন করবার জন্ত। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকার্নো থেকে ছুটে এলেন লিয় নগরে, সেখানে এক রাষ্ট্রবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান পরিচালনা করলেন। ফ্রান্সের নূতন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের হাতে এই অভ্যুত্থান বিধ্বস্ত হল। বাকুনিন অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরলেন, লিখলেন "নাউটো-জার্মান এম্পায়ার এণ্ড দি সোস্তাল রিভল্যুশন"[২] (১৮৭২) নামে এক বিরাট গ্রন্থ। রাজনীতি থেকে নক্ষত্রতত্ত্ব পর্যন্ত কোন বস্তু এতে বাদ নেই। অবশ্য এ বইও শেষ হল না। এর একখণ্ড পরে "ঈশ্বর ও রাষ্ট্র" নামে প্রকাশিত হয়।

পারীর শ্রমিক বিদ্রোহ ও পারী কমিউনের ক্ষণিক সাফল্য (মার্চ—মে ১৮৭১) তাঁকে আবার চঞ্চল করে তুলল। ম্যাট্‌সিনি কমিউনকে নিরীশ্বরবাদী বলে তিরস্কার করলে বাকুনিন তার তীব্র প্রতিবাদ করে ম্যাট্‌সিনির ধর্মনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। পরের বছর মার্ক্সের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ" নামক পুস্তক (১৮৭২) রচনা করলেন।

ইতোমধ্যে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছিল। আদর্শের নেশায় পাগল হয়ে তিনি নিজেকে ক্ষয় করে ফেলেছিলেন। ধনীর দুলাল ঘর ছেড়ে আসা অবধি আকাশবৃত্তি নিয়েছিলেন, দারিদ্র্য ও ক্লেশ হয়েছিল জীবনসঙ্গী। এক কঠিন ব্যাধির যন্ত্রণায় তাঁর অফুরন্ত জৈব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। ১৮৭৩ সালে সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করে অবসর নিলেন। ৮৭৪ সালের মে মাসে ইটালীতে দুর্যোগ দেখা দেবার পর আবার তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বলোনায় এক বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মশক্তির অবসান হল।

অক্ষম অচল অনির্বাণ এই বিপ্লবীর জীবনসায়াহ্নের দিকে তাকালে চোখের জল রাখা যায় না। পঙ্গু নরশার্দুলের দিকে ভক্তেরা ফিরে তাকায় না। একনিষ্ঠ বিপ্লব সাধনা পরিবারের শান্তিনীড় ভেঙে দিয়েছে। প্রিয়তমা এণ্টনিয়া ঘর ও সন্তান কামনায় ব্যর্থ হয়ে তাঁরই এক ভাগ্যবান সহকর্মীকে বরণ করেছেন। বেপরোয়া ধার নেওয়া ও শোধ না দেবার অভ্যাস বন্ধুদের দূরে

২ নাউট অর্থ জানোয়ারের নাসিকা। রুশ সাম্রাজ্যরূপী জানোয়ার ও জার্মান সাম্রাজ্য উভয়ের মিত্রতা ও তার বিরুদ্ধে সমাজ বিপ্লব—নামের এই তাৎপর্য।

ঠেলে দিয়েছে। স্ত্রীর উপপতি তাঁর অন্নদাতা আশ্রয়দাতা। অবশেষে ১৮৭৬ সালের পয়লা জুলাই বার্নের হাসপাতালে নির্বাসিত দেশহীন গৃহহীন নিঃস্ব অবস্থায় তাঁর প্রাণবিয়োগ হল। যাঁকে দেখে একদিন সারা ইয়োরোপের মানুষ মেতে উঠত তাঁর শবযাত্রায় চল্লিশজন লোকও উপস্থিত হয়নি।

মস্কোতে দর্শন চর্চার সময়ে বাকুনিন প্রথমে ফিকটের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঈশ্বর সর্বমানবব্যাপী, মানুষের মহিমায় ঈশ্বরের মহিমা, এর চেয়ে মধুর কথা আর কি আছে? কিছুকাল পরে এই রহস্যলোকে আঘাত করল হেগেলের পরমাদ্বৈতবাদ ও দ্বন্দ্ববাদ। ১৮৩৭ সালে তাঁর লেখা—

> "আমার ব্যক্তি-আত্মা এখন আর নিজের জন্য কিছুই চায় না; এখন হইতে আমার জীবন পরমসত্তায় লীন হইয়া গিয়াছে। জীবন ভয়াল সংঘর্ষে ভরপুর·····, তথাপি ইহা সুন্দর, ইহার মর্ম অলৌকিক পবিত্র—ইহা চিরন্তন ঐশ্বরিক সত্তায় বিধৃত।"[৩]

দ্বন্দ্বপর পরমসত্তায় ডুবে গেলেন বাকুনিন। কিন্তু রক্তে যার সর্বনাশের নেশা এ ভাবালুতায় তিনি কতদিন মেতে থাকবেন? খট্‌কা লাগল হেগেলের বচনে—যাহা বাস্তব তাহাই প্রজ্ঞান যাহা প্রজ্ঞান তাহাই বাস্তব। পরম প্রজ্ঞানে আত্মহারা হলে আর বিদ্রোহের অবকাশ কোথায়? প্রজ্ঞান যদি হয় সকল বস্তুর আধার তাহলে বাস্তবকে নির্বিচারে স্বীকার করতে হয়। বামপন্থী হেগেলবাদীদের সংসর্গে আসবার পর তাঁর সংশয় ঘনীভূত হল, পরমাদ্বৈতকে ছেড়ে তিনি ধরলেন দ্বন্দ্ববাদের নাশকতা। ফয়েরব্যাকের প্রতিধ্বনি করে বাকুনিন বললেন—'আমি ঈশ্বরকে খুঁজি মানুষে, মানুষের মুক্তিতে এবং বর্তমানে তাঁর সন্ধান করি বিপ্লবে।'

তখন তাঁর চিত্ত ধ্বংসের নেশায় মশগুল—ক্ষেপা মন দর্শনের বাঁধন মানতে চায় না। কর্মপিপাসুর কোন জিজ্ঞাসা নেই আছে শুধু জিগীষা। পিছনে পড়ে রইল ফয়েরব্যাক। বাকুনিন লিখলেন—

> "দূর হোক ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্ব। সত্য তত্ত্বকথায় নাই, আছে কর্মে জীবনে···; বসিয়া বসিয়া ভাবিলে সত্য আবিষ্কার হয় না, বাঁচিতে

৩ ভি, ভি, জেংকভ্‌স্কী: এ হিস্ট্রী অব রাশিয়ান ফিলজফি। অনুবাদ—জর্জ এল, কিল্‌নে, লণ্ডন, ১৯৫৩। খণ্ড ১, ২৪৮ পৃষ্ঠা।

হয়, জীবন চিন্তার অপেক্ষা ব্যাপক ; সত্যের রহস্য লুকাইয়া আছে জীবনে।"[৪]

বিপ্লব সৃজনচাঞ্চল্যের বিস্ফোরণ। বস্তু দ্বান্দ্বিক নিয়মে চিরচঞ্চল। যা অচল তা অবাস্তব, সুতরাং প্রজ্ঞানবিরোধী। সুতরাং বিপ্লব বাস্তব প্রজ্ঞানসম্মত সত্য। গোঁড়া হেগেলবাদীরা বাস্তব ও প্রজ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও অন্তরীক্ষ উভয়ের মাঝে ঢুলতে ঢুলতে যেন ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকে চলেছে।

বিপ্লব অবিশ্রাম চিরন্তন। অবিরাম ও সর্বাত্মক বিশ্ববিবর্তন, এই পরম সত্য—এখানে কোন শাস্ত্র কোন বিধানের জায়গা নেই। এই সর্বনাশের সত্য থেকে আসবে নীতির বিচার, ভালমন্দর মাপকাঠি।

তিনজন ব্যক্তির প্রভাব বাকুনিনের ওপর কায়েম হয়েছিল,—ফয়েরব্যাক, মার্ক্স ও প্রুদঁ। এঁদের আওতায় এসে তিনি হেগেলের ঐশ্বরিক ভাববাদ থেকে মুক্ত হয়ে পুরোদস্তর নাস্তিক ও জড়বাদী হলেন। ফয়েরব্যাক তাঁর "খ্রীষ্টানত্বের সারমর্মে" (১৮৪১) ধর্মের মুখোস খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ইয়োরোপে দার্শনিক চেতনার মোড় ঘুরল—তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন বাম হেগেলবাদীরা ও প্রুদঁ। এঁদের ছাড়িয়ে গেলেন বাকুনিন।

> "জড়বাদ পশুত্ব হইতে শুরু করে মানবত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। ভাববাদ দেবত্ব হইতে শুরু করে দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার এবং জনতাকে চিরতরে পশুত্বে আবদ্ধ রাখিবার জন্য।"[৫] ('নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য ও সমাজবিপ্লব')

"ঈশ্বর ও রাষ্ট্র" পুস্তিকাটি ভরে তিনি তীব্র শ্লেষের বিষ ঢেলেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের আদিম পাপ নিয়ে এর সূচনা। আত্মম্ভরি একাকী জিহোভার খেয়াল হল কিছু দাস নিয়ে বসবাস করবার,—সৃষ্টি করলেন মানবযুগল। সবই দিলেন তাদের, নিষেধ রইল কেবল জ্ঞানবৃক্ষের ফলের ওপর, যাতে তাদের পশুত্ব না ঘোচে। এমন সময়ে এল শয়তান 'চিরন্তন বিদ্রোহী এবং প্রথম স্বাধীনচিন্তক'। তার প্ররোচনায় মানবমানবী ঈশ্বরকে অমান্য করে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেল। প্রভুত্বগর্বী ঈশ্বর রাগে অন্ধ হয়ে শুধু অপরাধীযুগলকে

৪ ঐ, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৫ ম্যাক্সিমফ : দি পলিটিক্যাল ফিলজফি অব বাকুনিন, ইউ. এস. এ, ১৯৫৩। ৬৪ পৃষ্ঠা। এটি বাকুনিনের রচনার একটি বাছাই করা সংকলন। পরবর্তী পৃষ্ঠা নির্দেশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

নয় তাদের সকল উত্তরপুরুষকে অধঃপাতে ফেললেন। কিন্তু ক্রোধের প্রতিমূর্তি যিনি তিনি তো প্রেমেরও অবতার! তাই হতভাগ্য পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে নিজের পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে পাঠালেন। বেচারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েও কি পাপীদের ত্রাণ করতে পারল? তাদের জন্যে মজুত আছে অনন্ত নরক।

আসলে এই যীশুটি একটি অকর্মা অপোগণ্ড। পাইলেটের উচিত ছিল তাকে ক্রুশে না ঝুলিয়ে বরং জেলে পুরে আচ্ছা করে খাটানো।

কয়েরব্যাক ধর্মবিশ্বাসের একটা বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন: 'মানুষের আকাঙ্ক্ষা অমিত, সাধ্য সীমিত। অল্প ক্ষমতায় আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না বলে সে কল্পনার শরণ নেয়, সান্ত মানুষিক শক্তিকে অনন্ত অমানুষিক করে তাকে বলে দৈব। নিজের সত্তাকে খণ্ডিত করে, বিচ্ছিন্ন করে, নিজের উপরে দাঁড় করিয়ে সে তার ভজন করে। এমনি করে আসে ঈশ্বর ও মানুষের দ্বৈত, মর্ত্য ও স্বর্গের ব্যবধান। এই প্রসঙ্গ ধরে বাকুনিন এলেন উগ্র ধর্মদ্রোহিতায়। স্বর্গ মানুষেরই উলটিত বিবর্ধিত প্রতিচ্ছায়া, অজ্ঞ অন্ধ বিশ্বাসে নিজের বিকৃত ছবিকে সে দেবায়িত করেছে। এই প্রকারে

> "পৃথিবীর সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্বর্গ হইয়াছে সমৃদ্ধ এবং ইহার অনিবার্য পরিণামে স্বর্গ যতই সমৃদ্ধ হইয়াছে মানুষ ও পৃথিবী ততই শ্রীহীন হইয়াছে।
>
> ঈশ্বরই যখন সব তখন বাস্তবজগত ও মানুষ কিছুই নহে। যেহেতু ঈশ্বর সত্য, ন্যায়, সততা, সৌন্দর্য, শক্তি ও জীবন, সেহেতু মানুষ অসত্য, অন্যায়, অসততা, কুশ্রীতা, অক্ষমতা ও মৃত্যু। যেহেতু ঈশ্বর প্রভু সেহেতু মানুষ দাস। সে নিজের চেষ্টায় ন্যায় সত্য ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া এই সকল অভীষ্টলাভের জন্য দৈবাদেশের উপর নির্ভর করে। আর দৈবাদেশের কথা বলিলেই আসে আদেষ্টার কথা, ত্রাণকর্তা, ধর্মাবতার, পুরোহিত ও ঈশ্বরে অনুপ্রাণিত শাস্ত্রকারের কথা। ইহারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, মানুষকে মুক্তির পথে চালাইয়া লইবার জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে বাছিয়া বাছিয়া পবিত্র উপদেষ্টা করিয়া পাঠাইয়াছেন—এ কথা মানিয়া লইলে ইহাদের হাতে গিয়া পড়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।"[৬]

৬ গড এণ্ড দি স্টেট, মাদার আর্থ পাবলিশিং এসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক সিটি। ২৪ পৃষ্ঠা।

এইরূপে মানুষ আপনার দেবায়িত ছায়াকে বিচারবুদ্ধি ও ন্যায়বোধ সমর্পণ করে। সে হয় প্রভুর ভয়ে তটস্থ, প্রভুর দয়ার কাঙাল জানোয়ারের সামিল।

> "মনে কর একটি পোষা কুকুর প্রভুর একটু আদরের জন্য, একটু কৃপাদৃষ্টির জন্য আবেদন করিতেছে। তাহার চেহারায় কি ঈশ্বরের নিকট নতজানু ভক্তের ছাপ ফুটিয়া ওঠে না? পরিবেশের প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মানুষ তাহা আরোপ করিয়াছে ঈশ্বরে। ঐ কুকুরটাও কি তেমন তার কল্পনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষীণ চিন্তাশক্তি দিয়া প্রকৃতির পরম শক্তিকে প্রভুর মধ্যে দেখিতেছে না?" ('ফেডারেলিজ্‌ম্‌, সোস্যালিজ্‌ম্‌ এণ্ড এন্টি-থিয়লজিজ্‌ম্‌', ম্যাক্সিমফ, ১০৯)

ভলতের বলেছিলেন ঈশ্বর যদি নাও থাকে মানুষকে নিজের দরকারে তাকে সৃষ্টি করতে হয়। বাকুনিন তাঁর কথা উলটিয়ে বললেন "ঈশ্বর যদি থাকেও তাহলে তাকে বাতিল করা দরকার।" বাতিল তাকে হতেই হবে। জৈব প্রকৃতির অমানিশা পিছনে ফেলে মানুষ এসেছে বুদ্ধির মুক্ত দিবালোকে। আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষরা বন্য পশুর সামিল হলেও দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল—'চিন্তার ক্ষমতা ও বিদ্রোহের প্রবৃত্তি।' ধর্ম, দর্শন ও আইনের শাস্ত্র যত মিথ্যা আমদানি করেছে সমস্তের বিরুদ্ধে বুদ্ধি করেছে বিদ্রোহ ঘোষণা। আজ বুদ্ধি শানিত হয়েছে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান বিদ্রোহীর প্রচণ্ড হাতিয়ার। মুষ্টিমেয় বিদ্যাবিলাসীর হাত থেকে এ হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দিতে হবে জনতার হাতে। এই হাতিয়ার নিয়ে মুক্তবুদ্ধি জনতা চড়াও হবে স্বর্গের ওপর, লুণ্ঠন করবে স্বর্গের ঐশ্বর্য।

গডউইনের মত বাকুনিনও শান্তশুদ্ধ প্রাকৃতিক সমাজের ওপর বিজ্ঞানের আলোকপাত করেছেন, একে পশুর স্বর্গ বলে বিদ্রূপ করেছেন। প্রকৃতির কোলের মুক্ত বর্বর যেন মায়ের কোলের দুষ্টু ছেলে! কল্পনাটি আকাশের ফুলের মত সুন্দর এবং অলীক। বস্তুত মানুষ কোনকালে প্রকৃতির দাস ছিল না, প্রভুও ছিল না। তার মুক্তি আপেক্ষিক। সে প্রকৃতির অংশ কাজেই প্রকৃতির কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ।

> "মানুষের স্বাধীনতা বলিতে কেবল ইহাই বুঝায়—যে সে প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্য নিজ হইতে ইহাকে নিয়ম বলিয়া বুঝিয়াছে তাই,

বাহির হইতে অপরের ইচ্ছায় তাগিদে নহে,—তা সে ইচ্ছা দৈব কিংবা মানসিক, যৌথ কিংবা একক যাহাই হউক না কেন।"[৭]

মানুষ নীতিবোধ নিয়ে জন্মায় না। সে পরিবেশের সৃষ্টি, সামাজিক আবহাওয়ায় তার নীতিবোধ গড়ে ওঠে। গডউইনের মত বাকুনিনও অপরাধের জন্যে দায়ী করেছেন সমাজব্যবস্থাকে। শাস্তির মত অন্যায় আর নেই, কারণ

"যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হইয়াছে এবং যাহার আওতায় সে এখনও বর্তমান, ব্যক্তি তাহারই অনিচ্ছাকৃত উৎপন্ন জীব।"[৮]

অতএব হিতোপদেশে কিছু হয় না।

"মানুষকে নীতিবান করিতে হইলে দরকার তাহার সমাজপরিবেশকে নীতিবান করা। ইহার উপায় মাত্র একটি,—সকলকে ন্যায্য প্রাপ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া, অর্থাৎ সকলের সম্পূর্ণ সমতার মধ্যে প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা।" ('ইন্টিগ্র্যাল এডুকেশন,' ম্যাক্সিমফ, ১৫৫)

ঐশ্বরিক নীতিশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে প্রভুত্ব ও মানুষের অবনতির ওপর, মানবিক নীতিবোধ দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সাম্য ও মুক্তির ওপর। ঐশ্বরিক নীতিশাস্ত্র শ্রমকে বলেছে পাপের শাস্তি, মানবিক নীতিবোধ শ্রমকে দিয়েছে মর্যাদা।

"আমরা বিপ্লবের সন্তান, বিপ্লবের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি মানবতার ধর্ম, দেবতার ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর আমাদিগকে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" ('ফেডারেলিজ্‌ম্‌', ম্যাক্সিমফ ১৪২)

এসব প্রুদঁর কথার পুনরাবৃত্তি। ঐতিহাসিক জড়বাদের শিক্ষাও বাকুনিন প্রথম পান প্রুদঁর কাছে—

"হাঁ, প্রুদঁ ঠিক বলিয়াছেন, আদর্শ একটি ফুল যার শিকড় জীবনের বাস্তব অবস্থায় নিহিত। মানুষের দার্শনিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস কেবল আর্থিক ইতিহাসের প্রতিফলন।" ('গড এণ্ড দি স্টেট', ৯)

---

৭ গড এণ্ড দি স্টেট, ৩০ পৃষ্ঠা।

৮ ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্রাসীর কার্যসূচী।

এ তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ হয়েছে মার্ক্সের কলমে। তাঁর কাছে বাকুনিন ঋণ স্বীকার করেছেন। তাঁর অজস্র পত্রে ও পুস্তিকায় আছে মার্ক্সের ধনতান্ত্রিক শোষণ, প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া অধিকার, শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্য ইত্যাদি সূত্রের পুনরুক্তি। সম্পত্তিপ্রথার বিশ্লেষণে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি মার্ক্সের অনুগামী। কিন্তু একটি বিষয়ে আছে মৌলিক পার্থক্য। তিনি সম্পত্তিকে এনেছেন রাষ্ট্রের আগে নয়, পরে। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্রিক অবস্থার উৎপত্তি আর্থিক অবস্থা থেকে,

> "সে বলে দারিদ্র্য রাষ্ট্র ও তাহার দাসত্বের জন্ম দেয়। সে সায় দিবে না যদি কথাটা ঘুরাইয়া বলা হয়—রাষ্ট্র এবং তাহার দাসত্বও নিজেদের বজায় রাখিবার জন্য দারিদ্র্য সৃষ্টি করে ও জীয়াইয়া রাখে, এবং দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে রাষ্ট্রকে নাশ করা দরকার।"[১]

শ্রমিককে শোষণ করে জমা হয় সম্পত্তি ও পুঁজি। রাষ্ট্রের প্রথম কাজ হল আইনের বলে সম্পত্তিকে রক্ষা করা অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করবার অধিকারটিকে কায়েম করা। সুতরাং রাষ্ট্রকে আগে উচ্ছেদ করা দরকার। রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার কথা বলে মার্ক্স বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন। বুর্জোয়া শাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর শ্রমিক-শাসিত একতান্ত্রিক রাষ্ট্র দুয়ে আসলে কোন তফাত নেই। এ বিষয়ে বাকুনিনের মন্ত্রগুরু প্রুধঁ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তকরণ ও নৈরাজ্যের আদর্শ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। বাকুনিনের বিদ্রোহী স্বভাব যে একটা নাশাত্মক দর্শনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল তার কৃতিত্ব প্রুধঁর। প্রুধঁর দর্শনের জোরেই তিনি পরে মার্ক্সের সঙ্গে লড়তে পেরেছিলেন।

বাকুনিনের চিন্তাগুলি ধারালো উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে দর্শনের পরিণতি ও সামঞ্জস্য নেই। তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যেত আবেগে। প্রজ্ঞাকে ছাপিয়ে উঠত কর্মের নেশা। তাঁর রাজনীতিতে ছিল বেশ কিছু জাত্যন্ধতার খাদ। শ্লাভপ্রীতি, ইহুদী ও জার্মান বিদ্বেষ ছিল তাঁর অস্থিমজ্জায়। ১৮৬২ সালে ভ্রাতৃবধূ নাটালীকে তিনি এক পত্রে লিখছেন—

> "পোল, রুশ ও শ্লাভজাতির ইষ্টকামনায় আমি কর্মব্যস্ত হইয়া আছি এবং নিয়মিতভাবে একান্ত বিশ্বাসের সহিত জার্মানদের বিরুদ্ধে

১ মাক্সিমভ্‌, ফ্রীডম এণ্ড দি স্টেট, অনুবাদ ও সম্পাদনা, কে. জে, কেনাফিক, লণ্ডন। ৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা।

বিদ্বেষ ছড়াইতেছি। ঈশ্বর প্রসঙ্গে ভলতেরের উক্তির অনুকরণ করিয়া আমি বলি যদি জার্মানরা নাও থাকিত তাহা হইলেও জার্মানদিগকে আবিষ্কার করিতে হইত কারণ সুগভীর জার্মান বিদ্বেষ শ্লাভদিগকে যেমন একতাবদ্ধ করিতে পারে তেমন আর কিছুতে নয়।"[১০]

মার্ক্স্ ছিলেন জার্মান ইহুদী, বাকুনিন শ্লাভ রুশ। উভয়ে যে অহিনকুল সম্পর্ক দাঁড়াবে তা আর বিচিত্র কি?

উইটলিং ও প্রুদঁ বাকুনিনের কানে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি সিদ্ধ হলেন সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে আসার পর। "বিপ্লবের বিতর্কিকা" ও পরবর্তী লেখায় তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হল সর্ববিধ কর্তৃত্ব। কর্তৃত্ব কর্তা ও দাস দুজনকেই হেয় করে—কারণ তার কাজের ধারা জবরদস্তি, বুদ্ধি ও অন্তরের কাছে আবেদন নয়। জোরজুলুম আদিম কালের চাল, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এ চাল অচল হবে। জোরজুলুম সমাজে তিন আকারে অধিষ্ঠিত—ধর্ম, রাষ্ট্র ও সম্পত্তি। "ফেডারেলিজ্ম্, সোস্যালিজ্ম্ এণ্ড এণ্টিথিয়লজিজ্ম্" ইস্তাহারে তিনি এদের অপসারণ করবার উপায় বাতলালেন। ধর্মকে সরকারী ও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে বার করে দিতে হবে, ধর্ম হবে যার যার ব্যক্তিগত বিবেকের ব্যাপার। রাষ্ট্র তুলে দিতে হবে, তার জায়গায় থাকবে সমাধিকারী ব্যক্তি, স্বাতন্ত্র্যশীল কমিউন ও প্রদেশ এবং পরস্পরের সহযোগ। বর্তমান সম্পত্তিপ্রথার আমূল পরিবর্তন করে বিত্ত, শ্রম, অবসর ও শিক্ষা সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

সকল প্রকার কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর হল রাষ্ট্র। সম্পত্তি ও ধর্মের জুলুম রাষ্ট্রশাসনের ওপর ভর করে আছে। রাষ্ট্র ভেঙে পড়লে এরা হবে নিরালম্ব। সুতরাং নৈরাজ্যবাদীর লড়াই প্রধানত রাষ্ট্রের সঙ্গে।

"পশুবলের উপর বিধাতার আশীর্বাদ লইয়া রাষ্ট্রের জন্ম। ইহা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজ নহে যেখানে সকলের যৌথ জীবন প্রত্যেকের জীবনকে ধারণ করিয়া আছে। ঠিক তার বিপরীত। ইহাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের বলিদান হয়। জীবন্ত

১০ ই. এইচ. কার: মাইকেল বাকুনিন। ২৫১ পৃষ্ঠা।

সমাজকে নষ্ট করিয়া ইহা তাহার কায়াহীন ছায়া লইয়া দাঁড়ায়। সর্বসাধারণের স্বার্থের নাম করিয়া ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত, এমন কি সমূলে বিনাশ করে, তাহার জীবনকে পঙ্গু করে। এ এক সর্বগ্রাসী সার্বজনীনতা যার বেদীমূলে স্বাভাবিক সমাজের বলিদান হয়।" ('দেশপ্রেমের পত্রাবলী', ম্যাক্সিমফ, ২১৬)

রাষ্ট্রের কোন নীতির বালাই নেই। পরস্পর বিবাদ বিদ্বেষ ও অবিরাম যুদ্ধ এই ঐদের কারবার। চুরি, বাটপাড়ি, ডাকাতি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা রাজনৈতিক ধুরন্ধররা রাষ্ট্রস্বার্থের নামে অহরহ না করে থাকেন।

"সুতরাং রাষ্ট্র কখনো সৎ ন্যায়বান ও নীতিবান হইতে পারে না। সকল রাষ্ট্র এই অর্থে মন্দ যে তাহারা যে ধাতুতে যে উদ্দেশ্যে গড়া সেই স্বভাবদোষে মানবিক ন্যায় নীতি ও মুক্তির আমূল পরিপন্থী।[১১]"

রাজনীতি জনতাকে শাসন ও শোষণ করবার ফিকির। প্রভুত্বের সূত্র হল এই যে,

"যেহেতু জনগণ কখনই আপনাদিগকে শাসন করিতে পারে না সেহেতু তাহাদিগকে সদাসর্বদা কোন না কোন কল্যাণকামী জ্ঞানী ও বিচারকের শাসন মানিয়া চলিতে হইবে।... জনগণ কর্তৃক এই প্রকারে স্বীকৃত ও সম্মানিত প্রভুত্ব তিন উপায়ে আসিতে পারে—বল, ধর্ম ও উচ্চতর বুদ্ধি। আর এ সবগুলি থাকে লঘুতর সংখ্যার জিম্মায়।"[১২]

গণতন্ত্রের আইনে জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রভু। কিন্তু তাদের না আছে শিক্ষা, দিনগত পাপক্ষয়ের পর না আছে অবসর। বাধ্য হয়ে তারা প্রভুত্ব ছেড়ে দেয় কায়েমীস্বার্থদের হাতে। তারা মাস্টার জনতা বেয়াড়া ছাত্র, তারা মেষপাল জনতা মেষ।

"মেষপালক হইতে সাবধান। কারণ যেখানে ভেড়ার পাল আছে সেখানে আছে মেষপালক তাহাদের পশম ও পেট কাটিবার জন্য।" ('গড এণ্ড দি স্টেট', ৩৯)

---

১১ লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম-এর কংগ্রেসে দেওয়া বক্তৃতা। কার: ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

১২ মার্ক্সিজম্ ফ্রীডম এণ্ড দি স্টেট, ৩৭ পৃষ্ঠা।

এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা কিংবা গণভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ যে বা যারাই দেশ শাসন করুক, তাতে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় না। অনতিবিলম্বে প্রতিনিধিবর্গ হয়ে দাঁড়ায় এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ যারা জাত হাকিম, শাসন চালানো যাদের এখ্‌তিয়ার। যদিও বা গুণী ও সৎ লোকেরা নির্বাচিত হয় হুকুম করার অভ্যাস তাদের চরিত্র নষ্ট করে, ক্ষমতা ও সুবিধার মোহে তারা ভ্রষ্ট হয়। ক্ষমতার অবধারিত পরিণাম জনতার প্রতি অবজ্ঞা ও আত্মপ্রসাদের অতিরঞ্জন। শ্রমিকরাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একবার পার্লামেণ্টে এলে তাদেরও মাথা ঘুরে যায়। বুর্জোয়াদের পার্লামেণ্টারী কায়দাকানুন রপ্ত হবার পর তারা আর শ্রমিক থাকে না তারা হয় রাজনীতিজ্ঞ, পলিটিশিয়ান।

প্রুধঁ বলেছিলেন সার্বজনীন ভোটাধিকার বিপ্লব-বিরোধী। বাকুনিন এই বচনের বিস্তার করেছেন।

> "যতক্ষণ লঘুসংখ্যক লোক দেশের বিত্ত ও পুঁজি করায়ত্ত করিয়া জনগণ তথা শ্রমিক সাধারণের উপর আর্থিক আধিপত্য খাটায় ততক্ষণ জনসাধারণ রাজনৈতিক অর্থে মুক্ত ও স্বাধীন হইলেও তাহাদের সার্বজনীন ভোটের নির্বাচন ফলত ছলনাময় ও অগণতান্ত্রিক হইয়া দাঁড়ায়। নির্বাচনের ফল জনসাধারণের প্রয়োজন, প্রবৃত্তি ও প্রত্যাশার প্রতিকূল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।" ('নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য', ম্যাক্সিমফ, ২১৩)

প্রুধঁর ন্যায় বাকুনিনেরও ছিল সংবিধান ও আইনসভায় বিতৃষ্ণা। ইয়োরোপের পার্লামেণ্ট ও কংগ্রেসগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপ দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। এদের দলাদলি, বাক্‌বিতণ্ডা এবং কথা ও কাজে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখে তিনি বুঝেছিলেন এরা জনতার মানুষ নয়। 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি'তে তিনি লিখছেন—

> "প্রতিনিধিমূলক শাসন, বৈধানিক ব্যবস্থা, পার্লামেণ্টের অভিজাত শ্রেণী এবং তথাকথিত ক্ষমতার ভারসাম্য—যাহাতে রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যে কোনটিই কার্যকরী হইতে পারে না,—এককথায় পাশ্চাত্য উদারনৈতিকদের চুলচেরা সুচতুর অন্তঃসারশূন্য রাষ্ট্রদর্শনের বাক্যজাল,— এ সকলকে আমি কখনও প্রশংসা, সহানুভূতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে পারি নাই। তারপর যখন আমি ফ্রান্স, জার্মানী, এমন কি শ্লাভ কংগ্রেসেও পার্লামেণ্টারী

গণতন্ত্রের পরিণাম দেখিতে পাইলাম তখন হইতে এ সকলকে আমি আরো বেশি অবজ্ঞা করিতে শুরু করিয়াছি।" ('কার', ১৭২)

পার্লামেন্টারী শাসন আসলে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশধারী স্বৈরশাসন। মানুষকে নিজের অধিকার নিজের হাতে রাখতে হবে। নূতন সমাজের বনিয়াদ হবে যে স্বাধীনতা তা প্রতিনিধি দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে না।

"রাষ্ট্রাধিকারের সাম্য এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই কথাগুলির মধ্যে এক জাজ্বল্যমান বৈষম্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রাধিকার বলিতে বুঝায় বল, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, তার মানে অসাম্য। যেখানে সকলেই শাসক, সেখানে কেহ শাসিত নয়, সেখানে রাষ্ট্র নাই। যেখানে সকলে সমান মানবাধিকার ভোগ করে সেখানে রাষ্ট্রাধিকার থাকিবার কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রাধিকার অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিশেষ সুবিধা। যেখানে সকলের সুযোগ সুবিধা সমান সেখানে বিশেষ সুবিধার জায়গা নাই, রাষ্ট্রাধিকারও নাই। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাধিকারের সমতা বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের বিনাশ ও যাবতীয় রাষ্ট্রাধিকারের বিলোপন।" ('সমাজ বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিক মৈত্রী', ম্যাক্সিমফ, ২২২-২৩)

স্বাধীনতাকে ভেঙে টুকরা টুকরা করা যায় না। কিছুটা স্বাধীনতা খর্ব করে বাকিটুকু রাষ্ট্রের মারফত সুরক্ষিত করার যুক্তি একেবারে অসার।

"ঐ যেটুকু স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া হইতেছে ঐটুকু আমার সব, আমার স্বাধীনতার সার। অতি স্বাভাবিক অনিবার্য প্রয়োজনে আমার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঠিক ঐ জায়গাটুকুর মধ্যে আসিয়া জড় হইয়াছে।" ('ফেডারেলিজ্ম্', ম্যাক্সিমফ, ২০৯)

মুক্তির মূল সমাজে। একে পাওয়া যাবে তখনই যখন রাষ্ট্রকে ভেঙে দিয়ে ব্যক্তি সকল রকম কর্তৃত্ব থেকে ছাড়া পাবে, সকলে সমাজের সমান সভ্য হয়ে দাঁড়াবে।

"রাষ্ট্রের আত্মা দেশপ্রেম। স্বভাবজাত দেশপ্রেম একটি জৈব বৃত্তি। এ এক যূথজনীন আত্মম্ভরিতা, যে পৈত্রিক বা ঐতিহ্যবাহী জীবনশৈলী সমাজের স্বীকৃতি পাইয়াছে তাহার প্রতি জন্মগত যুক্তিহীন যন্ত্রপর আকর্ষণ, এবং অন্যবিধ জীবনশৈলীর বিরুদ্ধে তেমনি অন্ধ যন্ত্রবৎ শত্রুতা।" ('দেশপ্রেমের পত্রাবলী,' ম্যাক্সিমফ, ২২৭)

গাঁয়ের কুকুরগুলো যেমন স্বাধীনভাবে চলেফেরে যে যার ওপর পারে জোর খাটায়, কিন্তু ভিনগাঁয়ের একটি কুকুর যদি তাদের সামনে এসে পড়ে অমনি সারমেয়গণতন্ত্রের যত বিশিষ্ট নাগরিক হৈ হল্লা করে হতভাগ্য আগন্তুকের ওপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে দেশপ্রেমিকরাও ঠিক তেমনি।

যে জাতি যত পিছিয়ে আছে অভ্যস্ত জীবনের ওপর জৈবিক টান ও অনভ্যস্ত অন্য জীবনের ওপর ঘৃণা তার তত বেশি। ইতিহাসের সূচনায় বর্বরদের মধ্যে ভাষা, দেবদেবী, পুরোহিত এবং জাদুকরকে নিয়ে যে গোষ্ঠীপ্রীতি জাগরূক ছিল, যা জাতিযূথের বাইরে কোন কিছু মানত না, দেশপ্রেমের সূত্রপাত সেইখান থেকে। মেরুদেশের লোকেরা এখনো বাস করে পশুর মত, অতি সামান্য প্রয়োজনও তাদের মেটাবার সাধ্য নেই, তবু তারা অন্যত্র নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। আর ফরাসী জার্মান ও ইংরাজ, যারা প্রগতির পুরোভাগে চলছে তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

স্বদেশের প্রতি ভালবাসা একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এ নিয়ে বড়াই করবার কিছু নেই। অহংকারে অন্ধ হয়ে পিতৃভূমির গৌরব ও প্রতাপ বাড়াবার জন্যে মাতামাতি করা একটা বিকার।

> "জাতীয়তা একটা বাস্তব সত্য, যেমন ব্যক্তিত্ব বাস্তব সত্য—ইহা কোন নীতি নয়। ছোট বড় সকল জাতির নিজের স্বভাবধর্মে বসবাস করিবার অবিসংবাদী অধিকার আছে। ইহা সর্বপ্রযুজ্য স্বাধীনতা-নীতির অনুসিদ্ধান্ত।" ('নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য,' ম্যাক্সিমফ, ৩২৫)

দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাদ দিলে স্বাভাবিক দেশপ্রীতি সমাজে স্বচ্ছন্দ সহ-যোগিতার আকার নেয়।

> "সামাজিক একতার অভ্যুদয় হয় ঐতিহ্য, অভ্যাস, প্রথা, ভাবধারা, বর্তমান অনুষ্ঠান এবং সমবেত আশাআকাঙ্ক্ষার যোগাযোগে। ইহা সচল সফল বাস্তব একতা। আর রাষ্ট্রীয় একতা মিথ্যা, একতার ছলনা। ইহার মধ্যে বৈষম্য লুকাইয়া আছে। শুধু তাহাই নয়। যেখানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে একটি সক্রিয় ঐক্য অবশ্য গড়িয়া উঠিত সেখানে ইহা কৃত্রিম উপায়ে বৈষম্য সৃষ্টি করে।" ('ইটালীর বন্ধুদের প্রতি পত্র' ম্যাক্সিমফ, ২৭২)

ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি ইতালীতে যে জাগরণের ঢেউ এনেছেন তার গৌরব একতাবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠনে নয়। বরং এইটেই হয়েছে তাদের ভুল,

কারণ স্বাধীনতা ও জনগণের উন্নতি না হারিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করা যায় না। এর সার্থকতা এইখানে যে এই আন্দোলন ইতালীয় জনতার সামাজিক সংহতির বিঘ্নস্বরূপ ছোট ছোট প্রভুত্বশীল রাজ্যগুলিকে বিনাশ করেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে দেশপ্রেম মানে সুবিধাভোগীদের স্বার্থে মানবতার বিরুদ্ধাচার। প্রজার ধর্ম রাষ্ট্রানুগত্য, রাষ্ট্রের কাজ শোষকদের স্বার্থ বাঁচিয়ে চলা। এই স্বার্থ যখন বিপন্ন হয় তখন সুবিধাভোগীরা দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর পায় সঁপে দিতে কসুর করে না, যেমন ১৮৭০ সালে ফরাসী বুর্জোয়ারা জার্মানদের পায় তাদের স্বাধীনতা সঁপেছিল। কিন্তু যদি তাদের স্বার্থ শ্রমিকদের হাতে বিপন্ন হয়, এবং যদিও বা শ্রমিকরা স্বাধীনতার জন্যে লড়তে থাকে তাহলে গায়ের জোরে তাদের দমন করতে ইতস্তত করে না, যেমন ১৮৭১ সালে তারা পারী কমিউনকে দমন করেছিল। তাদের কাছে বিদেশীর আক্রমণের চেয়ে সমাজবিপ্লব গুরুতর সংকট। খাঁটি দেশভক্ত হল প্রলিতারিয়রা যারা দেশরক্ষার জন্যে এগিয়ে এসেছিল, যদিও তাদের পিতৃভূমি প্রসারিত হয়েছিল দুনিয়ার মজদুরকে নিয়ে। ('রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ')

১৮৪২ সালে বাকুনিন 'জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছিলেন

> "আমরা সেই চিরন্তন চিৎশক্তির উপর আস্থা রাখিব যাহা ধ্বংস ও বিলোপ করে জীবনের অজ্ঞেয় অবিরাম সৃষ্টি-উৎস বলিয়াই। বিনাশের বাসনা সৃষ্টিরই বাসনা।"

দুর্দান্ত নাশবৃত্তির সঙ্গে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ মিলিয়ে রচিত হয়েছে বাকুনিনের বিপ্লববাদ। নৈরাজ্যবাদে আসবার আগেই এর খসড়া তৈরি হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে 'শ্লাভদের প্রতি আবেদন'-এ তিনি লিখছেন,

> "এই স্থবির সমাজ জগৎকে আপাদমস্তক উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে, ঊষর অক্ষম এই সমাজের সাধ্য নাই এই প্রচণ্ড মুক্তির উচ্ছ্বাসকে ধারণ করে। সকলের আগে শোধন করিতে হইবে আবহাওয়া, বদলাইতে হইবে আমাদের জীবনের পরিবেশ যাহা আমাদের বৃত্তি ও বাসনা কলুষিত করিতেছে, অন্তর ও বুদ্ধি সংকুচিত করিতেছে। সামাজিক প্রশ্ন প্রধানত বর্তমান সমাজের উচ্ছেদের প্রশ্ন।" ('কার' ১৭৩)

"বিপ্লবের বিতর্কিকা"য় নাশকতা নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল। নিরাজ সমাজের ভূমিকা হল মহাপ্রলয়।

"বিপ্লব মানে যুদ্ধ আর যুদ্ধ মানে মানুষ ও বস্তুর বিনাশ। বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত অগ্রগতির কোন শান্তিপূর্ণ উপায় আবিষ্কার হয় নাই, রক্তস্নানের মধ্য দিয়া ইতিহাস তার প্রত্যেকটি পা ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ইহার জন্য প্রতিক্রিয়া বিপ্লবে দোষারোপ করিতে পারে না কারণ বিপ্লবের অপেক্ষা প্রতিক্রিয়ার হাতে রক্তপাত হইয়াছে বেশি।"

গড়বার ভাবনা এখন নয়। এযুগে শুধু নাশ, ধ্বংস, কোন কিছুর অবশেষ থাকবে না। এযে কেবল বিপ্লবীর নেশা তা নয়। সে কাল বয়ে এনেছিল মহাকালের পদধ্বনি, আকাশে ছিল মেঘের গর্জন বাতাসে ঝড়ের নিঃস্বন। ১৮৪৮-এর ধূলিসাৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সংহার মন্ত্রে। হাবুৎজেনের মত একজন স্থিতধী প্রচারকও তাঁর "ঝড়ের পরে" বইতে এই জাগরণের সম্বর্ধনা করেছিলেন—'গোল্লায় যাক সারা দুনিয়া, ধ্বংস ও উচ্ছৃঙ্খলার জয় হোক।' আদর্শবাদীর শেষ স্বপ্ন ছিল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা সমাজে আনবে ন্যায়ের বিধান। সে স্বপ্নসাধ মিলিয়ে যাবার পর আশার আর কোন আশ্রয় রইল না। ইয়োরোপের জনমানসকে অধিকার করে বসেছিল এক ভয়ংকর সর্বনাশা নেতিবাদ যা স্টার্নারের মত দর্শনে আবদ্ধ নয়, যার যুক্তি কথায় নয়, হিংসাত্মক কর্মে। এই অব্যক্ত আবেগকে ভাষা দিলেন বাকুনিন, তাঁর বিপ্লববাদ সমকালীন ক্ষিপ্ত যুযুৎসার তূর্যধ্বনি।

১৮৬৯ সালে রুশের তরুণ পলাতক বিপ্লবী সার্জী নেচাএভ জেনেভায় এসে বাকুনিনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি ছিলেন বাকুনিনের চেয়েও উগ্র, ন্যায়নীতির ধার ধারতেন না। গুরুশিষ্য মিলে তিনটি বেনামী ইস্তাহার রচনা করলেন, "বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে আসিয়াছে", "বিপ্লবের নীতিকথা" এবং "বিপ্লবের বিতর্কিকা"[১৩]। তিনখানি পুস্তিকায় আছে নাশকতার পাঠ, নির্মম নির্বিবেক হিংসাত্মক কাজের ফিরিস্তি।

১৩ এটি ১৮৬৬ সালের বিতর্কিকা থেকে স্বতন্ত্র। বাকুনিনের ভক্তরা স্বীকার করেন না যে বই তিনটির মুসাবিদায় তাঁর কোন হাত ছিল। কেনাফিক "মার্কস্‌বাদ, মুক্তি ও রাষ্ট্রে"র ভূমিকায় বাকুনিনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। ম্যাক্সিমফ তাঁর সংকলনে এই ইস্তাহারগুলিকে ও 'জারের

প্রথমটি রুশ কৃষাণদের চিরাচরিত বিদ্রোহ-প্রণালী দস্যুবৃত্তির বন্দনা।

"দস্যুবৃত্তি রুশ জাতীয় জীবনের অতি সম্মানিত বৈশিষ্ট্য।...একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী রুশের দস্যু, যে গরম কথায় ও কেতাবী বিদ্যায় বিপ্লবী নয়, আপোসহীন ক্লান্তিহীন দুর্দমনীয় কর্মের বিপ্লবী।.. যে রুশে ষড়যন্ত্র করিয়া গণবিপ্লব সাধন করিতে চায় তাহাকে ঐ রাজ্যে যাইতে হইবে। স্টেংকা রাজিন ও পুগাচেভের বর্ষতিথি সমাগত। এই জনযোদ্ধাদের সম্মানে উৎসব পালনের সময় আসিয়াছে।"[১৪]

দ্বিতীয় ইস্তাহারটির নির্দেশ আরো সরল সুস্পষ্ট।

"আমরা নাশকার্য ছাড়া অন্য কাজের মূল্য বুঝি না। অবশ্য আমরা স্বীকার করি এ কাজ নানা আকার লইতে পারে—যথা, বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাদি। এই যুদ্ধে যাবতীয় কুকর্ম বিপ্লবের ছোঁয়ায় পবিত্র হইয়া যায়।" ('কার' ৩৭৯-৮০)

তৃতীয় পুস্তিকা "বিপ্লবের বিতর্কিকা" গুপ্ত ষড়যন্ত্রের নির্দেশিকা। এতে আছে গুপ্ত সমিতির নিয়মকানুন ও সভ্যদের কর্তব্য সম্বন্ধে কঠোর নির্দেশ।

"বিপ্লবীর জীবন উৎসর্জিত। তাহার সর্বস্ব দখল করিয়া থাকিবে এক আগ্রহ, এক চিন্তা, এক কামনা—বিপ্লব (ধারা ১)।

আজিকার নীতিশাস্ত্র, ইহার ভিতরের অভিসন্ধি ও বাহিরের অভিব্যক্তি তাহার নিকট জঘন্য ও বর্জনীয়। তাহার কাছে যাহা বিপ্লবের অনুকূল তাহাই নীতি-সঙ্গত, যাহা প্রতিকূল তাহাই অপরাধ ও অন্যায় (ধারা ৪)।

'প্রতি স্বীকারোক্তি'-কে স্থান দেননি, সম্ভবত লেখকের যশের হানি হয় বলে। নেট্‌ল, কার প্রভৃতি লেখক বাকুনিনকে দায়মুক্ত করতে রাজী নন কারণ তাঁর রচনাভঙ্গী ও শব্দসম্ভার বইগুলিতে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

১৪ ১৬৭০ সালে ডনতীরের কসাক স্টেংকা রাজিন দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে জার আলেক্সিসের বিরুদ্ধে এক চাষীবিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তাঁর দল কয়েকমাস ধরে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করে বেড়িয়েছিল। মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে অনেক উপকথার সৃষ্টি হয়। এর ঠিক একশ বছর পরে মহারানী ক্যাথারিনের সময়ে এমিলিয়ান পুগাচেভ আরো ভয়ঙ্কর এক কিষাণ বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এক প্রতিসরকার গঠন করে তিনি চাষীদের মুক্তি, জমিদারদের মৃত্যুদণ্ড ও তাদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি ঘোষণা করেন। দু বছর ধরে ভলগা উপত্যকার বহুল অংশ তাঁর অধিকারে ছিল এবং তিনি সাম্রাজ্যের বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন।

একটি মাত্র বিজ্ঞান তাহার জানা আছে, ধ্বংসের বিজ্ঞান। কেবল এই উদ্দেশ্যে সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং সম্ভব হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে (ধারা ৫)।

অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক জ্ঞান—নির্দয় সংহার (ধারা ৬)।"[১৫]

পরের ধারাগুলি কুটিলতা ও নৃশংসতায় অতুলনীয়।

বিপ্লবীর প্রাথমিক কাজ রাষ্ট্রের বিনাশ। সরকারী দপ্তর, আইন সভা, আদালত, সেনা, পুলিস, চার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, সম্পত্তির দলিল সব দূর করতে হবে। দেনাদাররা ধার শোধ দেবে না। প্রজারা খাজনা দেবে না। আইনের দেওয়া অধিকার, দলিলপত্র, দানপত্র, উইল, কবালা, আদালতের সমন—কেউ এসব মানবে না। পুঁজি ও কলকারখানা শ্রমিকসংঘের হাতে চলে আসবে এবং সামুদায়িক উদ্যোগে ব্যবহৃত হবে। চার্চ ও সরকারের সম্পত্তি এবং ব্যক্তির জমানো সোনারূপা বাজেয়াপ্ত হবে। সরকারী নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হবে।

প্রাগের বিদ্রোহে (১৮৪৮) তিনি যা যা করতে চেয়েছিলেন 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি'-তে বাকুনিন তার ফিরিস্তি দিয়েছেন।

> "আমি স্থির করিয়াছিলাম অভিজাত ও বিরুদ্ধাচারী যাজকদিগকে তাড়াইয়া দিব এবং নির্বিচারে সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার কিছু অংশ ভূমিহীন কৃষাণদের মধ্যে বিলি করিব যাহাতে তাহারা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেয়, আর বাকি অংশ রাখিব বৈপ্লবিক তহবিলে। আমি স্থির করিয়াছিলাম অভিজাতদের দুর্গগুলি ভাঙিয়া ফেলিব, বোহেমিয়ার যেখানে যত দলিলের তাড়া আছে, লাল ফিতায় বাঁধা যত সরকারী কাগজপত্র সব পুড়াইয়া ফেলিব, সমস্ত বন্ধকী তমসুক ও দু হাজার গিল্ডেনের উপর যত দেনার খত সব মকুব করিয়া দিব। মোট কথা আমার পরিকল্পিত বিপ্লব ছিল ভয়ঙ্কর অভূতপূর্ব, যদিও ইহার আঘাত ছিল মানুষের অপেক্ষা বস্তুর উপরে বেশি।" (১৯৮ পৃষ্ঠা)

---

১৫ ম্যাক্স নোম্যাড : এপসল্‌স অব রিভল্যুশন, বস্টন, ১৯৩০, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা। অতিগর্হিত ধারাগুলোর মুসাবিদায় সম্ভবতঃ বাকুনিনের হাত ছিল না। তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল. তিনি ভালবাসতে জানতেন। স্ত্রী, বন্ধু, ভাই সকলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর দরদ। পরে এই সকল দুর্নীতির জন্যে নেচায়েভের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

লিয়ঁর বিদ্রোহের (১৮৭০) সময়ে 'দেশরক্ষার যুক্ত সমিতি'র পক্ষ থেকে বাকুনিন একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এতে নির্দেশ ছিল সরকারী শাসন-যন্ত্র রদ হয়ে যাবে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উঠে যাবে, তার জায়গায় আসবে পঞ্চায়েতী বিচার, খাজনা দেওয়া বন্ধ হবে, তার বদলে কমিউনগুলি দেশরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে বডলোকদের কাছ থেকে চৌথ আদায় করবে এবং তার কিছু ভাগ যুক্তসমিতির তহবিলে দেবে। দায় দেনা সব দূর হবে। পৌরসভাগুলি ভেঙে দিয়ে তাদের জায়গায় বসবে দেশরক্ষা সমিতি, এরা জনগণের তদারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে ('কার', ৪০২-০৩)।

এ সকল বিবর্তন গৃহযুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। তাতে ভয় পেলে চলবে না।

> "গৃহযুদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির কাছে অতি ভয়াবহ। আর এই কারণেই ইহা জনতার আত্মপ্রয়াস জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদের মানসিক, নৈতিক এমন কি আর্থিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। ইহার কারণ খুব সরল। সরকার পক্ষের আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণ ভেড়ার পালের মত শান্ত হইয়া থাকুক যাহাতে মেষপালকরা ইচ্ছামত তাহাদিগকে চরাইতে ও তাহাদের পশম ছাঁটিতে পারে। গৃহযুদ্ধ জনতার এই মেষসুলভ নিষ্ক্রিয়তা ভাঙিয়া দেয়।" ('নাউটো-জার্মান সাম্রাজ্য', ম্যাক্সিমফ, ৪০৭)

গৃহযুদ্ধ অনন্তকাল ধরে চলে না—কিছুকাল পরে আপনি থেমে যায়। আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি মানুষকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবে। কিছুকাল লড়াই করবার পর তারা একটা বোঝাপড়ায় আসবে।

> "আহার ও সন্তানপালনের প্রয়োজন এবং তার জন্য জমি চাষ করিবার ও ক্ষেতের কাজ চালাইয়া যাইবার প্রয়োজন, গৃহ পরিবার এবং আপন প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়োজন, এই সকল প্রয়োজন তাহাদিগকে পরস্পরে আপোস করিতে বাধ্য করিবে।" ('একজন ফরাসীর প্রতি পত্র', ম্যাক্সিমফ, ৪০৭)

ফতোয়া জারি করে বিপ্লব হয় না, জনতাকে নিষ্ক্রিয় রেখে বিপ্লবীদল আচমকা কেন্দ্রীয় শক্তি দখল করলেও বিপ্লব হয় না। আসল কথা গণ-অভ্যুত্থান। বহু রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে ব্যক্তির নেতৃত্বে। সমাজবিপ্লবে ব্যক্তিনেতৃত্ব অচল, শুধু তাই নয়, এর যে প্রধান লক্ষ্য জনগণের মুক্তিসাধন তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

> "সমাজবিপ্লব সর্বপ্রকারে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঠিক বিপরীত। ইহাতে ব্যক্তির বীর্যবত্তার কোন দাম নাই, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপই সব। ব্যক্তির কাজ শুধু গণচেতনার অনুসারী চিন্তাধারার বিস্তার, ব্যাখ্যান ও প্রচার, অবিরাম প্রচেষ্টায় জনতার স্বভাবশক্তির বৈপ্লবিক সংগঠন, ইহার অধিক কিছু নয়। বাকি যা কিছু কাজ তাহা জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে।" ('পারী কমিউন ও রাষ্ট্র', ম্যাক্সিমফ, ৩২)

বিপ্লবের সামনে থাকবে জনতা পিছনে থাকবে নেতৃত্ব। নেতৃত্ব জনতাকে উস্‌কানি দেবে, কাড়াকাড়ি লুটপাটের কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নেবে। এই কায়দাটি খোলাখুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে 'একজন ফরাসীর প্রতি পত্রে'।

> "জনসাধারণ নিজেরাই যাজকদের উপর হাত তুলিবে আর বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় স্বাধীনতার নাম করিয়া যাজকদিগকে রক্ষা করিবার ভান করিবে। আমাদের শত্রুদের চালাকি আমরা নকল করিব। দেখ না সরকার বাহাদুররা কেমন বড় গলায় স্বাধীনতার কথা বলে আর কাজের বেলা তাহারা পুরাদস্তুর প্রতিক্রিয়াশীল। বিপ্লবী কর্তৃপক্ষও তেমন মিষ্টিকথা বলিতে সংকোচ করিবে না। তাহারা একদিকে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও সংযত ভাষা প্রয়োগ করিবে অন্যদিকে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া যাইবে।" (ম্যাক্সিমফ, ৩৯৬)

যদিও জনশক্তিই বিপ্লবের প্রাণ তবু তাকে সংহতভাবে স্থির লক্ষ্যে পরিচালনা করবার জন্যে বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যে আদর্শে নিবেদিত বিপ্লবীদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়তে হবে। এর খসড়া দেওয়া হয়েছে 'স্বীকারোক্তি'তে।

> "গুপ্ত সমিতিতে থাকিবে তিনটি বিভাগ, পরস্পরে কোন যোগাযোগ ও পরিচয় থাকিবে না। একটি নগরবাসীদের জন্য, একটি তরুণদের জন্য, একটি কৃষকদের জন্য। প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ শ্রেণীর পরিবেশ অনুযায়ী আন্দোলনের ধারা স্থির করিবে। প্রত্যেক বিভাগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবে। সকলের উপরে থাকিবে তিনজন কি বড়জোর পাঁচজন লইয়া একটি কেন্দ্রীয় গুপ্ত সমিতি। বিপ্লব সার্থক হইলে সমিতি ভাঙিয়া দেওয়া হইবে না, বরং ইহাকে আরও বিস্তার করিয়া

শক্তিশালী করিয়া পুনর্গঠনের কাজে বহাল রাখা হইবে।" (২০৮-০৯ পৃষ্ঠা)

১৮৬৬ সালে নেপ্‌ল্‌স্‌-এ বাকুনিন 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসংঘ' নাম দিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গড়বার চেষ্টা করেন। এর মাথায় ছিল 'আন্তর্জাতিক পরিবার', অধস্তন 'জাতীয় পরিবার'গুলির হর্তাকর্তা। প্রত্যেক 'জাতীয় পরিবারে' ছিল কার্যসভা, তার নির্দেশ সভ্যদের নির্বিচারে মানতে হত। জাতীয় কার্যসভা নিবিচারে মানত কেন্দ্রীয় কার্যসভার নির্দেশ। সভ্য ছিল দুই প্রকার—সক্রিয় কর্মী ও নিষ্ক্রিয় সমর্থক। শেষোক্তরা ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান লোক। প্রথমোক্তদের একটি ছোরা স্পর্শ করে শপথ নিতে হত, শপথ ভঙ্গ করলে তার হত চরম দণ্ড। ভ্রাতৃসংঘের ওপর ভার ছিল জনবাহিনীকে পরিচালনা করা এবং বিপ্লবোত্তর কালে যাতে রাষ্ট্রের পুনরাবির্ভাব না হয় তার প্রহরা দেওয়া।

এমন অজস্র পরিকল্পনা বাকুনিনের মাথায় কিলবিল করত। কিন্তু তাঁর মগজের ও কাগজের বাইরে এরা স্থান পেত না, কদাচিৎ বাস্তবে ফুটে উঠলেও বুদবুদের মত মিলিয়ে যেত।

রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবের বাহক মধ্যবিত্তরা নয়। মধ্যবিত্তের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বরাবর কৃষাণ ও ভূমিদাসদের মুক্তিকামনার বিরোধিতা করে এসেছে। পোল জাতীয়তার ধুরন্ধররা দমন করেছে রুথেনীয় ভূমিদাসদের, ম্যাগিয়ার বিদ্রোহীরা ক্রোয়াট কৃষাণদের। বিপ্লবের বাহক হবে গ্রামের চাষী। রুশোর মত বাকুনিনও বিশ্বাস করতেন মানুষের যে স্বাভাবিক সততা সমাজ ও রাষ্ট্রের চাপে বিকৃত হয়ে যায় চাষীদের মধ্যে এখনও তার কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে আর এই 'বলিষ্ঠ বর্বর উপাদানে' নতুন সমাজ তৈরি হবে। ছেলেবেলায় দেশের গাঁয়ে তিনি চাষী ও ভূমিদাসদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন আর রুশে এই শ্রেণীর লোকই কারখানায় গিয়ে মজুর হত। তাঁর শ্লাভপ্রীতিও তাঁকে আকর্ষণ করত গ্রামের দিকে। রুশের গ্রাম্য কমিউন 'মির'কে ঘিরে ছিল আদিম যুগের যৌথ ভূমিস্বত্বের ঐতিহ্য। এই প্রাচীন বর্বর শক্তির ধারক রুশ মুজিক পারবে নতুন স্বর্ণযুগ রচনা করতে।

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা শহরের বিকার থেকে মুক্ত নয়। তাদের সমাজবাদ বুর্জোয়াভাবাপন্ন। গ্রামের সরল স্বাভাবিক যৌথজীবনের প্রতি তারা উন্নাসিক। চাষীও শ্রমিককে বুর্জোয়ার লেজুড় বলে ঘৃণা করে এবং তাতে বিপক্ষরা

লাভবান হয়। শ্রমিকচাষীর এই মনোমালিন্য ইয়োরোপের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে অসাড় করে ফেলেছে।

একবার যদি চাষীরা বোঝে যে তারা জমি দখল করতে পারবে এবং সে জমি ফিরিয়ে নেওয়া হবে না আর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর কোন বন্দোবস্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে না তাহলেই তারা শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাবে। এতে ব্যক্তিসম্পত্তি ফিরে আসবে এমন আশঙ্কা নেই। যেখানে মালিকানার সরকারী সমর্থন নেই, দায়াধিকার নেই, সেখানে স্বত্ব মানে হবে প্রত্যেকের কিছু কিছু জোত চাষ করার ও ভোগ করার অধিকার।

বাকুনিন বিশ্বাস করতেন ইতালী, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডে সমাজবিপ্লব আসন্ন এবং একবার শুরু হলে তা দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লবের অগ্রদূত হবে শহরের শ্রমিক, রুশ পোল্যাণ্ড ও শ্লাভদেশগুলিতে গ্রামের চাষী। পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে শ্রমিকরা সমাজ-বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু

> "শুধু শ্রমিক অভ্যুত্থান যথেষ্ট নয়। ইহা হইতে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে মাত্র আর চাষীদের মধ্যে অনিবার্য হইয়া দেখা দিবে এক স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রতিক্রিয়া। যদি তাহারা কেবল উদাসীন হইয়া থাকে তাহা হইলেও শহরে নিবদ্ধ বিপ্লবের অকালমৃত্যু হইবে, যেমন সম্প্রতি হইয়াছে ফ্রান্সে।"[১৬] ('ইতালীর বন্ধুদের প্রতি পত্র,' ম্যাক্সিমফ, ৩৭৮)

চাষীজাগরণের ওপর বেশি জোর দিলেও বাকুনিন শ্রমিকশক্তিকে উপেক্ষা করেননি। শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্বে শ্রমিক ধর্মঘটের বিপুল সম্ভাবনা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হলে সমাজবিপ্লবের সূচনা হয়। এই প্রসঙ্গে "ইন্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোস্যাল ডিমক্র্যাসী"তে তিনি লিখছেন—

> "স্ট্রাইক মানে সংগ্রাম আর সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জনগণ সংঘবদ্ধ হয়, সাধারণ শ্রমিক তাহার একঘেয়ে জীবনযাত্রা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিরর্থক নিরানন্দ নিরাসক্ত একাকীত্ব হইতে বাহির হইয়া আসে। সংগ্রাম তাহাকে এক আবেগ ও এক লক্ষ্যের প্রেরণায় অন্য শ্রমিকদের

---

১৬ প্যারী কমিউন ১৮৭১

সঙ্গে মিলাইয়া দেয়…যে সমাজবিপ্লবী প্রবৃত্তি জনগণের হৃদয়ে সুপ্ত হইয়া আছে, যে সম্বন্ধে তাহারা সচেতনও নয়, ধর্মঘট সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে।…

বুর্জোয়া শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যবধান ধর্মঘট তাহা আরো বাড়াইয়া দেয়, ইহা শ্রমিকদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয় যে পুঁজিপতি ও বিত্তবানদের স্বার্থের সঙ্গে তাহাদের স্বার্থের বৈষম্য আমূল। ধর্মঘট আরো মূল্যবান এইজন্য যে ইহা দলিত শোষিত জনসাধারণের মন হইতে শত্রুর সঙ্গে আপোস মীমাংসার সমস্ত সম্ভাবনা দূর করিয়া দেয়। ইহা বুর্জোয়াদের সমাজবাদ শিকড়সমেত উপড়াইয়া ফেলে এবং জনস্বার্থকে বিত্তবান শ্রেণীর রাষ্ট্রিক ও আর্থিক জালে জড়াইয়া পড়িতে দেয় না। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত রাখিতে হইলে ধর্মঘটের অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই।" (ম্যাক্সিমফ, ৩৮৪)

হুবহু সিণ্ডিক্যালিস্টদের কথা। চল্লিশ বছর পরে জর্জ সরেল ঠিক এই ভাষায় এই যুক্তিতে ধর্মঘটের প্রশস্তি করেছেন।

নির্বিশেষ ধ্বংসের উদ্গাতা বাকুনিনেরও মতিভ্রম হয়েছে, দু এক জায়গায় তিনি বিপ্লবোত্তর সংগঠনের কথা উত্থাপন করেছেন। "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্য-বাদ"-এ তিনি বিপ্লবীকে ভবিষ্যত সমাজের একটা পরিষ্কার ধারণা করে নেবার জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

"ভবিষ্যতের ধারণা যত স্পষ্ট হইবে বিনাশের শক্তি তত প্রবল হইবে। আর এই ধারণা সত্যের যত নিকটবর্তী হইবে অর্থাৎ বর্তমান সমাজপরিস্থিতির অবধারিত পরিণতির সঙ্গে যত খাপ খাইবে ধ্বংসাত্মক কাজ তত সার্থক ও সফল হইবে।" ("প্রটেস্টেশন্স অব দি এলায়েন্স", ম্যাক্সিমফ, ৩৮১)

এলায়েন্সের কার্যক্রমে নববিধানের একটা নক্সা দেবার চেষ্টা হয়েছে। এর মূল নীতি দায়াধিকার রদ, নরনারীর সমান অধিকার, ভূমি পুঁজি ও যন্ত্রের যৌথকরণ[১১], শিল্পীসংঘগুলির যুক্তকরণ, জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং রাষ্ট্রের

---

১১ কৃষকের ভূমিদখল নীতির সঙ্গে অসঙ্গতি লক্ষণীয়।

অবসান। সকলের আগে হবে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন। বিপ্লবের পর প্রথম কাজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া, শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে শ্রেণীভেদ দূর করা। শ্রমিকসংঘগুলি মূলধন ও যন্ত্র হাতে নেবে, গ্রামের চাষী-কমিউনগুলি জমির মালিক হবে ও জমি চাষ করবে। শ্রমিক ও চাষী পরস্পরের চাহিদা মেটাবে, শিল্প ও কৃষির সঙ্গে হাত মেলাবে বিজ্ঞান, চারুকলা ও সাহিত্যের বৃত্তি—সহযোগিতা ও যুক্তকরণের ধাপে ধাপে উঠবে নতুন সমাজ।

সকলকে সমান পরিশ্রম করতে হবে, কেউ সমাজের ঘাড়ে বসে খেতে পারবে না। বড় বড় মনীষীরাও কায়িক শ্রম থেকে রেহাই পাবেন না। এতে মনীষার মান কিছুটা নামবে বটে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির মান অনেক ওপরে উঠবে। মনীষীদেরও দেহের ও মনের জোর বাড়বে এবং তাঁদের মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ জন্মাবে। কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দান করবার এবং মানুষে মানুষে সমভাব সৃষ্টি করবার এই একমাত্র উপায়।

উত্তরাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হবে বিবাহ ও পরিবার। শাস্ত্র ও আইনের বিবাহ-বন্ধনের জায়গায় আসবে প্রেমের অবাধ মিলন। উভয় পক্ষের সমান অধিকার থাকবে অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া তালাক দেবার। সন্তানদের ওপর বাপমার হক থাকবে না। মাতৃগর্ভে আসবার পর থেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নেবে সমাজ।

> "পিতামাতার অধিকার সীমাবদ্ধ হইবে সন্তানদের ভালবাসায়। বাৎসল্যের জোরে তাহারা যৎসামান্য কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে এই কর্তৃত্ব সন্তানদের নীতিজ্ঞান, বুদ্ধির বিকাশ ও ভবিষ্যত স্বাধীনতায় ব্যাঘাত না জন্মায়।" (এলায়েন্সের কার্যক্রম, ম্যাক্সিমফ, ৩২৭)

নতুন সমাজের বনিয়াদ হবে স্বাধীনতা, সরকারী দপ্তরের ছাড়পত্র নেওয়া স্বাধীনতা নয়, বুর্জোয়া উদারনৈতিকদের হিসাব করা মাপাজোখা স্বাধীনতা নয়।

> "আমি বলিতেছি স্বাধীনতা নামের যোগ্য খাঁটি স্বাধীনতার কথা, যে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় প্রত্যেকের ভিতরে যে বাস্তব মানসিক ও নৈতিক সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে তাহার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ, যে স্বাধীনতা আমাদের স্বভাবগত নিয়মের বাহিরে আর কোন বন্ধন স্বীকার করে না।…

আমি বলিতেছি প্রত্যেক ব্যক্তির সেই স্বাধীনতার কথা যাহা অন্যের স্বাধীনতার সীমান্তে আসিয়া থামিয়া যায় না, বরং অন্যের স্বাধীনতায় সমর্থন লাভ করে, অনন্তে বিস্তৃত হয়, সকলের স্বাধীনতায় মিশিয়া প্রত্যেকের স্বাধীনতা হয় নিরঙ্কুশ, যাহা হইল ঐক্যের স্বাধীনতা, সাম্যের স্বাধীনতা।" (কেনাফিক, ১৭)

স্বাধীনতার দুটি দিক আছে। একদিকে ইহা প্রকৃতির নিয়মের প্রতি আনুগত্য, যে নিয়ম আমাদের ভিতরে ও বাহিরে সক্রিয়। অন্য দিকে ইহা সর্ববিধ বহিরাগত মানবিক শাসনের অস্বীকৃতি। মানুষের প্রকৃতি যূথগামী। সুতরাং স্বাধীনতা ব্যক্তিপরায়ণ হতে পারে না।

"প্রথম মানবিক নিয়ম সমাজ-ঐক্য, দ্বিতীয় নিয়ম স্বাধীনতা। দুই নিয়ম পরস্পরে বিজড়িত অবিচ্ছেদ্য এবং ইহাই মানবতার সত্তা। অতএব স্বাধীনতা একতার পরিপন্থী নয়, বরং একতার পরিপূরক, মানবত্বে পরিণতি।" (এলায়েন্সের কার্যক্রম, ম্যাক্সিমফ, ১৫৬)

চারদিকে সকলে যখন সমান স্বাধীন তখনই আমার স্বাধীনতা বাস্তব হল। একের স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার সর্তসাপেক্ষ। দাসপতি স্বাধীন নয় কারণ দাসের মানবত্ব অবজ্ঞা করে সে নিজের মানবত্ব হারিয়েছে। স্বাধীনতা একটি সামাজিক ধন সমাজের মধ্যে একে পেতে হয়। সমাজবাদ মানে সমাজসাম্য যা নইলে স্বাধীনতা আসে না।

"সমাজবাদকে বাদ দিলে স্বাধীনতা হইয়া দাঁড়ায় অন্যায় সুবিধা ভোগ। স্বাধীনতাকে বাদ দিলে সমাজবাদ হইয়া দাঁড়ায় দাসত্ব ও পাশবিকতা।" ("ফেডারেলিজ্ম্" ম্যাক্সিমফ, ২৬৯)

মানুষ তখনই নিজেকে স্বাধীন বলে বোধ করবে যখন দেখবে অন্যেও তার মত স্বাধীনতা ভোগ করছে। কারণ বিচ্ছিন্ন একক জীবনে মুক্তির স্বাদ নেই, আদানপ্রদান ও সহযোগিতার ভেতর দিয়ে মানুষ অধিকার অনুভব করে। কাজেই মুক্ত সমাজের গাঁথুনি হবে সহযোগিতা। বর্তমান আইন কানুন ও বাধ্যবাধকতার বদলে আসবে পারস্পরিক চুক্তি ও স্বেচ্ছায় মিলিত সমিতি সংসদ। স্বাভাবিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগিদে মিলনের আসর বাড়তে থাকবে। 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম'-এর কংগ্রেসে বাকুনিন সার্বভৌম যৌথ সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন।

"এতদিন সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে শাসন ও হিংসার জোরে উপর

হইতে নীচের দিকে। এবার জনতার স্বার্থ, প্রয়োজন ও স্বাভাবিক আকর্ষণের ভিত্তিতে নূতন সংহতির ইমারত উঠিবে নীচ হইতে উপরের দিকে। ব্যক্তিরা ইচ্ছামত যুক্ত হইবে কমিউনে, কমিউন যুক্ত হইবে প্রদেশে, প্রদেশ যুক্ত হইবে জাতিতে, জাতির মিলনভূমি হইবে ইয়োরোপের যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্বশীর্ষে উঠিবে সারা বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্র।" (ম্যাক্সিমফ, ২৭৪)

যুক্তরাষ্ট্র বস্তুত রাষ্ট্র নয়, নিরাজ গণতন্ত্র। প্রুদঁ ও বাকুনিনের রাষ্ট্রহীন সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঁ্যা সিমঁ, লুই ব্লাঁক ও কার্ল মার্ক্স-এর রাষ্ট্রাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের পার্থক্য মৌলিক। প্রথমটিতে ব্যক্তি থেকে জাতি পর্যন্ত নিরাজ যুক্তসভার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার আছে। এ অধিকার না থাকলে যুক্তসভা কেন্দ্রায়িত রাষ্ট্রে পর্যবসিত হবে। বাকুনিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ অধিকার পেয়েও কেউ প্রয়োগ করবে না। পরস্পরে স্বার্থ ও সুবিধার বন্ধন এত নিবিড় যে কেউ সরে যেতে চাইবে না, পারবেও না।

সত্যিই কি বাকুনিন বিশ্বাস করতেন যে বেপরোয়া ভাঙনের পালা শেষ হলে স্বর্গরাজ্য এত সহজে নেমে আসবে? একথা বোঝা যায় যে ভাঙনের কাজ যত নিখুঁত হবে পুরাতন ব্যবস্থার পুনরাবর্তন তত কঠিন হবে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা যে আসবে তার নিশ্চিতি কি? এর উত্তরে বাকুনিন দ্বান্দ্বিক সূত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন, বলছেন রাষ্ট্রবাদ হল ভাব, ধ্বংস ও শূন্যবাদ হল প্রতিভাব, উভয়ের দ্বন্দ্বের অবসান হবে নিরাজ গণতন্ত্রের সম্ভাবে। অবশ্য অন্ধ বিশ্বাস ও দর্শনের সূত্র ছাড়াও তাঁর আর একটি ভরসা ছিল—সেটি গুপ্ত সমিতি। নাশযজ্ঞের পর সমিতি হবে ভবিষ্যতের স্রষ্টা, নববিধানের প্রহরী। গুপ্ত সমিতির প্রহরায় ও প্রচেষ্টায় কেমন করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জনসমিতি গড়ে উঠতে পারে, যে আমলাশাসন রুখবার জন্যে গুপ্ত সমিতি কায়েম হবে তার সঙ্গে বস্তুত এর কোন তফাত আছে কিনা, এসব কূট প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার তিনি বোধ করেন নি।

মার্ক্স-এর সঙ্গে বাকুনিনের পঁচিশ বৎসরব্যাপী দ্বৈরথ সমর ইতিহাসে সুপরিচিত। স্বভাবচরিত্রে ও চিন্তাভাবনায় দুজনায় ছিলেন ঠিক বিপরীত। বাকুনিন ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আবেগপ্রবণ, কর্মচঞ্চল। মার্ক্স ছিলেন ধীর স্থির হিসেবী, দল ও আদর্শের সংগঠনে একাগ্র। বাকুনিনের কথায় ও

কলমে আগুন ছুটত, আর পতঙ্গের মত তিনিও ছুটতেন আগুনের দিকে। মার্ক্স হাতাহাতি লড়াই এড়িয়ে চলতেন, পড়তেন আর লিখতেন মত প্রতিষ্ঠার জন্যে। বাকুনিন ছিলেন এনার্কিজ্‌ম্‌-এর যোদ্ধা, মার্ক্স ছিলেন কমিউনিজ্‌ম্‌-এর গুরু। বাকুনিনের মৃত্যুর পর রইল তাঁর কাহিনী ও উপকথা। মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর রইল তাঁর মতবাদ ও দলীয় আদর্শ।

দুজনেই ছিলেন দুর্জয় আশাবাদী যা প্রত্যেক বিপ্লবীকে হতে হয়। মার্ক্স মনে করেছিলেন ধনতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে এসেছে এবং ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব অদূরবর্তী। বাকুনিন ভেবেছিলেন অচিরে সারা ইয়োরোপের রাষ্ট্রকাঠাম ভেঙে পড়বে এবং শতকান্তের আগেই দেখা দেবে নিরাজ সমাজতন্ত্র। উভয়েই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন হেগেল ও ফয়েরব্যাক থেকে এবং উভয়েই বিশ্বাস করতেন সমাজদ্বন্দ্বের অবধারিত পরিণাম বিপ্লব।

এ মিল বাহ্য। এর আড়ালে অমিল ছিল গভীর অতলস্পর্শী। ঝগড়ার সূত্রপাত প্রুদঁ ও মার্ক্স-এর মতদ্বন্দ্ব থেকে। এই প্রসঙ্গে ক্রপট্‌কিন বলছেন—'এ ব্যক্তিগত বিবাদ নয়, নীতির বিবাদ, যুক্তকরণ ও কেন্দ্রীকরণ, মুক্ত কমিউন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, জনসাধারণের স্বাধীন কর্মপরতা আর আইনের জোরে ধনতান্ত্রিক অনিষ্টের প্রতিকার দুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব ল্যাটিন ও জার্মান ভাবের দ্বন্দ্ব। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর জার্মান ভাবের বাহকরা বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি দর্শন এমন কি সমাজবাদেও তাদের প্রভুত্ব জাহির করতে লাগল, প্রচার করল তাদের সমাজবাদ বৈজ্ঞানিক আর সব সমাজবাদ কাল্পনিক।'[১৮] 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম'-এর কংগ্রেসে (১৮৬৮) বাকুনিন মার্ক্স-এর সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতভেদ কোথায় তা স্পষ্ট করে বলেছেন।

> "আমি কমিউনিজ্‌ম্‌কে ঘৃণা করি, কারণ ইহা মানুষের স্বাধিকার গ্রাস করে এবং স্বাধিকার বাদ দিয়া আমি মানুষকে ভাবিতে পারি না। আমি কমিউনিস্ট নই কারণ কমিউনিজ্‌ম্‌ রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের জন্য সমাজের যাবতীয় শক্তিকে কেন্দ্রায়িত ও আত্মসাৎ করে, কারণ ইহা অনিবার্যভাবে সকল বিত্ত রাষ্ট্রের মুঠায় আনিয়া দেয়। পক্ষান্তরে আমি চাই রাষ্ট্রের অবসান—যে রাষ্ট্র মানুষের সভ্যতা ও নৈতিক মান উন্নয়ন করিবার অছিলায় এতদিন শোষণ ও অত্যাচার

১৮ মেময়র্‌স্‌ অব এ রিভলিউশনিস্ট, লণ্ডন, ১৮৯৯। খণ্ড ২, ১৯২ পৃষ্ঠা।

চালাইয়াছে, মানুষকে দাসত্বে পরিণত ও কলুষিত করিয়াছে—তাহার প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বের নিঃশেষ বিলুপ্তি। আমি চাই সমাজ ও যৌথ বিত্ত উপর হইতে কোন প্রকার কর্তৃত্বের শাসনে পরিচালিত হইবে না, পরন্তু স্বাধীন সমবায়ের মাধ্যমে নীচ হইতে উপরে গড়িয়া উঠিবে। রাষ্ট্রের উচ্ছেদ যেমন আমি চাই, তেমন দায়লব্ধ ব্যক্তিসম্পত্তির উচ্ছেদও আমার কাম্য। মহাশয়গণ, আমি এই অর্থে কলেক্টিভিস্ট কিন্তু কমিউনিস্ট নই।" (কার, ৩৪১)

মার্ক্স বা বাকুনিন কারও প্রতিনিধিমূলক সরকারে আস্থা ছিল না। তবে দুজনের অনাস্থা জন্মেছিল দুই প্রকারে। মার্ক্স মনে করতেন যে ভোটপ্রথা বুর্জোয়াদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখবার একটা ফিকির। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মত গণতন্ত্রও প্রভুশ্রেণীর শাসন। বাকুনিনের ধারণাও তাই ছিল, কাজেই তিনি চেয়েছেন সকল তন্ত্র ঘুচিয়ে দিয়ে মুক্ত সমাজ আনতে। তাঁর মতে মার্ক্স-এর সর্বহারার একনায়কত্ব আর বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র উভয়ের সারবস্তু এক—

"অধিক সংখ্যক লোক মূর্খ ও অল্প সংখ্যক লোক বুদ্ধিমান এই অজুহাতে সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের শাসন।" ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৬)

বিপ্লবী একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দলনায়কত্ব। এর শাসন আরো কঠোর কারণ এখানে শাসকরা জনতাকে প্রভু বানিয়ে জনতার ইচ্ছা পরিপূরণ করার ভড়ং করে। মার্ক্স ও বিসমার্ক দুই জার্মানের এক জায়গায় সুন্দর মিল আছে—সে হল রাষ্ট্রপূজা।

রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ দুই আদর্শের গোড়ায় ছিল দুই ভিন্ন বাস্তব পরিবেশ। মার্ক্স-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মধ্য ইয়োরোপে যেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে শ্রেণী-সচেতন সর্বহারার সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠেছে। বাকুনিনের আকর্ষণ ছিল পূর্ব ইয়োরোপের কৃষিপ্রধান স্লাভ দেশগুলিতে যেখানে চাষীরা তখনও সামন্ত প্রভুদের ভূমিদাস। মার্ক্স-এর মতে চাষীরা স্বভাবত রক্ষণশীল, তাদের ঝোঁক প্রতিক্রিয়ার দিকে। বাকুনিনের মতে তাদের মধ্যে আছে খাঁটি বিপ্লবশক্তি, শুধু শ্রমিকের হঠকারিতা তাদেরকে বিপক্ষে ঠেলে দেয়।

কম্যুনিস্ট ইস্তাহারে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বলেছেন বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ হবে সর্বহারাদের শাসকশ্রেণীর জায়গায় বসানো। বাকুনিন প্রশ্ন করছেন—

> "তাহারা কাহাদিগকে শাসন করিবে?...এই নয়া শাসনের নয়া রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে আর এক সর্বহারার দল। হইতে পারে ইহারা ছোটলোক চাষী, মার্ক্সবাদীদের কাছে যাহাদের বিশেষ খাতির নাই, যাহারা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর হওয়ার দরুন শহর ও কারখানার শ্রমিকদের তাঁবেদারি করিবে। কিংবা জাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে হয়ত বা শ্লাভরা ঠিক একই কারণে বিজয়ী জার্মান সর্বহারাদের দাসত্ব করিবে, যেমন ইহারা এখন স্বদেশের বুর্জোয়াদের দাসত্ব করিতেছে।" ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৬-৮৭)

মার্ক্স প্রলিতারিয় রাষ্ট্রের যে ছক এঁকেছেন তার প্রত্যয় স্ববিরোধী। এ যদি জনগণের রাষ্ট্র হয় তবে এ বিলীন হবে কেন? আর যদি এর উদ্দেশ্য হয় জনগণের মুক্তিসাধন তবে এ জনগণের রাষ্ট্র হয় কেমন করে?

> "আপনাকে জীয়াইয়া রাখা ছাড়া একনায়কত্বের আর কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে না, যাহারা ইহাকে সহ্য করে তাহাদের মনে দাস্যভাব জন্মানো ছাড়া ইহার আর কোন কাজ হইতে পারে না। কেবল মুক্তি দিয়াই মুক্তি সৃষ্টি করা যায়।" ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ," ম্যাক্সিমফ, ২৮৮)

আর একনায়কত্ব কি সত্যিই সর্বহারাদের হাতে থাকবে? তাদের নামে গদিতে বসবে দল। যদিও বা জনকয়েক শ্রমিক সেখানে জায়গা পায় তারা তখন আর শ্রমিক থাকবে না, তারা হবে হুজুর মালিক, প্রতিনিধিত্ব করবে নিজের নিজের। অবশিষ্ট শ্রমিকরা অভাবের চাপে এবং ন্যায্য ভাগবাঁটোয়ারার আশায় স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে। কে তাদের বোঝাবে নিজের স্বাধীন অধিকার ছেড়ে দিলে আর্থিক সমতা ও ন্যায় অপরের দয়ায় পাওয়া যায় না?

> "বস্তুত শ্রমিক সাধারণের জন্য ইহা হইবে সেনাবাসের জীবন, যেখানে পুরুষ ও নারী শ্রমিক বাহিনী কলের পুতুলের মত ঢাকের বাদ্যে জাগিবে ঘুমাইবে খাটিবে বাঁচিবে। আর জাতীয় ব্যাঙ্কের টাকা দেশ বিদেশে খাটাইয়া পকেট ভারি করিবার মস্ত সুযোগ আসিবে, ভাগ্যসন্ধানীদের হইবে পৌষ মাস।" (কেনাফিক, ৫২)

মার্ক্স-এর আক্রমণ সম্পত্তি ও শোষণের ওপর, বাকুনিনের আক্রোশ রাষ্ট্র ও শাসনের ওপর। মার্ক্স-এর মতে রাষ্ট্র যেমন বুর্জোয়ার হাতে শোষণের কল,

তেমন শ্রমিকের হাতে হবে শোষণ বন্ধ করবার কল। বাকুনিনের মতে রাষ্ট্রের ধর্ম শোষণের সংরক্ষণ, তার বিপরীত কাজ একে দিয়ে হয় না। রাষ্ট্র বিকল হলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি ও শোষণও দূর হবে। মার্ক্স-এর বিশ্বাস ছিল একনায়কত্বের ফলে শ্রেণীভেদ ঘুচে যাবে এবং তারপর রাষ্ট্র আপনিই লোপ পাবে। বাকুনিনের আশঙ্কা ছিল রাষ্ট্র ক্রমশ বলশালী হবে এবং তার আশ্রয়ে নতুন সুবিধাবাদী শ্রেণী গজিয়ে উঠবে।

রাজনীতির সংঘর্ষ শুধু আদর্শের সংঘর্ষ নয়, তার সঙ্গে আসে চালবাজি ও ষড়যন্ত্রের লড়াই। একাজে দুই মহারথী ছিলেন সমান তৎপর। প্রথম প্রথম বাকুনিন মার্ক্স-এর চিন্তার মৌলিকতা দেখে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধার অনেকখানি শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। যুগের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক ও সমাজবাদী পণ্ডিত বলে তিনি মার্ক্স-এর সুখ্যাতি করেছেন, স্বীকার করেছেন

> "সমাজতন্ত্রের প্রতি তাহার অতুল অবদান, আমি তাহাকে জানিবার পর পঁচিশ বৎসর ধরিয়া সে অক্লান্ত ও একনিষ্ঠভাবে যাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে এবং যে কাজে আমাদের সবাইকে সে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" (কার, ৩৭০)

শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকখানি বিদ্বেষের খাদ মেশানো ছিল মার্ক্স শুধু জার্মান ও ইহুদী বলে নয়। আরো যা কারণ ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে ১৮৪৮ সালে ব্রাসেল্‌স্ থেকে বন্ধু হেরওয়েকে লেখা এক পত্রে।

> "জার্মানরা, মানে ঐ ধড়িবাজ বার্নস্টেড, মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ বিশেষ করিয়া মার্ক্স তাহাদের অভ্যাসমাফিক অপকর্মের ফন্দি আঁটিতেছে। দম্ভ, বিদ্বেষ, বিবাদ, পরমত-অসহিষ্ণুতা, কার্যক্ষেত্রে কাপুরুষতা আর মতবাদের কচকচানি…একটি শব্দ 'বুর্জোয়া' সর্বদা তাহাদের মুখে লাগিয়া আছে, যদিও তাহারা নিজেরা আপাদমস্তক হাড়ে হাড়ে বুর্জোয়া। এককথায় মিথ্যাচার ও মূঢ়তা, মূঢ়তা ও মিথ্যাচার। ইহাদের সংসর্গে অবাধে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়া যায় না।[১৯] (কার, ১৫৬)

১৯ বাকুনিনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত মার্ক্স-এর আর একজন সহকর্মী ঠিক এই বছর তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'নিজের বিষয়ে যথেষ্ট পণ্ডিত বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল এবং সত্যই সে যাহা বলিত তাহা পরিষ্কার, যুক্তিসঙ্গত ও মূল্যবান। কিন্তু এমন অপমানজনক, অসহ্য ঔদ্ধত্য আমি আর কোথাও দেখি নাই। যে মত তাহার নিজের মতের সঙ্গে মেলে না তাহাকে ভদ্রভাবে বিচার করিবার সম্মান সে দিত না। কাহারও যুক্তি তাহার ভাল না লাগিলে সে তাহাকে অজ্ঞ মূঢ় বলিয়া তামাসা

এই প্রশস্তিবাচনের কয়েকমাস বাদে মার্ক্স তাঁর পত্রিকা "নয়া রাইন্ সমাচারে" এক খবর ছাপলেন,—বাকুনিন রুশের বেতনভোগী গুপ্তচর। দুর্নামটা আগেও ছিল, এবার গায় লেগে রইল আঠার মত।

বাকুনিনের মনের ঝালের সঙ্গে ছিল জাতীয়তার ঝাঁঝ, আদর্শের তর্ক ছাপিয়ে যার উগ্র গন্ধ টের পাওয়া যায়।

> "মার্ক্স ও এঙ্গেল্স্ দুই দণ্ডমুণ্ডের কর্তার অধীন জার্মান শ্রমিকদের যে সোশ্যাল ডিমক্রেটিক দল, যাতে আছে বেবেল, লাইব্নেক্ট্ এবং জনকয়েক ইহুদী সাহিত্যিক, আমরা আমাদের শ্লাভ ভাইদিগকে তাহাতে ভিড়িতে প্ররোচিত করিব না। আমরা কখনই শ্লাভ সর্বহারাদিগকে ঐ দলে যোগ দিয়া আত্মহত্যা করিতে দিব না, যে দল স্বভাবে, আদর্শে, কার্যপ্রণালীতে জনগণের দল নয় আসল বুর্জোয়ার দল, অধিকন্তু জার্মান অর্থাৎ শ্লাভবিরোধী দল।" ("রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ", ম্যাক্সিমফ, ২৮৩)

জাতিবৈরিতা ছাড়াও দুজনের মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মনমেজাজের সংঘাত। কারও ধাতে সমান সাথী সইত না, যারা কাছে আসবে তাদের হতে হবে শিষ্য কিংবা শত্রু। একে অন্যকে কেন বরদাস্ত করতে পারতেন না বাকুনিন তার একটি সুন্দর কৈফিয়ত দিয়েছেন।

> "আমাদের মধ্যে কোন সময়ে সত্যকার অন্তরঙ্গতা ছিল না। আমাদের মেজাজ তাহা হইতে দেয় নাই। সে আমাকে বলিত ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী এবং সে ঠিক বলিত। আমি তাহাকে বলিতাম বিষণ্ণ, দাম্ভিক, বিশ্বাসঘাতক এবং আমিও ঠিক বলিতাম।" (কার, ১৩০)

অবশ্য বাকুনিন অত নরম গালাগালি খেয়ে পার পান নি।

১৮৬৮ সালে বাকুনিন 'লীগ অব পীস এণ্ড ফ্রীডম' ভেঙে দিয়ে গড়লেন 'ইণ্টারন্যাশন্যাল এলায়েন্স অব সোশ্যাল ডিমক্রেসী'। পরের বছর বাসেলের কংগ্রেসে তিনি দলবল নিয়ে মার্ক্স-এর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘে প্রবেশ

করিত কিংবা অভিসন্ধির ইঙ্গিত দিয়া তাহার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিত। আমার মনে আছে কী গভীর ঘৃণার সহিত সে 'বুর্জোয়া' শব্দটি উচ্চারণ করিত, বলিত থুতু ফেলার মত করিয়া। যে কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধে কথা বলিত তাহাকেই সে 'বুর্জোয়া' বলিয়া গালি দিত—যে গালির অর্থ নৈতিক ও আত্মিক অধঃপাতের একটি নিভু‍্র্ল দৃষ্টান্ত।' হ্যাম্পডেন জ্যাকসন: মার্ক্স, প্রুদোঁ এণ্ড ইয়োরোপীয়ান সোশ্যালিজ্‌ম্, লণ্ডন, ১৯৫৭, ৯৩ পৃষ্ঠা।

[illegible] কিন্তু তিনি এলায়েন্স ভাঙতে চাইলেন না। তাঁর মতলব ছিল এর [illegible]কৃত আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব হাতে নেওয়া। কিন্তু এ খেলায় মার্ক্স ও তাঁর সাকরেদরা ছিলেন বাকুনিনের চেয়ে পাকা। আন্তর্জাতিক দুর্গে ট্রয়ের ঘোড়াকে ঢোকাবেন এত নির্বোধ তাঁরা ছিলেন না। বাকুনিন নালিশ আনলেন মার্ক্স ও জেনারেল কাউন্সিল

> "আন্তর্জাতিককে একটি দানবীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা ইহাকে একটি মাত্র সরকারী মতের অধীনে রাখিতে চায়—যে মতের মুখপাত্র এক শক্তিমান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব।"

তিনি মার্ক্সকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে তিনি জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন।

> "যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস তথাকথিত বিপ্লবের স্বার্থে সারা দুনিয়ার সর্বহারাদের উপর এক সর্বশক্তিমান সরকার চাপাইয়া দেয়, ইহাকে তথাকথিত সরকারী নীতির দোহাই দিয়া আঞ্চলিক যুক্তসভা বাতিল করিবার এবং গোটা জাতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেয়, যখন এই সরকারী নীতি মিথ্যা ভোটগরিষ্ঠতার জোরে পরম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্স এর ব্যক্তিগত মত ছাড়া আর কিছুই নহে তখন ইহাকে কি বলিব?" (কেনাফিক, ৪৫)

বিভিন্ন দেশের এত রকমারি অবস্থা, স্বার্থ ও চিন্তাধারার বৈচিত্র্য, কয়েকটি-মাত্র লোক তা আয়ত্ত করে সারা দুনিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনকে চালনা করবে—এ অতি অসম্ভব কথা।

১৮৭২ সালে হেগ কংগ্রেসে বাকুনিন আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন। সহকর্মীদের নিয়ে সুইজার্ল্যাণ্ডে ঘাঁটি করে তিনি এক পাল্টা আন্তর্জাতিক গড়লেন যার বাঁধুনি হল 'মিত্রতা একতা ও আত্মরক্ষার চুক্তি'। পূর্ববর্তী সংগঠনগুলির মত এরও আয়ু বেশীদিন রইল না। কিন্তু মার্ক্স-এর আন্তর্জাতিক এই ভাঙনের চোট সামলে উঠতে পারেনি। তিনি এর দপ্তর সরিয়ে নিলেন নিউ ইয়র্কে। সেখানে কাঁচের ঘরে তাঁর চারাগাছটি ঝড়ঝাপটা থেকে বাঁচল বটে কিন্তু জলবায়ুর অভাবে শুকিয়ে গেল।

বাকুনিন নিজে যেমন তেমন তাঁর চিন্তাও উচ্ছৃঙ্খল। স্থির হয়ে ভেবে চিন্তে ধারণাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় প্রকাশ করবার মত ধৈর্য ও

সংযম তাঁর ছিল না। তাঁর ভাবনাগুলি বিদ্যুতের মত ক্ষণপ্রভ, চমক লাগিয়ে নিভে যায়, প্রজ্ঞার আলো তাতে নেই। তাঁর দর্শনের সূত্র নির্ধারিত হত তাঁর রাগবিরাগ পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা, কৃষকের ভূমিস্বত্ব, বৈপ্লবিক কার্যকলাপে ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি ইত্যাদি প্রসঙ্গে পারিবেশিক অবস্থার চাপে অথবা সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশে তিনি উল্টোপাল্টা মন্তব্য করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে চরম দুর্বলতা, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্যে আমূল অসঙ্গতি। আন্তর্জাতিকের জন্যে তিনি চাইলেন এক শিথিল বিকেন্দ্রিত সংগঠন আর নিজস্ব এলায়েন্সের বেলায় রাখলেন এক-নায়কত্ব ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। তাঁর 'আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃসংঘে' কেন্দ্রীয় কার্যসভার ক্ষমতা যে কোন স্বৈরাচারী সরকারের চেয়ে বেশি। একটি বিধিতে জাতীয় কার্যসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে

> "নিজ নিজ দেশে সংঘের প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য এবং নিজ নিজ দেশকে আন্তর্জাতিক শক্তির অসপত্ন পরিচালনায় সমর্পণ করিবার জন্য তাহারা যেন কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে কসুর না করে।"

এই আন্তর্জাতিক শক্তি তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির একটি গুপ্ত সভা, সারা দুনিয়ার গণবিপ্লব তারা পরিচালনা করবে। বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্রের পুনরাবর্তন রোধ করবার জন্যে তারা বহাল থাকবে। সংঘে আদর্শের বন্ধনের ওপর আছে কেন্দ্রীয় শাসনের নাগপাশ। মার্ক্স চেয়েছিলেন শ্রেণীবিদ্বেষের মাধ্যমে সহযোগিতার সত্যযুগ আনতে, বাকুনিন ভেবেছিলেন রামরাজ্য আনবে গুপ্ত নায়কের আজ্ঞাবাহী যো-হুকুমের দল। তাঁর দল যে মুক্ত সমাজের স্বাধীন নাগরিক গডবার উপযুক্ত শিক্ষাগার ছিল না তা বলা বাহুল্য।

বিপ্লবীকে হতে হয় স্থিতপ্রজ্ঞ, গভীর মননশীলতায় অচলপ্রতিষ্ঠ। তা নইলে লক্ষ্যে স্থিরতা থাকে না, চিন্তায় সামঞ্জস্য আসে না। বাকুনিনের ছিল না চিত্তসংযম, আত্মসমাধি, তাই বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে তিনি জাতীয়তার নিন্দা করেছেন আর শ্লাভপ্রেমে আত্মহারা হয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রভুত্ব ভাঙবার জন্যে বিপ্লবী একনায়কত্বের জয়গান করেছেন। তাই জার নিকলাস অথবা সেনাপতি মুরাভিয়েভকে রুশ বিপ্লবের নায়কত্বে বরণ করতে তাঁর বাধেনি।[২০] চিন্তার

২০ তাঁর সম্বন্ধে রুশের গুপ্তচর বলে অপবাদ এ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছে।

শিথিলতা ও চরিত্রের দুর্বলতা তাঁর দর্শনের ইমারতে বারবার ফাটল ধরিয়েছে। দায়াধিকার রদ করবার জন্যে যিনি বিপ্লবী আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেছেন তিনিই অভাবের পীড়নে বারবার ভাইদের তাগাদা দিয়েছেন পিতৃসম্পত্তি ভাগ করে তাঁর পাওনা পাঠিয়ে দেবার জন্যে। আজীবন ব্যক্তিসম্পত্তির ওপর বাক্যবান বর্ষণ করে জীবনসায়াহ্নে এক ভক্ত বন্ধুর টাকায় পরিবার নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠলেন। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় ধ্বংসবাদী জড়বাদী যোদ্ধার মনে পড়ল সাতাশ বছর আগে ভাগনারের সংগীত শুনেছিলেন, বললেন 'সব চলে যাবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু থাকবে নাইন্‌থ্‌ সিম্‌ফনী।' বাকুনিন যখন হেগেলবাদ পেরিয়ে সমাজবাদে আসেন তখন বন্ধু বেলেন্‌স্কী তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'সে জন্মেছে এবং মরবে রহস্যবাদী, আদর্শবাদী ও ভাবপ্রবণ হয়ে। দর্শন বদলালেই তো আর মানুষের স্বভাব বদলায় না।' বোধ হয় লেখক নিজেও জানতেন না তাঁর উক্তি এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে।

বাকুনিনের রক্তে ছিল সংহার ও ষড়যন্ত্রের নেশা। কিন্তু এ কাজে যে নির্মম চরিত্র ও কুটিল বুদ্ধির দরকার তা তাঁর ছিল না। তাঁর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল, ন্যায়নীতির বালাইও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। চক্রান্তের কারুশিল্পেও তিনি ছিলেন নেহাত আনাড়ি। প্রশংসায় তিনি গলে যেতেন এবং একজন অপরিচিত লোক তাঁর কাজকর্মের তারিফ করলে তাকে সব গোপনকথা বলে ফেলতেন। কখনো বা তিনি সাংকেতিক ভাষায় পত্র লিখে সংকেতটি চিঠির ভেতরই পুরে দিতেন। বিদেশী গুপ্তচর, নেচাএভের মত ধাপ্পাবাজ, কাউকে বিশ্বাস করতে তাঁর আটকাত না। নিজে বাস করতেন এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে, গুটিপোকার মত রেশমের কোষ দিয়ে বাস্তবকে আড়াল করে। তাই ছলনায় প্রতারণায় তাঁর আত্মপর ভেদ ছিল না, যত সহজে নিজেকে ঠকাতেন তত অনায়াসে অন্যকে ধাপ্পা দিয়ে চলতেন।

তাই তাঁর তর্ক ও সমালোচনায় কথার ধার যেমন আছে যুক্তির ধার তেমন নেই। ধর্মের ওপর তাঁর আক্রমণ ভল্‌তের ও প্রুদঁর বচনের প্রতিধ্বনি কিংবা স্ট্রাউস ও ফয়েরব্যাকের সমালোচনার পুনরাবৃত্তি। কেবল তাঁর উষ্মা ও কটুতা বেশি। ধর্মের ওপর ঘৃণার বিদ্বেষে তাঁর বিচারশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তা নইলে তিনি দেখতে পেতেন যে-ধর্মের মোহে মধ্যযুগের চার্চ এত অত্যাচার

করেছে, সেই ধর্মের প্রেরণায় চার্চদ্রোহী রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামও হয়েছে একাধিকবার।

সৃষ্টিরহস্যের অন্তরালে বাকুনিন দেখেছেন চিরন্তন বিবর্তন। তাই সমাজ-বিপ্লবও অবিরাম। এই তত্ত্ব দিয়ে তিনি তাঁর নাশকতার পাগলামিকে দর্শনের সাজ পরিয়েছিলেন। বিপ্লব যদি অবিরাম হয় তা হলে গৃহযুদ্ধ থামবে কেন, নিরাজ সমাজই বা টিকবে কি করে এসব প্রশ্ন তাঁর মনে আসেনি। ইতিহাসের যেমন চণ্ডমূর্তি আছে তেমন শান্তরূপ আছে, যেমন গতি আছে তেমন স্থিতি আছে, বিপ্লবের পাশাপাশি আছে বিরাম ও বিকাশ—এ সহজ ছন্দটি তিনি ধরতে পারেন নি কারণ যা তাঁর মেজাজে পোষায় না তা তাঁর যুক্তিতে আসে না।

যে বিপুল সামাজিক দায়িত্ব এখন কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করছে সে দায় কাঁধে নেবার আগে জনতার কোন শিক্ষার দরকার নেই, নূতন অভ্যাস নীতিমান মূল্যবোধ গড়ে তোলার দরকার নেই, কেবল একবার সব নিঃশেষে ভেঙে চুরে দিতে পারলেই ভোজবাজির মত নিরাজ ভ্রাতৃসমাজ এসে হাজির হবে এ বিশ্বাস সম্ভব একমাত্র শিশু ও কবির পক্ষে। মাঝে মাঝে তাঁর খেয়াল হত এ কল্পনা কত অবাস্তব। "স্বীকারোক্তি"-তে তিনি স্বীকার করেছেন—বিপ্লবের সর্বাত্মক নাশকতা ও অবাধ মুক্তি অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা একটা প্রতিজ্ঞা। 'আমার অন্তরের বাণী কানে কানে বলত এ আশা বাতুলতা—সে বাণীকে অমানুষিক চেষ্টায় রুদ্ধ করে আমি আমার প্রতিজ্ঞা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।' সর্বভুক্ শূন্যবাদের ওপর কোন কিছু দাঁড়াতে পারে না—তখন পশুবল হয় ধ্বংসকর্তার একমাত্র অবলম্বন।

সার্থক বিপ্লবী রহস্য ও রোমাঞ্চের টানে আত্মহারা হয় না। আর বাকুনিন এর পিছনে মাতালের মত ছুটতেন। যখন তিনি পথে পা বাড়াতেন ভাবতেন না পথ তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে। নিজ চরিত্রের এই পাগলামির কথা তাঁর অজানা ছিল না। "স্বীকারোক্তি"-তে তিনি সুন্দর আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

> "আমার চরিত্রে একটি মারাত্মক দোষ অদ্ভুতের প্রতি আকর্ষণ। গতানুগতিকের বাহিরে দুঃসাহসিক কর্মপ্রয়াস যার সম্মুখে উন্মুক্ত হয় এক অনন্ত দিক্‌চক্রবাল এবং যাহার সীমানা কেহই দেখিতে পায় না, তার টানে আমি আত্মহারা হইয়া যাই।"

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যদি তাঁর সকল স্বপ্ন সফল হয় তা হলে তিনি কি করবেন। তিনি জবাব দেন 'আমি তৎক্ষণাৎ আমার গড়া জিনিসগুলো ভাঙতে শুরু করব।' ঠিক 'চিরন্তন বিপ্লবী'র মত কথা। এই নির্বোধ বিনাশবৃত্তি, উদ্দেশ্য ও উপায়ের অসঙ্গতি এবং বাস্তববোধের অভাব—এই তিন দোষে বাকুনিনের বিপ্লব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল। বন্ধু বিরুভভ তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন, 'যতবার তিনি রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের ছক কেটেছেন ততবারই সেই আয়োজন তাঁর কাঁধের ওপর ধ্বসে পড়েছে। সারাজীবন তিনি সিসিফাসের খেলা খেলে গেলেন।' (কার, ৪৪০)

তা বলে কি মানুষের মুক্তি-অভিযানে বাকুনিনের কিছুই অবদান রইল না ? এ কথা ঠিক নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর বিশেষ কোন মৌলিক অবদান নেই। কিন্তু কে অস্বীকার করবে একথা যে তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও নিরলস সংগ্রাম নৈরাজ্যবাদকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে, পণ্ডিতের আসর থেকে নিয়ে এসেছে যোদ্ধার কুরুক্ষেত্রে, দার্শনিকের মিনার থেকে নামিয়ে এনেছে পথে ঘাটে বস্তিতে পল্লীতে ? বিদগ্ধরা দেখেছে তাঁর যুক্তির হেত্বাভাস, দর্শনের দারিদ্র্য, মানুষ শুনেছে সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের বাণী, ধ্বংসের আহ্বান, তারা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সাম্রাজ্য নিপাত হবে, রাজমুকুটগুলি খসে পড়বে, ধনীর বিত্ত আসবে গরীবের ঘরে, চাষী পাবে মুক্ত জীবন, ছোট ছোট স্বাধীন গণতন্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত সম্মিলনে সৃষ্টি হবে নতুন সমাজ, আর এই উদাত্ত আহ্বানের পিছনে দেখেছে এক আত্মভোলা সর্বত্যাগী পরমক্ষত্রিয়কে। উত্তরকাল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় পেয়েছে। ১৮৪৮ সালে 'শ্লাভদের প্রতি আবেদনে' তিনি অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে শ্লাভরাষ্ট্রগুলির একটি সংহতি সৃষ্টি করবার নকশা দেন। সত্তর বৎসর পরে ১৯১৮ সালে দক্ষিণপূর্ব ইয়োরোপের মানচিত্র সেইভাবে চিত্রিত হল। ১৮৭২ সালে "রাষ্ট্রবাদ ও নৈরাজ্যবাদ"-এ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন জার্মান ঐক্যের আবেগ জার্মান স্বাধীনতাকে বলি দিয়ে ইয়োরোপে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে। পঁচিশ বছরের মধ্যে এই চেতাবনির বাস্তবতা প্রমাণিত হল।

উনিশ শতকের শেষার্ধের সকল প্রকার বিপ্লব আন্দোলনে বাকুনিনের ব্যক্তিত্ব, কৌশল ও চিন্তার ছাপ আছে। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে ক্রপট্‌কিনের নৈরাজ্যবাদ, ফ্রান্সের সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌, রুশের নিহিলিজ্‌ম্‌ ও বলশেভিজ্‌ম্‌।

বাকুনিন প্রুদঁর শিষ্য হলেও তাঁর নৈরাজ্যবাদের নিরিখ আলাদা। প্রুদঁর নৈরাজ্যবাদ প্রজ্ঞানশীল, তার আবেদন বুদ্ধি ও বিবেকে। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ বিপ্লবনিষ্ঠ, তার আবেদন সংগঠন ও সংগ্রামে। প্রুদঁর কেন্দ্র ব্যক্তি, বাকুনিনের কেন্দ্র সমাজ। বাকুনিনের কলেক্‌টিভিজ‌্ম্ সমর্পিত হল তাঁর উত্তরসূরী ক্রপট্‌কিনের হাতে, এর নূতন রূপায়ণ ও নামকরণ হল এনার্কিস্ট কমিউনিজ‌্ম্।

নিহিলিজ‌্ম্-এর মন্ত্রগুরু বাকুনিন। তাঁর ধ্বংসবাদ শূন্যবাদের ভূমিকা। আবার তাঁরই আহ্বান গিয়ে পৌঁছল এই নেতিবাদী তরুণদের কানে,—বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ ছেড়ে গ্রামে যেতে হবে, চাষীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নেচাএভের গর্হিত ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টাও তাঁর কাছে সমান ঋণী, তাঁর রোমাঞ্চপ্রীতির এ এক অশুভ প্রতিফলন। তারপর এল যে মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের দল তাদের সামনেও ছিল এই অকুতোভয় অগ্নিহোত্রী সন্ন্যাসীর জীবন্ত বিগ্রহ।

সিণ্ডিক্যালিজ‌্ম্-এর মন্ত্রগুরু যদিও প্রুদঁ, তবু এর সঙ্গে বাকুনিনের চিন্তার সামীপ্য অধিক। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার সমর্থন, শ্রমিক ধর্মঘটের শক্তি, রাজনৈতিক দলগঠন ও আন্দোলনে অবিশ্বাস, শিল্পীসমবায়ের মালিকানায় কারখানা পরিচালনা ইত্যাদি যাবতীয় সিণ্ডিক্যালিস্ট সূত্র বাকুনিনের রচনায় বিদ্যমান। নিরাজ সমাজের যে রেখাচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন শতকের শেষে তাতেই রং দিয়েছেন পেলুতিয়ে ও সরেল।

তারপর বলশেভিজ‌ম্ বা লেনিনবাদ। আলবের কাম্যু-র কথায় বলতে গেলে 'লেনিনের মতবাদে বাকুনিনের দান তাঁর শত্রু মার্ক্‌স্-এর চেয়ে কিছু কম নয়। অধিকন্তু বিপ্লবী শ্লাভ সাম্রাজ্যের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং তার যে চিত্র তিনি জারের সামনে তুলে ধরেছিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিটি সীমান্তসমেত রূপ পেয়েছে স্টালিনের হাতে'।[২১] বিপ্লবের কৌশল ও দলগঠনের নীতি লেনিন মার্ক্স-এর চেয়ে বাকুনিনের কাছ থেকে শিখেছেন বেশি। ফরাসী-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়ে বাকুনিন ফরাসী মজুরদের ডেকে বলেছিলেন এ যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে নিয়ে যেতে। সাতচল্লিশ বছর পরে লেনিন রুশ শ্রমিকদের ডেকে বলেছিলেন ঠিক এই কথা। লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামকে

২১ ল্যম্‌ রেভল্‌তে (বিদ্রোহী), অনুবাদ এন্টনী বাওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫৪, ১৩০ পৃষ্ঠা।

গ্রামে নিয়ে যাওয়া এবং চাষীদের জমি দখল করতে প্ররোচিত করার বিপ্লবী নীতিও বাকুনিনের কাছ থেকে পাওয়া। আদর্শের ঐক্যে ও নিয়মশৃঙ্খলায় দৃঢ়বদ্ধ বিপ্লবী সংগঠনের যে পরিকল্পনা বাকুনিন দিয়েছিলেন তার সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল বলশেভিক ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যান্য দলে। বিপ্লবী সংঘের ঐক্যবদ্ধ সামরিক নেতৃত্ব, মতবাদে একনিষ্ঠ আনুগত্য, বিপ্লবের পরে অসপত্ন কর্তৃত্ব, এর কাঠাম ও বাইরের সম্পর্ক, এসব লেনিনবাদের পূর্বাভাস। "বিপ্লবের বিতর্কিকা"য় (১৮৬৬) সংগঠনের নিয়মপ্রসঙ্গে প্রত্যেক সভ্যকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে,

> "কিন্তু যে মুহূর্তে কার্যসভা অধিকাংশের মতানুসারে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নামে তাহার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত লইবে সেই মুহূর্ত হইতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমত প্রভাবিত করিবার কোন অধিকার তাহার থাকিবে না।"

এই সাংগঠনিক নীতি ধার করে বলশেভিকরা আখ্যা দিয়েছে 'ডিমক্রেটিক সেণ্টেলিজ্‌ম্' বা 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রায়ন'। বাকুনিন গুপ্ত সমিতির সভ্যদের 'কর্মী' ও 'সমর্থক' দুই ভাগে ভাগ করেছেন। শেষোক্তদের সামনে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের নামের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে সমিতি নিজের কাজ হাসিল করবে। এই কৌশল কমিউনিস্ট দলে চালু হয়েছে এবং এই জয়ঢাক বইবার লোকেরা 'ফেলো-ট্রাভলার' বা সহযাত্রী বলে পরিচিত। "স্বীকারোক্তি"-তে বাকুনিন বলছেন,

> "আমার বিশ্বাস অন্য যে কোন জায়গা অপেক্ষা রুশে এক সুদৃঢ় একনায়কশক্তি অপরিহার্য যে শক্তির একমাত্র কাজ হইবে চাষীদিগের শিক্ষা ও জীবনের মান উন্নয়ন, যে শক্তির প্রেরণা ও চালনা হইবে অব্যাহত, যাহাতে কোন পার্লামেণ্টারী অধিকার থাকিবে না, যাহা স্বাধীনতার ভাবধারা প্রকাশ করিয়া বই ছাপিবে, কিন্তু যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিবে না, যাহাকে ঘিরিয়া থাকিবে একমতাবলম্বী জনতা, যাহা মুক্ত স্বাধীন পঞ্চায়েতী শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (১৭৯ পৃষ্ঠা)

বিস্ময়ের কিছু নেই যে বাকুনিনের রচনাবলীর সোভিয়েত রুশ সংকলক য়ুরি স্টেক্‌লভ্ পুলকিত হয়ে বলছেন এ চিত্র রাষ্ট্রান্তক বিপ্লবের নয়, কমিউনিস্ট বিপ্লবের। 'নৈরাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় এ সে বস্তু নয়, বরং এ হল

সোভিয়েত শক্তি, সর্বহারার একনায়কত্ব'।[২২] খুব ভুল তিনি করেননি। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে লেনিন তিন দফা শ্লোগান দিয়েছিলেন 'চাষীকে জমি দাও', 'মজুরকে কারখানা দাও' আর 'সকল ক্ষমতা যাক পঞ্চায়েতের হাতে'। সেই থেকে শুরু করে স্টালিনের পার্টি শোধন ও কমিউনিস্ট সাম্রাজ্য বিস্তার পর্যন্ত সমস্ত পদক্ষেপের ইঙ্গিত বাকুনিন দিয়ে গেছেন। ম্যাসারিক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'বলশেভিকরা মার্ক্সবাদকে নিয়ে বড়াই করে যে তারাই এর একনিষ্ঠ ভক্ত। তারা বোঝে না মার্ক্স-এর প্রতিদ্বন্দ্বী বাকুনিনের কাছে তাদের ঋণ কতখানি'।[২৩]

নিয়তির কি নির্মম পরিহাস? এই ব্যক্তিই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মার্ক্স-এর সর্বহারার একনায়কত্ব এক অভূতপূর্ব স্বৈরশাসন নিয়ে আসবে, সর্বহারাদের দেবে 'সেনাবাসের স্বাধীনতা'। এই ব্যক্তিই তাঁর সকল স্ববিরোধী উক্তি ও কার্যকলাপ সত্ত্বেও মানবজাতির মুক্তিযজ্ঞের হোমশিখার মত ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করে আছেন। বাকুনিন ইতিহাসের একটি মূর্তিমান দ্বন্দ্ব। মুক্তি ও ধ্বংস, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য, আদর্শ ও আবেগ বিপ্লবী আত্মার এই চিরন্তন সংঘাত বাকুনিনের জীবনে সামঞ্জস্যের আস্তরণ চূর্ণ করে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ফেটে পড়েছে। সেই সংঘাতের চিহ্ন বহন করেছে ইতিহাস, তাতে ধ্বংস হয়েছেন বাকুনিন।

৯। রুশ: নিহিলিজ্‌ম্‌

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান পর্যটক ব্যারন ফন হক্সথাউসেন রুশে এসে আবিষ্কার করলেন এক সামুদায়িক ভূমি ব্যবস্থা। তিনি দেখলেন এখানকার গ্রামগুলি এক একটি চাষী-কমিউন, যাকে তারা বলে 'মির'। এর মাথায় আছে একজন প্রধান, গৃহকর্তাদের সঙ্গে বসে সে গ্রামকৃত্য নির্বাহ করে। সভায় স্থির হয় জমিতে এবার কোন কোন ফসল তোলা হবে, আর জমির উর্বরতা রক্ষার জন্যে ফসলের আবর্তন হবে কি প্রকারে। যখন কোন কোন পরিবার আয়তনে বেড়েছে, কোন কোন পরিবার কমেছে তখন সকলের মধ্যে সমতা রাখবার জন্যে নতুন করে জমির ভাগ বাটোয়ারা হয়।

---

২২ বাকুনিনের রচনাবলী, খণ্ড ১, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

২৩ সর ল্যা বলশেভিজ্‌ম্‌, জেনেভা, ১৯২১, ২৯ পৃষ্ঠা।

অবশ্য চাষীরা তখন ভূমিদাস এবং মালিকের অধিকার ছিল বাটোয়ারা রদবদল করবার।

চাষীরা যে নির্বিবাদে মালিকের অধিকার মেনে নিত, অথবা মালিক যে সর্বদা নিজ অধিকার খাটাতে পারত তা নয়। ভূমিদাস চাষীদের দাবি ছিল —"আমরা তোমার সম্পত্তি বটে কিন্তু জমি আমাদের সম্পত্তি।"

কমিউনে ছিল তিন প্রকারের জমি ও স্বত্ব। বাস্তুভিটা ও বাগান ছিল চাষীর। মাঠ, গোচর ও জঙ্গল ছিল গ্রামের। খেতখামারগুলিতে স্বত্ব ছিল যৌথ কিন্তু আবাদ হত পৃথক। এর ভাগ বিলি করত কমিউন। এ প্রথা ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছিল এবং বহু জায়গায় জোতগুলি চাষীর দখলে চলে এসেছিল।

জমি বিলি করা ও চাষের তদারক করা ছাড়া কমিউনের আরও কাজ ছিল। মির ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের পীঠ। রাস্তাঘাট, সাঁকো ইত্যাদি মেরামত করবার কাজ ভাগ করে দেওয়া, অকালের জন্যে খাদ্যশস্য মজুত রাখা, যৌথভূমির তত্ত্বাবধান করা, অগ্নিকাণ্ড ও চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা, ঝগড়াঝাটির সালিশি, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম দেওয়া —এসব ছিল মিরের এখ্‌তিয়ারে।

আদিম যূথ সমাজের সার্বজনীন ধারা বহন করে আসছিল রুশের এই গ্রামগোষ্ঠী। ব্যারনের নিজের দেশে তখন ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনার ধাক্কা এসেছে,—তিনি বিদেশের গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা আশ্রয় খুঁজে পেলেন। কিন্তু রুশের প্রগতিবাদীরা এর মধ্যেই পেল নূতন সমাজের ইঙ্গিত। আলেকজাণ্ডার হার্ৎজেন দেখতে পেলেন এক নবীন রুশের চিত্র, যেখানে মির ও মুজিকের বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কারিগরদের সমবায় সমিতি বা আর্তেল। মুক্ত কমিউনগুলির সম্মিলনে তৈরী হবে নবীন রুশ। "বিপ্লবী ভাবনার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে তিনি দেখালেন যে এই বিকেন্দ্রিত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েই আছে। জাতির প্রাণশক্তি নিহিত মির এবং আর্তেলে—রোমানভ্‌ সম্রাটরা তার ওপর চাপিয়েছে ভূমিদাসত্ব, অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের অবান্তর বোঝা। এর ওপর এসে জুটেছে গ্রীক চার্চ। এই রক্তশোষা পরগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, কিন্তু জোরজবরদস্তি করে নয়। জনতার মনে সাড়া তুলতে হবে। তারা সচেতন না হলে বিপ্লব অসম্ভব। ইয়োরোপে নির্বাসনে

বসে হার্ৎজেন "কলকল" বা "ঘণ্টা" নাম দিয়ে এক পত্রিকা বার করলেন। সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে রুশের ঘরে ঘরে এই পত্রিকা তাঁর আদর্শ প্রচার করতে লাগল।

হার্ৎজেনের সমসময়ে শতকের ষষ্ঠ দশকে নিকলাস চের্নিশেভস্কি তাঁর "সমকালীন" পত্রিকার মাধ্যমে একই প্রকার আদর্শ ছড়াতে লাগলেন। তিনিও পেলেন চাষীর মির ও কারিগরের আর্তেলে সমাজতন্ত্রের বীজ। রুশ সরাসরি সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবে, ইয়োরোপের মত তাকে ধনতন্ত্রের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। জারের শাসনে বসে এসব কথা বলার যা পরিণাম চের্নিশেভ্স্কির কপালে তাই জুটল। জেলখানায় বসে তিনি একটা উপন্যাস লিখলেন—"কি করতে হবে?" তাতে আঁকলেন তাঁর স্বপ্ন মুক্ত কমিউনের ছবি।

এদিকে তখন রুশ তরুণদের বুকে বারুদ জমছে। তারা চায় সর্বাঙ্গীন মুক্তি, সকলের আগে বুদ্ধির মুক্তি। বুদ্ধির ওপর কোন শাসন নেই। সভ্যসমাজ মিথ্যাচারের নাগপাশে ব্যক্তিকে আপাদমস্তক আবদ্ধ করেছে, ছিঁড়তে হবে সে বন্ধন। এই গোষ্ঠীর একজন উত্তর-সাধকের কথায়

> "এই বিদ্রোহের মূলকথা সমাজ, পরিবার ও ধর্ম ব্যক্তির উপর যত বাধকতা আরোপ করিয়াছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।"[১]

ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন বিলীয়মান। স্বৈরাচারী জারের শাসনে মুক্তিপিপাসু তরুণ নির্বিচার নেতিবাদ ভিন্ন আর কোন রাস্তা দেখতে পেল না।

টুর্গেনিভ তাঁর "পিতা ও পুত্র" উপন্যাসে (১৮৬২) এই দৃষ্টিভঙ্গির নামকরণ করলেন নিহিলিজ্‌ম্‌ বা শূন্যবাদ।[২] উপন্যাসের নায়ক বাজারভ খাঁটি মুক্তবুদ্ধি অবিশ্বাসী। তার চেলা আর্কেডির কথায় নিহিলিস্ট হল এমন ব্যক্তি যে কোন কর্তার কাছে মাথা নোয়ায় না, কোন নীতিকে অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করে না— সে নীতি যত পবিত্রই হোক না কেন। তার একনিষ্ঠ আনুগত্য বিচারবুদ্ধির প্রতি। সে মুখপোড়া, স্পষ্টবাদী, রেখে ঢেকে কথা কয় না। বিবাহ, প্রেম,

---

১ স্টেপনিয়াক: আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা, লণ্ডন, ১৮৮৩, ৪ পৃষ্ঠা।

২ 'নিহিল' অর্থ 'কিছু না'।

বন্ধুতা তার কাছে ভুয়া। বাজারভ বলছে, "যদি কোন নারীকে তোমার ভাল লেগে যায়, তবে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা কর। কিন্তু যদি বিফল হও, বেশ ত—ছেড়ে দাও তাকে, সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ভাল মাছ আছে।" আদব কায়দা, ভদ্রতা, আবেগ, উচ্ছ্বাস এসব তার উপহাসের বস্তু। তার একাগ্র নিষ্ঠা বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের তত্ত্বকথায় নয়, ব্যবহারিক প্রয়োগে।

এই দলের চিন্তানায়ক ছিলেন দ্মিত্রি পিসারেভ,[৩] "রুশ্‌কোয়ে স্লোভো" বা "রুশের কথা" পত্রিকার নিয়মিত লেখক। টুর্গেনিভের চিত্রিত নিহিলিস্ট চরিত্রকে তিনি সাদরে স্বীকৃতি দিলেন। নিহিলিস্ট খাপছাড়া—চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সে তাল রেখে চলে না। পিসারেভ চারদিকে তাঁর বাক্যবান বর্ষণ করতে লাগলেন। দর্শন, ধর্ম, সভ্যতা, নীতিশাস্ত্র,—শেষে বিজ্ঞান, শিক্ষা, চারুকলা কিছু বাদ রইল না। শিক্ষা ব্যক্তিত্বের ওপর জুলুমবাজি আর চারুকলা রূপের ব্যবসা।

> "র‍্যাফেলের চেয়ে একজন মুচির কদর বেশি; কারণ মুচির হাতে কাজের জিনিস তৈয়ারী হয়, আর র‍্যাফেল যাহা তৈয়ার করেন তাহা কোন কাজে লাগে না।"

এই আত্মসর্বস্ব কাজের লোকেরা যদি নিজ নিজ ভবিষ্যত গুছিয়ে নিয়ে ভড্‌কার টেবিলে বসে সমালোচনার তুবড়ি ছোটাত তাহলে সেটা মানাত ভাল। কিন্তু তা হল না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ফলিত দর্শন নিয়ে তারা যেমন মাতামাতি শুরু করল তা গোঁড়া ধর্মান্ধদের হার মানায়। বুয়েক্‌নারের 'স্টফ আণ্ড ক্রাফ্‌ট্' বা 'শক্তি ও পদার্থ' হল তাদের বেদ। একজনের স্বীকারোক্তি: 'আমরা প্রত্যেকে মলেশ' ও ডারউইনের জন্যে হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।' এই প্রকারে বস্তুর ওপর এসে দাঁড়াল বস্তুবাদ, বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিশল বিশ্বাসের সংস্কার। নাস্তিকদের পাণ্টা চার্চ তৈরী হল, আস্তিকরা হল মহাপাতক।

পিসারেভ বললেন বাসনা চরিতার্থ করা মানে ইন্দ্রিয় সেবা নয়। খাঁটি বাস্তববাদী জানে যে তার গুণপনা সমাজের জিনিস, সে নির্বোধ ভোগবিলাসে তা ক্ষয় করে না। তোমার মনের ঠিক ঠিক তৃপ্তি হবে তখন 'যখন বুঝতে

---

৩ পিসারেভের লেখার সংকলন করেছেন এ. ককার: দ্মিত্রি পিসারেভ এ. লিদেঅলজি দ্য নিহিলিজ্‌ম্ রুশ, পারী, ১৯৪৬।

পারবে যে তুমি মানুষের কোন কাজে লেগেছ, তোমার সঞ্চিত ঋণের বোঝা থেকে কিছু কিছু তুমি শোধ করছ।' এই প্রকারে যুক্তিশীল নেতিবাদকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ—

> "অন্নহীন ও বস্ত্রহীনের অনিবার্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান—এই প্রশ্নের বাহিরে কোন কিছু নাই যাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অথবা হৈ-চৈ করিবার কোন সার্থকতা আছে।"

কাব্য ও কলা, বিজ্ঞান ও দর্শন হবে সমাজনিষ্ঠ, এদের ওজন হবে সমাজের মানদণ্ডে। সামাজিক প্রশ্নের জবাব যাতে নেই তার থাকবার অধিকার নেই। বর্তমান সমাজকে নির্মমভাবে নাশ করতে হবে, তবেই আসবে নূতন সমাজ, নূতন জীবনমূল্য নিয়ে। পিসারেভ লিখলেন

> "যাহা চূর্ণ হইবার তাহা চূর্ণ করিয়া দাও। যাহা আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারিবে তাহা টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, যাহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে তাহা জীর্ণ। যাহাই হউক, ডাইনে বামে আঘাত হানো—তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, হইতে পারে না।"

নেতিবাদ ও নাশকতার দার্শনিক বিস্তারে যদি এরা ক্ষান্ত হত তাতে রুশের কারও নিদ্রাভঙ্গ হত না। পিসারেভ যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন তখন জারের টনক নড়ল।

> "যুক্তির আঘাতে স্থবির স্বেচ্ছাচার, জরাজীর্ণ ধর্ম এবং সরকারী নীতিশাস্ত্রের ঘুণধরা তক্তাগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,…রোমানভ বংশ ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আমলাবর্গ নিপাত হউক…যাহা ক্ষয়িষ্ণু আপনা হইতে তাহা কবরে গিয়া পড়িবে। আমাদের কাজ শুধু শেষ ধাক্কাটা দেওয়া এবং উহাদের পূতিগন্ধ শবদেহের উপর ধূলি বর্ষণ করা।"

স্বেচ্ছাচারী সরকারকে লক্ষ্য করে পিসারেভ লিখলেন তার হাতে আছে প্রচারের যন্ত্র ও পশুবল। এর সঙ্গে যখন খোলাখুলি পাল্লা দেবার উপায় নেই তখন জনতাকে গোপন প্রচারের আশ্রয় নিতে হবে।

এর পর জারের পুলিস চুপ করে থাকতে পারে না। প্রচারপুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করে রচয়িতাকে তারা পিটার এণ্ড পল দুর্গে পাঠিয়ে দিল। ১৮৬২ সালের জুলাই থেকে ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চার বছর জেলে কাটল। তাঁর অধিকাংশ রচনা এই সময়কার। মুক্তির পর দুই বৎসরের মধ্যে

ল্যাটভিয়ার উপকূলে স্নান করতে গিয়ে তিনি জলমগ্ন হন। তখন তাঁর বয়স সাতাশ বছর। এর মধ্যেই রুশ তরুণের বুকে তিনি আগুন ছুঁইয়ে গেলেন।

আত্মপর যুক্তিসর্বস্ব নিহিলিস্ট দর্শন থেকে উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল তার্কিক ভোগবাদী, আসলে উৎপন্ন হল কঠোর বৈরাগী—যার কাছে কেবল ধনসম্পদ নয়, শিল্পকলা, দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্বও পঙ্কিল বিলাসিতা। নিহিলিস্ট শুরুতে ছিল মুক্তবুদ্ধি সংশয়ী, আখেরে হল আত্মত্যাগী সমাজবাদী। নীতি-শাস্ত্রকে নস্যাৎ করে সে এমন এক কৃচ্ছ্রসাধনায় মগ্ন হল যার তুলনা পাওয়া কঠিন। খাঁটি নিহিলিস্টের কাছে আপন মুক্তি ও সুখ সকলের উপরে—সে নিষ্প্রেম, নির্বিবেক, বেপরোয়া। যখন নিজের মুক্তি ও সুখ বিসর্জন দিয়ে সে সমাজের মুক্তি ও সুখের জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, তখন স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে হল সমাজবিপ্লবী।

১৮৬২ সালে 'জমি ও মুক্তি' নামে এক বিপ্লবী সমিতি গঠিত হল। ১৮৬৬ সালে কারাকাজভ নামে একটি যুবক জারকে হত্যা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পুলিসের তৎপরতায় বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হল। এদের মধ্যে একজন, পিটার লাভরভ (১৮২৩-১৯০০) নির্বাসনে বসে লিখলেন "ঐতিহাসিক পত্রাবলী" (১৮৬৮-৬৯)। পরের বছর সুইৎজারল্যাণ্ডে পালিয়ে এসে তিনি "ভ্পিরিওদ" বা "অগ্রগামী" নামে এক পত্রিকা বের করলেন। শিক্ষিত তরুণদের তিনি দেখালেন গ্রামের রাস্তা, ঘুমন্ত মুজিকদের জাগিয়ে তুলবার কাজ তাদের। যাদের আছে ভাববার, বিচার করবার শক্তি সমাজের উন্নতি সাধনের দায় তাদের হাতে। সকলের আগে চাই নিজের সর্ববিধ শক্তির অনুশীলন, তারপর চাই সেই শক্তির প্রয়োগে সামাজিক বিধানে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। নূতন বিধান রচিত হবে সাম্য ও স্বাধিকারের মূল মির ও আর্তেলের উপর। আশাহত গ্রাম্য জনতার দুয়ারে দুয়ারে এই বাণী পৌঁছে দিতে হবে, তাদের মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে হবে।

এর পর 'জনতার সংকল্প' নামে গঠিত হল উগ্র বিপ্লবী দল। তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লাভরভ যে বিপ্লবের দিগ্দর্শন দিলেন সে ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নয়। বিদ্রোহের আগে চাই প্রস্তুতি প্রচার—সর্বসাধারণের মনে ব্যাপক অসন্তোষ ও নূতন সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা। গণচেতনা জাগ্রত হলে রাষ্ট্রশাসনের ইমারত আপনিই ধ্বসে পড়বে, স্বাধীন চুক্তি ও আদান প্রদানের মাধ্যমে মানুষ আপনার ভাগ্য রচনা করবে।

এদিকে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে রাশি রাশি সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য সীমান্ত-প্রহরা ভেদ করে রুশের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল। বিপ্লবী ভাবনার রস পেয়ে রুশের ঊষর মাটিতে জাগল সৃষ্টি-সম্ভাবনা। পিতৃপুরুষের শোষণলব্ধ বিত্ত পরিত্যাগ করে তরুণতরুণীরা হল পথচারী—স্বদেশতীর্থের সন্ধানে তারা গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে গেল ডাক্তার শিক্ষক ধাত্রী সেবিকা এমন কি চাষী করিগর হয়ে—গ্রামবাসীর কানে প্রচার করতে লাগল বিপ্লবের মন্ত্র। নগরে নগরে লোকচক্ষুর আড়ালে জমল গুপ্ত সমিতি। ১৮৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল জারের ওপর কারাকাজভের হামলা ব্যর্থ হল। পরবর্তী মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা গেল কারাকাজভ ও তার সহকর্মীরা সব ধনকুবেরদের সন্তান। সব ছেড়ে এসে তারা হয়েছিল শ্রমজীবী। তারা এক এক ঘরে তিন চারজন করে বাস করত, মাথাপিছু মাসে খরচ করত দশ রুবল (১৫৲ টাকার মত), বাকি আয় ঢেলে দিত নিজেদের সমবায়ী কারখানায় বা সমিতিতে।

সার্গিয়েই নেচাএভ নামে একটি ভূমিদাসের ছেলে সেণ্ট পিটার্সবার্গের কলেজে পড়তে এসে কারাকাজভের দলে যোগ দেয়। হত্যা ও নাশ ছাড়া আর কিছু সে বুঝত না। তার গরম গরম কথা পুলিসের কানে পৌছতে বিলম্ব হল না। গ্রেপ্তার আসন্ন বুঝে নেচাএভ স্থির করল দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবে বীরপুরুষের গৌরব। সেণ্ট পিটার্সবার্গের স্তাবকদের উদ্দেশে[৪] সে একটি চিঠি লিখল যে জারের পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে এক অজানা দুর্গে নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সে আর একটি পত্র জুড়ে দিল সেটি যেন একজন অজ্ঞাতনামা ছাত্রের লেখা,—একটি পুলিসের গাড়ি থেকে একজন কয়েদী প্রথম পত্রটি ফেলে দিয়েছে, সেইটি কুড়িয়ে নিয়ে সে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাচ্ছে। চিঠি পেয়ে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা যখন তার মুক্তির দাবিতে হৈ-চৈ করছে তখন নেচাএভ একটি জাল পাসপোর্ট নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে স্যুইৎজারল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়াল।

জেনেভায় এসে সে তার মানসপিতা বাকুনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এবং বিপ্লবী ভোলানাথকে কয়েকটি রূপকথার গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করল। সারা রুশসাম্রাজ্যব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করেছে রুশের কমিটি অব একশন, তারই প্রতিনিধি হয়ে সে আসছে পিটার এণ্ড পল দুর্গ থেকে পালিয়ে।

৪ চিঠিটা লেখা হয় স্বনামধন্যা বিপ্লবী মেয়ে ভেরা জাসুলিচকে।

এতদিনে মনের মতন 'ছেলে' পেলেন বাকুনিন, তৎক্ষণাৎ 'রুশ কমিটি অব একশনের' প্রতিনিধিকে সনদ দিলেন 'বিশ্ববিপ্লবী সংস্থার রুশ শাখার' প্রতিনিধিত্ব করবার। বুদ্ধিমান পুত্র এই ছাড়পত্রের চেয়ে মূল্যবান একটি জিনিস যোগাড় করে নিল। বাকুনিনের মধ্যস্থতায় এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে সে দশ হাজার ফ্রাঁক হস্তগত করল, অবশ্য আশ্বাস দিতে ভুলল না যে এ টাকায় ঠিক ১৮৭০ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী সারা রুশে বিপ্লবের আগুন জ্বলবে।

দলের আদর্শ ও কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ হল তিনটি পুস্তিকায়—"বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে আসিয়াছে", "বিপ্লবের নীতি" এবং "বিপ্লবের বিতর্কিকা"।[৫] প্রথমটি রুশ চাষীর বন্দনা ও তার নাশাত্মক ঐতিহ্যের প্রতি আবেদন। দ্বিতীয়টি নাশাত্মক উপায়ের বর্ণনা—'বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাদি।' তৃতীয়টিতে আছে ষড়যন্ত্র ও নাশকতার বিশদ ব্যাখ্যান এবং বিপ্লবী চরিত্রের মান নির্ধারণ।

> "১। বিপ্লবীর আপনার বলিতে কিছুই নাই—না কোন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ, বিত্ত, এমন কি নাম। তাহার সর্বস্ব ডুবিয়া গিয়াছে এক স্বার্থে, এক চিন্তায়, এক নেশায়—বিপ্লবে।
>
> ৩। একটি মাত্র বিজ্ঞান তাহার জানা আছে—ধ্বংসের বিজ্ঞান। শুধু এই উদ্দেশ্যে সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও সম্ভব হইলে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।…
>
> ৪। ·· তাহার ন্যায় অন্যায়ের বালাই নাই। যাহা বিপ্লবের জয়লাভে সহায়ক তাহা ন্যায়সঙ্গত, আর যাহা তার প্রতিবন্ধক তাহা অন্যায় ও অপরাধ।…
>
> ৬। নিজের উপর সে যেমন কঠিন অন্যের প্রতিও তাহাকে তেমন কঠিন হইতে হইবে। তাহার হৃদয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুতা, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কোমল অনুভূতির স্থান নাই, বুক জুড়িয়া আছে বিপ্লবী সাধনার কঠোর আবেগ। তাহার তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও আনন্দ কেবল বিপ্লবের সফলতায়। অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক জ্ঞান,—নির্মম সংহার।…

৫ এই পুস্তিকাগুলিতে বাকুনিনের দান কতখানি তা নির্ণয় করা কঠিন। বাকুনিন নেচাএভের মত হৃদয়হীন ছিলেন না এ নিঃসন্দেহ। কোথাও কোথাও বাকুনিনের চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট, যেমন 'বিতর্কিকা'র শেষ চার অনুচ্ছেদ (২৩-২৬) যেখানে রাষ্ট্র, সম্পত্তি, অভিজাত, আমলাতন্ত্র ও পাদরিদের মুণ্ডপাত এবং দস্যুবৃত্তির প্রশস্তি পাঠ হয়েছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

> ৮। বিপ্লবীর বন্ধুতা ও আকর্ষণ থাকিবে শুধু তাহাদের প্রতি যাহারা কাজের মধ্য দিয়া তাহার মত বিপ্লবী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সাথীর প্রতি তাহার বন্ধুতা, অনুরাগ ও দায়িত্ব নিরূপিত হইবে সর্বধ্বংসী বিপ্লবে সাথী কতটা কার্যকরী তাহা দিয়া।"

পরবর্তী কয়েকটি ধারায় সমাজের উপরতলার লোকদের ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিপ্লবের কাজে সবচেয়ে অনিষ্টকর লোকগুলি প্রথম পর্যায়ভুক্ত। তাদের অবিলম্বে শেষ করে দিতে হবে।

> "১৬। লোকটা কত বদমাস কিংবা দল অথবা জনসাধারণ তাহাকে কত ঘৃণা করে এই মাপকাঠিতে তালিকা তৈয়ারী হইবে না। জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার পক্ষে বরং এই বদমাসি ও ঘৃণা কাজে লাগিতেও পারে।...
>
> ১৭। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে এমন সব লোক যাহাদিগকে আপাতত হত্যা করা হইবে না যাহাতে তাহারা পাশবিক অত্যাচারে জনতাকে অনিবার্য বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়া দিতে পারে।"

তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে 'উচ্চপদস্থ পশুর দল।' তাদের ফাঁদে ফেলে কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে থাকবে উচ্চাভিলাষী উদারপন্থীরা। তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবার ভান করে তাদের গোপন অভিসন্ধি ধরতে হবে—তারপর হাতের মুঠোয় এনে তাদের খেলাতে হবে। পঞ্চম পর্যায়ে থাকবে বাক্যবিলাসীরা। তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গরম গরম বিবৃতি দেওয়াতে হবে যাতে তারা ধরা পড়ে জেলে যায় এবং তাদের সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অল্পসংখ্যক খাঁটি বিপ্লবী তৈরী হতে পারে। ষষ্ঠ পর্যায়ে থাকবে মেয়েরা। তাদের মধ্যে যারা স্বার্থপর ও ছিদ্রান্বেষী তাদের প্রতি ঐ প্রকৃতির পুরুষদের মত আচরণ করা হবে আর যারা খাঁটি 'তারা আমাদের অমূল্য রত্ন।'

> "২২। জাতির উপর দিয়া যত প্রকার উৎপীড়ন ও দুর্যোগ চলিতেছে দলের কাজ হইবে সকল উপায়ে সকল শক্তি দিয়া সেগুলিকে বাড়াইয়া তোলা যাহাতে অবশেষে জনতা ধৈর্য হারাইয়া ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।"[৬]

নীতি, কৌশল ও কার্যপদ্ধতি সকলই অভূতপূর্ব। তার চেয়েও প্রধান

৬ ম্যাক্স্ নোমাড: এপস্‌লস্ অব দি রিভল্যুশন, বস্টন, ১৯৩৯, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

বৈশিষ্ট্য এর হৃদয়হীনতা। এতদিন বিপ্লবী শত্রুকে আঘাত করেছে জনসমাজের শুভার্থে। ঘর ও সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে যারা এই দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ভ্রাতৃসম্বন্ধ, পরস্পরকে ভালবেসে তারা শূন্য মণিকোঠা পূরণ করেছে। এবার বিপ্লবের পাষাণদেবতা চলে গেল ভালবাসার ঊর্ধ্বে, যাদের জন্যে বিপ্লব এবং যাদের নিয়ে বিপ্লব তাদের উপরে;—হিংসা আর প্রতারণার কোন সীমা রইল না। নেচাএভের মৌলিকতা এইখানে। একমাত্র সেই নিহিলিজ্‌ম্-এর শূন্যবাদকে রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রবর্তন করতে পেরেছিল,—যে বিপ্লব নীতিহীন, নির্বিবেক, নির্মম, যাতে কোন সাংগঠনিক উদ্যোগের নামগন্ধ নেই।

এই দর্শন আর তার সঙ্গে বাকুনিনের ছাড়পত্র ও টাকা নিয়ে নেচাএভ রুশে ফিরে এল। 'জনতার প্রতিহিংসা' কমিটি নাম দিয়ে সে এক দল গড়ল, এর প্রতীক হল কুঠার। এক একজন নায়কের পরিচালনায় পাঁচ পাঁচজনের গ্রুপে দলটা ভাগ করে দেওয়া হল যাতে এক গ্রুপের কথা অন্য গ্রুপ না জানতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সব খবর আসত এবং তার নির্দেশ সকল গ্রুপকে নিবিচারে মানতে হত। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দলের যোগসূত্র ছিল একা নেচাএভ। অনুচরদের হাতে রাখবার জন্যে নেতাদের হিংসা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবার অধিকার ছিল। দলে লোক আনবার জন্যে সাহস ও বলিদানের প্রেরণায় আবেদন করা হত না। বিশ্বাসীদের ভাঁওতা দিয়ে, অবিশ্বাসীদের ভয় দেখিয়ে, আবেগ-প্রবণদের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়ে দলে ভেড়ান হত। পরিচিত লোকদের কাছে তাদেরকে জড়িয়ে এমন সব চিঠিপত্র পাঠান হত যাতে তারা পুলিসের খপ্পরে পড়ে এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্রে নামতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী আমলাদের প্রশ্রয় দেওয়া ছিল দলের নীতি, কারণ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। কাজেই দুর্বৃত্ত সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করা ছিল নীতিবিরুদ্ধ।

দলের ছেলেদের নিয়ে এই ধমক ও ধাপ্পাবাজির খেলা বেশী দিন চলল না। ইভানভ নামে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ছেলে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্যে সস্তাদরে একটা হোটেল চালাত। নেচাএভের হুকুম হল এর দেয়ালে একটি বিপ্লবী প্রচারপত্র এঁটে দেবার। ইভানভের মনে নেতার ওপর সন্দেহ জাগছিল। অধিকন্তু হোটেলের ওপর পোস্টার আঁটলে পুলিস ওটা ভেঙে

দেবে এবং গরীব ছেলেরা খুব অসুবিধায় পড়বে। দলের নীতি অবশ্য তাই চায়—যত অত্যাচার বাড়বে তত ভাল জমি তৈরী হবে। কিন্তু ইভানভ তার আদর্শপ্রবণ ও সেবাপরায়ণ মন নিয়ে তা বুঝতে চাইল না—নেচাএভের নির্দেশ সে অমান্য করল। পুলিসের কাছে সে সব কথা ফাঁস করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। নেচাএভ ও কেন্দ্রীয় গ্রুপের আর তিনজন তাকে এক বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলি করল হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এই গ্রুপের ছেলে উসপেন্স্কি প্রশ্ন করেছিল,—একটি দুরাচার অফিসারকেও যে দণ্ড দেওয়া হয় নি, ইভানভের মত একজন আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান কর্মীকে সেই দণ্ড দেওয়া হল এ কি রকম বিচার? নেচাএভ তাকে বুঝিয়েছিল 'এটা ন্যায় বিচারের প্রশ্ন নয়, কর্তব্যের প্রশ্ন। আমাদের লক্ষ্যের পথে যত কিছু বাধা তাহা সরাইয়া দিবার প্রশ্ন।' বিপ্লব কোন অধিকার দেয় না, দেয় শুধু দায়িত্ব, কর্তব্য—আর তা স্থির হয় ওপর থেকে।

> "এখন তোমাদের কাজ কথা বলা নয়, কাজ করিয়া যাওয়া, এবং এসব ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা যাহারা যোগ্যতর লোক তাহাদের হুকুম মত কাজ করা। তোমাদের কর্তব্য তর্ক করা নয়, আদেশ পালন করা।"[১]

এদিকে পুলিসও তাদের কর্তব্য পালনে তৎপর হল। নেচাএভের দলের শত শত ছেলে গ্রেপ্তার হল। চুরাশিজনের কারাদণ্ড হল অল্পবিস্তর মিয়াদের। নেচাএভ আবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল (১৮৭০) সুইৎজারল্যাণ্ডে। আবার সে বাকুনিনের কাছে এসে আর এক আজব গল্প ফাঁদল,—পুলিস যখন তাকে পাকড়াও করে সাইবেরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে তখন সাথীরা এসে তাকে ছিনিয়ে নেয় এবং সে রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। বাকুনিন আবার তার কথায় বিশ্বাস করে তার কার্যকলাপে সাহায্য করতে লাগলেন। অবশেষে রুশ থেকে এসে উপস্থিত হল লোপাটিন নামে নেচাএভের এক পুরান সাথী। সারা রুশব্যাপী বিপ্লব ও দুই পলায়নের কাহিনী এবং ইভানভের আসল কথা সে ফাঁস করে দিল। বাকুনিন দেখলেন শিষ্য তাঁকেও খেলাচ্ছে। 'বিতর্কিকা'র উনিশ নম্বর ধারায় উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের গোপন তথ্য হস্তগত করে তাদেরকে হাতের মুঠোয় এনে খেলাবার যে কৌশল বাতলানো

১৮৭১ জুলাই-এর মামলায় সাক্ষীর জবানবন্দী।

হয়েছে তার প্রয়োগ হচ্ছে গুরুর ওপর। এবার বাকুনিন নাচার হয়ে সহকর্মী-দের কাছে মানসপুত্রের মুখোস খুলে দিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখছেন—

> "যদি তুমি তাহাকে তোমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও তাহা হইলে তাহার প্রথম চেষ্টা হইবে তোমাদের মধ্যে বিভেদ কুৎসা ও চক্রান্ত সৃষ্টি করিয়া ঝগড়া বাধাইবার। যদি তোমার বন্ধুর স্ত্রী অথবা কন্যা থাকে তবে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে তাহাকে ফুসলাইয়া গর্ভবতী করিবার যাহাতে তাহাকে প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের খপ্পর হইতে ছিনাইয়া আনিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামানো যাইতে পারে।"[৮]

বাকুনিনের খেয়াল ছিল না যে তাঁর নিজের যে সর্বনাশের ডাক তা থেকে প্রচলিত নীতিশাস্ত্রও বাদ পড়ে না এবং শিষ্য তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ করছিল মাত্র। তার দর্শনে বাকুনিনের মত অসঙ্গতি ছিল না—সে যা বুঝত তাই বলত এবং তাই করত। নিহিলিস্টদের মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব ছিল সে তা কাটিয়ে উঠে নিহিলিজম্‌কে যথার্থ শূন্যতায় পযবসিত করতে পেরেছিল।

নেচাএভ কাপুরুষ অথবা স্বার্থপর ছিল না। বাকুনিনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার কিছু পরে স্থইস সরকার তাকে রুশ সরকারের হাতে সমর্পণ করলেন (১৮৭২)। মস্কোতে যখন তার বিচার হয় তখন সে একটুও দুর্বলতার পরিচয় দেয় নি। কুড়ি বছরের সাজা নিয়ে সে গেল কুখ্যাত পিটার এণ্ড পল দুর্গে। সেখানকার একজন অফিসার তাকে সহকর্মীদের নাম ধাম বলে দেবার জন্যে প্রলোভন দেখালে তাকে সে ঘুসি মেরে ধরাশায়ী করে দেয়। ঐখানে বসে সিপাইদের নিয়ে সে দল তৈরি করল এবং বাইরে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। দুর্গ থেকে তাকে বার করে নেবার একটা পরিকল্পনা দিয়ে সে 'জনতার সঙ্কল্প' দলের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে এক চিঠি পাঠাল। এই দলের অন্যতম নায়িকা ভেরা ফিগনার পরে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন—

> "সেই চিঠি আমাদের উপর এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিল। অকস্মাৎ যেন তাহার নামের উপর হইতে সকল কালিমা মুছিয়া

---

৮ ই. এইচ. কার: মাইকেল বাকুনিন, লণ্ডন, ১৯৩৭, ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

গেল। নিরপরাধ লোকের রক্তপাত, জোর করিয়া টাকা আদায়, গোপন পত্র হাত করিয়া লোককে নাকে দড়ি দিয়া ঘোরানো, বিপ্লবের নামে যত রকম মিথ্যাচার ও অনাচারের জালপাতা,—সব আমরা এক নিমেষে ভুলিয়া গেলাম।

আমরা দেখিলাম একটি মন যাহা বছরের পর বছর নির্জন কারাবাসে কাটাইয়া একটুও দুর্বল বা বিমর্ষ হয় নাই, একটি সংকল্প যাহা নিষ্ঠুর শাস্তির পেষণে মচকায় নাই, একটি তেজস্বী চরিত্র যাহা ব্যর্থতায় ম্রিয়মান হয় নাই। কমিটির বৈঠকে আমরা চিঠিটা পড়িলাম এবং এক চিন্তা সকলকে অধিকার করিল—তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।"[১]

এক প্রচণ্ড ঘটনার আলোড়নে সমস্ত যোজনা ওলটপালট হয়ে গেল। তার ঝাপটা এসে পড়ল কারাগারেও। সেখানকার জেরা ও জুলুমের চাপে একজন কয়েদী নেচাএভের গোপন কথা ফাঁস করে দিল। সিপাইদের হল জেল। নেচাএভকে অন্য সকলের কাছ থেকে সরিয়ে এক অন্ধকার কুঠরিতে অর্ধভুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হল। কয়েকমাসের বেশি তাকে এ যন্ত্রণা ভুগতে হল না। ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে নির্জন কারাকক্ষে সকলের অলক্ষ্যে তার প্রাণবিয়োগ হল।

নেচাএভের কর্মজীবন চার বছরের, একুশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর দশ বছর জেলের নিষ্ফল জীবন। যে পরিবেশে সে মানুষ তাতে সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করবার বয়স তার হয় নি। এনার্কিস্ট বলে আত্মপরিচয় দিলেও নৈরাজ্যবাদের কিছুই সে বুঝত না। নিহিলিজ্‌ম্‌-এর শূন্যতা, বাকুনিনের নাশকতা আর গোপন ষড়যন্ত্রের নেশা এই সব মিশিয়ে তৈরী হয়েছিল তার মানসিক ধাত। তার বিশেষত্ব এইটুকু যে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সে মানবত্ব থেকে সরিয়ে এনে একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যবসিত করতে পেরেছিল। ধর্মীয় সংগ্রামে জেসুইটরা এবং রাষ্ট্রনীতিতে মেকিয়াভেলি যেমন ন্যায়-অন্যায়ের এক নূতন মাপকাঠি আবিষ্কার করেছিলেন, নেচাএভ বিপ্লব সাধনায় সেই কীর্তির অধিকারী। মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সকল উপায়ই মঞ্জুর, এই আপ্তবাক্যকে

[১] বাকুনিনেরও এতটা মনের জোর ছিল না। তিনি দু বছর কারাবাসের পর 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি' করেছিলেন।

একান্ত নিষ্ঠায় সে পালন করছে, যা বাকুনিনও পারেন নি। এর ফলে যে নৈরাজ্যবাদ ছিল মানবমূল্যে অধিষ্ঠিত এক পবিত্র আদর্শ তা হল কলঙ্কিত,—এনার্কিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল হিংসা ও প্রতারণার অপবাদ। অথচ আশ্চর্য কথা যে উত্তরকালে দূরস্থান, সমকালে সহচরদের মধ্যেও তার বিপ্লবী নীতিশাস্ত্র বিশেষ আমল পায় নি। রুশের সে যুগের তরুণতরুণীরা তাদের রক্ত দিয়ে যে অবিস্মরণীয় মহাকাব্য লিখে গেছে তার মধ্যে নেচাএভ অধ্যায় একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের প্রলাপ।

রুশের ধনীর দুলালরা ঘর ছেড়েছিল মানুষকে ভালবেসে। হৃদয়বৃত্তির অপরিসীম উচ্ছ্বাস পরিবারের ছোট্ট আধারে তারা ধরে রাখতে পারে নি। তাদের বীজমন্ত্র ছিল 'ভ নারদ',—জনতার সামিল হও। কারাকাজভ, শেকোভস্কি এরা গুপ্ত সমিতি গড়ে এই মন্ত্রে দীক্ষা নিল। সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কো থেকে দলের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল শহরে শহরে—কিয়েভ, ওডেসা, ওরেল, টেগেনরগ। ছেলেমেয়েরা গ্রামে গিয়ে বসল চাষী কারিগরদের কানে তাদের মন্ত্র পৌঁছে দেবার জন্যে।

রুশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান খুব উঁচু ছিল না। সেখানে প্রগতিশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তাধারা ছিল নিষিদ্ধ। সুইৎজারল্যাণ্ডে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছিল খোলা। সেখানে রুশের ছাত্রছাত্রীরা যেত বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের জন্যে। শুধু বিজ্ঞানের বই পড়ে তাদের খিদে মিটত না। তারা বসত শ্রমিক আন্তর্জাতিকের বৈঠকে, পড়ত প্রুদঁ, মার্ক্‌স্‌, বাকুনিন। খবর পৌঁছল জারের কানে। তিনি এক ফতোয়া জারি করলেন—এই মুহূর্তে সকল রুশ নাগরিক দেশে ফিরবে, অন্যথায় তারা দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে। কয়েক শ' ছেলেমেয়ে বুকে বারুদ নিয়ে দেশে ফিরল, এক কান থেকে আর এক কানে ছড়াতে লাগল তাদের মারাত্মক কথাবার্তা।

স্বৈরাচারী এমনি করেই নিজের ফাঁসিকাঠ তৈরি করে। গোয়েন্দা বিভাগ ঢেলে সাজা হল, তারা লাগল ছেলেমেয়েদের পিছনে। তিলমাত্র সন্দেহে তাদের গ্রেপ্তার করে সরকার দীর্ঘ মিয়াদের কারাদণ্ড দিল। আদালতের বিচার হয়ে দাঁড়াল তামাসা। সব সময়ে এ তামাসারও দরকার হত না। অনেকে চালান হত সোজা থানা থেকে অজ্ঞাতবাসে। এদিকে চাষীরাও সাড়া দিল না। তাদের জড়তা ছুটল না। একদিকে পুলিসের ভয়, অন্যদিকে

'বাবু'দের কি জানি কি মতলব আছে সন্দেহ, তারা মনের দরজা খুলল না। সামনে তুষারপর্বতের মত জনতা, পিছনে রুদ্রমূর্তি স্বৈরশাসন, মাঝে পড়ে বিপ্লবী পাতালের সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করল।

এই পরিস্থিতিতে পুনরুজ্জীবিত হল ১৮৬২ সালের 'জমি ও মুক্তি' সমিতি। এর সুদক্ষ শিল্পী আলেকজাণ্ডার মিহাইলভ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, ওডেসা, কিয়েভ ও খারকভের দলগুলিকে একত্রিত করল। গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য হল জনতার হাতে জমি আর জনতার জীবনে মুক্তি। বিদ্রোহীদের দমন করতে শাসকশক্তির যেমন কোন মায়ামমতা নেই, শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সমিতিরও তেমন কোন নৈতিক সংযম থাকবে না। চের্নিশেভ্স্কি ত' লিখেই গেছেন—

> "ইতিহাসের রাস্তা গিয়াছে ধূলাকাদা, জলাভূমি ও ভাঙা ইটপাথরের উপর দিয়া। যাহার জুতা নোংরা হইবার ভয় আছে তাহার জনসাধারণের কাজে নামা উচিত নয়।"

১৮৭৭ সালে দুটি বিরাট রাজনৈতিক মামলা রুজু হল,—একটি মস্কোতে পঞ্চাশজন আসামীকে নিয়ে, আর একটি সেন্ট পিটার্সবার্গে একশ তিরানব্বই জনকে নিয়ে। শেষেরটি চলেছিল চার মাস, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত। এর মধ্যে মৃত, উন্মাদ ও আত্মঘাতী হল পঁচাত্তরজন।[১০] পুলিসের কর্তা ট্রেপভ একদিন জেলখানায় এসে বগল্যুবভ নামে একটি ছাত্র আসামীকে কাপড় খুলতে বললেন। ছেলেটি কথা না শোনায় তিনি তাকে চাবুক মারলেন। বিচারের রায় বেরুবার পরদিন ভেরা জাসুলিচ নামে একটি মেয়ে ট্রেপভকে গুলি করে আত্মসমর্পণ করল। জুরির বিচারে সে খালাস পেয়ে গেল কারণ পুলিসের কর্তার জেলখানায় গিয়ে আসামীকে চাবুক মারবার কোন এখ্তিয়ার ছিল না। খালাস পাওয়া মাত্র ভেরাকে পুলিস আবার গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করল। আদালতের বাইরে ছিল লোকের ভিড়। তারা রুখে দাঁড়াল, পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করল তাকে। ভেরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেল বাইরে।

ইতোমধ্যে পিটার এণ্ড পল দুর্গের রাজবন্দীরা কয়েদখানার অসহ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করল। কর্তৃপক্ষের অনমনীয়

১০ স্টেপনিয়াক: আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা।

আচরণের ফলে জনকয়েকের মৃত্যু হল। এর পর অকস্মাৎ একদিন সেণ্ট পিটার্সবার্গের একটি পার্কে প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়েন্দা বিভাগের মাথা মেজেণ্টসেভ নিহত হলেন। হত্যাকারী স্টেপনিয়াক[১১] পালিয়ে আত্মগোপন করল আর 'জমি ও মুক্তি' সমিতি তাদের গুপ্ত ছাপাখানা থেকে "মৃত্যুর বদলে মৃত্যু" নামে বিপ্লবী প্রতিহিংসার নীতিসূত্র ব্যাখ্যান করে এক পুস্তিকা প্রকাশ করল (অগস্ট, ১৮৭৮)।

ঘটনা দুটিতে বোঝা গেল বিপ্লবী দণ্ডবিধানে লোকসম্মতি রয়েছে। জারের শাস্ত্রে দমননীতি ছাড়া আর কোন প্রতিকার বিহিত ছিল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কুক্ষণে ওখ্‌রানা নামক পুলিসের দমন বিভাগ গঠন করলেন। শাসনের নামে নির্যাতনের মাত্রা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হল।

সন্ত্রাসের জবাবে ভীষণতর সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে জমি ও মুক্তির কর্মীদের আত্মপরীক্ষায় বসতে হল। দক্ষিণের নগর ওডেসা থেকে এল জেলিয়াবভ, পরিচালকমণ্ডলীর সামনে সে এক নূতন কর্মসূচী পেশ করল। জারতন্ত্রের সঙ্গে লড়তে হলে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি চাই, আচমকা কিছু করা যাবে না। বর্তমান দমননীতির আমলে কোন প্রকার সাংগঠনিক প্রস্তুতি সম্ভব নয়, খানিকটা মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে সংবিধান পরিষদের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এতদিন এ আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল উদারপন্থী অভিজাতদের হাতে। তাদের নরম পথে কাজ হবে না। এক চরম বিভীষিকা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। গোয়েন্দা, পুলিস বা সরকারী আমলা নয়, এবারকার শিকার স্বয়ং জার। জারের প্রাণ নিতে পারলে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে, ভীতত্রস্ত সরকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবিধান পরিষদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে, তারপর চলবে সমাজবিপ্লবের আয়োজন। সুতরাং সমস্ত বল এখন এক লক্ষ্যে নিয়োগ করতে হবে, দলীয় সংগঠন কেন্দ্রায়িত হবে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—জারের নিধন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করল দলের নেতা মিহাইলভ। এর প্রতিবাদ করল নরমপন্থী প্লেখানভ, একসেলরড ও ভেরা জাসুলিচ। এদের মত হল চাষীদের মধ্যে ধৈর্য ধরে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া। দল দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল, ধৈর্যশীল জ্যেষ্ঠরা হল চর্নী পেরেদল বা 'কালো বিভাগ'। তারা লাভরভের

১১ ইনিই "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা"র লেখক। স্টেপনিয়াক এঁর ছদ্মনাম, আসল নাম ক্রাভ্‌চিন্‌স্কি।

বাণী নিয়ে গেল গ্রামে, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম ছেড়ে নামল সামাজিক প্রচারে; উত্তরকালে এরা হল সোশ্যাল ডিমক্রেট দল। উগ্রপন্থী তরুণরা হল নারদনোয়া ভলিয়া বা 'জনতার সংকল্প'। তারা বাকুনিনের নাশমন্ত্র নিয়ে চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল, উত্তরকালে এরা হল সোশ্যাল রেভল্যুশনারী দল। প্রথম দল সংখ্যায় ভারি। কিন্তু বেশির ভাগ তরুণ উদ্যোগী কর্মী এসে জুটল দ্বিতীয় দলে এবং তাদের পক্ষে ভিড়ল সাধারণের সহানুভূতি।

দুই দলের শুধু কর্মসূচীতে পার্থক্য ছিল না, সমাজলক্ষ্যও ছিল আলাদা। জনতার সংকল্পের গোপন প্রচারপত্রে তাদের দার্শনিক মিহাইলভ্স্কি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখে। সে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষপাতী এবং যান্ত্রিক শ্রম বিভাগের বিরোধী। ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকজীবন হয়ে যায় একপেশে। কৃষকের জীবনে আছে ভারসাম্য। তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে ঘিরে আসবে মুক্ত সমাজ—মাঝখানে ধনতন্ত্রের অভিশাপকে ডেকে আনবার কোন দরকার নেই। ডানিয়েলসন নামে আর একজন দার্শনিক সমাজবিপ্লবে শ্রমিকদের ভূমিকা বর্ণনা করল। উৎপাদনের কাজ পুনর্গঠন করবার দায়িত্ব নেবে চাষী ও শ্রমিকদের কমিউন—যাতে দেশের বিত্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগে না লেগে সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যয় হয়। শ্রমিকদের কমিউন বড় বড় কারখানা গড়বে শুধু নয়, ধনিকশিল্পগুলিকে সমাজশিল্পে পরিবর্তন করবেও তারাই। "রুশকোয়ে বোগাৎস্ত্ভো" বা "রুশের সম্পদ" পত্রিকার স্তম্ভে চাষীকমিউন ও শ্রমিক আর্তেলকে ধনতন্ত্রের চাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রচার চলতে লাগল যাতে এরা একদিন মুক্ত সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। 'কালো বিভাগ' দল ছিল গোঁড়া মার্ক্সবাদী। এরা বলল সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়মে সামন্ততন্ত্রের পরে ধনতন্ত্রকে আসতেই হবে। ধনতন্ত্রের আঘাতে গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে যাবে তার জন্যে দুঃখ করলে চলবে না। এই ভাঙনের শেষে আসবে সমাজবিপ্লব ও শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিক-প্রধান সমাজতন্ত্র। দুই দলের মিতালি হল দুই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সঙ্গে। মার্ক্সবাদীদের সঙ্গে মিলল ধনিকরা। পপুলিস্টদের সমর্থন করল সরকারী আমলাতান্ত্রিকরা—প্রলিতারিয় বিপ্লবকে রুখবার জন্যে রক্ষণশীল চাষী কমিউন হল উপযুক্ত হাতিয়ার।

এদিকে ঐতিহাসিক মারণচক্রের জাল বিস্তৃত হল যথাস্থানে যথাকালে। হঠাৎ প্রধান জালী জেলিয়াবভ গ্রেপ্তার হয়। তার দুদিন পরে, ১৮৮১ সালের

১৩ই মার্চ সম্রাট্ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁর লোহার পাতে মোড়া জুড়ি গাড়ি করে গ্র্যাণ্ড ডাচেস ক্যাথারিনের বাড়ি থেকে তাঁর শীতাবাসে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় সোফিয়া পেরভ্স্কায়া মাথার ওড়না উড়িয়ে সংকেত করল আর একটি বোমা এসে পড়ল জারের গাড়িতে। লোহার গাড়ির ভেতর জার অক্ষত রইলেন কিন্তু তাঁর কয়েকজন দেহরক্ষী আহত হল। জার গাড়ি থেকে নেমে তাদের দেখলেন, রাইসাকভ নামে যে ছেলেটি বোমা ছুড়ে ধরা পড়েছিল তাকে কি যেন বললেন। তারপর যখন গ্রিনেভটস্কি নামে আর একটি ছেলের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে ফিরছেন তখন ছেলেটির হাতের বোমা পড়ল দুজনের মাঝখানে। দুজনেই ভীষণভাবে আহত হলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুজনারই পরমায়ু নিঃশেষ হল। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী, সবচেয়ে সুরক্ষিত স্বৈরাচারীর মৃত্যু হল শ'খানেক বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়ের চক্রান্তে।

প্রত্যাশিত সফলতার পর যা ঘটল তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। জারের মৃত্যুতে ভীত হয়ে স্বৈরশাসন আত্মসমর্পণ করল না। বরং বিপ্লবীরাই জারতন্ত্রের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একজন সরকারী অফিসার ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন—বিপ্লব হয়ে দাঁড়াল কুটিরশিল্প।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'জনতার সংকল্পে'র পরিচালকমণ্ডলী নূতন জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠাল। তারা প্রস্তাব করল যদি সম্রাট্ স্বাধীন জনমতে নির্বাচিত একটি জাতীয় মহাসভা গঠন করবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে তারা হিংসাত্মক কাজ ছেড়ে দেবে এবং বিনাসর্তে মহাসভার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। জারের সরকার এর জবাব দিলেন জেলিয়াবভ ও আর চারজনকে ফাঁসি এবং যতজনকে ধরতে পারা গেল তত-জনকে কারাদণ্ড দিয়ে। সমিতি ভেঙে গেল—বিপ্লবীরা ছোট ছোট উপদলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯০৩ সালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে গড়ল 'সামরিক সংগঠন'। ১৯০৫ সালে জারের প্রধান মন্ত্রী প্লেহ্ভে ও গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্গিয়েইর হত্যা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ পর্ব।

বিপ্লবী হিংসার উৎপত্তি হয় স্বৈরাচারী হিংসা থেকে। হিংসার উত্তরে আসে প্রতিহিংসা। পপুলিস্টরা ঘাতকের মন নিয়ে জন্মায় নি। অপরের জীবনে তাদের ছিল গভীর মমতা, নিজের জীবনের প্রতি তারা ছিল সবচেয়ে নির্মম। তারা জানত হত্যা পাপ—সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে হলেও,

উপায়ান্তর না থাকলেও। হৃদয়ের কাছে এর ক্ষমা নেই। এই পাপের কালিমাকে নিজের রক্ত দিয়ে ধুতে হয়। তাই হত্যা ও আত্মবলিদান একই কর্ম-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিপ্লবের হোমানল এই যুগ্ম আহুতি নিয়ে প্রসব করবে নূতন জীবনমূল্য, নূতন সমাজ যেখানে ন্যায়ের কঠোরতা ও ভালবাসার কোমলতার দ্বন্দ্ব-নিরসিত হয়েছে।

জেলিয়াবভকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর তার শেষ অভিপ্রায় জানতে চাওয়া হল। সে বলল জারের হত্যাকারীদের সঙ্গে যেন তাকে বধ করা হয়। পাঁচটি ফাঁসিকাঠ পাশাপাশি সাজানো হল। কর্মসঙ্গিনী ও মানসসঙ্গিনী সোফিয়া পেরভ্স্কায়া প্রিয়তম ও দুইজন সাথীকে চুম্বন করে সকলের আগে ফাঁসিমঞ্চে উঠল। তারপর জেলিয়াবভ ও আর দুইজন পরম তৃপ্তির সঙ্গে একে একে এগিয়ে গেল মৃত্যু বরণ করতে। পঞ্চম আসামী রাইসাকভ ভেঙে পড়ল, তাকে টেনে নিয়ে যেতে হল বধ্যভূমিতে। বিপ্লবীর ধর্মে সে হল পতিত। হত্যার পর হত্যাকারীর বাঁচবার অধিকার নেই। নিষ্পাপ জীবন অপরাধে কলঙ্কিত হবার পর, হিংসার ছোঁয়ায় প্রেম অশুচি হবার পর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছামরণ।

কার্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা মরণের জন্যে পাগল হয়ে উঠত। জীবনের বদলে জীবন দিলে তবেই ব্রত উদ্‌যাপন হবে, সেই সার্থক শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় এক মুহূর্ত তর সইত না। নৌ-অধ্যক্ষ ডুবাসভের ওপর বোমা ছুঁড়ে ভইনারভস্কির প্রাণবিয়োগ হয়। সে তার ডায়রীতে লিখেছিল, 'মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুবে না, মুখের ওপর একটি ভাঁজ পড়বে না, আমি ফাঁসির মঞ্চ বেয়ে উঠব···নিজের ওপর এ কোন জবরদস্তি নয়, এই ত' আমার জীবনলীলার পূর্ণতম স্বাভাবিক পরিণতি।' গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্গিয়েইর হত্যাকারী কালিয়াএভকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল এবং পাদরি তার সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি তুলে ধরল, সে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল তার ও জিনিসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ দলের মধ্যে কেবল এই ছেলেটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। আগে আর একটি হত্যাকাণ্ডের অভিযানের সময়ে সে সঙ্গে নিয়েছিল ক্রুশমূর্তি এবং বোমা ছুড়বার আগে দুই হাতে ক্রুশচিহ্ন ধরে মনকে শক্ত করেছিল।[১২]

১২ আলবের কামু : ল্যাম্ রেভলতে, অনুবাদ, এণ্টনী বাওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫৪, ১৫১-৫২ পৃষ্ঠা।

এই নরহত্যা আত্মহন্তাদের প্রাণ ছিল ফুলের মত নরম, বিবেক ছিল সূর্যের আলোর মত সজাগ। আহত দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন অসহায় হয়ে বরফের ওপর পড়েছিলেন কয়েকটি ক্যাডেট কুচকাওয়াজ করে সেই পথে ফিরছিল। তারা একটি স্লেজগাড়ি এনে মুমূর্ষু জারকে তাতে ধরে তুলল। এমেলিয়ানভ নামে একটি ছেলে পাশ থেকে দৌড়ে এল তাদের সাহায্য করবার জন্যে। তার হাতে ছিল বোমা—অল্পক্ষণ আগে সে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, জারের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যর্থ হলে তার পালা আসবে বলে।[১৩] ডুবাসভকে মারতে যাবার আগে ভইনারভস্কি প্রতিজ্ঞা করেছিল অধ্যক্ষের স্ত্রী সঙ্গে থাকলে সে বোমা ছুড়বে না। 'সামরিক সংগঠনে'র নেতা স্মাভিংকভ ডোরা ও র‍্যাচেল নামে দুটি মেয়ের প্রসঙ্গে লিখছে যে এরা সাহসে ও আত্মদানে কারও চেয়ে কম নয় কিন্তু রক্তপাত এদের অসহ্য। এই ছেলে-মেয়েরা যখন কারও প্রাণ নেবার সংকল্প করত তখন সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুলত না যাতে একটিও নির্দোষ লোকের প্রাণহানি না হয়, একটি সাধারণ সিপাই কিংবা বধ্য অফিসারের স্ত্রী ও সন্তানের গায়ও যেন আঁচড় না লাগে।

ন্যায় ও প্রেমের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে আবহমান, কিন্তু তার বেদনা কে এমন করে বহন করেছে? স্থূল মানস সহজ বিচারে একটাকে বেছে নেয় কিংবা বিবেককে প্রতারণা করে। যে সকল ধর্মরাজরা রাষ্ট্রের হাল ধরে আছেন তাদের কাছে হিংসা দূষণীয়, অক্ষমণীয়—ব্যতিক্রম শুধু সরকারের বেলা কারণ সরকারী হিংসা জনহিতার্থে। আর অসহিষ্ণু বিদ্রোহী—যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিংসার পিছল পথে পা দিয়ে গড়িয়ে যায়, ক্রমশ তার বিবেক হয় শিথিল, হৃদয়ের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়, তাকে গ্রাস করে হত্যার নেশা, তাতে ডুবে যায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। লক্ষ্য যায়, সার হয় উপলক্ষ্য। শাসক ও বিদ্রোহী উভয়ে বরাবর ইতিহাসকে এই ছলনার কাহিনীই দিয়ে গেছে।

রুশ নিহিলিস্টদের ছিল না এই সহজ সমাধান। তাদের দ্বিধা ও সংশয় কাটে নি। তাই তাদের শেষ উত্তর জীবনদান। তারা বলে গেছে—জীবন যে নিয়েছি হিংসায় নয়, ভালবেসে—নিজের জীবন বিলিয়ে তার প্রমাণ দিলুম। বলে তারা সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

১৩ পি. এ. ক্রপট্‌কিন: মেমঘর্স অব এ রিভল্যুশনিস্ট, লণ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড ২, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু সব দিয়েও কি তারা গড়তে পেরেছে কিছু? সে হিসেব বড় কঠিন। দধিচীর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হয়, অসুরনিপাত হয়, ইন্দ্রপুরী রচিত হয় না। রুশ থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ, সন্ন্যাসীর অস্থিতে বৃত্রসংহার হল কতবার, মরলোকে অলকার ভিত্তি পড়ে নি। পরম স্থষ্টির তপস্যায় যারা হারিয়ে যায় বাস্তবের সফলতায় তাদের মাপা যায় না। তারা স্থষ্টিসাধক, নির্মাণশিল্পী নয়। তারা ক্রুশবিদ্ধ হয়, চার্চ গড়ে না। তাই মানুষের বুকে তাদের জায়গা, ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থান নেই। তাদের তৈরী জমির ওপর বিশ্বকর্মারা ঘর তোলে, ইতিহাস সে কীর্তির সাক্ষ্য দেয়। নিহিলিস্টরা হৃদয় নিঙড়িয়ে লিখেছে কাব্যগাথা, বলশেভিকরা এসে লোহার অস্ত্রে পাথরের ফলকে লিখল ইতিহাস।

১০। ইয়োরোপ ঃ পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১)

১৮৮৯ সালে ক্রপটকিন যখন লণ্ডনে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন জনৈক সাংবাদিক তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : 'যদিও তাঁর বয়স বাড়ছে তথাপি তাঁর বপু ও বচন থেকে ঝরে পড়ছে অনির্বাণ যৌবন। তাঁর ভাবনা ছুটে চলেছে জোর কদমে—উৎসাহের আতিশয্যে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়া ঘোড়ার মত। চশমার পিছনে ধূসর চোখজোড়া অপরাজেয় মমতায় চকচক করছে। কারলাইলের বীরপুরুষের মত তিনি যেন চাইছেন দুনিয়ার লোককে বুকে জড়িয়ে উত্তপ্ত করে রাখতে।'

নেচাএভের মত এ ব্যক্তিটিও রুশ নিহিলিজ্‌ম্-এর সন্তান। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবী, করুণায় কোমল ও প্রতিভায় উজ্জ্বল দৃষ্টি, চওড়া কপাল, মাথায় টাক ও গালভরা শাদা দাড়ি—সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যক্তিত্ব যে সামনে দাঁড়ালে মাথা আপনি নত হয়। অথচ তাঁর এতটুকু দম্ভ নেই, নেই নিজেকে জাহির করবার তিলমাত্র চেষ্টা। কখন বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীর আসরে, কখন বিপ্লবীদের বৈঠকে, কখন অভিজাতদের সভায়, কখন বা মজুরদের মজলিসে,—সর্বত্র তিনি সমান আত্মবিস্মৃত, নিজের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় নির্বিকার, উদাসীন এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আত্মহারা। গভীর মনীষা ও অটল নীতিবোধ ছাড়া আপনার বলতে তাঁর কিছুই নেই। তাই সবাই হল তাঁর আপনজন, স্বভাবগুণে পেলেন তিনি নেতৃত্বের দায়।

১৮৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মস্কোতে রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাজবংশ রুরিকদের

পরিবারে পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিনের জন্ম হয়। শিশুকালে মাকে হারিয়ে বাড়ির দাসদাসীর যত্নে তিনি মানুষ হন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত পিতার জমিদারীতে বসে তিনি দেখলেন হতভাগ্য ভূমিদাসদের দুর্দশা এবং পতনোন্মুখ অভিজাতশ্রেণীর দম্ভ—শিশুমনে কায়েম হয়ে রইল এই বৈষম্যের ছাপ। ১৮৫৭ সালে তিনি জারের সুনজরে পড়েন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে এসে সম্রাটের দেহরক্ষীদের সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হলেন। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি স্বেচ্ছায় সাইবেরিয়ার প্রান্তরে আমুর কসাক বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এলেন। পাঁচ বছর ধরে এ অঞ্চলের ও তার অপরাধী সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

১৮৬১ সালের আইনে রুশের ভূমিদাসদের দাসত্ব মোচন হল। কিন্তু মোটা খেসারতের দায়ে তারা জমিদারদের কবল থেকে গিয়ে পড়ল সুদখোরদের খপ্পরে। এদিকে পোল্যাণ্ডে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। যে অভিজাতশ্রেণী স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, নিজ দেশের চাষীদের স্বাধীনতা দিতে তারা নারাজ। ১৮৬৩ সালে চাষীরা ক্ষেপে গিয়ে প্রভুদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বানচাল করে দিল। এরপর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জনকয়েক পোল বিদ্রোহী বইকাল রোডে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে গিয়ে বিফল হল। বিচারে তাদের পাঁচজন নেতার প্রাণদণ্ড হল। এসব দেখেশুনে ক্রপটকিন চাকরি ছেড়ে দিলেন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটীতে এসে তিনি গণিত ও ভূগোল নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ১৮৭১ সালে সাইবেরিয়ার পূর্ব দক্ষিণের অজানা অঞ্চলে অভিযান করে তিনি অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। এশিয়ার মানচিত্রের এক শূন্যস্থান পূর্ণ হল। রুশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী এই নবীন বৈজ্ঞানিককে সম্পাদকের পদে বরণ করবার প্রস্তাব নিল। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ গবেষণার সুখ ও যশের গৌরবে তাঁর অধিকার নেই 'যখন চারদিকে শুধু দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং একটুকরা শুকনো রুটির জন্যে মানুষের লড়াই চলেছে।'[১] বৈদগ্ধ্যকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করবার কোন অবসর এই শ্রেণীদুষ্ট সমাজে নেই। পরে "তরুণদের প্রতি আবেদন" পুস্তিকায় তিনি তরুণ মনীষীদের ডেকে দেখিয়েছেন তাদের

---

১ ক্রপটকিন ঃ মেময়র্স অব এ রিভল্যুশনিস্ট. লণ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড ১, ২০ পৃষ্ঠা।

শিক্ষাদীক্ষা ও বৃত্তির অসারতা—চিকিৎসা, ব্যবহার, যন্ত্রশিল্প, অধ্যাপনা, সাহিত্য সমস্ত ধনীর পরিচর্যায় নিয়োজিত। সুতরাং বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে যার ন্যায়বোধ আছে তার একমাত্র রাস্তা সমাজবিপ্লব। বিজ্ঞান ও শিল্প জনকল্যাণে সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

এই নবীন সমাজের রূপরেখা ক্রপটকিনের চোখে ফুটে উঠেছিল। সরকারী চাকরির মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেও তিনি জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করলেন, পালিয়ে এলেন ইয়োরোপে।

সে কালের তরুণ বিপ্লবীদের ওপর শ্রমিক আন্তর্জাতিকের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিকের নৈরাজ্যবাদী দলের ঘাটি ছিল জেনেভা। এখানকার জুরা শ্রমিক ফেডারেশন ছিল বাকুনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্রপটকিন এসে এদের সঙ্গে ভিড়লেন। এখান থেকে একতাড়া বিপ্লবী প্রচারপত্র সংগ্রহ করে তিনি গোপনে রুশে ফিরলেন—এসে যোগ দিলেন চাইকভস্কির গুপ্ত সমিতিতে। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল আত্মানুশীলন, কারণ সমিতি বিশ্বাস করত যে 'প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ হওয়া উচিত নীতিবান ব্যক্তিত্ব, তা সে প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক রূপই গ্রহণ করুক না কেন কিংবা ভবিষ্যতে ঘটনার চাপে যে কর্মপদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেন।'[২] সমিতির কাজ ছিল মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আশেপাশে ছাত্রদের জড় করা এবং তাদের মারফত চাষী মজুরদের সঙ্গে সংযোগ করা। স্টেপনিয়াকও এই সমিতিরই সভ্য ছিলেন। তিনি "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা"য় লিখছেন যে ক্রপটকিন যখন বরডিন ছদ্মনামে আলেকজাণ্ডার-নেভ্স্কি জেলায় শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকের প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তখন পুলিসের ঘুষ খেয়ে একজন শ্রমিক তাঁকে ধরিয়ে দেয় (৯৬ পৃঃ)।

সকল রাজদ্রোহীর গন্তব্যস্থল পিটার এণ্ড পল দুর্গে ক্রপটকিন আবদ্ধ হলেন। দাদা আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর পিঠাপিঠি সোদর ও দোসর। তিনি ভাইকে জেলে দেখতে আসতেন। সন্দেহবশে সাইবেরিয়ায় তাঁর নির্বাসন হল। সেখানে বার বৎসর একাকী অসহায়ভাবে কাটিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। বোন, ভাই, ভ্রাতৃবধূ যাঁরা ছিলেন আপন জন কেউ পুলিসের নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন না। একটিমাত্র মিথ্যা কথার বিনিময়ে মুক্তিলাভ ও

২ মেময়র্স, খণ্ড ২, ১৪ পৃষ্ঠা।

স্বজনের নিষ্কৃতি অর্জনের সুযোগ পুলিস তাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু সত্যকে বিকিয়ে স্বাধীনতা পাবার প্রবৃত্তি ক্রপটকিনের চরিত্রে ছিল না।

দু' বছরের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পড়ল যে তাঁকে সেণ্ট পিটার্স-বার্গের উপকণ্ঠে এক সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে হল। এখানে তিনি একটু নড়াচড়া করবার সুযোগ পেতেন। এই সুযোগ নিয়ে তিনি বাইরের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং হাসপাতাল থেকে পালালেন। রুশ ছেড়ে তিনি পালিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে সুইৎজারল্যাণ্ডে এসে আবার জুরা ফেডারেশনকে কর্মক্ষেত্র করে বসলেন। এখানে ১৮৭৮ সালে তাঁর বিয়ে হল সোফী এনানিয়েভের সঙ্গে। তেত্রিশ বৎসর নানা দুঃখ দুর্যোগের মধ্যে এই মহিলা স্বামীকে সেবা সাহচর্য ও যত্ন দিয়ে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। দিনরাত পড়া, লেখা আর লণ্ডন, পারি, জুরিক ও জেনেভার মধ্যে দৌড়দৌড়ি ও বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান—এই হল ক্রপটকিনের কাজ। জুরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তিনি 'ল্য রেভল্তে' বা 'বিদ্রোহী' নামে এক পত্রিকা বের করলেন। সুইস সরকার পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবার পর এর নাম বদলে রাখা হল 'লা রেভল্ত' বা বিদ্রোহ। ১৮৮১ সালে রুশ সরকারের তাগিদে সুইস সরকার তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলেন। ক্রপটকিন এলেন লণ্ডনে, সেখান থেকে ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সভ্য হবার অপরাধে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। মিয়াদ ফুরবার কিছু আগে তিনি জন-আন্দোলনের চাপে ছাড়া পেলেন (১৮৮৬)। তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে হ্যারোতে ঘর বাঁধলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় নৈরাজ্যবাদী প্রবন্ধ লিখে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকার সংস্থান হত। ১৮৯৯ সালে তিনি নিজের সম্পাদনায় "ফ্রীডম" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল—সেই আগুনে ক্রপটকিনের রাষ্ট্রনীতির সংস্কার হল। এতদিন তিনি প্রচার করে এসেছেন যে বৈদেশিক সমরে জনসাধারণের কোন স্বার্থ নেই—সকল অবস্থায় জাতীয় সরকারের বিরোধিতাই তার কর্তব্য। সুতরাং রাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক সংগ্রামে বিপন্ন তখনই তাকে আঘাত করার প্রশস্ত সময়—ক্রপটকিন তথা নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর এইটেই ছিল কূট কৌশল। ক্রপটকিন এই কৌশল বর্জন করে জনতাকে আহ্বান করলেন মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য করবার ও জার্মান সামরিক শক্তিকে রুখবার জন্যে। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী মহলে ছি-ছি

পড়ে গেল। লেনিন তাঁকে 'সুবিধাবাদী ও মেরুদণ্ডহীন যুদ্ধবাজ' বলে গালি দিলেন, স্টালিন বললেন 'বোকা বুড়োটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।' আর নৈরাজ্যবাদীর দল ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল। ক্রপটকিন, জ্যাঁ গ্রেভ, পল রক্স প্রমুখ ষোলজন আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। এর পাল্টা বিবৃতি দিলেন মালাতেস্তা, শ্যাপিরো, এম্মা গোল্ডম্যান প্রভৃতি। দ্বিতীয় পক্ষ হল দলে ভারি। ক্রপটকিনের আবেদন অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হল।

যুদ্ধের অবসানে মাতৃভূমিতে আবির্ভাব হল আরাধ্য বিপ্লব দেবতার। ক্রপটকিন ভাবলেন বুঝি মুক্ত জীবনের আশীর্বাদ নিয়ে নবীন রাশিয়ার জন্ম হল। এই জন্মোৎসবে শরিক হবার জন্যে তিনি দেশে ফিরে এলেন। যখন দেখলেন যে জনতার উদ্যোগের পেছনে রয়েছে বলশেভিক দলের বজ্রমুষ্টি তখন তাঁর চৈতন্য হল—তিনি কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রুশ সঙ্কটের চাপে পড়ে নৈরাজ্যবাদীদলের ফাটল বন্ধ হল।

প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও মতগুলিকে সমূলে বিনাশ করলেও বলশেভিকরা ক্রপটকিনকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি। জারের সরকার যেমন জনমতের ভয়ে টলস্টয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি, বলশেভিক সরকারের ক্রপটকিন সম্বন্ধে তেমনি ভীতি ছিল। মস্কোর চল্লিশ মাইল উত্তরে দ্মিত্রভ্ নামক গ্রামে বসে ক্রপটকিন রুশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন—সরকার বাধা দিলেন না কারণ তাঁর লেখা ছাপবার মত ছাপাখানা ও প্রকাশক সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিল না।

তখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বিকল, পক্ষাঘাতে দেহ অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোগযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন—মৃত্যুশয্যার পাশে বসে অশ্রুবর্ষণ করলেন স্ত্রী সোফী, কন্যা সাশা, জামাতা বরিস লেবেডেভ এবং জনকয়েক বন্ধু।

পৃথিবীতে এমন আর কোন বিপ্লবী এবং দার্শনিক বোধ হয় জন্মান নি যিনি বিশ্বের বিদগ্ধ আসরে এবং শ্রমিক ও ভূমিদাসের সমাজে সমান মর্যাদায় বিচরণ করেছেন, যিনি রাজবংশের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে গৃহহীন পলাতক জীবন বরণ করেছেন। অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় একটি বস্তু ছিল স্থির নিশ্চিত—আদর্শ এবং জীবনের নৈতিক মান। ১৮৮৫ সালে, যখন তিনি ফরাসী কারাগার ক্লেরভোতে বন্দী তখন সহকর্মী বিখ্যাত ভৌগোলিক এলিসে রক্লু তাঁর

রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি 'পারোল দ্যঁ রেভল্‌তে' বা একজন বিদ্রোহীর কথা নাম দিয়ে সংকলন করেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'এই লোকটির প্রতি আপামর জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল, তবুও তাঁহার উপর জেলের বন্ধ দরজা নড়িবার নাম করে না। ইহা দেখিয়া কেহ অবাক হয় না। কারণ ইহা ত' স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় যে শ্রেষ্ঠতার মূল্য গুরু এবং নিষ্ঠার নিত্যসঙ্গী দুঃখবেদনা। ক্রপটকিন জেলে আবদ্ধ আছেন এ কথা ভাবিলে নিজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারা যায় না "আমি মুক্ত কেন? মুক্ত থাকার চেয়ে বেশী যোগ্যতা আমার নাই বলিয়া কি?"'

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন আমি দুটি লোক দেখেছি যারা সত্যিই সুখী এবং তাদের একজন ক্রপটকিন। রম্যাঁ রলাঁ বলেছিলেন টলস্টয় যা প্রচার করেছেন ক্রপটকিন তাই হয়েছেন,—অর্থাৎ তিনি খাঁটি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নৈরাজ্যবাদী। ফরাসী শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে বলত 'নত্র্‌ পিয়ের'—'আমাদের পিটার'। এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন চরিত্রগুণে। তাঁর আদর্শে ও আচরণে কোন ফাঁক ছিল না। চরম দারিদ্র্যদশায় পড়েও তিনি কারো কাছে হাত পাতেন নি, কারও দান গ্রহণ করেন নি। বরং যখন যে এসেছে তিনি তার সঙ্গে অভাবের অন্ন ভাগ করে নিয়েছেন। একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর সংযম ও মিতাচার ছিল না—সে হল কাজ।

নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই বিপ্লবীর বুকে ছিল রসের ফোয়ারা। তিনি হসতে জানতেন, হাসাতে পারতেন—পাথর নিংড়ে মধু বার করবার কারুকলা তাঁর জানা ছিল। নিরাশ্রয় ভবঘুরে জীবনে যখন একটু স্থিত হয়েছেন—তখন হয়ত হাল্‌কা মনে পিয়ানোর পর্দা টিপে গান ধরেছেন, পাশের বাড়ির দাসীদের ডেকে তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, কিংবা তাদের মেয়েদের নিয়ে নাচের আসর জমিয়ে বসেছেন। ক্রপটকিন শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—তিনি ছিলেন জীবনশিল্পীও।

ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবদ্য প্রাঞ্জলতা আছে যা প্রুদঁ-র রচনায় নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাঁথুনি আছে, বাকুনিনে যার অভাব। গভীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রসঙ্গও তিনি সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। তিনি ছিলেন বাকুনিনের ভক্ত, যদিও তাঁকে কোনদিন দেখেননি। কিন্তু বাকুনিনের মত তিনি লোককে গরম কথায় তাতিয়ে তুলবার রাস্তা নেননি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনায়।

ক্রপটকিনের বহুল রচনার মধ্যে প্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ, "ফীল্ডস্, ফ্যাক্টরীজ এণ্ড ওয়ার্কশপ্স্" (১৮৯৮), "মেময়র্স অব এ রেভল্যুশনিস্ট" (১৮৯৯), "মিউচুয়েল এড, এ ফ্যাক্টর অব ইভল্যুশন" (১৯০২), "লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ" (১৯০৯) বা রুটির জয় এবং "এথিক্স্" (১৯২১)। "ল্য রেভল্তে"-তে লেখা তরুণদের প্রতি আবেদন (১৮৮০), আইন ও শাসন কর্তৃত্ব (১৮৮০), বিপ্লবী সরকার (১৮৮২) প্রভৃতি প্রবন্ধ ১৮৮৫ সালে "পারোল দ্যঁ রেভল্তে" নামে সংকলিত হয়। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিসৎ" (১৮৮৬); "ইন রাশ্যান এণ্ড ফ্রেঞ্চ প্রিসন্স্" (১৮৮৭)[৩]; "লা মোরাল এনার্কিসৎ" (১৮৯০); "স্টেট : ইট্স্ হিস্টরিক্যাল রোল" (১৮৯৬); "এনার্কিস্ট কম্যুনিজ্ম্—ইট্স্ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্ল্স্" (৮৯৬); "লানার্কি সা ফিলসফি, সঁ ইদেয়াল" (১৮৯৬); "লা সিয়াঁস্ মদার্ন এ লানার্কি" (১৯০১); "দি গ্রেট ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন এণ্ড ইট্স্ লেসন্স্" (১৯১৪); "এনার্কিজ্ম্" (এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় লিখিত প্রবন্ধ)।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রপটকিন লিখছেন যে নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস। নিরাজ সমাজ কল্পনার মেঘলোক থেকে নেমে আসবে না, সর্বসাধারণের বুদ্ধির বিকাশের জন্যেও বসে থাকবে না—সে আসবে বাস্তবের তাগিদে সমাজবিকাশের অব্যর্থ নিয়মে। সমাজের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে, অসংখ্য তথ্য চয়ন করে তিনি দেখিয়েছেন যে তার গতি শাসনহীন যুথকেন্দ্রিক সমাজের দিকে। মানুষের সমাজও প্রকৃতির মত নিয়মানুবর্তী। প্রকৃতির রহস্য উদ্ধার করতে যে বৈজ্ঞানিক শৈলী অবলম্বন করতে হয় মানুষের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবার জন্যেও সেই পদ্ধতিই গ্রহণীয়।

নক্ষত্রলোক থেকে ব্যক্তিমানস পর্যন্ত সর্বত্র এক ধারা এক রীতি চলে এসেছে। সর্বত্রই উদ্দাম বহুধা গতিশক্তির একটা সামঞ্জস্য বিধানই যেন প্রকৃতির নিয়ম। নভোমণ্ডলে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আপন খেয়ালে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে—কিন্তু পরস্পরে সংঘর্ষ হয় কদাচিৎ। তার কারণ

৩ এ বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ পুলিস গোটা সংস্করণ কিনে নষ্ট করে ফেলে এবং ক্রপটকিন বিজ্ঞাপন দিয়েও একখণ্ড সংগ্রহ করতে পারেননি।

তাদের পরস্পর বিমুখী গতি একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে—যার ফলে যার যার অক্ষপথে তাদের পরিক্রমা—লক্ষ লক্ষ বছরেও তারা পথভ্রষ্ট হয় না এবং তাদের সংঘর্ষ ঘটে না।

জীবলোকেও একই রেওয়াজ। এক একটি জীবে বহুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি, জীবাণুতে যে আবার কত পরমাণু আছে তার ইয়ত্তা নেই। এরা নিজেদের মধ্যে আপস করে নিয়েছে বলেই দেহ সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে।

মানুষের মনই বা কি? মনোবিজ্ঞান বলছে যে সেখানে অজস্র বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত, অজস্র খেয়ালখুশির সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কাম, ক্রোধ, লোভ আবার দয়া মায়া ভালবাসা—একের বিরুদ্ধে অপরের ক্রিয়া সংযত হয়েছে—সকলের সন্ধিক্ষেত্র হল মন।

আবার এ সন্ধি ও মীমাংসা কোথাও চিরস্থায়ী নয়। এ একটা সাময়িক সমাধান। শক্তির ক্রিয়া চিরকাল একভাবে হয় না, গতি চিরকাল একমুখী নয়। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সমাধানকে খাপ খাওয়াতে হয়। কোন শক্তিকে জোর করে দাবিয়ে রাখলে সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। এই প্রকারে নভোলোকে নক্ষত্রপতন ঘটে, জীবনে রোগ ও বিকার দেখা দেয়, মনের ভেতর ঝড় ওঠে। সমাজে বিপ্লব হয় একই কারণে।

চিরচঞ্চল বহুবিধ বিক্ষিপ্ত শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রকৃতির ধর্ম। সমাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেখানে কারও স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে অবহেলা করা চলে না। সকলের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধনই সমাজের কাজ স্বার্থ ও কামনা যখন বদলায়, সামঞ্জস্যেরও তখন সংস্কার করতে হয়। এই সজীব সহজ সামঞ্জস্যের জায়গায় যখন রাষ্ট্র আইনের অচলায়তন স্থাপন করবার চেষ্টা করে তখন বিপ্লব হয় অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ এই বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

> "এখন ইহা আর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নহে; ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।"[৪]

"ল এণ্ড অথরিটি" এবং "স্টেট: ইট্‌স্ হিস্টরিক রোল" দুটি পুস্তিকায়

৪ এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্—ইট্‌স্ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স, ফ্রীডম পাবলিকেশনস, লণ্ডন ১৯০৫, ২ পৃষ্ঠা

ক্রপটকিন রাষ্ট্র ও আইনের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। আদিম সমাজে আইন ছিল না, ছিল অভ্যাস ও প্রথা। শান্তি ও সামঞ্জস্য তাতেই বজায় থাকত। কারও কোন বিত্ত ছিল না তাই বিত্ত নিয়ে বিবাদ ও বিত্তরক্ষায় আইনও ছিল না। যাযাবর জাতি কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে ভূমিবশ হল—একাধিক জাতির মিলনে মিশ্রণে গঠিত হল গ্রাম সমাজ। আদিম যৌথ জীবন তখনো নষ্ট হয়নি। জমি জমার মালিক সারা গ্রাম। সমাজবিধির রক্ষক পঞ্চায়েত। সেখানে পৈত্রিক প্রথা বলবৎ, আইনের বিচার নেই।

কিন্তু ছিল কুসংস্কার, অন্ধ গতানুগত্য, ভীরুতা, চিন্তার আলস্য। সেই সুযোগে ধূর্ত স্বার্থসন্ধীরা এসে আধিপত্য বিস্তার করল,—গ্রামগোষ্ঠীর বিত্ত ও ক্ষমতা করায়ত্ত করে তারা প্রভু হয়ে বসল। পঞ্চায়েতের জায়গায় এল কাজির বিচার, রাজদণ্ড—তার ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে পাইক বরকন্দাজ। তার সঙ্গে হাত মিলাল ধর্মধ্বজ পুরোহিত—লোকের ভাগ্য নিয়ে যার জাদুবিদ্যার ব্যবসায়।

এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গড়ে উঠছিল জনপদ, জাতি উপজাতি মিলে এক স্বাতন্ত্র্যশীল মহাজাতি। মধ্যযুগে দেখা যায় ক্ষমতার কেন্দ্রায়নে এরা বাধা দিয়েছে, স্যাক্সন, কেল্ট, জার্মান, শ্লাভ সবাই আপন আপন কেন্দ্রাতিগ যূথ-সমাজের রক্ষণে যত্নবান। গ্রামের চাষী-সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গড়ে তুলেছে কারিগর-সংঘ, তাদের মিলনে তৈরী হয়েছে পৌরসভা, জুরির আদালত ও নাগরিক বাহিনী। নগর নগরের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর আদান-প্রদানের আসর রচনা করেছে। ডোভার উপকূলের পঞ্চবন্দর ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফরাসী ও ওলন্দাজ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, স্যান্ডিনেভিয়ান ও জার্মান নগরগুলি সংগঠিত হয়েছে হানিসিয়াটিক লীগে, তার সামিল হয়েছে রুশের নভগরড। এদের মধ্যে যে সব সন্ধি ও চুক্তি হত তার সর্তগুলি পরবর্তী আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের উপকরণ হয়ে দাঁড়াল। নগরে মুক্ত জীবনের পরিবেশে উচ্ছ্বসিত হয়েছে এক অভিনব সৃষ্টিপ্রেরণা যার নিদর্শন গথিক ও রোমানেস্ক স্থাপত্য, র‍্যাফেলের চিত্র, দান্তের কাব্য ও বেকনের বিজ্ঞান।

কালক্রমে নগরযূথের স্বায়ত্তশাসন বিকৃত হল, ক্ষমতা আবদ্ধ হল কয়েকটি বনেদি বংশের গণ্ডিতে। নগরসভায় তারা সর্বেসর্বা। সেখানে নবাগতরা

প্রবেশাধিকার পেল না। এক একটি নগরযূথও হয়ে দাঁড়াল সামন্ত প্রভু। চারপাশের কৃষকরা তাদের ভূমিদাস, এদের শ্রমফল ভোগ করে নাগরিকরা ধনী হল। যে নগর একদিন ছিল স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের পীঠস্থান সে নগর হল শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, অর্থাৎ নগররাষ্ট্র। শক্তিমান রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করল—তৈরী হল বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের চাপে গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগ ও ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে গেল—গ্রামের জমি চাষীর হাত থেকে চলে গেল জমিদারের হাতে।

মিশর, এশিয়া, ভূমধ্য সাগরের উপকূল ও মধ্য ইয়োরোপ সর্বত্র একই ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রথমে আদিম জাতি, তারপর আত্মনির্ভর গ্রামযূথ, তারপর মুক্ত নগর, শেষে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র— এই পারম্পর্য দেখা গেছে মিশরে, এসীরিয়া, পারস্য ও প্যালেস্টাইনে, গ্রীসে ও রোমে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কেল্ট, জার্মান, শ্লাভ ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ইয়োরোপে নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে এল, তার অধিষ্ঠান হল গ্রামের মুক্তজীবনে, তারও অবসান হল রাষ্ট্রের শাসন পীড়নে।

রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের মাধ্যমে। স্বৈরাচারের যুগে আইনের মাহাত্ম্য ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, রাষ্ট্রের নীতি। স্বৈরাচারের উচ্ছেদ করল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল এবং আইনশাস্ত্র রচনা করে তার বলে শাসনের গদিতে কায়েম হয়ে বসল। বর্বররা যেমন এককালে পাথরের রাক্ষস দেবতাকে নরবলি দিয়ে পূজো করত, তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেত না, সে দেবতাকে তুষ্ট করবার মন্ত্র জানা ছিল কেবল জাদুকর পুরোহিতের, আজকাল সেই রাক্ষস দেবতার মহিমা পেয়েছে আইন। তার পূজারী এক শ্রেণীর আইনকর্তা—

> "যাহারা কি বিষয়ে আইন হইবে তাহা না জানিয়া আইন করিতে পারে; যাহারা আজ স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ধারণা না রাখিয়া পৌরস্বাস্থ্যের আইন পাশ করিতেছে, কাল সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যদিও কোন দিন একটা বন্দুককে নাড়িয়া দেখে নাই; শিক্ষা বিষয়ে বিধান দিতেছে যদিও কোনদিন কোথাও একটি পাঠও দেয় নাই কিংবা নিজ সন্তানদেরও সুশিক্ষা দেয় নাই; যাহারা যে দিকে নজর যায় সেদিকে আইন করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অপরাধীদের জন্য জেল ও শাস্তি বিধান করিতে ভোলে না যাহাদের

দুর্নীতির কলঙ্ক এই আইন কর্তাদের এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়।"[৫]

আর বে-আক্কেল জনতা, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বুদ্ধি যাদের আদৌ নেই, 'প্রভুদের নির্বাচন করিবার বেলায় তাহারা হয় জ্ঞানের অবতার।'[৬]

এদিকে যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্র নিয়ে এসেছে নিদারুণ ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ। শ্রমিক বিত্ত উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্র ধনিকের করায়ত্ত, শাসকবর্গও তারই তাঁবেদার। মজুর চাইছে সমাজের বিত্তে তার নিজের হিস্সা বুঝে নিতে, উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তাদের অন্তরের আশা মন্থন করে উঠেছে সমাজবাদের মন্ত্র, শিল্প ও বিত্তের ওপর সমাজ-কর্তৃত্বের দাবি।

একদল সমাজবাদী বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে এই অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের ধারণা শ্রেণীরাষ্ট্রকে জনরাষ্ট্রে পরিণত করে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব। শিলারের উপন্যাসে মার্কুইস অব পোসা স্বপ্ন দেখেছিল তার একায়ত্ত ক্ষমতার বলে সে লোকরাজ আনবে, জোলার রোমে পাদরি পিটার স্বপ্ন দেখেছিল যে চার্চের শুভ চেষ্টায় সমাজতন্ত্র আসবে। রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এমনি আকাশকুসুমের কল্পনায় মশগুল। তারা রাষ্ট্রের হাতে দেবে অপরিমিত ক্ষমতা—উৎপাদন ও বণ্টনের, শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। তারা দেখছে না যে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রায়ণের পরিণাম হবে শান্তি ও স্বাধীনতার অবসান।

> "ইতোমধ্যে রাষ্ট্র যে সকল কাজ হাতে লইয়াছে তাহার উপর যদি অর্থনৈতিক জীবনের মূল উপাদানগুলি তাহাকে সমর্পণ করা হয়, যথা জমি, খনি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি, উপরন্তু সে যদি যন্ত্রশিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখার তত্ত্বাবধান শুরু করে তাহা হইলে নূতন করিয়া এক স্বৈরাচারের বাহন সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র আমলাতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইবে বৈ আর কিছু নয়।"[৭]

এরা আর্থিক সম্পর্কগুলি কতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে

৫ ল এণ্ড অথরিটি : রজার এন. বলডুইন সঙ্কলিত ক্রপট্‌কিনের বিপ্লবী পত্রাবলী, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭, ২০১ পৃষ্ঠা।

৬ এনার্কিজ্‌ম্‌ : ইট্‌স্‌ ফিলজফি এণ্ড আইডিয়েল, বলডুইনের সঙ্কলন, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৭ এনার্কিজ্‌ম্‌ : এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা।

তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবার পর তাদের ভুল ত্রুটি শোধরাবার মত বিনয় থাকবে না। পূর্বতন স্বৈরাচারীদের মত তারাও হবে দাম্ভিক, নিজেদের মনে করবে নির্ভুল সবজান্তা। ফলে এক কালের সাথীরা হবে শত্রু, রাষ্ট্রের ভেতর দেখা দেবে অন্তর্বিরোধ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব।

> "তুমি যাহা করিবে তাহাই ঠিক, এরূপ এক অবিসংবাদী কর্তৃত্ব চাপাইয়া সমাজের সংস্কার করিবার চেষ্টা করিও না। পোপ ও সম্রাটদের মত তুমিও বিফল হইবে। এমনভাবে সমাজের সংস্কার কর যাহাতে সহকর্মীরা অবস্থার চাপে পড়িয়া তোমার শত্রু হইয়া না দাঁড়ায়। ঐ ব্যবস্থাগুলিকে বদলাও যাহা কয়েকজনকে অপরের শ্রমফল একচেটিয়া করিবার অধিকার দেয়।"[৮]

মজদুরকে ভোটাধিকার দিলে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদেব নিয়ে সরকার তৈরি করলেই রাষ্ট্র লোকায়ত্ত হয় না। সমাজে যতরকমের বিচিত্র ও বিপরীত স্বার্থ বিদ্যমান তাদের সকলের প্রতিফলন নির্বাচনের মাধ্যমে হতে পারে না, তাদের সন্তুষ্টি সাধন ও সমন্বয় কোন আইনসভা করতে পারে না। নির্বাচন কোনদিন এমন একদল লোক খুঁজে বার করতে পারে নি যারা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে, যারা দলীয় মনোবৃত্তির ওপরে উঠে সারা দেশের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপান্তর হয়। ভূমিদাস প্রথার আমলে ছিল দরবারি শাসন। ধনতন্ত্রের যুগে এল প্রতিনিধিমূলক শাসন। উভয়ত ক্ষমতা রইল শ্রেণীবিশেষের হাতে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের কোন দাম নেই, কারণ উৎপাদনশালার চাবিকাঠি যাদের হাতে নির্বাচনের যন্ত্র তাদের স্বার্থের অনুকূল। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক সরকারের দ্বারা শ্রমিকের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, ঠিক যেমন চার্চ, দৈবাধিকার, সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রভৃতির মারফত তা সম্ভব নয়।

শ্রমিক যখন ধনিকের অন্নদাস থাকবে না তখন তার শোষণযন্ত্র রাষ্ট্র হবে অবান্তর।

> "মুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজন হইবে স্বাধীন সংগঠনের—যাহার বনিয়াদ

[৮] আনার্কি দাঁ রেভল্যুশিয় সোস্যালিস্ত।

স্বেচ্ছাধীন চুক্তি ও সহযোগিতা, যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে ঢাকিয়া যায় না।"[৯]

এই নিরাজতন্ত্র ভাবীকালের সমাজবিধান যেখানে মানুষ শ্রেণীশোষণ ও রাষ্ট্রশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আজকের দিনেও দুনিয়ার অধিকতর ক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তি ও সহযোগিতায় কাজ চলছে। দেশবিদেশের ডাকবিভাগ মিলে আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন আছে, দেশবিদেশের রেলপথে আছে বোঝাপড়া যাতে যাতায়াত আদান-প্রদানে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তার জন্যে ডাক পার্লামেণ্ট অথবা রেল পার্লামেণ্ট গড়বার দরকার হয় নি। বৈজ্ঞানিকদের সমিতিগুলিও তাদের গবেষণা ও অভিযানের জন্যে পার্লামেণ্ট নির্বাচন করে না। তারা সম্মেলন করে, সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়, প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিনিধিরা ফিরে আসে আইন নিয়ে নয়, প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবে সায় দিলে সমিতি যোগ দেয়, অন্যথায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। লোককার্য পরিচালনা করার এটাই যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। নৈরাজ্যবাদ সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বহাল করতে চায়।

অনেকের ধারণা ভোটের অধিকার পেলেই মুক্তিলাভ হল। নারীমুক্তির নেত্রীরা এই অধিকারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

> "আমিও চাই মেয়েরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত ভোটের অধিকার পাক। ইহার অসারতা বুঝিতে তাহাদের পঞ্চাশ বছর কি তারও বেশী সময় লাগিবে আর ইতোমধ্যে তাহাদের নেত্রীরা কায়েমী স্বার্থের রক্ষণে সাহায্য করিবে। ভোটাধিকার পাইয়া শ্রমিকরাও তাহাই করিয়াছিল। ইহারা যে অধিক বুদ্ধিমতী হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই।"[১০]

মুক্ত মহিলা তার ঘরের কাজ অন্য মেয়ের ঘাড়ে চাপাবে—একের মুক্তি বাড়াবে অপরের দাসত্বের বোঝা। নারীকে মুক্তি দিতে হলে প্রথমে দিতে হবে গৃহকর্মের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি, দিতে হবে যথেষ্ট অবসর, শিক্ষা-লাভের ও সমাজজীবনে পুরুষের সঙ্গিনী হবার সুযোগ।

৯ এনার্কিস্ট কমিউনিজ্ম্—ইট্স্ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্ল্স্, ৬ পৃষ্ঠা।

১০ ফ্রীডম প্রেসের পরিচালকের প্রতি মন্তব্য: জর্জ উডকক ও আইভেন এভাকুমোভিক: দি এনার্কিস্ট প্রিন্স, লণ্ডন, ১৯৫০। ৩০১ পৃষ্ঠা।

পারি কমিউনের পতনের পর থেকে শ্রমিক আন্তর্জাতিক সংঘে জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাট ও ল্যাটিন শ্রমিক সংঘদের মধ্যে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। মার্ক্‌স্‌-এর নেতৃত্বে প্রথম দল চাইল সারা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলন এক সংগঠনের আওতায় এক কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে আনতে। বাকুনিনের নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিক সংঘগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সচেষ্ট হল। জার্মানদের আদর্শ কমিউনিজম, ল্যাটিনদের আদর্শ কলেক্‌টিভিজম—যাতে উৎপাদনের উদ্যোগ যৌথ হলেও ভোগ ও বণ্টনের ব্যবস্থা যার যার ইচ্ছাধীন।[১১] একই লক্ষ্যে পৌছবার যে আলাদা আলাদা রাস্তা থাকতে পারে এ কথাটা জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাটরা কিছুতেই বুঝতে চায় নি। সারা মহাদেশ জুড়ে নিজেদের পছন্দমত একটা শ্রমিক আন্দোলন চালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তারা পঁচিশটা বছর নষ্ট করেছে।

১৮৮০ সালে সুইৎজারল্যাণ্ডের জুরা ফেডারেশন তাদের কংগ্রেসে মুক্ত সমাজবাদ বা এনার্কিস্ট কমিউনিস্ট নীতি ঘোষণা করল। তদবধি জুরা হল ইয়োরোপের স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রুধঁ ও বাকুনিন যে নিরাজ সহযোগী সমাজের ছবি এঁকেছিলেন জুরার ঘড়িওলাদের সামনে ছিল সেই ছবি। শুধু যে এই আদর্শ তুলে ধরবার জন্যেই ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিকদের ওপর তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, তাদের সংগঠনও ছিল এই আদর্শের অনুগামী। তারা কারখানায় কাজ করত না। যার যার ঘরে ঘরে স্বাধীনভাবে তারা ঘড়ি তৈরির কাজ করত—কাজে স্বাধীনতা ছিল, মৌলিকতার অবকাশ ছিল। তাদের সংঘে নেতা ও জনতার ফারাক ছিল না—ইউনিয়নের বৈঠকে কোনরকম মতবাদের দোহাই না দিয়ে সমস্যাগুলি আলোচনা করা হত।

> "যে সমাজ কাঠাম আমরা কামনা করিতাম তাহা এখানে আদর্শে ও বাস্তবে তলদেশ হইতে গড়িয়া উঠিতেছিল। নৈরাজ্যবাদের আদর্শ বিস্তার করিবার কাজে জুরা ফেডারেশনের ছিল এক বিশিষ্ট ভূমিকা।"[১২]

এদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকে ক্রপটকিন এনার্কিজম-এ দীক্ষা নিলেন। এর

১১ আন্তর্জাতিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে শুধু আদর্শ নিয়ে ছিল না সে প্রসঙ্গ আগে আলোচিত হয়েছে।
১২ মেময়র্স, খণ্ড ২, ২১১ পৃষ্ঠা।

আগে তিনি পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় অপরাধীদের মধ্যে কাটিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন শাসন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে যা মানুষকে দিয়ে করান যায় না, তার শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলে সে কাজ কত সহজে হাসিল হয়। এই সব নির্বাসিত চোর ডাকাতের সঙ্গে একলা বস্তা বস্তা সরকারী নোট ও টাকা নিয়ে তিনি দিনের পর দিন শত শত মাইল আমুর নদী পথে অতিক্রম করেছেন। সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, তাঁকে গলাটিপে মেরে ফেললেও কেউ টের পেত না। টাকায় হাত দেওয়া দূরে থাকুক এরা দুর্গম দেশে আপদে বিপদে তাঁকে রক্ষা করেছে। আইনের সাজায় যে চরিত্র ঢাকা পড়েছিল বিশ্বাস ও ভালবাসা তা মেলে ধরেছে।

> "সামন্ত প্রভুর পরিবারে মানুষ হইয়া যখন আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করিলাম তখন সে কালের তরুণদের মত আমারও খুব আস্থা ছিল যে ধমক হুকুম ও শাস্তি ছাড়া কাহাকে দিয়া কোন কাজ করান যায় না। কিন্তু প্রথম জীবনেই যখন আমাকে মানুষ লইয়া কারবার করিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইল তখনই আমি বুঝিতে লাগিলাম যে হুকুম ও শাসনের নীতি এবং আপসে বোঝা-পড়ার নীতি এ দুয়ে কত তফাত। প্রথমটি সামরিক কুচকাওয়াজে বেশ কার্যকরী। কিন্তু যেখানে বাস্তব জীবন লইয়া কারবার, যেখানে কার্যসিদ্ধির জন্য বহুর ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা ও কঠোর উদ্যমের প্রয়োজন সেখানে হুকুম ও শাসন দিয়া কোন কাজ হয় না।"[১৩]

শাস্তি দিতে সরকার খুব পটু। জনসাধারণের নির্মাণমূলক উদ্যোগে সরকার কত মনোযোগী ক্রপট্‌কিন তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। বইকাল হ্রদের দক্ষিণে চিতা নামে একটি শহর উঠেছে। সেখানকার লোকেরা প্রহরার জন্যে একটি মিনার তুলবার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিসেব পাঠাল। দু বছর পরে যখন পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়ে এল ততদিনে মালমসলার দাম ও শ্রমিকের মজুরি অনেক বেড়ে গেছে। নূতন করে হিসেব পাঠান হল—আবার সরকারের চিঠি এল দু বছর বাদে, এবং এবারও শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়ে গেছে বিস্তর। অগত্যা শহরবাসীরা ডবল করে দাম ধরে হিসেব পাঠাল, হিসেব মঞ্জুর হয়ে এল এবং মিনারের প্ল্যান লালফিতার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল।

---

১৩ মেময়র্স, খণ্ড ১, ২৫০-৫১ পৃষ্ঠা।

সাইবেরিয়া ছেড়ে আসবার সময়ে ক্রপটকিন রাষ্ট্রশাসন ও নিয়মানুগত্যের প্রতি সবটুকু শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে এলেন।

রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে স্বাধীন উদ্যোগ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শিল্প-বাণিজ্যের যোগাযোগ, রেডক্রশ সোসাইটীর কাজ, বৈজ্ঞানিকদের আন্তর্জাতিক সভা সমিতি, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন—এরা লাল ফিতার ধার ধারে না, কোন কর্তার হুকুমের অপেক্ষা রাখে না। ম্যাড্রিড থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রেলপথ গেছে দেশ বিদেশের বেড়া ডিঙিয়ে। বিশটা কোম্পানী চুক্তি করে গাড়ি চালাচ্ছে, ভাড়ার আয় অনুপাত মত ভাগ করে নিচ্ছে।[১৪] একজন নেপোলিয়ন কিংবা চেঙ্গিজ খাঁ এসে ইয়োরোপকে দলে মুচড়ে তবে এই লাইন পাতবে—সে অপেক্ষায় লোকেদের বসে থাকতে হয় নি।

> "সর্বত্র রাষ্ট্রকে তাহার পবিত্র দায়িত্ব বেসরকারী লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। সর্বত্র স্বাধীন সংগঠন ইহার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। অথচ যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আভাস পাওয়া যায় মাত্র ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের অবর্তমানে স্বাধীন চুক্তির সম্ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী।"[১৫]

সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে সমাজ চাইছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। এর উপর নির্ভর করছে সমাজের প্রগতি, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য। সরকারের একমাত্র কর্তব্য তার কর্ম স্বাধীন আঞ্চলিকগোষ্ঠী ও উৎপাদনসংঘের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

১৮৮৯ সালে লণ্ডনের ডক মজদুররা এক বিরাট ধর্মঘট করে। বন্দর থেকে এই ধর্মঘট সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পবাণিজ্য ও নাগরিক জীবন অচল করে তুলেছিল। ইউনিয়ান পাঁচ লক্ষ মজুরকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করেছিল যে তারা শুধু লড়াই করতে জানে না, দেশকে রাখতেও তারা পারে। এই ধর্মঘটে ক্রপটকিন এক নূতন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। সমাজ বিপ্লবে শ্রমিক-সংঘের ভূমিকা তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ১৯০৭ সালে "ফ্রীডম" পত্রিকার স্তম্ভে তিনি শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন, তাদের

---

১৪ এসব দেশে রেলপথ তখনো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়নি।

১৫ লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ, ইংরাজি অনুবাদ, লণ্ডন, ১৯১৩। ১৮৮ পৃষ্ঠা।

সাবধান করেও দিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করবার মোহে তারা যেন না পড়ে।

তখন এনার্কিস্টরা সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—তাদের মধ্যে আশাহত কয়েকজন গোপন ষড়যন্ত্র ও হত্যার পথে নেমেছে, আর কিছু যোগ দিয়েছে সিণ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে শেষের দল ক্রপটকিনের আশীর্বাদ লাভ করল। সিণ্ডিক্যালিস্টদের শ্রমিক সংগঠন ও সাধারণ ধর্মঘটের কর্মপদ্ধতিকে তিনি সমর্থন জানালেন। ১৯১১ সালে তিনি পাতাউ ও পুজের "সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ এণ্ড কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্‌থ্"এর ভূমিকা লিখলেন। কিন্তু সিণ্ডিক্যালিস্ট সমাধানে তিনি নিঃসংশয় হতে পারেন নি। মজুরদের সিণ্ডিকেট মুক্ত সমাজের কাঠাম তৈরী করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি সমান অধিকারসম্পন্ন গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীও থাকতে হবে—এ বিশ্বাস তাঁর অটুট ছিল।

১৯০৭ সালে ক্রপটকিন "রাশ্যান রিভলিউশন এণ্ড এনার্কিজম" নামে একটি পুস্তিকা লিখলেন। দুটি দাবি তুললেন তিনি—চাষীর হাতে জমি চাই, জনে জনে আলাদা করে নয়, যৌথ সত্বে। মজুরদের ইউনিয়ানের হাতে চাই কারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদি। জুন মাসে রাশিয়ায় দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আবার "তাঁ মুভো" বা "নূতন কাল" পত্রিকার স্তম্ভে এই বাণী প্রচার করলেন। ১৯১৭ সালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসে লেনিন এই মন্ত্র গ্রহণ করে এর সঙ্গে আর এক দফা দাবি জুড়ে দিলেন,—সকল ক্ষমতা দাও পঞ্চায়েতের হাতে। কথাটা ক্রপটকিনের খুব মনঃপূত হল। কিন্তু বিপ্লবের পরে যখন দেখলেন যে পঞ্চায়েতগুলি জনতার মুখপাত্র না হয়ে দলীয় যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল। সোভিয়েত রুশে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সালে তিনি দিনেমার সাংবাদিক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস-এর মারফত 'পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিকদের প্রতি পত্র' নামে একটি বিবৃতি পাঠান। এতে রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত সরকারের ভালমন্দ দুই দিক তিনি বিচার করেছেন। সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং উনিশ শতকে ফ্রান্সে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্যে যে বিপ্লব ঘটেছিল রুশ বিপ্লব তারই উপসংহার। যে আর্থিক সমতা পূর্বের দুই বিপ্লব আনতে পারে নি রুশ বিপ্লব তা আনতে চেয়েছে। এর আর এক কীর্তি চাষী মজুরের পঞ্চায়েতের মারফত রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবন পরিচালনা করা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই লোকসংস্থাগুলি কঠোর দলীয় শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ সত্তা হারিয়ে কলের পুতুলে পরিণত হবে। তখন বিপ্লব ব্যর্থ হবে। সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে যে বিপুল সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রয়োজন তা জাগিয়ে তোলা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

> "স্থানে স্থানে কত প্রকারের বিচিত্র আর্থিক সমস্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, যাহার সমাধান করিতে হইলে যাহারা ঐ বিষয়ে ওয়াকিফহাল, যাহারা উহার সহিত জড়িত এমন অসংখ্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার দরকার। এই সহযোগিতাকে বাতিল করিয়া দলীয় একনায়কদের হাতে সর্বস্ব অর্পণ করিবার পরিণাম শ্রমিক ইউনিয়ান, আঞ্চলিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি সমাজের প্রাণকেন্দ্রগুলিকে দলের আমলাতান্ত্রিক বিভাগে পর্যবসিত করিয়া বিনাশ করা। আর আজ এখানে তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[১৩]

তা বলে বলশেভিক সরকারকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা ধৃষ্টতার কাজ হবে। ফরাসী বিপ্লব দমন করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া যা করেছিল কোন দেশ যেন সেই হীন দৃষ্টান্ত নকল না করে। বিদেশী আক্রমণ একতান্ত্রিক শাসনকে আরও মজবুত করবে এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রচেষ্টাকে আঘাত করবে। প্রতিবিপ্লবের চেষ্টাও নিরর্থক। এ উত্তাল বিপ্লব তরঙ্গকে রুখবার সাধ্য কারও নেই। একদিন এই উচ্ছ্বাস আপনি শান্ত হবে তখন পড়বে অবসাদের ভাঁটা—ঠিক যেমন সমুদ্রের বুকে ঢেউ নেমে আসবার পর একটা শূন্য গহ্বরের উদ্ভব হয়। তখন আসবে নূতন সংগঠনের সুযোগ। নৈরাজ্যবাদীকে ধৈর্য ধরে সেই দিনটির জন্যে বসে থাকতে হবে।

ক্রপটকিন অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ছক দিয়েছেন দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থে —একটি "ফীল্ড্স, ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্স" অপরটি "লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ"। প্রথমটির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতের মিল লক্ষণীয়। ইয়োরোপের দেশগুলির কৃষি ও শিল্প, আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদির ওপর অজস্র তথ্য

১৩ বলডুইনের সঙ্কলন, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

সমাবেশ করে তিনি কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করেছেন। প্রথমত কারখানার শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, দ্বিতীয়ত কৃষি ও শিল্পে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, তৃতীয়ত মাথার কাজ ও হাতের কাজে মিলন ঘটাতে হবে, চতুর্থত শিক্ষা ও হাতের কাজ একসঙ্গে চলবে

আজকের যন্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য চুলচেরা শ্রমবিভাগ ও অণু পরিমাণ কর্মে অতিদক্ষতা। একজন হয়ত সারাজীবন ধরে শুধু আলপিনের মাথা গোল করছে কিংবা কলমের নিব শান দিচ্ছে। এতে মজুর তার সৃষ্টি প্রেরণা হারিয়ে যন্ত্রের সামিল হয়ে দাঁড়ায়, উৎপাদন প্রণালী একটা ছাঁচের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞতার গুণে এক এক দেশ এক এক শিল্পে একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে। কোন দেশ হয় শিল্পপ্রধান, কোন দেশ কৃষিনির্ভর—প্রথমরা শোষণ করে দ্বিতীয়দের। ইদানীং শিল্পোন্নত দেশগুলির একাধিকার বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কৃষিনির্ভর দেশগুলি, যারা এতকাল ফসল ও কাঁচামাল বিদেশে পাঠাত এখন তারা নিজেদের কলকারখানা গড়ে শিল্প পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা করছে। যেমন জাপান। ইয়োরোপ থেকে মাল আমদানি করা দূরে থাকুক, সে নিজেই তার শিল্পপণ্য নিয়ে ইয়োরোপের বাজার আক্রমণ করেছে।

নূতন বাজার আবিষ্কার করে এই সমস্যার সুরাহা হবে না। দেশের বাজার বাড়াতে হবে, যারা পয়দা করে পণ্য তাদের ভোগে লাগাতে হবে। বিদেশে শিল্পপণ্য পাঠিয়ে তার বদলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠছে দেখে আজকাল শিল্পপ্রধান দেশগুলি নিজেরা শস্য ফলাতে বাধ্য হচ্ছে। শস্য ফলাবে দেশের চাষী আর পণ্য কিনবে দেশের ক্রেতা ক্রমশ এই ব্যবস্থা তাদের মেনে নিতে হবে। এ কিছু অবাস্তব কথা নয়। বহুল সংখ্যাতথ্য হাজির করে ক্রপটকিন দেখিয়েছেন পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি সংস্কার, বৈজ্ঞানিক আবাদ প্রণালী ও উৎপাদন সংগঠন এই সকল উপায় অবলম্বন করলে ইংল্যাণ্ডের মত দেশও খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে, কিছুদিন আগেও যার দুই তৃতীয়াংশ লোকের অন্ন আসত বিদেশ থেকে। মাটি অন্নদা। যে কোন আবহাওয়ায় যে কোন জমিতে আমরা যা চাই তা ফলাতে পারি, কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটানোর অপেক্ষা।

চাষবাড়ির আশপাশে উঠবে ছোট ছোট কারখানা। বড় বড় কারখানার যন্ত্রপাতি সহজে বদলান যায় না, ক্রেতার পছন্দ মাফিক মালের চেহারা বদলান

তাদের পক্ষে সহজ নয়। এতে কারিগরের সৃজনশক্তি প্রকাশের সুযোগ পায় না, তারা রক্তমাংসের যন্ত্রে পরিণত হয়। ছোট কারখানায় যন্ত্রপাতি পালটাবার অসুবিধা নেই, সেখানে কারিগরের ওস্তাদি দেখাবার অবকাশ আছে, সে ক্রেতার সাধ মেটাবার চেষ্টা করতে পারে। বড় কারখানার প্রতিযোগিতায় ছোট কারখানা উৎসন্ন হবে মার্ক্স্-এর এই 'অর্থ নৈতিক সূত্র' ভিত্তিহীন। তা যদি হোত তাহলে সুইৎজারল্যাণ্ডের কুটিরশিল্প বড় বড় কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকত না। সস্তা বিদ্যুৎশক্তি, সহযোগিতা ও উৎপাদনের কৌশল-এর জোরে আজকের যন্ত্রশিল্পের বাজারেও কুটিরশিল্প জায়গা করে নিতে পারে।

কারখানাকে যেতে হবে মাঠে, নির্ভর করতে হবে কারিগরের সহযোগিতা ও উৎপাদনী শক্তির ওপর, পণ্য দিয়ে মেটাতে হবে চাষীর চাহিদা। অবশ্য সব শিল্পকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় না—যেমন লোহা শিল্প। কিন্তু বেশীর ভাগ কারখানা শহরে ভিড় করেছে প্রাকৃতিক কারণে নয়, মুনাফাখোরদের প্রয়োজনে। শিল্পোদ্যোগ যে ধনিকদের হাতে কেন্দ্রায়িত হয়ে চলেছে তার কারণ উৎপাদনের খরচ কমানো নয়, বাজারের ওপর একছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের কেন্দ্রায়নে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নেই, আছে উৎপাদনের বিকেন্দ্রণ ও কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে।

> "এমন সমাজ আনিতে হইবে যেখানে প্রত্যেকে হাতের কাজ ও মাথার কাজ দুই-ই করে; যেখানে প্রত্যেক সুস্থ সমর্থ ব্যক্তি শ্রমিক; যেখানে শ্রমিক ক্ষেতেও খাটে কারখানায়ও খাটে এবং যেখানে শ্রমিকসংঘ নিজের উৎপন্ন শস্য ও পণ্যের অধিকাংশ নিজেরাই ভোগ করে।"[১৭]

এ ব্যবস্থা সেখানেই সম্ভব যেখানে প্রত্যেকটি নরনারী একাধিক প্রকার হাতের কাজ ও মাথার কাজ জানে। সে শিল্প কোথায়? শিক্ষা ও শ্রমে অহিনকুল সম্পর্ক। এমন কি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গেও বাস্তব পরীক্ষার সম্পর্ক কম। ওয়াট, স্টিফেনসন, ফুলটন প্রভৃতি সেকালের মনীষীরা স্কুলে তেমন কিছু

---

১৭ ফীল্ড্স্ ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ স্, লণ্ডন, ১৯১২, ২৩ পৃষ্ঠা। অথচ যন্ত্রশিল্পে ক্রপটকিনের বিরাগ ছিল না। তিনি স্মৃতিকথায় লিখছেন—'সুদৃঢ় সুগঠিত যন্ত্র আমার বেশ লাগিত...' যন্ত্রের

শিক্ষা পান নি—তাঁরা হাতে হাতে পরীক্ষা করে যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একালের বৈজ্ঞানিক যাঁরা হাতের কাজ ছেড়েছেন তাঁদের চিন্তা বন্ধ্যা হয়ে আসছে।

> "ঐতিহাসিক ও সমাজবেত্তা যদি মানুষকে দুটি একটি ব্যক্তির অথবা কেতাবের মারফত বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও কর্মশালার মাধ্যমে সমগ্রভাবে জানিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সে জ্ঞান কত খাঁটি হয়! তরুণ চিকিৎসকের যদি রুগ্নের সেবায় হাতে খড়ি হয় এবং সেবিকারা যদি রোগ উপশমের শিক্ষা পায় তাহা হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান ঔষধের অপেক্ষা স্বাস্থ্য বিস্তার প্রতি কত বেশী নির্ভর করিবে। কবি যদি মাঠে চাষীদের সঙ্গে লাঙ্গল ধরিয়া উদীয়মান সূর্যের সাক্ষাৎ পায়, যদি জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ঝড়ের সহিত লড়াই করে, শ্রম ও বিশ্রাম, দুঃখ ও আনন্দ, যুদ্ধ ও জয় এ সকলের কাব্য যদি তাহার জানা থাকে তাহা হইলে প্রকৃতির কত মধুর রসই না তাহার আয়ত্ত হইবে, মানুষের অন্তরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইবে কতই না নিবিড়।"[১৮]

"লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ" বা "রুটির জয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার আরও মৌলিক তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন এবং নিরাজ সমাজের অর্থ নৈতিক নকশা এঁকেছেন। ধনবিজ্ঞানের কারবার আর্থিক প্রয়োজন নিয়ে, যার তাগিদে চলে উৎপাদনের কাজ। সুতরাং উৎপাদনের সংগঠন হবে ভোগের প্রয়োজন মাফিক। প্রথমে খুঁজতে হবে সমাজে লোকের চাহিদা কি, তারপর আবিষ্কার করতে হবে

কাব্য আমি বুঝিতাম। আজকালকার কারখানায় যন্ত্রের কাজে শ্রমিক ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার কারণ সারাজীবন ধরিয়া সে একটি যন্ত্রের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু করে না। ইহা হয় অব্যবস্থার জন্য, ইহার সঙ্গে যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। হয়রানি ও একঘেঁয়ে কাজ সকল ক্ষেত্রেই খারাপ—তা যন্ত্রের কাজই হউক আর মামুলি হাতিয়ারে হাতের কাজই হউক। একথা ছাড়িয়া দিলে আমি বেশ বুঝিতে পারি যন্ত্রের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যন্ত্রের বুদ্ধিসঙ্গত ও নিখুঁত কাজ দেখিয়া মানুষ কত না আনন্দ পাইতে পারে। আমার মনে হয় উইলিয়ম মরিস যে যন্ত্রকে ঘৃণা করিতেন তাহার কারণ তাঁহার কাব্য প্রতিভায় যন্ত্রের শক্তি ও শ্রী ধরা পড়ে নাই।' (খণ্ড ২, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

১৮ ফীলড্‌স, ৪০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

ন্যূনতম শক্তিব্যয়ে চাহিদা মিটাবার উপায়। প্রাথমিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়। এই তিনটি মৌলিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে যদি প্রত্যেকে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে সময় দেয় তাহলে বছরে একশ পঞ্চাশ দিনে সকলের মত অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে। এর পর যথেষ্ট অবসর থাকবে শিল্প বিজ্ঞান চারুকলা আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি দ্বারা মনের খোরাক যোগাবার। এই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যবস্থা চালু হয় না সংগঠনের দোষে। চাষী যদি বেশী শস্য ফলায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে জমির ভাড়া, সরকারের খাজনা, মহাজনের সুদ। যন্ত্র ও সারের দামও বাড়বে তারপর যদি বা কিছু চাষীর হাতে থাকে তাতে মোটা ভাগ বসাবে শস্যের ব্যবসায়ীরা। যেখানে উৎপাদন সংগঠনে এমন অব্যবস্থা সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও যন্ত্রের সাহায্য পেলেও কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

চলতি ধনবিজ্ঞানের ধারা উলটো। আগে প্রয়োজন তার পরে উৎপাদন নয়, অর্থশাস্ত্রীরা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে মোক্ষম বলে ধরে নিয়েছেন তারপর এ থেকে কেমন করে চাহিদা মেটান যায় তার অঙ্ক কষেছেন। এই ধনবিজ্ঞান হল 'প্রভুভৃত্য সম্পর্কের দৌলতে মানবশক্তির অপচয়ের বিজ্ঞান।' 'বেতন নিয়ে কাজ করা অন্নদাসত্ব—এর পক্ষে যথাসাধ্য উৎপাদন সম্ভব নয় উচিতও নয়।' অর্থশাস্ত্রীদের মতে বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কারণ প্রয়োজনীয় রসদের অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। বিজ্ঞানের বলে উৎপাদন শক্তি জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর বেগে বেড়ে চলেছে। দোষ সংগঠনে, সমাজ-ব্যবস্থায়। পুঁজিপতিদের লক্ষ্য কেমন করে অল্প মজুর দিয়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করবে এবং দরকার হলে দাম চড়াবার জন্যে উৎপাদন কমাবে। যথেষ্ট মুনাফা হয় না বলে মালিকরা হাজার হাজার খনিমজুরকে বেকার বসিয়ে রাখবে অথচ গরীবদের ঘরে কয়লা জুটছে না, হাজার হাজার তাঁতি ছাঁটাই হয়ে যায় এদিকে গরীবদের কাপড় জোটে না, হাজার হাজার চাষী জমি আবাদ করে গরীবদের মুখে অন্ন দিতে পারে না। অথচ ধনীর বিলাসপণ্য যোগাতে যে কত মজুর খাটছে তার লেখাজোখা নেই।

> "একজন বড়লোক যখন তাহার ঘোড়াশালের জন্য এক হাজার পাউণ্ড খরচ করে তখন সে একজনের পাঁচ ছয় হাজার দিনের কাজ নষ্ট করে। এখন যাহারা বিবরে মাথা গুঁজিয়া আছে এই পরিশ্রমে তাহাদের জন্য আরামপ্রদ ঘর উঠিতে পারিত। যখন কোন

মহিলা তাহার পোশাকের জন্য একশ পাউণ্ড খরচ করে তখন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে সে অন্তত দু বছরের ব্যক্তিশ্রম অপব্যয় করিতেছে যাহার সদ্ব্যয় হইলে একশ মেয়েছেলেকে ভদ্র পোশাক পরান যাইত এবং উৎপাদন যন্ত্রের উন্নয়নে প্রয়োগ করিলে আরও বেশী ফল পাওয়া যাইত।"[১৯]

সুতরাং অতিপ্রজননের ফলে ধনাভাব দেখা দেয় ম্যালথাস ও হার্বার্ট স্পেন্সারের এ সূত্র অসিদ্ধ। এই দলের অর্থশাস্ত্রীরাই আবার বলেন কখন কখন নাকি বাড়তি উৎপাদন হয়, মাল বিকোয় না তাতেও অভাব দেখা দেয়। অভাব অতি-উৎপাদন জনিত নয়, নিজেদের তৈরী জিনিস উৎপাদকদের কিনবার সাধ্য নেই বলে।

আমাদের যা কিছু ধন ও উৎপাদনের উপকরণ তা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। তার পিছনে আছে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ, এতে কার কতখানি দান তার হিসেব সম্ভব নয়।

"বিজ্ঞান ও শিল্প, জ্ঞান ও প্রয়োগ, আবিষ্কার ও কার্যকরণ যাহাতে নূতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হইতেছে, বুদ্ধির কসরত ও হাতের কৌশল, মনের ও বাহুর মেহনত,—সব একযোগে কাজ করিতেছে। প্রত্যেকটি আবিষ্কার, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, তিল তিল সঞ্চিত বিত্ত, তার পিছনে আছে অতীত ও বর্তমান কালের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।"[২০]

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা জন্মলাভ করে শিল্পপ্রগতি থেকে। হাজার হাজার অখ্যাত আবিষ্কার থেকে উদ্ভাবন হয় নূতন যন্ত্রের। সাহিত্যিকের জন্য ভাষা ও ভাব প্রস্তুত হয়ে আছে, সাহিত্যের আদি থেকে তার ভাণ্ডার জমে উঠছে, পূর্বসূরীদের রচনায় পাঠকের মন রসায়িত হয়েছে, সে জন্যেই আজকের সাহিত্যিকের জয়জয়কার। কাল কালান্ত ধরে চলেছে সৃষ্টির মহাযজ্ঞ, দুনিয়ার মেহনতী জনতা—চাষী মজুর, শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সকলের সমিধ গ্রহণ করে সেই যজ্ঞাগ্নি যে প্রসাদ বিতরণ করছে তাতে কার কতখানি ভাগ, কার কত পাওনা গণ্ডা সে হিসেব করবে কে? হিসেব হোক

১৯ এনার্কিস্ট কমিউনিজম, ১২ পৃষ্ঠা।

২০ লা কঁকেৎ, ৯ পৃষ্ঠা।

চাই না হোক, এই যজ্ঞের পায়স আগলে বসেছে জনকয়েক লোভাতুর লোক, যারা এই যজ্ঞকুণ্ডে কিছুই সমর্পণ করেনি। ল্যাংকাশায়ারের লেস বোনার যন্ত্র তিন পুরুষের তাঁতিদের ঘামে তৈলাক্ত হয়েছে, তাদের আজ সেই কাপড়ের কলে কাজও জোটে না। মানুষ ও মাল চলাচল না করলে যে রেলপথ লোহালক্কড়ের ঢিপি হয়ে পড়ে থাকত তার ওপর মৌরুসী পাট্টা জমিয়েছে জনকয়েক অংশীদার যারা রেলপথের ঠিকানাও জানে না।

সুতরাং সুস্থ ও সমদর্শী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিসম্পত্তির জায়গা নেই। সেখানে সব সকলের সম্পত্তি। উৎপাদনকারীরা সমিতি গড়বে, সমিতি হবে কাঁচামাল ও উপকরণের মালিক। সমিতিরা পরস্পর চুক্তি করবে, সম্বন্ধ পাতাবে আদান-প্রদানের জন্যে। প্রত্যেকে কাজ করবে এবং যখন যা দরকার যৌথ ভাণ্ডার থেকে পাবে। টাকা পয়সার রেওয়াজ, মজুর খাটানো মূলধন জমানো—সব উঠে যাবে।

কেহ কেহ টাকার নোটের বদলে যার যার পরিশ্রম অনুসারে হুণ্ডি দেবার প্রস্তাব করেছেন।[২১] তাতে শ্রমিকের দাসত্ব ঘোচে না। মুদ্রা কিংবা হুণ্ডি কোনটা দিয়েই পরিশ্রমের দাম মাপা যায় না। সম্পত্তি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কও তুলে দিতে হবে। সবাইকে দিতে হবে প্রয়োজন মত, পরিশ্রম মত নয়। বৃদ্ধ যুবকের চেয়ে পরিশ্রম করে কম কিন্তু তার প্রয়োজন বেশী। শিশুবতী মায়ের প্রয়োজন অন্য নারীর চেয়ে বেশী এবং খাটবার শক্তি কম। এদের পাওনা পরিশ্রম দিয়ে মাপা হয় না।

আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজেও চারদিকে সবাইকে দরকার মত ভোগ করতে দেবার চলন বাড়ছে। রাস্তা ও সেতুর ওপর হাঁটবার জন্যে কাউকে দাম দিতে হয় না। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, ছোটদের ইস্কুল, রাস্তার আলো, কলের জল, বেড়াবার বাগান সব বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। যখন উৎপাদনের যন্ত্র সাধারণের হাতে আসবে, কেহ অপরের অন্নদাস থাকবে না, তখন উৎপাদন যে অনেক বাড়বে এবং সকলের চাহিদা মেটাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি?

অবশ্য অনেকের সন্দেহ আছে এ ব্যবস্থায় কেউ কাজ করবে না—বিনা কাজে যখন সব পাওয়া যায় তখন কে বা খেটে মরবে? আশঙ্কাটা ঠিক নয়।

---

২১ যেমন প্রুধঁ।

মানুষ স্বভাবত অলস নয়। বেকার বসে থাকতে কারও ভাল লাগে না। অসম ধন-ব্যবস্থার জন্যে শ্রমিক কর্মবিমুখ হয়। অধিকন্তু যন্ত্র তাকে যন্ত্র বানিয়ে কাজের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অভাব অনটন, মালিকের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ, সব মিলে তাকে অলস করেছে। মজুর স্বাধীন হলে এবং মনের মত কাজ পেলে সাধ করে খাটবে—তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কৌশল যুক্ত হলে কোন অভাব থাকবে না।

কতক কতক কাজ আছে যা নোংরা কিংবা অপ্রীতিকর—যা জোর করে কিংবা টাকার লোভ দেখিয়ে করান হয়, স্বেচ্ছায় কেউ করতে চায় না। টলস্টয় উদাহরণ দিয়েছেন যেমন ময়লা পরিষ্কারের কাজ, জাহাজের বয়লারে কয়লা ঢালার কাজ ইত্যাদি। ক্রপটকিন বললেন মুক্ত সমাজে নোংরা ও হয়রানির কাজ থাকবে না। তখন কাজকে পরিচ্ছন্ন ও অনায়াসসাধ্য করবার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হবে।

> কারখানা ছাপর ও খনিকে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর পরীক্ষাগারের মত স্বাস্থ্যকর ও জমকালো করিয়া তোলা খুবই সম্ভব।[২২]

হাতের কাজের ওপর মাথার কাজের কৌলীন্য দূর হবে। কালো হাত আর শাদা হাতের তফাত করলেই শাদা কালোর ওপর শোষণ চালাবে। পাঠশালার শিক্ষা হবে প্রকৃতির পরিবেশে হাতের কাজের মারফত। তাতে হাতের কাজ সম্মান পাবে এবং শিক্ষায় আসবে আনন্দ। লেখকরা ছাপাখানার কাজ জানবে, নিজেদের বই নিজেরা ছাপবে।[২৩] প্রত্যেককে একটা না একটা কাজ বেছে নিতে হবে এবং সেই বৃত্তি নিয়ে গড়া সমিতিতে ঢুকতে হবে। পরস্পর চুক্তি হবে, যে কোন সমিতি ও চুক্তিতে আসতে চাইবে না তার পক্ষে টেকাই হবে দায়।

> আমরা তোমাকে আমাদের ঘরবাড়ি, পণ্যভাণ্ডার, রাস্তাঘাট, যানবাহন, স্কুল, মিউজিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে রাজী আছি এই সর্তে যে বিশ বছর বয়স হইতে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তুমি জীবনের আবশ্যক কোন কাজে দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা

২২ লা ক'ক্কেৎ, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

২৩ যেমন অনেক লেখক পাণ্ডুলিপি নিজে টাইপ করেন।

করিয়া সময় দিবে। কোন্ উৎপাদন সমিতিতে তুমি যোগ দিবে তাহা নিজেই বাছিয়া লও অথবা নিজেই একটি সমিতি গড়িয়া তোল। শুধু দেখিতে হইবে সমিতি কোন প্রয়োজনীয় কাজ করে। উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তুমি যাহার সঙ্গে খুশি মিশিতে পার, মিলিয়া যেমন তোমার রুচি আমোদ স্ফূর্তি কর, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা কর।

কিন্তু যদি আমাদের ফেডারেশনের হাজার হাজার সমিতির মধ্যে একটিও তোমাকে লইতে না চায়, যদি তুমি কোন প্রকার দরকারী জিনিস উৎপাদন করিতে একেবারেই অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে একাকী কিংবা পঙ্গুর মত বসিয়া থাক · তোমাকে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রেতাত্মা বলিয়া ধরিয়া লইব···।[২৪]

কোন কোন সমাজবাদী যৌথকরণের ব্যাপারে উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের বস্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে, এবং ভোগের বস্তুকে ব্যক্তির হাতে রাখতে চায়। কলকারখানা জমি কাঁচামাল ইত্যাদি হবে সকলের, ভাত কাপড় ঘর থাকবে যার যার। এই সূক্ষ্ম তারতম্যের কোন মানে নেই। গৃহ বিশ্রামের জায়গা যাতে মজুরের দেহযন্ত্র মেরামত হয়। ইঞ্জিন চলতে যে কয়লা পোড়ে তা যেমন উৎপাদনের মসলা মজুরের খাদ্যও তেমন উৎপাদনের মসলা। কামারের পোশাক হাতুড়ি ও নেহাইর মতই উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সুতরাং ভোগ্য বস্তুও সার্বজনীন মালিকানায় আসবে। দেশের শস্য এজমালি গোলায় মজুত হবে, বড় বড় প্রাসাদগুলি বাজেয়াপ্ত করে সেখানে বস্তিবাসীদের থাকতে দেওয়া হবে। কাপড়ের আড়ত থেকে সকলে কাপড় পাবে এবং খুশি মত দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে। সবাই খাটবে সবাই পাবে কিন্তু কেউ কিছু আগলে বসে থাকতে পারবে না।

নতুন সমাজে সকলে সমান হবে, কাউকে কোন মালিকের কাছে শ্রম অথবা বুদ্ধি বিকিয়ে খেতে হবে না। সকলে যার যার সমিতির মারফত উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবে। সমিতিতে কোন জোর

২৪ লা ক'কেৎ, ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

জুলুম নেই, সভ্যদের কাজ গুছিয়ে মিলিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা তার উদ্দেশ্য যাতে কাজের ফল পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। ব্যক্তির কর্তৃত্ব কোথাও নেই বটে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির উদ্যম ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সর্বত্র। উৎপাদন ও ভোগের জন্যে সমস্বার্থে সমিতিগুলি পরস্পর সংযুক্ত হবে, সকল বৃত্তি, সকল স্বার্থ, সকল অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তকরণের বুনোনি দেশ ছেয়ে ফেলবে, অবশেষে দেশের ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। কোন সম্বন্ধ ও চুক্তি অকাট্য বলে ধরা হবে না। সমাজ যন্ত্র নয়, একটা সজীব দেহ, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ যেমন চিরপরিবর্তনশীল, সমিতির কার্যকলাপ ও তাদের চুক্তিও তেমন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন সাপেক্ষ। সরকারের জায়গা নেবে স্বাধীন চুক্তি ও যুক্তকরণ। কোন বিবাদ বিসংবাদ উঠলে সালিশি দ্বারা তার নিষ্পত্তি হবে। কাকেও জোর করে খাটান হবে না। সম্পত্তি প্রথা ও শোষণ সম্পর্ক উঠে যাবার ফলে সকলের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা জেগে উঠবে। আলস্য দূর হবে, অভাবও রইবে না।

ক্রপটকিন নৈরাজ্যবাদের অর্থনৈতিক রূপায়ণে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এনেছেন। তাঁর হাতে শুধু যে প্রুদঁ ও বাকুনিনের যুক্তকরণের নীতি বিস্তারিত হয়েছে তা নয়, এ নীতির সঙ্গে গোটা সমাজদর্শনের ঐক্যসাধন হয়েছে। গডউইন ছিলেন ব্যক্তিপ্রবণ, কোন প্রকার সহযোগিতার কল্পনাকে তিনি আমল দেননি। প্রুদঁ ব্যক্তিপ্রবণ হলেও পারস্পরিক চুক্তি ও যুক্তকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। বাকুনিন ছিলেন যৌথবাদী, ফেডারেশনের পিরামিডে তিনি পেয়েছেন একতা ও স্বাধীনতার সমন্বয়। ক্রপটকিন এই নক্সার ফাঁক পূরণ করলেন প্রয়োজন অনুসারে অবাধ বিতরণের বিধি এনে এবং শ্রমকে শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে। এই হল এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্ বা নিরাজ সাম্যবাদের ছবি যাকে কল্পনা থেকে নামিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক আকার দিয়েছেন ক্রপটকিন।

কেমন করে আসবে এই পরিবর্তন? এত বড় একটা ওলটপালট বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। সমাজে যখন ধীর ক্রমবিকাশের গতি বাধা পায় তখন বাধা সরিয়ে আবার তাকে সচল করবার জন্যে বিপ্লব আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইতিহাসের ধারা মোড় ফেরে, গতানুগতিক জীবনে ছন্দপতন হয়, নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়। বিপ্লবের ঢল শান্তভাবে নামে না। তাতে পার ভাঙে, তীর

ভোবে। সুতরাং কেমন করে বিপ্লব এড়ান যায় সে প্রশ্ন আসে না, প্রশ্ন আসে কেমন করে ন্যূনতম গৃহযুদ্ধ প্রাণহানি ও রেষারেষি ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। তার জন্যে সকলের আগে চাই দলিত জনগণের মনে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ।

এটা হলে দেখা যাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীরও অনেকে এদিকে ঝুঁকছে। এদের টানবার খুব প্রয়োজন আছে। যাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বিপ্লব, বিপ্লবের আদর্শ তাদের মধ্যে সংক্রামিত হলে তবে ফল প্রসব করে। মালিকদের বিবেক ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে না উঠলে রুশে ১৮৬১ সালে এ প্রথা রদ হত না। আজ তেমনি বুর্জোয়াদের মনে শ্রমিকদের মুক্তির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাদের ভেতর থেকে অনেকে সমাজ-বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছে।

বিপ্লবের মহড়া হবে পথে ঘাটে পল্লীতে বস্তিতে, সর্বত্র। যেখানে আছে কর্মশালা—মাঠে বা কারখানায় যেখানে দলবেঁধে মানুষ খাটতে নেমেছে সেখানে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে সংঘ চেতনা, যৌথ অভ্যাস, নূতন সমাজের কল্পনা ও তা গড়বার আকাঙ্ক্ষা। এই মেহনতী জনতা হবে বিপ্লবের কারিগর। বুর্জোয়া বিপ্লবীদের যত রোখ সরকারের ওপর, বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে নিজেরা গদিতে বসলেই তাদের বিপ্লব সার্থক হল। তাদের বড় আশা যে শোষণ ও দাসত্বের অবসান করবে তাদের 'বিপ্লবী সরকার'। এ আশা বাতুলতা। সরকার মানে আইনানুগত্য, বদ্ধ নিয়ন্ত্রিত জীবন, রক্ষণশীলতা আর বিপ্লব মানে স্বাধীন উদ্যোগ, মুক্ত জীবন, ভাঙন ও সৃষ্টি। বিপ্লবী সরকার হল সোনার পাথরবাটি।

'বিপ্লবী সরকার' গণতান্ত্রিক হতে পারে, একতান্ত্রিকও হতে পারে। বিপ্লবের মুখে যখন জনসাধারণের উৎসাহ চরমে উঠেছে, যখন তারা পুরান বিধানের ইমারত ভেঙে গুঁড়ো করছে তখন সেই জোয়ারে বাঁধ দিয়ে নেতারা ভোটপত্র নিয়ে হাজির হয় এবং অনুরোধ করে সমস্ত উদ্যোগ নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে। ১৮৭১ সালের বিপ্লবে পারিতে ঠিক এই ঘটেছিল। সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয়ে বড় বড় বিপ্লবীরা কমিউন গঠন করল। জনতার হাত থেকে তাদের হাতে গেল বিপ্লবের দায়িত্ব। শুরু হল পৌরসভার তর্কবিতর্ক, দপ্তরে লাল ফিতার কাজ, নরমপন্থীদের সঙ্গে আপস রক্ষা। শেষ অবধি নগররক্ষার কাজেও তারা এঁটে উঠতে পারল না।

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের যত কিছু গলদ সব নির্বাচিত 'বিপ্লবী সরকারে' এসে দেখা দেয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক এতে তারা বাধাই দেয়। অবশেষে জনতা উত্যক্ত হয়ে রুখে দাঁড়ায় কিন্তু তখন গদির মোহ শাসকদের পেয়ে বসেছে। তারা জন-আন্দোলন দমন করতে অগ্রসর হয়। অসন্তোষ বাড়ে, আর এক দফা বিপ্লবের ঝাপটায় 'বিপ্লবী সরকার' নিপাত হয়।

এই অভিজ্ঞতার পর কোন কোন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের বদলে একতান্ত্রিক সরকারের জন্যে তদ্বির করছেন। যে দল সরকারের পতন ঘটাবে তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে। তারা জোর করে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করবে, বিরুদ্ধাচারীদের ফাঁসি দেবে। এই শাসকদের ফাঁসিকাঠে ঝুলবার যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী দেরী হয় না। কারণ একনায়কত্ব চিরকাল বিপ্লববিরোধী। নায়কপূজা রাষ্ট্রপূজারই নামান্তর।

দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। তাদের অভ্যুত্থানে যখন জয়লাভ আসন্ন হয় তখন নানাপ্রকারের স্বার্থসন্ধীরা এসে ভিড় করে। তারা দলের সামিল হয় এবং তার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

> বিপ্লবের সাংগঠনিক দায়িত্ব এত বিরাট যে কোন সরকার তা নিয়ে সামলাতে পারে না। সমাজ বিপ্লব হইতে যে অর্থনৈতিক বিবর্তন আসিবে তাহা এত ব্যাপক ও এত গভীর, আজকার সম্পত্তি ও বিনিময় প্রথায় আশ্রিত লোকসম্বন্ধগুলিকে এমন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে যে একজন বা অনেকজন ব্যক্তির পক্ষে তাহার বিভিন্ন দিককার কাজ সামলানো সম্ভব নয়। ইহা সম্ভব শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ সার্বজনীন প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিসম্পত্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে বহুমুখী দাবি-দাওয়া ও বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্য সমস্ত জনসাধারণের সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজন। বাইরের কর্তৃত্ব শুধু বাধা সৃষ্টি করিবে এবং বিবাদ ও বিদ্বেষের পাত্র হইবে।[২৫]

জনসাধারণ ভুল করে তখন যখন তারা জনকয়েক সবজান্তাকে ভোট দিয়ে

২৫ রিভলিউশনারী গভর্ণমেণ্ট, ফ্রীডম প্রেস, লণ্ডন, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪৫, ১১-১২ পৃষ্ঠা।

তাদের হাতে নিজেদের দায়িত্ব তুলে দেয়। যখন তারা নিজেদের জানা কাজ নিজেদের ভালমন্দ নিজ হাতে নিয়ে বসে তখন ঐ তর্কবাগীশদের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন হয়। এর দৃষ্টান্ত লণ্ডনের ডক স্ট্রাইক। যে কোন গ্রাম্য কমিউনে এর নজির মিলবে। অবশ্য গোড়ার দিকে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও অনাচার দেখা দিতে পারে। তার প্রতিকার স্বাধীনতা, দাসত্ব নয়। অবাধ স্বাধীনতা যে সাময়িক বিকার আনবে স্বাধীনতাই হবে তার প্রতিষেধক। স্বাধীন সমালোচনার চাপে ক্রমে ক্রমে বাড়াবাড়িগুলো সংযত হবে, ভুলত্রুটি-গুলো সংশোধিত হবে।

বিপ্লবের সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে আসে রুটির প্রশ্ন। প্রতিবিপ্লবী শক্তির মোক্ষম অস্ত্র অন্নাভাব। এর চাপে ফ্রান্সের তিন তিনটি বিপ্লব পণ্ড হয়ে গেছে।[২৬] সুতরাং প্রথম থেকেই এমন একটা কৃষিনীতি নিতে হবে যাতে দীর্ঘকাল ধরে অবরোধকারী শত্রুপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়। বিপ্লবের সূচনায় ঘোষণা করতে হবে যে প্রত্যেকের রুটির সুরাহা হবে সর্বপ্রথম। সংবিধান গঠনে সময় নষ্ট না করে সমস্ত শস্য গোলাজাত করতে হবে এবং সবাইকে রেশন মাফিক বিলি করা হবে। যথাসম্ভব নতুন জমি আবাদে আনতে হবে। চাষীদের কাছ থেকে তাদের দরকারী শিল্পপণ্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য নিতে হবে।

রুশ বিপ্লবে দেখা গেল রুটির সমস্যার সমাধান এত সহজে হয় না। ১৯১৯ সালে "পারোল দ্যঁ রেভোল্যতে"র রুশ সংস্করণে ক্রপটকিন একটু পুনশ্চ দিয়ে লিখলেন যে প্রতিবেশী দেশগুলোর শত্রুতার ফলে বিপ্লবের সামনে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। যে এক-তৃতীয়াংশ লোকের এখন অন্ন জোটে না তাদের মুখে অন্ন দিতে হবে। আমদানি নেই, উৎপাদন কমেছে আর ভোগের দাবি বাড়ছে। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। এর প্রকোপ কিছুটা শান্ত হতে পারে যদি জনতা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নিজ হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়।

বিপ্লবকে প্রথম দিন থেকে দেখাতে হবে যে সে নিপীড়িত জনতার জন্যে ন্যায়ের বিধান নিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি নয়, আজ এই মুহূর্তে প্রতিকার আনতে হবে।

২৬ ১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮।

সকল কাজের বন্দোবস্ত এমনভাবে করিতে হইবে যে বিপ্লবের প্রথম দিন হইতে শ্রমিক বুঝিতে পারিবে যে তাহার সম্মুখে এক নূতন যুগ আসিতেছে, এখন হইতে কাহাকেও রাজপ্রাসাদ নিকটে থাকিতে পুলের নীচে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে না, কাহাকেও প্রাচুর্যের মধ্যে বসিয়া উপবাস করিতে হইবে না, পশমের দোকানের পাশে পড়িয়া কাহাকেও শীতে মরিতে হইবে না, সকল বস্তু সকলের জন্য—কেবল কথায় নয় কাজেও; বুঝিতে পারিবে যে ইতিহাসে এই প্রথম একটি বিপ্লব ঘটিয়াছে যাহাতে লোককে তাহাদের কর্তব্য শিখাইবার আগে তাহাদের কি প্রয়োজন তাহার বিবেচনা হইতেছে।[২৭]

এ কাজটা হয়না বলেই বিপ্লব বারবার পরাস্ত হয়। নেতারা সমর কৌশল ও সংবিধান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে আসল কাজ ভুলে যান। ১৮৬৩ সালের পোল অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল সামন্তরা। রুশ প্রভু ভূমিদাসদের মুক্তি দিল (১৮৬১) কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তাদের মুক্তি দিতে রাজী হল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ফতোয়ার চেয়ে উদার মুক্তিসর্ত দিলে সামন্তরা দাসদের বিপ্লবের পক্ষে পেত। তা তারা করল না। জারের দয়ায় জমি পেয়ে পোল চাষীরা প্রভুদের বিদ্রোহ গুঁতিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল।

১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের নায়করা এক প্রবল চাষীবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। জেকোবিনরা কৃষি উন্নয়নে মন দেয়নি, চাষীর স্বার্থ দেখেনি। পারির অন্নাভাব মেটাবার জন্যে যখন বিপ্লবীরা চাষীর শস্যে হাত দিতে গেল তখন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। শস্যের বদলে জেকোবিনরা দিতে চেয়েছিল কাগজের নোট যা বাজারে পড়ন্ত। যদি শস্যের বিনিময়ে তারা চাষীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে সরবরাহ করতে পারত তা হলে এ সঙ্কট দেখা দিত না।

১৮৭১ সালের পারি কমিউনও এই রকম অদূরদর্শিতার জন্যে ব্যর্থ হয়েছিল। পৌরসভা গঠিত হল শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীদের নিয়ে। কিন্তু সভায় বসবার পর থেকে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ রইল না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে তারা বসল মালিকদের সঙ্গে আপসের

২৭ লা কঁকেৎ, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা

আলোচনায়। দু মাস অবরোধের পর যখন কমিউন আত্মসমর্পণ করল তখন বুর্জোয়ারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের নরম নীতির জবাবে কঠোর প্রতিহিংসা নিতে ছাড়েনি।

ক্রপটকিনের বড় আশা ছিল যে এত শিক্ষার পর জনতা এবার বিপ্লবের পরিচালনা পরিত্রাতাদের হাতে ছেড়ে দেবে না—নিজেদের হাতে রাখবে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন শতাব্দী পেরুবার আগেই ইয়োরোপময় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবের ঝড় উঠবে, তাতে সকল দেশের রাষ্ট্রকাঠাম ভেঙে পড়বে।[২৮] শতাব্দী পেরুবার আগে স্বপ্ন ভেঙে গেল, রাষ্ট্রকাঠাম ভাঙল না। ক্রপটকিন দেখতে পেলেন রাষ্ট্র যে বিরাট যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছে তাতে সে সহজে ঘায়েল হবে না। অন্যদিকে জনসাধারণ স্বাধীনতার চেয়ে সচ্ছলতাকে মূল্য দিচ্ছে বেশী। জনকল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র তাদের মনে কায়েম হয়ে বসেছে। এই মোহ থেকে আগে তাদের মুক্তি না দিলে, স্বাধীনতার মূল্যবোধ না জাগালে সমাজবিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। এখন ধৈর্যশীল প্রস্তুতির সময়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব আসবে এ দুরাশা ক্রপটকিনের ছিল না। তিনি হিংসাত্মক উপায়ে বিশ্বাস করতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন চারদিকে বিপ্লবের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন ফ্রান্স ও ইটালীতে কিছু কিছু লোক গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিল। সরকারমহল এর মধ্যে ক্রপটকিনকে জড়াতে চেষ্টা করল। এই নির্বোধ হত্যাকাণ্ডগুলির প্রতিবাদ করলেও তিনি হত্যাকারীদের নিন্দা করলেন না। প্রতিহিংসা দিয়ে অত্যাচার রোধ হয় না ঠিক, তাই প্রতিহিংসা কোন কার্যক্রম হতে পারে না। কিন্তু এ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা আসবে। অসন্তোষ নিয়ে যখন বিপ্লবের কারবার তখন প্রতিশোধজনিত হত্যা তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই দেখা দেবে। ঐ অত্যাচারের জ্বালা যারা অনুভব করেনি তাদের হত্যাকারীদের বিচার করতে বসবার অধিকার নেই।

> তুমি কি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সমান দুঃখভোগ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তাহা হইলে লজ্জায় লাল হইয়া চুপ করিয়া থাক।[২৯]

যখন দাবি আদায়ের কোন বৈধ উপায় থাকে না তখন সকল দলই হিংসার

২৮ লানাকি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিস্‌ৎ।

২৯ লে প্রিজঁ, ১৮৯০, ৫৭ পৃষ্ঠা।

আশ্রয় নেয়। আর যে সরকার হিংসার নিন্দায় পঞ্চমুখ তিলমাত্র অবাধ্যতা দেখলে সে সঙ্গিন উঁচিয়ে ধরতে কসুর করে না। রাষ্ট্র যে বড় বড় বুলির আড়ালে পাইকারি হারে নরহত্যা করে তাতে কোন দোষ নেই। যতদিন যুদ্ধ ও প্রাণ-দণ্ড থাকবে ততদিন ব্যক্তির কাছে উন্নততর নৈতিক মান আশা করা বৃথা।

ক্রপটকিন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিতে সকল রকম অপরাধকে দেখেছেন, —এর জন্যে দায়ী করেছেন রাষ্ট্রকে। রুশ ও ফরাসী জেলখানায় থেকে এসে তিনি বলেছেন 'এগুলি রাষ্ট্রপোষিত অপরাধ-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়।' জেলখানার আবহাওয়ায় চরিত্র সংশোধন দূরস্থান, যতদূর সম্ভব নৈতিক অধঃপতন হয়। কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে জানোয়ারের মত খাটিয়ে, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে এবং যন্ত্রের মত চালিয়ে জেলখানা তার স্বভাবকে বিগড়ে দেয়। খালাস পাওয়ার পর ভদ্রসমাজে তার স্থান হয় না, আসামী সমাজ তাকে আদর করে ডেকে নেয়। তখন অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে সে বাধ্য হয়। প্রথমবার সে হঠাৎ ভুল করে অপরাধ করে ফেলেছিল। এখন সে জিদ করে অপরাধে নামল। তার শাস্তিদাতারা তার চেয়ে পাকা চোর, এই বিশ্বাস নিয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল।

> বড় বড় নগরের নৈতিক ও বাস্তব আবর্জনার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট ভ্রষ্ট মানবসমাজে বছরের পর বছর ধরিয়া হাজার হাজার বালক বালিকা বড় হইতেছে। ইহাদের সত্যিকার কোন ঘরবাড়ি জানা নাই। আজ তাহারা আছে একটা জীর্ণ চালার নীচে, কাল রাত্রিবাস রাস্তার উপরে। তাহাদের তারুণ্যশক্তি সুস্থভাবে নিষ্ক্রমণের পথ পায় না। যখন দেখি মহানগরীর বুকে এই পরিবেশের মধ্যে বালক বালিকারা মানুষ হইতেছে তখন দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে তাহাদের মধ্যে এত অল্প কয়েকজন দস্যু ও নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। আমার দেখিয়া বিস্ময় লাগে মানুষের সামাজিক অনুভূতি কত গভীর, সবচেয়ে বদ প্রতিবেশীরও কতখানি বন্ধুভাব আছে। তা না থাকিলে আরো কত লোক সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। এই বন্ধুভাব, হিংসায় অভক্তি না থাকিলে নগরের রাজপ্রাসাদগুলির একখানি ইটও অবশিষ্ট থাকিত না।"[৩০]

৩০ লে প্রিন্স, বলডুইনের সঙ্কলন, ২৩১

আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা যায় না। তা হলে অপরাধ বন্ধ করবার উপায় কি? একুশ শ বছর আগে চুয়াংসে উপায় বাৎলেছিলেন। ক্রপটকিনের উপায়ও কতকটা সেই রকম, তাঁর কথায়ও সেই ঝাঁঝ।

> গিলোটিনগুলি পুড়াইয়া দাও; জেলখানাগুলি গুঁড়াইয়া ফেল; বিচারক, পুলিস এবং পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা যে শ্রেণীর লোক সেই গোয়ান্দাগুলিকে তাড়াও; যে ঝোঁকের মাথায় অপরের অনিষ্ট করিয়াছে তাহার সহিত ভাইয়ের মত আচরণ কর; আর সর্বোপরি অলস বুর্জোয়ারা অসৎ উপায়ে যাহা অর্জন করিয়াছে সেই পাপের পসরা লোভনীয় করিয়া দেখাইবার সুযোগ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লও। দেখিবে সমাজবিরোধী অপরাধ কত কমিয়া যাইবে।[৩১]

নৈরাজ্যবাদী দর্শনে ক্রপটকিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি মিউচুয়েল এড : এ ফ্যাক্টর অব ইভল্যুশন। তখন ডারউইনের শিষ্যরা প্রচার করছেন যে জীবন সংগ্রামসঙ্কুল, যার জয় হয় সে লক্ষ্মীমন্ত, সে ভাগ্য নিয়ে বেঁচে থাকে, যার হার হয় তার কপালে দুঃখ ও মৃত্যু। এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম নিয়েই জীবন, এর দ্বারাই নিয়মিত হয় মানবপ্রগতি। ১৮৮৮ সালে 'জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের উপর ইহার ইঙ্গিত' নামে হাক্স্লীর একটি প্রবন্ধ বেরুল—তাতে তিনি দেখালেন যে জীবজগত একটি গ্লাডিয়েটরের মল্লভূমি এবং আদিম মানুষের জীবন অবাধ অবিরাম সংগ্রামে কণ্টকিত। এর পাল্টা জবাবে ক্রপটকিন "নাইনটীন্থ্ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। মিউচুয়েল এড এই প্রবন্ধগুলির সংকলন।

ক্রপটকিন তাঁর প্রতিবাদের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন রুশ পশুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কেস্লারের কাছ থেকে। ১৮৮৩ সালে তিনি মস্কোতে 'ল অব মিউচুয়েল এড' শীর্ষক বক্তৃতামালায় পশুজগতে বলবানের স্থায়িত্বের সূত্র খণ্ডন করেন। ক্রপটকিন তাঁর কথাগুলি নিজের সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, কোথাও অবাধ সংগ্রাম ও শক্তির জয়ের সমর্থন পেলেন না।

৩১ ল এণ্ড অথরিটি, বলডুইনের সঙ্কয়ন ২১৭ পৃষ্ঠা।

আসলে ডারউইন এ কথা বলেননি। তিনি যখন বলেছিলেন, যে যোগ্যতম্ম সেই বাঁচবে, তখন যোগ্য বলতে তিনি শুধু শক্ত ও ধূর্তকে বোঝেননি, তিনি বুঝেছেন তাদেরও যাদের জীবনে পরস্পর সহানুভূতি আছে। ক্রপটকিন জীবতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করে দেখালেন যে সংগ্রামের মতো সমাজবন্ধনও প্রকৃতির নিয়ম।

পিঁপড়ে, মৌমাছি ও উইপোকা থেকে শুরু করে বন্য পশু পর্যন্ত কীট ও পশুজীবনে যৌথচেতনার কতখানি গুরুত্ব তার নজির দেখিয়ে ক্রপটকিন বর্বর জাতির আলোচনায় এসেছেন। নিউগিনির পাপুয়া ও কেপ হর্নের (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর) ফুয়েজিয়ানদের ভেতর এখনও কোন সর্দার নেই, অপরাধ ও বিবাদ নেই। তারা একসঙ্গে কাজ করে, স্ফূর্তি করে, সন্তান পালন করে। রেড ইণ্ডিয়ান ও এস্‌কিমোদের ভেতরও এই আদিম সমতা বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক কালে সেমাইট, গ্রীক ও রোমানদের ছিল এই প্রকার যূথসমাজ। টাসিটাস হানাদার জার্মান উপজাতিদের সম্বন্ধে একই চিত্র এঁকেছেন। প্রাচীন কেল্ট ও শ্লাভ জাতিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এস্‌কিমোদের সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি এসেছে কিন্তু তারা একটা সীমার বেশি একে বাড়তে দেয় না। কেউ বেশী ধনী হয়ে উঠলে সে সভা ডেকে উৎসব করে উদ্বৃত্ত ধন বিলিয়ে দেয়। এদের জ্ঞাতি এলিউট উপজাতির সঙ্গে দশ বছর কাটিয়ে রুশ মিশনারী ভেনিয়ামিনভ ১৮৪০ সালে লিখছেন যে গত একশ বছরে ষাট হাজার লোকের মধ্যে খুন হয়েছে এবং চল্লিশ বছরে আঠার শ লোকের মধ্যে আইনবিরোধী অপরাধ হয়েছে মাত্র একটি করে।

আজকের আন্তর-রাষ্ট্রিক আইনের মত এই সকল উপজাতিরও আইন ছিল। তাদের শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন সম্বন্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তি দিয়ে নিয়মিত হত।

আদিম যূথসমাজ ভেঙে যাওয়ার পর এল গ্রাম সমাজ। গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগে বিকাশ হল কৃষি ও কুটির শিল্পের। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পঞ্চায়েতী বিচার, চারুকলা গ্রামের সর্বসাধারণের জন্যে সৃষ্টি হল। তারপর এল শিল্পীসংঘ ও নগর। মধ্যযুগে ইয়োরোপের নগর যে কেবল রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দুর্গ ছিল তা নয়। এ ছিল গ্রাম সমাজের বিস্তৃত সংস্করণ, সহযোগিতা ও সাহচর্যের ভিত্তিভূমি, যেখানে সকলে আপন আপন রুচি ও দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তি অনুসরণ করত আর সম্মিলিতভাবে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলত।

নগরে ও নগরের বাইরে ছিল শিল্পীসংঘ বা ভ্রাতৃসংঘ। জীবিকার জন্যে সকলকে কোন না কোন বৃত্তির অনুসরণ করতে হত এবং সমব্যবসায়ীরা মিলে সংঘ গঠন করত। প্রত্যেককে কোন না কোন সংঘে স্থান করে নিতে হত। একক জীবন ছিল অসম্ভব।

তারপর এল রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ। ব্যক্তির আনুগত্য হল সংঘের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি নয়, মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত রাষ্ট্রের প্রতি। পরস্পরের প্রতি কোন বাধকতা ও কর্তব্য রইল না। মধ্যযুগে শিল্পীসংঘের কারও রোগ হলে অন্যেরা পালা করে তার সেবা করত। এখন রোগীর দায় হাসপাতালের, প্রতিবেশী খবরও রাখে না। বর্বর জাতির সমাজে প্রথা ছিল দু জন লোক যদি মারামারি করে আর একজন খুন হয় তাহলে যারা দাঁড়িয়ে দেখবে আর থামাতে চেষ্টা করবে না তারাও খুনের দায়ে পড়বে। রাষ্ট্রের আমলে মারামারি থামাতে যাওয়া নাগরিকের কর্তব্য নয়, এ দায় পুলিসের। হটেনটটরা খেতে বসবার আগে তিনবার হাঁক দিত যদি কেউ অভুক্ত থাকে তা হলে তার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাবে বলে। আজকালকার সম্ভ্রান্ত নাগরিক দুঃস্থদের ভরণপোষণের জন্যে নির্ধারিত খাজনা দিয়েই খালাস—কে উপোস করে মরল সে ভাবনা তার নয়।

তবুও মানব চরিত্র থেকে রাষ্ট্রের চাপে সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎসগুলি একেবারে শুকিয়ে যায়নি। যখন মহাযুদ্ধের হাড়িকাঠে হাজার হাজার লোক বলি হয় সেই উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের সুধা ঝরে পড়তে দেখা যায়।

> কিয়েভের রাস্তা দিয়া যখন অবসন্ন জার্মান ও অস্ট্রিয় যুদ্ধবন্দীরা পা টানিয়া টানিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে তখন চাষী রমণীরা আসিয়া তাহাদের হাতে রুটি আপেল বা দু এক খণ্ড তাম্র গুঁজিয়া দিয়াছে। শত্রুমিত্র, নায়ক সৈনিক বিচার না করিয়া হাজার হাজার নরনারী আহতদের সেবা করিয়াছে। গ্রামের সমর্থ চাষীরা যুদ্ধে গেলে পর ফ্রান্স ও রুশে বৃদ্ধরা ও নারীরা গ্রামসভায় বসিয়া স্থির করিয়াছে যে তাহারা জমিগুলি আবাদ করিবে। সারা ফ্রান্স জুড়িয়া লঙ্গরখানা ও অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। এই সকল ও অনুরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে লুকাইয়া আছে নূতন জীবনের বীজ। এই বীজ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানে অঙ্কুরিত হইবে, ঠিক যেমন পুরাকালীন সহভাব হইতে

একসময়ে সভ্য সমাজের উন্নততম প্রতিষ্ঠানগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল।[৩২]

মিউচুয়েল এড-এর নৈতিক দিকটার বিশদ আলোচনা করলেন ক্রপটকিন তাঁর শেষ ও অসমাপ্ত গ্রন্থ "এথিক্‌স্"-এ। এর আগে ১৮৯০ সালে এই প্রসঙ্গে "লা মোরাল আনার্কিস্‌ৎ" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। প্যারিতে একজন এনার্কিস্ট বন্ধুর একটি মুদিখানা ছিল। সাথীরা এ দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম দিত না—'প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত পাবে' এই নৈরাজ্যবাদী নীতির দোহাই দিয়ে। দোকানী ক্রপটকিনের দুয়ারে ধর্না দিল। ক্রপটকিন এই পুস্তিকাটিতে নীতিশাস্ত্রের অতি পুরাতন সূত্রটির উল্লেখ করলেন—'অন্যের কাছে যে ব্যবহার তুমি আশা কর অন্যের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিও।' দোকানের পৃষ্ঠপোষকদের নৈরাজ্যবাদী যুক্তির খণ্ডন হল।

আসলে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি এই সূত্রের চেয়ে ব্যাপক। নীতিধর্ম দেনা-পাওনার কারবার নয়। ব্যবসাদারী সততার চেয়ে এর দাবি বেশী। যে পাওয়ার ও চাওয়ার অতিরিক্ত দিতে পারে, যে দেয় ভালবাসা থেকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে সেই বেহিসাবী দাতা খাঁটি নীতিবান পুরুষ। পরবর্তী গ্রন্থ "এথিক্‌স্"-এ ক্রপটকিন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করে তার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করলেন। প্রুঁদঁর মতো তিনি একে ধর্মীয় শাসন ও অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। নীতিবোধের মূল তিনি খুঁজে পেলেন প্রকৃতির ভেতর। প্রকৃতি নীতিহীন নয়। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক ধারায় নীতি-বোধ এসেছে, শুধু মানুষে নয়, ইতর জীবেও। প্রকৃতি 'মানুষের প্রথম নৈতিক শিক্ষক'। জীবে ও মানুষে আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তি। এইখান থেকে জন্ম ভালবাসার, নীতিবোধের।

> পিঁপড়েরা বাসাটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাখি হরিণ কিংবা বানর দলের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে ইহা জীববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য; প্রকৃতির রাজ্যে হামেশা ঘটিতেছে এরূপ ঘটনা। শত শত জীবজাতির মধ্যে যে এই ধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার পশ্চাতে আছে স্বজাতির প্রতি স্বভাবজাত সহানুভূতি, আপদ-

---

৩২ মিউচুয়েল এড, লণ্ডন, ১৯১৯, ভূমিকা।

বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবার অভ্যাস এবং এক সচেতন জৈবশক্তি। ডারউইন প্রকৃতিকে চিনিতেন। তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা উভয়ের মধ্যে সমাজচেতনা অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। তিনি যে ঠিক বুঝিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।[৩৩]

সমাজজীবন নির্ভর করে যূথচেতনার, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তির ওপর। প্রকৃতি জীবকে ঐক্যের প্রেরণা দিয়েছে তা থেকে আসছে নব নব উপায়ে সংহতিকে সুদৃঢ় করবার তাগিদ—ন্যায়বোধ ও নীতিধর্ম।

মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক সমাজ অবশ্য এইটেই চায়। সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করা নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য। যে কাজে অপরের ক্ষতি হয় দুঃখ হয় তা গর্হিত। যে কাজে অপরে সুখী ও স্বচ্ছন্দ হয় তা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এটা যুক্তির কথা, তত্ত্বের কথা, হৃদয়ের আবেগের কথা নয়। ক্রপটকিন দেখাতে চেয়েছিলেন নীতিবোধের মূল আরো গভীর, জৈবধর্মে অন্তর থেকে এর রস আহরিত হয়। কিন্তু এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। এই প্রতিশ্রুতির মাঝপথে এসে তাঁর কলম অবশ হয়ে গেল।

রাষ্ট্রনির্ভর সমাজবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত সমাজবাদের গুণগান করেছেন একাধিক আদর্শবান মনীষী, কিন্তু তাঁরা এই আদর্শকে তথ্য ও যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠা করেননি। রাষ্ট্রমুক্ত সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা কোথা থেকে আসবে, অরাজকতার বিশৃঙ্খলা কেমন করে রুদ্ধ হবে কেহ তার হদিস দেননি। ক্রপটকিনের মিউচুয়েল এড ও এথিক্স্ মানব-প্রকৃতির এক নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করল যার ওপর মুক্ত সমাজবাদের ভিত্তিস্থাপন হতে পারে।

ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদ তিনটি স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান,—আর্থিক সমতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নীতিবোধ। এর সংক্ষিপ্তসার—

৩৩ ডারউইনের ডিসেন্ট অব ম্যান থেকে ক্রপটকিন একটি নজির দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উটায় ভ্রমণকালে ক্যাপ্টেন স্ট্যান্সবেরি দেখতে পান একটি অন্ধ পেলিক্যানকে দলের অন্য পাখিরা তিরিশ মাইল দূর থেকে মাছ এনে খাওয়াচ্ছে। এথিক্স্—আরজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৪, ৪৩ পৃষ্ঠা।

ধনতন্ত্রের কবল হইতে উৎপাদনের মুক্তি। যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যথেচ্ছ ভোগ ব্যবহার।

সরকারী শাসন হইতে মুক্তি; সমিতি ও সংহতির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ, পরস্পরের সুবিধা ও রু'চ অনুযায়ী স্বাধীন সংগঠন—ক্রমশ জটিল, বিস্তরমান।

ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র হইতে মুক্তি। বাধ্যতাহীন কর্তৃত্বহীন স্বাধীন নীতিবোধ যাহা সমাজজীবন হইতে উত্থিত ও ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত।[৩৪]

নিঃসংশয়ে সমাজের গতি এই দিকে। নিরাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুই অবধারিত পথে প্রকৃতির দেওয়া স্বাধিকারবোধ ও যূথচেতনার প্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি। দুই পথের সন্ধিস্থল নিরাজ সমাজতন্ত্র আমাদের গন্তব্য স্থান, সেখানে আমাদের উপস্থিতি আসন্ন ও সুনিশ্চিত।

ওভিডের কল্পনা নয়, জেনোর স্বপ্নবিলাস নয়, এই বাস্তব সম্ভাবনার প্রমাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে নিঃশাসন যূথজীবনের প্রেরণা অগণিত অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করছে। যা ছিল বায়ুভূক কল্পনা, আশার আকাশপদ্ম বিশ্বাসে নির্ভরমান সে আদর্শ বাস্তবে অবতরণ করে লোকায়ত্ত হল। ক্রপটকিনের হাতে নৈরাজ্যবাদ এক পূর্ণাবয়ব জীবন-দর্শনে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উৎক্রান্ত হল।

ক্রপটকিনের দার্শনিক ভাবনা ছিল স্থির বিশ্বাসের উর্ধ্বে, তাঁর বিচারশক্তি কখনো গোঁড়ামিতে আবদ্ধ হয় নি, ডগমার জড়তায় পঙ্গু হয়নি। দলগত নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। ১৯০৭ সালে ইয়োরোপের আকাশে যখন ঈশানের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল তখন নৈরাজ্যবাদীরা এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রস্তাব নিল যে তারা যে কোন উপায়ে সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দেবে, সেনাবিভাগে হরতাল করাবে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতরণ করবে। বাকুনিনের প্রবর্তিত এই রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবকৌশল ছিল সর্বসম্মত। যুদ্ধ বাধবার পর ক্রপটকিন এই নীতি বর্জন করলেন। জার্মান সামরিক শক্তির আঘাত থেকে পতনোন্মুখ গণতান্ত্রিক ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে তিনি ইয়োরোপের

৩৪ লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিস্ং।

জনতাকে ডাক দিলেন। জারতন্ত্রের অবসানের পর তিনি রুশ বিপ্লবীদের জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করলেন। সারা ইয়োরোপের নৈরাজ্য-বাদীরা ক্ষেপে উঠল। লণ্ডনে "ফ্রীডম" পত্রিকাকে ঘিরে যে দল গড়ে উঠছিল তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে এই কাগজে ক্রপটকিন একটি চিঠি ছাপলেন—সহকর্মীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাদের আদর্শের সামনে নূতন সংকট সৃষ্টি করেছে জার্মান জঙ্গীরাজ। এই দুরন্ত শক্তিকে হটিয়ে মুক্তি আন্দোলনকে অপঘাত থেকে বাঁচাতে হবে। একাজ সম্ভব একমাত্র জনশক্তির পক্ষে। জার্মান হানাদার বিতাড়িত হলে পর বিজয়ী জনতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান করবে।

বিপক্ষকে শান্ত করা দূরে থাক এই পত্র আগুনে ঘি ঢালল। চারদিক থেকে পত্রাঘাতে "ফ্রীডম" পত্রিকা নাজেহাল হয়ে উঠল। সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ এল ইটালীর নৈরাজ্যবাদী ক্রপটকিনের পরম বন্ধু মালাতেস্‌তার কাছ থেকে।

> শ্রেণীবিরোধ, অর্থনৈতিক মুক্তি, নৈরাজ্যবাদের যত কিছু পাঠ সব যেন ক্রপটকিন ভুলিয়া গেলেন। তিনি বলিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে আক্রান্ত দেশের পক্ষ লইয়া সমরবিরোধীকে অস্ত্র ধরিতে হইবে। কে যে আসল হামলাদার তাহা যথাসময়ে অনুধাবন করিবার সাধ্য সাধারণ শ্রমিকদের নাই। অতএব ক্রপটকিনের 'সমরবিরোধী'কে তাহার সরকারের হুকুম-ই তামিল করিতে হইবে। ইহার পর সমর-বিরোধিতার তথা নৈরাজ্যবাদের কী বা অবশিষ্ট থাকে ?
>
> আসল কথা ক্রপটকিন সমরবিরোধিতার মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন কারণ তিনি মনে করেন সামাজিক প্রশ্নের আগে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আর আমরা মনে করি যে শ্রমিকদের দাসত্ব কায়েম রাখিবার জন্য প্রভুদের যত প্রকার উপায় জানা আছে তাহার মধ্যে প্রধান জাতিবৈরিতা ও জাতিবিদ্বেষ। সকল শক্তি দিয়া আমরা ইহাতে বাধা দিব।

যুক্তি ও গোঁড়ামির লড়াই বরাবর এই রীতিতে চলে আসছে। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ, তথ্য ও পরিস্থিতির বিচার, বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত ; অন্যদিকে আপ্তবাক্যের দোহাই, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আবেগের উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয় দল সংখ্যায় ভারি হয় এও চিরকালের রীতি। এখানেও সংখ্যালঘু যুক্তি পরাস্ত হল, ক্রপটকিন সমাজচ্যুত হলেন।

আদর্শ ও উপায়ের মানদণ্ড এক নয়, মহান আদর্শের জন্যে হীন উপায় গ্রহণীয়, তাতে পাপ নেই, বিপ্লবী শাস্ত্রের এই চিরাচরিত নীতি ক্রপটকিন স্বীকার করেননি। আপাত-সিদ্ধির আশায় তিনি তাঁর সুনির্দিষ্ট নীতিমানকে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হতে দেননি। একটিমাত্র মিথ্যা কথা, একটুমাত্র স্বীকারোক্তির বিনিময়ে কারামুক্তি যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমন তিনি এমন সব কূটনৈতিক কৌশলের বিরোধিতা করেছেন যাতে নিরাজ সমাজবাদের আদর্শ মলিন হয়। তাঁর সমাজবাদ মানুষের নৈতিক চেতনার ওপর অধিষ্ঠিত —যে কাজে এই চেতনা ক্ষুণ্ণ হয়, রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে কার্যকরী হলেও অন্তিমে তা ক্ষতিকর। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চেয়েছিল, বলশেভিক একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করবার জন্যে অনেকে বিদেশী আক্রমণকারীকে ডেকে আনতে চেয়েছিল। প্রস্তাব দুটির একটিও তাঁর কাছে আমল পায় নি। বরং এই নীতিহীন কূটনীতিকে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন।

এমন অটল সততা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই শত্রুরাও তাঁকে সমীহ করত; এবং এর জোরেই নিঃসম্বল নির্বান্ধব অবস্থায় শত্রুপুরীতে বাস করেও প্রতিপক্ষের অন্যায়ের নির্ভীক সমালোচনা তিনি করতে পারতেন। ১৯২০ সালে বলশেভিকরা যখন শত্রুপক্ষের লোকদের ধরে জামিন রেখে শত্রুর ওপর চাপ দেবার নীতি অবলম্বন করল তখন ক্রপটকিন লেনিনকে একটা চিঠি লেখেন। পত্রটি ইতিহাসের একখানি অতুলনীয় দলিল।

> আজিকার প্রাভ্‌দায় মন্ত্রীসভার প্রচারিত একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তি আমি পড়িলাম। দেখিলাম র‍্যাংগেলের সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে জামিন রাখা স্থির হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হয় না তোমার কাছাকাছি এমন একজনও নাই যে তোমাকে বলিয়া দিতে পারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত তামসিক মধ্যযুগের কথা, জেহাদের যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্লাডিমির ইলিচ, যে সকল আদর্শ ধরিয়া আছ বলিয়া তুমি দেখাইতে চাও তোমার বাস্তব কর্ম তাহার ঠিক বিপরীত।
>
> এও কি সম্ভব তুমি জান না এই জামিনের মানে কি? জামিন মানে এক ব্যক্তি যে নিজের দোষে বন্দী হয় নাই, বন্দী হইয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সাথীদের উপর চাপ দেওয়ার সুবিধা

শত্রুপক্ষের আছে বলিয়া। এই ব্যক্তির মনের অবস্থা ফাঁসির আসামীর মত যাহাকে অমানুষ ঘাতকেরা প্রতিদিন দুপুরবেলা বলিতেছে যে কাল পর্যন্ত ফাঁসি মুলতবী রহিল। এই উপায় অবলম্বনে যদি তুমি সায় দাও তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিব একদিন তুমি দৈহিক নির্যাতনেও পশ্চাৎপদ হইবে না—যাহা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল।

আশা করি তুমি জবাবে বলিবে না যে ক্ষমতা অব্যাহত' রাখা রাষ্ট্রনায়কের ধর্ম, তাহার ব্যক্তিগত কর্তব্য, এই ক্ষমতার উপর কোন প্রকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ম যে কোন গুরু মূল্য দিতে হইবে। এই মত আজকাল রাজা-মহারাজারাও পোষণ করে না। শত্রুপক্ষের লোক জামিন রাখিয়া যে আত্মরক্ষার কৌশল আজ রাশিয়ায় গৃহীত হইল রাজতন্ত্রের অধীশ্বররা তাহা বহুকাল আগে ছাড়িয়া দিয়াছে ··বলিতে পার তোমার কমিউনিজ্‌ম্‌-এর ভবিষ্যত কি···?

বলশেভিক রাশিয়ায় বসে লেনিনকে এইরূপ চিঠি লেখার স্পর্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। চিঠিখানি মনে করিয়ে দেয় বারো বছর আগে টলস্টয়ের একখানি বিবৃতির কথা। জারের পুলিস যখন বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন মর্মান্তিক বেদনায় টলস্টয় লিখেছিলেন 'আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না'। সেদিন টলস্টয়ের কান্না অভিজাতদের নিশ্চল বিবেকে নাড়া দিয়েছিল। ক্রপটকিনের বুকের জ্বালা তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল, বলশেভিজ্‌ম্‌-এর ইমারতে একটা আঁচড়ও পড়ল না।

ক্রপটকিন বহুলাংশে প্রুদঁ ও বাকুনিনের কাছে ঋণী। তাঁর বৈজ্ঞানিক দর্শন নিখুঁত বা নির্দোষ নয়। তাঁর ভূরি ভূরি রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি, কোথাও কোথাও ভুলত্রুটি চোখে পড়ে। তিনি চেয়েছেন সকলে মাথার কাজ এবং হাতের কাজ ত' করবেই, হাতের কাজের মধ্যেও মাঠের কাজ ও কলের কাজ সকলকে করতে হবে, যাতে কৃষি ও কারিগরির বৈষম্য দূর হয়। আবার যার যার বৃত্তি নিয়ে আলাদা আলাদা সমিতি গড়বার কথাও তিনি বলেছেন যা হবে ভবিষ্যৎ সমাজের বনিয়াদ। দুটো কথায় একটু অসঙ্গতি রয়েছে। যন্ত্রশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রমবিভাগের তিনি নিন্দা করেছেন, ছোট শিল্পকে যন্ত্রের ওপরে স্থান দিয়েছেন, আবার মুক্ত কণ্ঠে যন্ত্রের গুণগানও

করেছেন। যন্ত্রকে গ্রহণ করলে শ্রমবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগকেও মানতে হয়। মিউচুয়েল এড্-এ জীব ও মানুষের সহযোগ প্রবৃত্তিকে তিনি কিছু অতিরঞ্জন করেছেন। হাক্স্‌লী ও হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মত তাঁর দৃষ্টিও কিছু একদেশদর্শী। পোকামাকড়, মাছ, সরীসৃপ এদের মধ্যে হিংসার যে বীভৎস মূর্তি দেখা যায়, বের্গশঁর "সৃষ্টিপর ক্রমবিকাশে" পাতায় পাতায় যার নজির, জীবনের সেটাও একটা দিক যা উপেক্ষণীয় নয়। আদিম জাতিরা পরস্পর সংগ্রামে কোন সংযম রাখত না, পরাজিত শত্রুর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকত না। প্রথম প্রথম তারা শত্রুদের নিঃশেষে নিপাত করত, একটু সভ্য হবার পর তাদের দাসদাসী বানাত। আদিম জাতির কোন শাসন পীড়ন ছিল না—এও কাব্য-কল্পনা। গোত্রশাসন অথবা যূথশাসন রাষ্ট্রশাসনের চেয়ে কঠোরতায় কম ছিল না। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রামের যৌথ উদ্যোগ ও স্বাধীনতা নাশ করার অপরাধে তিনি রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন। এটা ঠিক নয়। মধ্যযুগের শুরু থেকে গ্রামের চাষী সামন্ততন্ত্রের কবলে পড়ে উৎসন্ন যাচ্ছিল। রাষ্ট্র ছিল দুর্বল, অক্ষম। গ্রামক্ষেত্র গ্রাস করে, চাষীকে ভূমিদাস বানিয়ে, গ্রামোদ্যোগ ভেঙে দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করছিল রাষ্ট্র নয়, জমিদার শ্রেণী।

ক্রপটকিনের বৈজ্ঞানিক দর্শন এর চেয়ে একটা গুরুতর দোষে দুষ্ট, সে হল তাঁর পরম আশাবাদ। আশার ছলনায় কোথাও তিনি বাস্তবকে তুচ্ছ করেছেন, কোথাও বা অতিরঞ্জন করেছেন। এ বিভ্রান্তির ফাঁদে সকল বিপ্লবীকেই পড়তে হয়। কারণ শুধু বিজ্ঞান নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না, তার সঙ্গে মেশাতে হয় বেশ কিছু স্বপ্নের খাদ, সত্যকে একটুখানি চোখ ঠারতে হয়, প্রতিকূল বাস্তবকে আশার পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হয়। ক্রপটকিন বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা ও বিপ্লবের সাধনায় সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা হয় না।

তথাপি ক্রপটকিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সার্থক। দর্শনের মূল্যায়ন ছিদ্র সন্ধান ও ছিদ্র গণনা করে হয় না। বনস্পতির গায়ে ছিদ্র থাকে কোটর থাকে, তৃণলতার দেহ সমতল মসৃণ।

তবে কেন তাঁর সাধনা বিফল হল? বিপ্লবী নায়কের সকল গুণে গুণী হয়েও আপামর জনতার শ্রদ্ধাভাজন হয়েও ক্রপটকিন জন আন্দোলন সৃষ্টি করে যেতে পারলেন না। তাঁর বিপ্লবদর্শন বাস্তবে ফলিত হল না, সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল না। রাষ্ট্রশক্তির পরিমাপে, রাষ্ট্রের পরমায়ু গণনায় তাঁর

ভুল হয়েছিল। তিনি বিপ্লবোত্তর সমাজের চিত্র দিয়েছেন, মানুষের বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের উপায় দেখান নি, সংগ্রাম কৌশল উদ্ভাবন করেন নি। দেশে দেশে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও সংগঠনের শিকড় গাড়বার সুযোগও তাঁর ছিল না।

দল ও গোষ্ঠী তৈয়ার করতে হলে যুক্তি ও বিজ্ঞান, স্বপ্ন ও আশা দিয়ে হয় না, সাহস ভালবাসা বলিদান ইত্যাদি গুণপনাও যথেষ্ট নয়,—চাই কূটবুদ্ধি, শিথিল ন্যায়বোধ। এ কাজে চরিত্রের বিশুদ্ধি মস্ত অন্তরায়। ক্রপটকিনের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যর্থতার জন্যে প্রধানত দায়ী তাঁর নিষ্কলঙ্ক সততা, অনমনীয় বিবেক। রাষ্ট্রসংগ্রামে বীরের ধর্ম পালন করার রেওয়াজ হয়ত বা কোন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ছিল, কলিযুগে নেই, থাকলেও খ্রীষ্টান নাইট ও তুর্ক সুলতান-দের পর থেকে উঠে গেছে। কীট ও পশুর জীবনমরণ সংগ্রামের মতই করাল ভয়াল রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সংগ্রাম, উভয়ই বাস্তব জৈব সত্য, কোনটিতে ন্যায়নীতির সংযম নেই। এ ফুটবল খেলা নয়, ক্রীড়ামঞ্চের মল্লযুদ্ধ নয়। এই সুস্পষ্ট সত্যটা কি ক্রপটকিনের চোখে ধরা পড়েনি? তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কি নীতিবায়ুতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল?

তা নয়। তাঁর নীতিনিষ্ঠা নিছক সংস্কার কিংবা বিবেকের শাসন ছিল না। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। তাঁর বিপ্লবকাব্যের আদিকাণ্ডে রাষ্ট্রনিধন, উত্তরকাণ্ডে মুক্তসমাজের প্রতিষ্ঠা। জনরাজকে পরিস্রুত হতে হবে নূতন মূল্যবোধে, বিপ্লবীর কর্তব্য তার পরিচর্যা তার পরিশীলন। যদি রাষ্ট্রনিধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বিপ্লব হবে লক্ষ্যহীন রক্তপাতের লড়াই। যে সংগ্রামী কার্যসিদ্ধির জন্যে মূল্যবোধকে বলি দিতে পারে সে জয়মাল্য পায়, কালের ফলকে তার নাম উৎকীর্ণ হয়। আর যে সযত্নে তার সৃষ্টি-উপাদানকে রক্ষা করে, যশ ও খ্যাতিকে উপেক্ষা করে অনাগত কালের প্রতীক্ষায় দিন গণে সে হয় একলা পথের যাত্রী, যুগের কাছে অবজ্ঞাত, যুগের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। কিন্তু বিফলতাই তাঁর সৃজনমনীষার পরিচয়। যে দর্শন কালোত্তর, কালের নিকষে তার যাচাই হয় না। ক্রপটকিন কালোত্তর ভাবনার ভাবুক তাই যুগের সংগ্রামে তিনি পরাহত, যুগের মানসে তিনি উপেক্ষিত।

১৮৭১ সাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাজ্যের জয় হল কিন্তু ধর্মরাজ্যের পত্তন হল না। ইটালী ও জার্মানী রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করল, ইটালী ও

ফ্রান্স স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হল, জয়ী হল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র কিন্তু জনতার দুঃখমোচন হল না, জনতার অধিকার অর্জিত হল না। সামন্ততন্ত্রের দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করে চলে গেল বিপ্লবের ঝড়, তার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উঠল ধনতন্ত্রের সাতমহলা কুঠি, সমাজতন্ত্রের স্বপ্নসৌধ হতবাক্ সংগ্রামীর চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।

বিধাতা এই নিষ্ঠুর তামাসাটি খেললেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে সেটি হল প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়। এর আশু পরিণাম প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম, ইটালীর রাষ্ট্রীয় একায়নের সমাপ্তি, ফ্রান্সে একনায়কত্বের অবসান। তৃতীয় নেপোলিয়নের জায়গায় রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র বসবে তা যখনো স্থির হয় নি, পারি যখন জার্মান সেনাদ্বারা বেষ্টিত ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদীরা মিলে পারিতে এক স্বাধীন কমিউন বা শ্রমিকতন্ত্র স্থাপন করল। এরা অন্যান্য শহরগুলিকেও আহ্বান করল বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করে পারির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। এর আগেই বাকুনিনের পরিচালনায় লিয়ঁতে কমিউন গঠিত হয়, মার্সাই, তুলু প্রভৃতি গুটিকয়েক শহরেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটল কিন্তু একটিও টিকল না। অবশেষে বিজয়ী জার্মান সেনা অবরোধ তুলে নেবার পর ভার্সাই থেকে এল ফরাসী জাতীয় মহাসভার ফৌজ, পারি অবরুদ্ধ হল দ্বিতীয়বার। পারিকে বাঁচাবার সাধ্য ক্ষুদ্র বিপ্লবী সেনার ছিল না। ২৬শে মার্চ থেকে ২১শে মে (১৮৭১) পর্যন্ত দুমাসের মিয়াদের পর কমিউন বিধ্বস্ত হল, ভার্সাই সেনা নগরীতে প্রবেশ করল। গৃহযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গেল এই অভিনব গণবিপ্লব। ক্ষণজীবী পারি কমিউনের সাথে সাথে কমিউনিস্ট ও এনার্কিস্টদের আশা ভরসা বিলুপ্ত হল, ফ্রান্সে বহাল হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র।

কুরুক্ষেত্রের রণপর্বের পর ব্যাসদেব লিখেছিলেন শান্তিপর্ব, শ্মশানের মহাশান্তি নিয়ে। উনিশ শতকের শেষ পাদে বিপ্লবপীড়িত ইয়োরোপের কপালেও শান্তি জুটেছিল, জার্মানীতে কাইজারতন্ত্রের আর রাশিয়ায় জারতন্ত্রের শান্তি। জার্মানীর সমরনায়কেরা গোটা জাতিকে দাস বানিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে আত্মহারা হল—ইয়োরোপের আকাশে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব বাকুনিনের দৃষ্টি এড়ায় নি। রুশ সরকার সন্ত্রাসবাদের জবাবে বিপ্লবীদের নির্যাতন করে ক্ষান্ত হলেন না, সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তার ও

স্বাধিকারবোধের মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলিও নতুন রাস্তার নিশানা দিতে পারল না, তাদের নিস্তেজ বাক্‌সর্বস্ব প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মন সাড়া দিল না। কলকারখানার দৌলতে দেশে দেশে উৎপাদন বাড়ল, সম্পদ জমল কিন্তু কুলিমজুরের কপালে ধনিকের উচ্ছিষ্টও জুটল না। বিপ্লব হল, গণভোট নির্বাচন ও দায়িত্বশীল সরকার নিয়ে এল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, যুগ বদলাল কিন্তু মানুষের ভাগ্য বদল হল না। একের বদলে এল আর এক হুজুর, আর এক মালিক। এই যখন ইয়োরোপের অবস্থা সেই সময়ে আশার ভাণ্ড শূন্য করে বাকুনিন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হলেন আর ক্রপটকিন শুষ্ক সলিতার নিভন্ত দীপশিখাটি আগলে অন্ধকারে পথ খুঁজতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধারা ফ্রান্স, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সীমানা পেরিয়ে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাকুনিন স্পেনবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহার প্রচার করে তার পিছনে ফানেলি নামে একজন বিশ্বস্ত দূতকে স্পেনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ক্যাটালনিয়া ও বার্সিলনায় ঘাঁটি তৈরী হল। ইটালীতে নিরাজমন্ত্র নিয়ে এলেন কার্লো কাফিয়ো ও এনরিকো মালাতেস্তা। মিলান থেকে নেপ্‌ল্‌স পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় জোট গজিয়ে উঠল। ১৮৭৬ সালে বাকুনিনের মৃত্যুবৎসরে সুইৎজার্ল্যাণ্ডের বার্ন শহরে একটি আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এখানে কাফিয়ো ও মালাতেস্তা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব পাস করালেন। পরের বছর তাঁরা নেপ্‌ল্‌স্‌-এর বেনেভেন্তোর আশপাশে চাষীদের ক্ষেপিয়ে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করলেন বটে কিন্তু এ বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে ইটালীর সরকারকে বেগ পেতে হয় নি।

১৮৭৯ সালে পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হল সুইস জুরার লা শো ড্য-ফঁ নামক স্থানে। এখানে খোলাখুলিভাবে প্রস্তাবিত হল 'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতি, রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টি করবার নীতি। ১৮৮১ সালে আরো তোড়জোড় করে লণ্ডনে আবার এক বৈঠক বসল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, স্পেন, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি এল, কিন্তু কংগ্রেস কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

আসলে রামরাজ্যের রঙীন চিত্র ছাড়া তাদের দেবারও কিছু ছিল না। জ্যঁা গ্রাভের 'মুমূর্ষু সমাজ ও নৈরাজ্য' এবং চার্ল মালাতোর 'নৈরাজ্যবাদের

দর্শন' এই চিত্রের ওপর দাগা বুলানো ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গলোকে পৌছবার জন্যে মর্ত্যলোকে কোন সিঁড়ি তাঁরা গাঁথতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের বিচারধারা থেকে একটা সূত্রের প্রতিপাদন হল অনায়াসে—যদি আইন ও কর্তৃত্ব অন্যায় হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য বলপ্রয়োগ হবে দেশব্যাপী, তার আগে কোথাও না কোথাও তাকে শুরু করতে হবে। দেশলাই কাঠির ছোট্ট একটু আগুন না জ্বাললে ঘর পোড়ে না। তেমনি গুপ্তহত্যার স্ফুলিঙ্গ না তুললে কোনকালে সর্বগ্রাসী হিংসার দাবানল জ্বলবে না। বাকুনিন ও নিহিলিস্টরাও হত্যা ও হিংসার পথে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদের হত্যা ছিল বিপ্লবী দর্শন ও কার্যক্রমের অঙ্গ। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে হতাশার অন্ধকারে যারা হত্যার সুড়ঙ্গপথে পা বাড়াল নৈরাজ্যবাদের তক্‌মা আটলেও তাদের মাথায় কোন বিপ্লববোধ ছিল না। 'কাজের দ্বারা প্রচারের' গরম গরম বুলি তাদের দুর্বল মগজে জট পাকিয়ে বসল, বংশধারা ও পতিত জীবনের অপরাধবৃত্তি বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালকে আমন্ত্রণ করল বিচার বিবেকহীন নরহত্যার উৎসবে।

নৈরাজ্যবাদের নামে বেপরোয়া খুনখারাবির পিছনে যে মনোবৃত্তি ও সমাজপরিবেশ কাজ করছিল এদের দু' একজনের পরিচয় দিলে তা বোধগম্য হবে। ফ্রান্সে লোয়ার নদীর উপত্যকায় একটি মিলমজুরের বস্তিতে রাবাচল মানুষ হয়েছিল। এক রঞ্জকের দোকানে সামান্য বেতনে সে কাজ করত। কোন কারণে মালিক তাকে বরখাস্ত করে। কোথাও কাজ না পেয়ে সে চুরি ডাকাতি শুরু করল। এ কাজের সমর্থনে নৈরাজ্যবাদী প্রচারপত্র থেকে সে একটি যুক্তিও খাড়া করল। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত নানাস্থানে নিরীহ লোকদের খুন করে ও নিরর্থক বোমা ফাটিয়ে সে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অবশেষে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পর কোন কোন নৈরাজ্যবাদী পত্রিকায় সে শহীদের সম্মান লাভ করল।

ফ্রান্সের অগস্ত ভাইয়াঁ ছিল মায়ের অবৈধ সন্তান। শিক্ষাদীক্ষা তার কিছুই হয় নি। চৌদ্দ বৎসর বয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হল। কিন্তু এখানে সেখানে দৌড়দৌড়ি সার হল, সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না। একটু শান্তির আশায় সে ঘর বাঁধল কিন্তু স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে ফেলে ঘর ভেঙে পরম শান্তির আশ্রয়ে চলে গেল। ভাইয়াঁর কোন বদখেয়াল ছিল না, কাজে কর্মে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, তবু কেন তার

এই দুর্ভোগ তার কোন মানে সে খুঁজে পেল না। সে স্থির করল অভিশপ্ত জীবন আর রাখবে না কিন্তু কারও না কারও ওপর প্রতিশোধ নিয়ে একটা আদর্শের জন্যে মরতে হবে। শুধু শুধু সে মরবে না। নৈরাজ্যবাদী পুস্তিকায় আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের বিধান সভায় দর্শকদের মঞ্চ থেকে সে বোমা ছুড়ল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল এবং সে শহীদের বরমাল্য লাভ করল।

লুইগি লুছেনির জন্ম হয় পারিতে। সেও জারজ সন্তান। জন্মের কিছু পরেই মা তাকে ফেলে চলে যায় এবং সে ইটালীতে পার্মার এক অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়। বাল্য বয়সে সে মজুরের কাজে ভর্তি হল। এ কাজ তার ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। বেকার ভবঘুরে জীবনে নানা উৎকট চিন্তা মাথায় ঘুরত। একটা কিছু করে চমক লাগাবার নেশা তাকে পেয়ে বসল। ১৮৯৮ সালে সে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ ফ্রান্সিস জোসেফের রানী এলিজাবেথকে হত্যা করে মনের সাধ মেটাল।

এই হতভাগ্য বেকারের দল যারা সমাজে পতিত, যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারও স্বীকৃত নয়, যাদের কঙ্কালের ওপর হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র তার ঠাটঠমক জাঁকিয়ে বসেছে তাদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের মূল্যবোধ কতটুকু? তাদের মনের দুয়ারে ঘা দিল রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের জেহাদ,—'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতিতে তারা খুঁজে পেল তাদের হিংসাবৃত্তির সমর্থন। তা বলে এ কালের সকল হিংসাত্মক কাজের পিছনে যে নৈরাজ্যবাদী মন্ত্রণা ছিল তা নয়। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সঙ্গে কোন রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক ছিল না। তার কারণ এসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনে সাধারণ লোক কোন সামাজিক অধিকার পায় নি, তাদের দুর্গতির কোন উপশম হয় নি। কোন ধ্বংসাত্মক মতবাদের চেয়ে এই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশই এই অপরাধগুলির জন্যে বেশী দায়ী।

কিন্তু দুর্নামের কলঙ্কটুকু লেগে রইল নৈরাজ্যবাদের গায়। রক্ষণশীল কাগজগুলির অবিরাম প্রচারের ফলে নৈরাজ্যবাদ হয়ে দাঁড়াল গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রের নামান্তর। তার ওপর দেশে দেশে চলল অবাধ দমননীতির মহড়া। ফলে সাচ্চা ও ঝুটার তফাত চলে গেল, যারা ছিল আদর্শনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল।

এদিকে ইয়োরোপের চেহারা বদলে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মজদুর শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হল, ঘোরাল হয়ে উঠল শ্রেণী সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের বৈধানিক পন্থায় নির্ভর না করে তারা নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। এই ঘনায়মান শ্রেণী সংগ্রামকে অবলম্বন করে, শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যবাদের নবরূপায়ন হল, অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল দীপশিখা, তার আলোয় মেহনতী জনতা দেখতে পেল নিঃশোষণ সমাজের ছবি।

১১। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌

ফরাসী সিণ্ডিকেট্‌ বা মজুর ইউনিয়ন থেকে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ কথার উৎপত্তি। নৈরাজ্যবাদের নূতন ভিত্তি হল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কর্মপন্থা হল শ্রমিক সংগ্রাম। ইউনিয়ন কেবল লড়াইয়ের হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন হবে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠাম। প্রুধঁর যুক্তকরণের নীতি অনুসরণ করে ইউনিয়নগুলি পরস্পর চুক্তি করবে, মাঠে খনিতে কারখানায় তারা উৎপাদনের কাজ পরিচালন করবে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনবে শ্রমতান্ত্রিক সমাজ। যারা পরিশ্রম করে না, সমাজে যাদের কোন কাজ নেই, শ্রমতান্ত্রিক সমাজে তাদের জায়গা হবে না। যারা সমাজের খোরপোষ জোগায় সমাজ তাদের —এইটেই সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মোদ্দা কথা। এতদিন সমাজবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ছিল বুদ্ধিজীবীর কপোলকল্পনা, এবার তাদের প্রতিষ্ঠা হল শ্রমজীবীর কর্মশালায়। সমাজবাদীরা এতকাল মজদুর ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছে ক্ষমতা করায়ত্ত করবার ফিকিরে, সমাজতান্ত্রিক বিধানে তাদেরকে কোন স্থান দেয় নি। মার্কস্‌ এবং তাঁর অনুচররাও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তোলার বেশী ইউনিয়নের কোন ভূমিকা দেখতে পান নি এবং তাঁদের শ্রেণীহীন সমাজে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নগুলিরও বিলোপ প্রতিশ্রুত হয়েছে।

১৮৬৯ সালে বাসেলে শ্রমিক আন্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে এই মতের প্রতিবাদ হল। বেলজিয়ান প্রতিনিধি ইউজেন হিন্‌স্‌ একটি ইস্তাহার পেশ করলেন, সুইস্‌ জুরা ও ফরাসী প্রতিনিধিদের সমর্থনে সেটি গৃহীত হল। এই ইস্তাহারের মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হল :

এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে শ্রমিকরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে

প্রতিরোধ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন খাড়া হওয়া মাত্র ইউনিয়নগুলিকে জানাইতে হইবে যাহাতে এক এক শিল্পে একটি করিয়া জাতীয় শ্রমিক সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতীয় সংহতিগুলির কর্তব্য হইবে আপন আপন শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা, যৌথভাবে প্রতিকার-সাধনের পথ দেখান এবং সেই পরামর্শ অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেদিকে নজর রাখা—যাহাতে অন্তিমে বর্তমান অন্নদাস প্রথা দূর হইয়া মুক্ত মজুরদের একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উৎপাদন পরিচালনা যাতে এককালে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আসে তার প্রস্তুতির জন্যে শ্রমিক পরিষদ গড়বার প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ও পারি কমিউনের পতনে সব জল্পনা কল্পনা বরবাদ হয়ে গেল।

যদিও যন্ত্রশিল্প ও তার আনুষঙ্গিক শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডে তবু সিণ্ডিক্যালিস্ট মত ও বিশ্বাস পরিপুষ্ট হল ফ্রান্সের জলহাওয়ায়। তার কারণ ফ্রান্সে দলীয় রাজনীতি এতদূর দূষিত হয়েছিল যে সরকার ও সরকারী ব্যবস্থায় কারও আর আস্থা ছিল না। কুখ্যাত দ্রেফুর মামলা এর একটি বিশিষ্ট নজির। ১৮৯৪ সালে আলফ্রে দ্রেফু নামে একজন ইহুদী সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে বিদেশে গোপনীয় সংবাদ পাঠাবার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও সামরিক আদালতে তিনি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হলেন। লোকসমক্ষে চূড়ান্ত অপমানের পর তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার একটি অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল। দু'বছর পরে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা কর্নেল পিকার আবিষ্কার করলেন, যে দলিলটির ওপর নির্ভর করে দ্রেফুকে সাজা দেওয়া হয়েছিল আসলে সেটি দ্রেফুর লেখা নয়, সেটির হস্তাক্ষর আর একজনের। সমরবিভাগের কর্তারা খুশী হলেন না, তাঁরা পিকারকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসালেন কর্নেল হেনরি নামে এক অফিসারকে। কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ হল না। একটা সাংঘাতিক রকমের অবিচার হয়েছে এরকম আশঙ্কা চারিদিকে মুখর হয়ে উঠল। প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এমিল জোলা। ন্যায়বিচার দাবি করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড ও জরিমানা হল।

এর অল্প পরে হেনরির এক জালিয়াতি ধরা পড়ল এবং সে আত্মহত্যা

করল। ড্রেফুর নির্দোষিতার আর একটি প্রমাণ পেয়ে ফরাসীরা ক্ষেপে উঠল। সামরিক কর্তারা তাঁর পুনর্বিচার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মর্যাদা খোয়ানো বড় কঠিন। আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস না করে দণ্ডের মিয়াদ কমিয়ে করল দশ বৎসর, আর রাষ্ট্রপতি তাঁকে মাপ করে মুক্তি দিয়ে জিদের মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের সামঞ্জস্য করলেন। ড্রেফুর সমর্থকরা দাবি করল ক্ষমা নয় দোষ স্খালন। অবশেষে এ দাবি মানতে হল। ফ্রান্সের সদর আদালত সামরিক আদালতের রায় নাকচ করে ঘোষণা করল ড্রেফুর বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ফ্রান্সের ইতিহাসে ড্রেফুর বিচারপর্ব এক দুরপনেয় কলঙ্ক। সামরিক আদালতের অবিচার ও অসাধুতার চেয়েও যা বেশী লজ্জাকর সে হল রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির ভূমিকা। দলীয় স্বার্থ ও নেতৃত্বের লোভ মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে এই ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। সমরবিভাগের সঙ্গে যে সব ক্যাথলিক, ইহুদীবিদ্বেষী ও রাজতন্ত্রবাদীরা হাত মিলিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্রকে বেইজ্জত ও ঘায়েল করা। এই ষড়যন্ত্রের সামনে ন্যায়বিচার ও আইনের মর্যাদারক্ষার জন্যে প্রজাতন্ত্রবাদীরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে নি। তাদের নীতিহীন ও মেরুদণ্ডহীন আচরণে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ শিথিল হয়ে গেল।

সমাজতন্ত্রী নেতারাও কোন সদ্‌দৃষ্টান্ত রাখতে পারল না। সমাজবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে উঠল। ১৮৯৯ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত সমাজবাদী নেতা আলেকজাণ্ডার মিয়েরাঁ দলত্যাগ করে বিরোধী দলের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ছেড়ে শান্তির নামাবলী গায় দিলেন। এর পরে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সকল ভরসা খুইয়ে সিণ্ডিক্যালিস্টরা শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীসংস্থার ওপর নির্ভর করতে আহ্বান করল।

ফ্রান্সে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর জন্মবৃত্তান্ত খুঁজলে যেতে হয় ১৮৮৬ সালে যখন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর থেকে আইনের নিষেধ প্রত্যাহার করা হল। ১৮৯২ সালে ফার্নার্দ্‌ পেলুতিয়ের নেতৃত্বে তৈরী হল বুর্সে দ্যু ত্রাভাই নামে একটি মজদুর ফেডারেশন। এক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মজুর ইউনিয়নগুলি মিলিত হয়ে গড়ল বুর্সে, নানা অঞ্চলের বুর্সে একজোট হয়ে গঠিত হল বুর্সে দ্যু ত্রাভাই। মালিকের হয়ে চেম্বার অব কমার্স যে কাজ করে মজুরের হয়ে বুর্সে

দ্যু ত্রাভাই করে সে কাজ। এ রাজনীতির ধার ধারে না। এর কাজ ইউনিয়নকে মজবুত করা আর সাধারণ ধর্মঘট এবং অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকের লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এর সংগঠন প্রুদঁর পরিকল্পিত বিকেন্দ্রায়ন ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সকল শিল্প ও শিল্পাঞ্চল এই সংগঠনের সামিল হয় নি। খনিমজুর, বস্ত্রমজুর, ছুতারমিস্ত্রি এরা সব যার যার জাতীয় ফেডারেশন করে বসেছিল। ১৮৯৫ সালে এদের একত্র করে আর একটি শ্রমিক সংস্থা গঠিত হল— কঁফেদেরাশিয়ঁ জেনেরাল দ্যু ত্রাভাই। বুর্সে ছিল চরমপন্থী, কঁফেদেরাশিয়ঁ কিছুটা নরমপন্থী। উভয়ের মিলনের এই অন্তরায়টুকু দূর হল দ্রেফুস মামলা ও মিয়েরাঁর দলত্যাগের ফলে। গ্রিফুয়েলে প্রমুখ বামপন্থী সমাজবাদীরা এবং পুজে ও দেলেসাল প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীরা কঁফেদেরাশিয়ঁতে যোগ দিয়ে একে সংস্কারমুক্ত করলেন। এঁদের আন্দোলনের ফলে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ওপর দুই সংগঠনের ঐক্য সাধিত হল। ১৯০২ সালে বুর্সে কঁফেদেরাশিয়ঁতে যোগদান করল।

কঁফেদেরাশিয়ঁ বা সিজিটি আসলে একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও বুর্সের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে দুটি ফেডারেশনে ঢুকতে হয়। একবার এক অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে জুটতে হবে স্থানীয় বুর্সের সঙ্গে, স্থানীয় বুর্সেগুলি যুক্ত হবে তাদের ফেডারেশনে, আর একবার অন্যান্য অঞ্চলের সমশিল্পের ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মিলে সেই শিল্পের জাতীয় ফেডারেশনের সামিল হতে হবে। আঞ্চলিক প্রীতি ও বৃত্তিগত স্বার্থ উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে এই ব্যবস্থা। দুই ফেডারেশনের ইমারত উঠেছে তলা থেকে উপরে, ইউনিয়নগুলির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায়, স্বার্থের সমতা ও বিশ্বাসের একতা ছাড়া তাদের আর কোন বন্ধন নেই। এই বিকেন্দ্রিত সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণী একাধারে পেল তাদের লড়াই-এর হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতের মুক্তসমাজের কাঠাম।

১৯০৪ সালে মোট সঙ্ঘবদ্ধ মজদুরের মধ্যে শতকরা ২০.৯ জন ছিল সিজিটির সভ্য আর মোট ইউনিয়নের শতকরা ৪২.৪টি ছিল সিজিটির অন্তর্গত। ১৯১০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৩৬.৬ ও ৫৭.১।[১] সংখ্যার অনুপাতে

১ জে, এ, এসটে: রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্, লণ্ডন, ১৯১৩, ৪৬ পৃষ্ঠা।

এর শক্তি ছিল বেশী কারণ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়নগুলি প্রায় সবই সিজিটিতে ভর্তি হয়েছিল।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর মতবাদ ও পথনির্দেশ রচিত প্রুদঁর নৈরাজ্যবাদ ও মার্কস্‌-এর শ্রেণীসংগ্রামের মিশ্রণে। প্রুদঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের আদর্শ, মার্কস্‌-এর কাছ থেকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয় সংগ্রামের পদ্ধতি। ধনতন্ত্র ও তার হাতিয়ার রাষ্ট্রকে একসঙ্গে নিপাত করা এর লক্ষ্য। এ কাজ রাজনৈতিক দলের নয়। সরেল ও তাঁর শিষ্য লাগার্দেল রাজনৈতিক দল ও অর্থ নৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সমাজবাদী দল বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে তৈরী একটা জগাখিচুড়ি, এদের চিন্তায় ঐক্য আছে বটে কিন্তু স্বার্থের মিল নেই। তারা দল করে কারণ রাজনীতি তাদের নেশা, রাজনীতিতে তাদের অহঙ্কার মেটে ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শ্রেণী সমস্তরের লোক নিয়ে তৈরী, তাদের স্বার্থ এক, যার বন্ধন মতবাদের চেয়ে দৃঢ়।[২]

দলের দুর্বলতার একটি জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত জার্মানীর সোস্তাল ডিমক্র্যাট দল। ১৯৩২ সালে ডায়েটে তাদের বল ছিল দ্বিতীয়। তাদের পক্ষে ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষ ভোটার আর হাতে ছিল ষাট লক্ষ ইউনিয়ন মজদুর। প্রাশিয়ার যুক্তসরকারে তারা ছিল প্রধান দল এবং মন্ত্রীসভায় নেতৃত্ব ছিল তাদের। তা সত্ত্বেও যখন ভন প্যাপেন জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে জুলাই মাসে জোর করে প্রাশিয়ার মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলেন তখন তারা কোন বাধা না দিয়ে হাইকোর্টে আপীল করতে গেল। জার্মানীতে গণতন্ত্রের পতনের সূত্রপাত এই থেকে। হিটলার যখন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তখন সমাজবাদী দল টু শব্দটি করল না এবং মাসকয়েকের মধ্যে তাদের ইউনিয়নগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের কর্মপন্থা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ যার মানে লড়াইর দায়িত্ব অপরের হাতে তুলে না দিয়ে মজুরদের নিজের হাতে রাখা। তাদের লড়াইর চূড়ান্ত কৌশল সাধারণ ধর্মঘট। চলতি ধর্মঘটের উদ্দেশ্য মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা। সিণ্ডিক্যালিস্টদের বিপ্লবী ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমতন্ত্র প্রবর্তন করা। সুতরাং অন্য সকল উপায় ব্যর্থ হলে যে ধর্মঘটে নামতে হবে তা নয়, যখনই সুযোগ মিলবে তখনই এই অস্ত্রে শান

---

২ যুবের লাগার্দেল: স্যাদিকালিজ্‌ম্‌, এ সোসিয়ালিজ্‌ম্‌, ৪৫ পৃষ্ঠা।

দিতে হবে। এমিল পুজের কথায় বলতে গেলে "কাজের সমর্থন কাজে: ফল কি হবে তার খোঁজে দরকার নেই।"

সকলে একসঙ্গে না নামলে যে সাধারণ ধর্মঘট সম্ভব হবে না তা নয়। অল্প কয়েকজন লোকও কোমর বেঁধে নামলে ধনতান্ত্রিক বিধানকে অচল করতে পারে। পুজে দেখিয়েছেন যে গুটিকয়েক মৌলিক শিল্পে ধর্মঘট হলেই কাজ হাসিল হয়। খনিমজুররা যদি কয়লা তোলা বন্ধ করে, ডকমজুররা যদি জাহাজের মাল না নামায়, রেলমজুররা যদি মাল ও মানুষের চলাচল আটকে দেয় তাহলে একদিনের মধ্যে ধনিক অর্থনীতি বেসামাল হয়ে যাবে এবং বিপ্লব ঘটবে। মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে আসার ফলে এই কৌশল আরো সুসাধ্য হয়েছে। "রাষ্ট্র মানুষের শরীরের মত ক্ষণভঙ্গুর, একটি মাত্র শিরা কেটে দিয়ে তাকে খতম করা যেতে পারে।"[৩]

সিণ্ডিক্যালিস্ট দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ সরেল (১৮৪৭-১৯২২) তাঁর রেফ্লেকসিয়ঁ স্যুর লা ভিওলাঁস নামক গ্রন্থে (১৯০৮) সাধারণ ধর্মঘটকে নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর দর্শন রচনা করলেন। তাঁর আসল বক্তব্য হল যে মানুষ সংগ্রামের প্রেরণা মতবাদ থেকে পায় না, পায় যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে। এক একটি কথায় এমন জাদু থাকে যে তার সামনে যুক্তিতর্ক দাঁড়াতে পারে না।

> বড় বড় সামাজিক আন্দোলনে যাহারা শরিক হয় তাহারা সর্বদা স্বপ্ন দেখে যে যুদ্ধে তাহাদের জয় অবধারিত। এই বিশ্বাসগুলিকে আমি বলিতে চাই মিথ্, সিণ্ডিক্যালিস্ট সাধারণ ধর্মঘট ও মার্কস্-এর সর্বনাশা বিপ্লব এই প্রকারের মিথ্।[৪]

আদিম খৃষ্টান ধর্ম, ষোড়শ শতকের রিফর্মেশন, আঠার শতকের ফরাসী বিপ্লব—যাবতীয় বিরাট জন-আন্দোলনের পিছনে আছে মিথের শক্তি, সুনিশ্চিত জয়লাভে যুক্তিহীন বিশ্বাসের শক্তি। যুক্তি দিয়ে এর খেই পাওয়া যায় না, কারণ এখানে সংগ্রামের উপজীব্যই হল অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস জোগায় সংকল্প ও সংগ্রামের বল। আর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গড়া হয় ইউটোপিয়া, আদর্শ সমাজচিত্র, এতে মনের ক্ষুধা মেটে রক্তে নেশা ধরে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত

৩ হার্বার্ট রীড: এনার্কি এণ্ড অর্ডার, লণ্ডন, ৫২ পৃষ্ঠা।

৪ রেফ্লেকসিয়ঁ, অনুবাদ, টি, ই, হিউম' লণ্ডন, ১৯২১' ২২ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীতে দেওয়া হল।

সমাজবাদ ছিল ইউটোপিয়ার আদর্শ বিলাস। মার্কস্ অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের অন্ধ বিশ্বাস আমদানি করে সমাজবাদকে বৈপ্লবিক শক্তি দিলেন।

অযৌক্তিক হলেও মিথ্ অবৈজ্ঞানিক নয়। সমাজবিজ্ঞানের কাজ সামাজিক শক্তি-গুলিকে আবিষ্কার করা, আর বিপ্লবীর কাজ নতুন সমাজগঠনে সেগুলিকে প্রয়োগ করা। এক একটা মিথের পেছনে প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি দানা বেঁধে ওঠে। যীশুখৃষ্ট আবার ফিরে এসে মানুষের মনের ময়লা মুছে ফেলবেন এই অলীক কল্পনা মধ্যযুগে কত সহিষ্ণুতা, কত বলিদানের খোরাক জুগিয়েছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মায়ামন্ত্র হাজার হাজার লোককে পাগল করেছিল বলেই না ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হতে পেরেছিল। আসন্ন প্রলিতারিয় বিপ্লবে সাধারণ ধর্মঘটেরও হবে এইরূপ ভূমিকা। শ্রমিকশ্রেণীর সকল আশাআকাঙ্ক্ষার নির্যাস নিয়ে উচ্চারিত হবে ধর্মঘটের জাদুমন্ত্র। যুক্তি দিয়ে, সম্ভাবনার মাপকাঠি দিয়ে এর যাচাই হবে না, শুধু দেখতে হবে এই মন্ত্র দিয়ে মজুরদের মাতিয়ে তোলা গেল কিনা।

মজুরদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাষ্ট্র। চরম ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে এনে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচালনায় রাষ্ট্র পোপের চেয়েও শক্তিশালী একটা দানবিক পীড়নযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সিণ্ডিক্যালিস্ট রাষ্ট্রকে শোধরাতে চায় না, চায় নাশ করতে। মার্কস অবশ্য তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যতদিন না শ্রেণীস্বার্থের বিলোপন হয় ততদিন প্রলিতারিয় একনায়কত্বে রাষ্ট্রশক্তি বজায় থাকবে। মার্কস্ ধনতন্ত্রের বিস্তারকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রলিতারিয় বিপ্লবের পথও ঠিক বাতলিয়েছেন, কিন্তু প্রলিতারিয় সংগঠন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না এবং বলেনওনি, শ্রেণীসংগ্রামের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তেও তিনি আসেননি।

> যে সকল ঘটনার সঙ্গে আজকাল আমরা পরিচিত মার্কস্ এর তাহা জানা ছিলনা। ধর্মঘট কি ব্যাপার আমরা তাঁহার চেয়ে ভাল করিয়া জানি কারণ আমরা সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সাধারণ ধর্মঘটের মিথ্ জনপ্রিয় হইয়াছে, মজদুরের মনে কায়েম হইয়া বসিয়াছে। মার্কস্-এর হতভাগ্য শিষ্যরা এতকাল ধরিয়া তাঁহার শাস্ত্রবাক্যের টিকা রচনা করিয়াছে। তার বদলে আমাদের উচিত তাঁহার দর্শনের অভাব পূরণ করা। (৩৪-৩৫)

নিশ্চয়ই মার্কস্ চাননি একদল সংখ্যালঘুকে সরিয়ে আর একদল সংখ্যালঘু সরকারের গদিতে বসুক। তাঁর ভক্তরা বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত নকল করে ঠিক তাই চেয়েছে, শুধু বুর্জোয়াদের জায়গায় এনেছে শ্রমিকদের। বলপ্রয়োগ চাই কিন্তু শাসনকর্তৃত্ব লাভ করবার জন্য বলপ্রয়োগ আর শাসন-কর্তৃত্ব উচ্ছেদ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ এক জিনিস নয়—এ তাদের খেয়াল নেই। সিণ্ডিক্যালিস্টদের কার্যকলাপ মার্কসীয় ছকের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তারা কালের দাবি অনুসারে মার্কস্‌বাদের সংস্কার করে নেবে।

রাজনৈতিক ধর্মঘট ও প্রলিতারিয় ধর্মঘট উভয়ের পার্থক্য মৌলিক। রাজনৈতিক ধর্মঘট বুর্জোয়াদের একটা চাল। নির্বোধ জনতার হয়ে ভাববার গুরু দায়িত্ব তাদের মাথায়। জনতার মনে আছে রাষ্ট্রের জাদুকরী শক্তিতে অটল আস্থা। ওপরে ধনিকরা ধর্মঘটের আতঙ্কে অস্থির। একের অজ্ঞতা ও অপরের ভীরুতা উভয়ের সুযোগ নিয়ে বাক্যবীর সমাজবাদীরা দলের হাতে সকল ক্ষমতা দখল করে নেয়।

এদের ধাপ্পাবাজি ফাঁস করবার একমাত্র উপায় প্রলিতারিয় ধর্মঘট। প্রলিতারিয় ধর্মঘট ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং চরম শক্তিপরীক্ষা,—শ্রমিকের দুর্বার সঙ্ঘশক্তির প্রমাণ। এর লক্ষ্য শ্রমিকের দাসত্বমোচন, সরকার বদল নয়। শ্রমিকের সকল চিন্তাভাবনা আশাআকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে মূর্তিমান হয়ে ওঠে।

> ধর্মঘট শ্রমিকের মধ্যে গভীরতম ও উচ্চতম আবেগের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সাধারণ ধর্মঘট তাহাদিগকে নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র করে, একটি চিত্রে সন্নিবেশ করিয়া প্রত্যেককে চরম উত্তেজনায় টানিয়া আনে। (১৩৭)

সফলতা দিয়ে একে মাপা যায় না। ধর্মঘট সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি, সংগ্রামের মহড়া। এর মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যচেতনা জেগে ওঠে। সুতরাং বাস্তবে এর ফলাফল যাই হোক না কেন, এর দূরবর্তী সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে সুযোগ পেলেই ধর্মঘটের সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।*

* সরেল এবং লাগার্দেলের মত ধর্মঘটকে এপ্রকার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অন্যান্য সিণ্ডিক্যালিস্টরা দেননি। এদের মধ্যে গ্রিফুয়েলে, পেলুতিয়ে প্রভৃতি যাঁরা ইউনিয়ন চালিয়েছেন তাঁরা ফলাফল চিন্তা না করে ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন না।

রোম জয় করার পর জার্মানরা নিজেদের বর্বরতায় লজ্জা পেয়ে রোমানদের কাছে সভ্যতার শিক্ষানবিসি করেছিল। এই অধমতাবোধ থেকে শ্রমিকদের বাঁচতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখলে তাদের বুদ্ধিজীবী সুবিধা-বাদীদের ফাঁদে পড়তে হবে। জ্যঁা জরে প্রমুখ[৬] গণতন্ত্রী সমাজবাদীরা দুই শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে নির্বাচনের রাস্তা পরিষ্কার করে। বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে তারা ধনিকদের কাছ থেকে কাজ বাগায় আর শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই করবার ভান করে তাদের ধাপ্পা দেয়। ধনিকদের বেশী চটাতে তারা সাহস করে না কারণ তাহলে ধনিকরা বিগড়ে গিয়ে দেশ রক্ষণশীল সরকারের হাতে তুলে দেবে। এইসব কারচুপিগুলোকে ফাঁসিয়ে দিতে হলে একমাত্র অস্ত্র প্রলিতারিয় ধর্মঘট।

ধর্মঘটের আগে মালিক বলে থাকে ব্যবসার যা অবস্থা তাতে মজুরের দাবি মেটান চলে না। ধর্মঘটের চাপে শুকনো গরুর বাঁট থেকে দুধ বেরোয়, পাওনাগণ্ডা আদায় হয়। দেখা যায় ধর্মঘটের অবিরাম চাপ না থাকলে ন্যায়বিচার মেলে না। সুতরাং সামাজিক কর্তব্য বা দায়িত্ব সব বাজে কথা। কাজের কথা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে দাবি আদায়। শ্রমিকদের বোঝাতে হবে তারা ভিক্ষা চাইছে না, যা চায় তা কেড়ে নিচ্ছে। সরকারও ধর্মঘটকে ভয় পায়, তারা আপস করবার জন্য মালিকদের চাপ দেয়। ধনিকদের এই দুর্বলতা ধনতন্ত্রের পতনের পূর্বাভাস এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সুস্পষ্ট সমর্থন।

কিন্তু এ ব্যাপারটা বিপ্লবের পক্ষে খুব শুভ নয়। বিপ্লবের পূর্ণ সফলতা নির্ভর করে উভয় পক্ষের তেজস্বিতার ওপর। একপক্ষ নিস্তেজ হয়ে গেলে অপর পক্ষও দুর্বল হয়, তার শক্তির ঠিক পরীক্ষা হয় না। ধনিকশ্রেণী যদি শান্তির আশায় ধনতন্ত্রের সংস্কার শুরু করে আর শ্রমিকশ্রেণী যদি আপসে রাজী হয় তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করতে হলে এ হতে দেওয়া চলবে না, বুর্জোয়াদের আপস ও আত্মসমর্পণ করতে দেওয়া হবে না। একটু নতি স্বীকার করলেই দাবির মাত্রা বাড়িয়ে ধর্মঘটের চাবুক মেরে তাদের শান্তির স্বপ্ন ভেঙে দিতে হবে।

৬ ফ্রান্সের এই গণতন্ত্রী সমাজবাদী নেতার বিরুদ্ধে সরেল প্রাণ খুলে বিষোদ্গার করেছেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে গণতন্ত্রবিরোধী পত্রিকাগুলির প্ররোচনায় একটি রেস্তর‍াঁয় তিনি নিহত হন।

"ধনতন্ত্র যখন পূর্ণবয়স্ক, যান্ত্রিক বলে পূর্ণতা লাভ করিয়া যখন ইহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, অথচ যখন অর্থব্যবস্থা উন্নতিশীল, মার্কস্-এর বিপ্লববাদ বলে ধনতন্ত্রের মর্মস্থলে আঘাত করিবার তাহাই প্রশস্ত সময়। যদি অর্থব্যবস্থা নিম্নগামী হয় তাহা হইলে কি হইবে এ প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে নাই।... ঐতিহাসিক যুগ হইতে যুগান্তরে উত্তরণকে মার্কস্ দায়াধিকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নূতন যুগ পুরাতন যুগের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। যদি অর্থ নৈতিক অবনতির মধ্যে বিপ্লব ঘটে তবে এই সম্পদ কি কমিয়া যাইবে না এবং অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ত্বরায়িত করিবার কি কোন আশা থাকিবে?" (৯১-৯২)

যে শ্রেণীসংগ্রামের ওপর মার্কস্ তাঁর গোটা বিপ্লববাদকে দাঁড় করিয়েছেন ধর্মঘট তাকে ঘনীভূত করে। যারা একটু উঁচুদরের মজুর যেমন এঞ্জিনীয়ার ফোরম্যান কেরাণী, এবং সংগ্রামে দোমনা, ধর্মঘটের বেলায় তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

"যখন হইতে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি সংঘর্ষ শ্রেণীগত যুদ্ধের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট এক সর্বাত্মক ধ্বংসের চিত্র তুলিয়া ধরে, তখন সামাজিক শান্তির সম্ভাবনা, গতানুগত্যে আত্মসমর্পণ কিংবা দরদী মালিকের উপর ভরসা সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ধর্মঘটের ধারণার পিছনে এমন একটা দুর্নিবার শক্তি রহিয়াছে যে ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই বিপ্লবের রাস্তায় টানিয়া নামায়। এই ধারণার ফলে সমাজবাদের থাকে চিরযৌবন। সামাজিক শান্তির চেষ্টা ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হয়, সাথীদের মধ্যবিত্তদলে যোগদান জনতাকে নিরাশ করে না বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে আরো উত্তেজিত করে; এক কথায় দুই দলের ভেদরেখা মুছিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না।" (১৪৫)

এদিকে ধর্মঘট ধনিকদেরকে নিজ শ্রেণীস্বার্থে সচেতন করে তোলে, তারা সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাদের তেজস্বিতা ফিরে আসে। ধনতন্ত্রের অর্থ নৈতিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্যে এবং তার সম্পদ বিপ্লবের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে ধনিকদের শ্রেণীবলকে জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রলিতারিয় সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে।

"যে সকল স্পার্টান বীররা থার্মপীলির গিরিপথ আগলাইয়া প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করিয়াছিল তাহাদের নামে যেমন গ্রীকরা মাথা নোয়াইত আমরাও তেমন সভ্যতার ত্রাণকর্তা প্রলিতারিয় বিপ্লবীকে নমস্কার করিব।" (৯৯)

সরেলের বইএর নাম "বলপ্রয়োগের ভাবনা"। বইএর পাতায় পাতায় ভিয়োলাঁস বা বলপ্রয়োগ শব্দটির উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি। এ থেকে আশঙ্কা হতে পারে তিনি বুঝি-বা হত্যা ও নাশাত্মক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছেন। বস্তুত তাঁর ভিয়োলাঁস শিল্পযুদ্ধের বলপ্রয়োগ, ধর্মঘটের জুলুম। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মতো এতে মারামারি খুনোখুনি নেই। বিপ্লবী শ্রমিক ধনিকশক্তিকে আঘাত করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকগুলিকে নয়। সমাজের দুঃখদুর্দশার জন্য জনকয়েক দুষ্ট লোককে তারা দায়ী করে না। তারা জানে যে,

"গোটা সমাজব্যবস্থা এক অনড় নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ। ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। ইহা একটি অখণ্ড সত্তা। ইহাকে নাশ করিতে হইলে চাই সর্বাত্মক বিপ্লব যাহাতে গোটা ব্যবস্থায় ঘা পড়ে।" (১১)

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লবীরা চার্চ ও রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্ষমতাশীল লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। দৈবাৎ তাদের হাতে যদি ক্ষমতা আসে তাহলে তারা প্রজাপীড়নে চার্চ, বুরবোঁ রাজা এবং বিপ্লবনায়ক রোব্‌স্‌পীয়েরের চেয়ে কম যাবে না।

একদিন ছিল যখন ফরাসীদের বুকে ছিল রক্তারক্তির নেশা। তারা রাস্তায় নেমে বাস্তিল দুর্গে আগুন লাগিয়েছে, নেপোলিয়নের পিছনে পিছনে সারা ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছে। জেকবিনদের বিভীষিকা, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবিস্তার তাদের ওপর মায়াজাল বিস্তার করেছে। সেদিন আর নেই। হিংসার পুরোহিতরা আজ আর বীরের সম্মান পায় না। এ যুগের বীরপুরুষ প্রলিতারিয় যোদ্ধা, ধর্মঘটের পরিচালক। ক্ষমতালোভী বিবেকহীন রাজনীতি-ব্যবসায়ীগুলোকে সরিয়ে প্রলিতারিয় বীর এক বলিষ্ঠ নীতিমান রচনা করবে, সমাজকে সে দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে দেবে না।

দ্রেফুর ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নৈতিক সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন এর নীতি ফটকা বাজারের নীতি।

"পুঁজিওলা বাজারে ঢাক পিটাইয়া বড় বড় কোম্পানী খুলিয়া বসে, বছর কয়েকের মধ্যে কোম্পানী ফতুর হইয়া উঠিয়া যায়। আর রাজনৈতিক পাণ্ডা দেশবাসীকে অজস্র কল্যাণকার্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ জানে না কেমন করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিবে, প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের গাদা গাদা নথিপত্রে পর্যবসিত হয়। দুজনার মধ্যে খুব বেশী তফাত নাই।" (২৫৯-৬০)

দুই মাণিকজোড় পরস্পরকে বেশ ভাল করে চেনে। শেয়ার-হোল্ডারদের সভা ও পার্লামেণ্টের সভা ভর্তি করে বসে থাকে এদের হাততোলার দল। গণতন্ত্র তাই জুয়াচোর ফাটকাবাজদের ভূস্বর্গ।

এই লোকগুলোর কোন ন্যায়নীতির বালাই নেই বলে কি মানুষ উচ্ছন্নে যাবে? প্রলিতারিয় বীর এদের সঙ্গে এদের দুর্নীতি জুয়াচুরি ঝেঁটিয়ে দূর করবে, মানবসমাজে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে।

সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক বীরকে ঘিরে সরেল যে মায়াময় পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তাতে বাস্তববাদী বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিস্টরা সায় দেয়নি বটে, তবে সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকদের ব্রহ্মাস্ত্র বলে সবাই গ্রহণ করেছে। ১৯০৬ সালে সিজিটির শ্রমিকরা দৈনিক অনধিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থার সূচনা করেছিল।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র কাজ পণ্ড করা বা সাবতাজ। ধনিকের বিধানে শ্রম পণ্যবিশেষ। বাজারের নীতি,—যেমন দাম দেবে তেমন জিনিস পাবে। তেমনি নীতি,—যেমন মজুরি দেবে তেমন কাজ পাবে। মজুর পাওনা না পেলে কাজে অবশ্যই ফাঁকি দেবে—এ বাজারের নিয়ম, শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও নিয়ম। দরকার হলে সে যন্ত্রপাতি এবং মালপত্রও নষ্ট করে দেবে। পুজে উদাহরণ দিয়েছেন—একমুঠো বালি একটা মেশিনকে বন্ধ করতে পারে, দরজী পোশাকের ছাঁটকাট খারাপ করে মালিককে নাস্তানাবুদ করতে পারে কিংবা ক্ষেতমজুর খারাপ বীজ বুনে জমিদারের ফসল মাটি করতে পারে।[৭] সাধারণ ধর্মঘটের চেয়ে এতে ঝকৃকি কম অথচ ফল বেশী। ১৯০৬ সালের মে মাসে পারির সেলুনগুলোকে কষ্টিকের ছোপ দিয়ে বিকৃত

৭ ল্য সাবতাজ, ৩৪ পৃষ্ঠা। যে সরেল এত করে জবরদস্তির প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি কিন্তু এ সব কাজ সমর্থন করেননি, কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

করে নাপিতরা আটঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করেছিল। মালিক পুলিশ ও দালাল লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু যন্ত্রকে বিকল করে ধর্মঘটে ভেড়াতে পারলে আর সে ভয় নেই।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের আর এক হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে দলে টানা। এরা ধনিকতন্ত্র ও ধনিক রাষ্ট্রের খুঁটি। শ্রেণীসংগ্রাম সঙ্গিন হয়ে উঠলে সরকার ফৌজ লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করে। অথচ সেনা ও শ্রমিক একই শ্রেণীর লোক, একই সামাজিক স্তর থেকে এসেছে তারা। শ্রমিকদের শায়েস্তা করে তাদের কোন লাভ নেই। দেশরক্ষার জন্যে তাদের জীবন বলি দিতে বলা হয় অথচ দেশের একটুকরো চাষের জমিও তাদের নেই। এই মন্ত্রগুলো তাদের কানে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে তারা যেন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে।[৮] তাবলে সিণ্ডিক্যালিস্টরা সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে চায় না বা শান্তির স্বপ্ন দেখে না। সৈন্যদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া শ্রেণী-যুদ্ধের এক কৌশল।

সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রেণীসংগ্রামের আরো নানারকম কায়দা আছে। যেমন মালের ওপর লেবেল লাগানো। যে কারখানায় ইউনিয়নের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানকার মালের ওপর ইউনিয়ন একটা লেবেল মেরে দেবে। অধিকাংশ ক্রেতা শ্রমিক এবং শ্রমিকরা লেবেল ছাড়া জিনিস কিনবে না। লেবেল তাই দাবি আদায়ের একটা অস্ত্র। এছাড়া সভা, জলুস, হরতাল, বয়কট এসব ত' আছেই।

এনার্কিজম্-এর সঙ্গে একটি কর্মপন্থা ও সংগঠন জুড়ে দিয়ে সিণ্ডিক্যালিজম্ তৈরী। শতাব্দীর অন্তে ঘোর দুর্দিনে পড়ে এনার্কিস্টদের অনেকে সন্ধান করেছিল একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতির এবং এমন একটি শ্রেণীর যাদের স্বার্থ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত, যারা এ নিয়ে লড়াই করবে। এই শ্রেণী হল প্রলিতারিয় শ্রমিক, কর্মপন্থা হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। শ্রমিকরা ইতোমধ্যে ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, ইউনিয়নকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এমতাবস্থায় নৈরাজ্যবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেয়ে উৎপাদনে ধর্মঘট করে অচলতা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব দেখে পেলুতিয়ে, পুজে, দেলেসাল প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিস্ট শিবিরে যোগ

৮ জি. য়েভেতো : ল্য মানুয়েল দ্যু সল্দা : মরিস চার্নাই : কাতেকিজম্ দ্যু সল্দা।

দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রয়ে গেল বাইরে। তারা সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে সহানুভূতি জানাল কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের বদলে সাধারণ ধর্মঘটকে নিতে রাজী হল না। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে আমস্টার্ডামে এক আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসে সমবেত হয়ে তারা ঘোষণা করল,

> "সকল দেশের সাথীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা যেন শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিদ্রোহের ভাবনা, ব্যক্তিগত উদ্যম ও সংহতির শক্তি বাড়াইয়া তোলে যাহা নৈরাজ্যবাদের সার কথা।......কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করে যে ধনতান্ত্রিক ও প্রভুত্বশীল সমাজকে শুধু সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব। সরকারের সামরিক শক্তির সঙ্গে লড়িবার যাহা প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য পদ্ধতি সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে ও সাধারণ ধর্মঘটে উৎসাহ দিতে গিয়া তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।"

প্রথম প্রথম ক্রপটকিনও এই মত পোষণ করতেন। তারপর যখন তিনি দেখলেন সশস্ত্র সংগ্রামের আশা সুদূরপরাহত এবং এর পরিণতি হয়েছে লক্ষ্যহীন গুপ্তহত্যায় তখন তিনি সিণ্ডিক্যালিস্টদের পুরোপুরি সমর্থন না করলেও আশীর্বাদ জানালেন। গোঁড়া নৈরাজ্যবাদীরা যাই বলুক না কেন আসলে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ শিল্পযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এনার্কিজ্‌ম্-এর নয়া সংস্করণ। অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা এনার্কিজ্‌ম্ বলতে বোঝেন গডউইন, স্টার্নার ও প্রুঁদর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞানির্ভর দর্শন, বাকুনিন ও ক্রপটকিনের যূথকেন্দ্রিক সংগ্রামনির্ভর নৈরাজ্যবাদের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না।[৯] সরেল প্রমুখ অনেকে এনার্কিস্টদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১০] এনার্কিস্টদের গরম গরম কথায় রাষ্ট্রের ইমারত থেকে একটি ইটও খসেনি। তবে তাদের বেপরোয়া হিংসার বাণী সিণ্ডিক্যালিস্টদের কাজে

৯ যেমন—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্, ১২৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

১০ সরেল নিজে ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর। তাঁর নজরে পড়েনি যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব—যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—প্রথমে তাদের ভেতর থেকেই বেরোয়। রাশিয়ায় ডিসেম্ব্রিষ্ট, পপুলিষ্ট, বাকুনিন, ক্রপটকিন সব ছিলেন অভিজাত বংশের লোক।

লেগেছে, "তারা মজুরদের শিখিয়েছে যে হিংসাত্মক কাজে লজ্জার কিছু নেই" (৪১)। আশ্চর্যের কথা যে প্রুদঁর শিষ্য হয়েও সরেলের মনে পড়ল না যে তাঁর নিরাজ সমাজের আদর্শ এবং স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের নীতি নৈরাজ্যবাদের জনকের কাছ থেকে পাওয়া। মার্ক্‌স্‌-এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে এনার্কিজ্‌ম্‌কে লালন করেছিল যে ল্যাটিন দেশগুলি, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর বিকাশ ঘটেছিল যে সেই দেশগুলিতেই এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

ইউনিয়ন কেবল লড়াইএর হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন মজুরদের শিক্ষাশালা। এর মারফত তাদের সাহস ও দায়িত্ববোধ বাড়বে, লড়াইর কায়দাকানুন রপ্ত হবে, আর চোখের সামনে ফুটে উঠবে ইউনিয়ন-আশ্রয়ী সহযোগী সমাজের চিত্র। ভবিষ্যতে সমাজ কি চেহারা নেবে সে সম্বন্ধে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করে নি। কেবল মাত্র পাতাউ ও পুজে একখানি পুস্তকে পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে শ্রমিক সমাজের উদ্‌ভব পর্যন্ত ঘটনা-পরম্পরার কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে একটা মনোরম রামরাজ্যের ছবি এঁকেছেন।[১১] একদিন ধর্মঘটি মজুরের ওপর পুলিশ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত কলে কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল, মেশিন বিকল হল। জনতার কোপে পড়ে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে সেনাবাহিনী বন্দুক নামিয়ে বসে রইল। বিষদাঁত ভেঙে সরকার যখন কাবু হয়ে পড়েছে তখন ইউনিয়নগুলি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের কাজ হাতে নিল—তারা জনসাধারণের খোরপোষ ও বাসের দায় গ্রহণ করল। যাবতীয় জাতীয় কল্যাণকার্য ও সেবাকার্য তারা পরিচালনা করতে লাগল, শ্রমিকদের জাতীয় সিণ্ডিকেট রেলগাড়ি চালাবার, খনিমজুর সিণ্ডিকেটের ফেডারেশন কয়লা তুলবার দায়িত্ব নিল। উৎপাদন ও জনহিতের যাবতীয় কাজের মধ্যে যোগা-যোগ রাখবার ভার নিল ইউনিয়নের ফেডারেশনগুলির এক সার্বভৌম সাধারণ কনফেডারেশন।

চাষীরা জমিদারের জমি দখল করে মালিক হয়ে বসল, ক্রমশ তারাও সহযোগিতা ও যুক্তকরণের নীতি মেনে নিয়ে সিণ্ডিক্যাল ব্যবস্থার সামিল হল।

১১ কমাঁ নু ফের্‌রঁ লা রেভেল্যুশিয়ঁ (কেমন করে আমরা বিপ্লব সমাধা করব ?)

শিক্ষকদের ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করল, শিক্ষাকে শ্রমমুখীন করল। ধনতন্ত্রের আওতায় যে সকল প্রতিভা চাপা পড়ে ছিল এখন তা মুক্ত হয়ে নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত হল। উৎপন্ন বিত্ত ইউনিয়নগুলির মারফত সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল, কারও হাতে কোনো মুনাফা রইল না। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং বাড়তি উৎপাদনের অনর্থ সমাজকে ভুগতে হল না। ধর্ম উঠে গেল, তার জায়গা নিল চারুকলা। এতদিন পুরোহিত, রাজামহারাজা ও বেনিয়ারা চারুকলাকে বন্দিনী করে রেখেছে—এবার চারুকলা হল সমাজলক্ষ্মী।

বিপ্লবের শেষে জন্মলাভ করল মার্কসীয় রামরাজ্যের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীনসমাজ।

> "ধনতান্ত্রিক যুগের নরপশুর জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে নূতন পরিবেশ, নবীন আবহাওয়ার সৃষ্টি মৈত্রীপরায়ণ নবজাতক। মানুষ সৎ হইয়াছে কারণ অসৎ হইয়া তাহার লাভ নাই।
>
> মানুষে মানুষে হানাহানি মারামারির পরিবর্তে আসিয়াছে চুক্তি, সৌহার্দ্য, পরস্পর সহায়তা। যুদ্ধ চলিতেছে কেবল প্রকৃতির রাজ্যে। এখানে মানুষ একযোগে প্রতিকূল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া সমাজের কাজে খাটাইতেছে। সকল সন্দেহের নিরসন হইয়াছে, পৃথিবী জুড়িয়া বিপ্লবের দামামা বাজিতেছে, ঘরে ঘরে আসিয়াছে শান্তি মুক্তি ও কল্যাণ। ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোন বিপদের ভয় নাই। তাই এখন জীবন মধুময় হইয়াছে, বাঁচিয়া সুখ আছে।"[১২]

বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে, বিশেষ করে স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্পেনে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্তক প্রুঁদর শিষ্য পি ই মারগাল। তিনি ছিলেন সমাজবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁর তৈরী জমিতে বাকুনিন বীজ ফেললেন। স্পেনীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা ইস্তাহার এবং ফানেলির সংগঠন শ্রমিক আন্তর্জাতিকের স্পেনীয় শাখাকে মার্কস্‌বিরোধী নৈরাজ্যবাদী শিবিরে টেনে নিয়ে এল। ১৯১০ সালে ল্যাটিন স্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহ্য বহন

১২ অনুবাদ, শার্লট ও ফ্রেডারিক চার্লস, অক্সফোর্ড ১৯১৩, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

করে স্থাপিত হল কনফেদারেসিয়ন নাসিয়নাল দেল ত্রোবাজো নামে সিণ্ডি-ক্যালিস্ট শ্রমিক ফেডারেশন, সংক্ষেপে সিএনটি।

১৯৩৬ সালের উনিশে জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফাসিস্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হল। এই কালশনিকে রুখবার কাজে অগ্রণী হয়ে এল সিএনটি এবং তার সমধর্মী আইবেরিয়ার এনার্কিস্ট্ ফেডারেশন ফাই (এফ. এ. আই)। লড়াইর সাথে সাথে তারা জোতজমি চাষী-সমবায়ের হাতে আনল, কল-কারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে আনল। ক্যাটালনিয়া ও বার্সিলনা থেকে আন্দোলন উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে বিস্তারিত হল এবং সমাজতন্ত্রী দলের ইউনিয়নগুলিকে ফাসিবিরোধী সংগঠনে ভাঙিয়ে নিয়ে এল, চাষী ও মজুরদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদেরও অনেকে এসে জুটল। সকলের সমবেত চেষ্টায় ক্যাটা-লনিয়ার অর্থনৈতিক চেহারা ফিরে গেল। জমির তিনচতুর্থাংশ এল চাষী সমবায়ের যৌথকর্তৃত্বে। বাকি জমি স্বল্পবিত্ত চাষীপরিবারগুলির মধ্যে লোক-সংখ্যার অনুপাতে বেঁটে দেওয়া হল। সামুদায়িক কৃষির হিড়িক এরাগনেও পৌঁছল। এখানে পতিত জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ আবাদ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে।

যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এরা অসাধ্যসাধন করল। সিএনটি ভার নিয়ে রেলগাড়ি, বাসলরি ও জাহাজ চালাল, বিজলি কাপড় ও যন্ত্রের কারখানা চালাল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম উৎপাদনের সংস্কার হল। যুদ্ধের রসদ পয়দা করবার জন্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শত শত কারখানা বসল। এদিকে সিএনটির পরিচালনায় এক লক্ষ বিশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক ফাসিস্তদের সঙ্গে লড়ছে, আর ওদিকে যুদ্ধধ্বস্ত অঞ্চলের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিচ্ছে ক্যাটালনিয়া। ইংল্যাণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির সম্পাদক ফেনার ব্রকওয়ে এই সময়ে (১৯৩৭) স্পেন ঘুরে এসে লিখেছিলেন "সামনে তারা ফাসিবাদের সঙ্গে লড়েছে, পিছনে তারা গড়েছে নবীন শ্রমিকসমাজ। তারা দেখেছে যে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর সমাজবিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দুটি কাজ অবিচ্ছেদ্য।"[১৩] স্পেনের দারুণ সঙ্কটের কালে সিণ্ডিকেটগুলি দেখিয়েছে যে তারা সমান মাত্রায় সামরিক শক্তি ও গঠনপ্রতিভার অধিকারী।

এ সত্ত্বেও তারা ফাসিস্ত বাহিনীকে রুখতে পারেনি। ফাসিস্তদের হাতে

---

১৩ রুডলফ্ রকার : এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজ্ম্, লণ্ডন, ১৯৩৮, ১০১ পৃষ্ঠা।

ছিল প্রচুর কাঁচা মাল, তারা পেয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির সামরিক সাহায্য, আর তাদের সঙ্গে ছিল গৃহশত্রু পঞ্চম বাহিনী। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা বিদেশের শ্রমিক দলগুলি থেকে বিশেষ কিছু সাড়া পায় নি, নিজ নিজ দেশের সরকারকে স্পেনে সৈন্যসাহায্য পাঠাবার জন্যে তারা বিশেষ কোন চাপ দেয়নি।

ফ্রান্সের সিজিটি ও স্পেনের সিএনটির মত আর একটি লড়াকু শ্রমিকসঙ্ঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আই ডব্লিউ ডব্লিউ। ইয়োরোপের চেয়ে এখানে ধনতন্ত্র ফেঁপে উঠেছিল অনেক বেশী এবং ধনিকসঙ্ঘগুলির ছিল অপর্যাপ্ত ক্ষমতা। এখানে বিদেশ থেকে আনকোরা মজুর আসত দলে দলে যে আপদ ইয়োরোপে ছিল না। মার্কিন শ্রমিকদের হাত ছিল কাজে পাকা, তাদের মজুরিও ছিল মোটা। বলতে গেলে এখানে দুটি আলাদা শ্রমিকশ্রেণী গজিয়ে উঠল যাদের জীবনের মানমাত্রা এক নয়। সুদক্ষ কারিগররা সংগঠিত হল আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারে, আনকোরা বহিরাগতের দল এসে ভিড়ল ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্লর্ড-এর ঝাণ্ডার নীচে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে শিকাগোয় শ্রমিকনেতাদের এক বৈঠকে এই সঙ্ঘটির পত্তন হয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর ভেতর এক মতভেদ দেখা দিল। সমাজবাদী নেতা ড্য লিওঁ চাইলেন একদিকে আই ডব্লিউ ডব্লিউ যেমন অর্থ-নীতির ওপর শ্রমিক প্রভাব বাড়াতে থাকবে অন্যদিকে তেমনি সমাজবাদী দল নির্বাচনে নেমে সরকার দখল করবে, করে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করবে। বিল হেউড ও ভিনসেন্ট সেণ্টজন প্রমুখ সিণ্ডিক্যালিস্ট নেতারা এ মতে সায় দিলেন না। দলবাজি ও ভোটাভোটির মধ্যে না গিয়ে তারা চাইলেন সরাসরি রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে। এই বিবাদে সংগঠন দু' দুবার ভেঙে গেল (১৯০৬, ১৯০৮)। বিদেশী আনকোরা মজুরদের ভোট ছিল না—তাই রাজনৈতিক দলের ওপর তারা ভরসা করত না। এদের সমর্থন পেয়ে সিণ্ডিক্যালিষ্টরা জিতে গেল। এ পর্যন্ত আই ডব্লিউ ডব্লিউর সংবিধানের গৌরচন্দ্রিকায় সমাজবাদী রাজ-নৈতিক কর্মপন্থার স্বীকৃতি ছিল। এবার সেটুকু তুলে দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হল। ড্য লিওঁ সংগঠন ছেড়ে এসে সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টি নামে একটি দল তৈয়ারী করলেন।[১৪]

---

১৪ ১৯১২ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টি সিণ্ডিক্যালিস্টদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে দুই মতের ভেদরেখা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংশোধিত গৌরচন্দ্রিকায় ঘোষিত হল যে অর্থনৈতিক অস্ত্রই সর্বেব। ইউনিয়নের আওতায় গোটা শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত হবে, ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে চলবে আপসহীন সংগ্রাম যতদিন না তারা পরাস্ত হয়ে হৃতসর্বস্ব হয়।

> "মজুরশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কোথাও মিল নাই······এই দুই শ্রেণীর পরস্পর সংঘর্ষ চলিবে যতদিন না দুনিয়ার মজদুর শ্রেণীগত ঐক্য লাভ করিয়া সারা পৃথিবী ও উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ করায়ত্ত করে এবং অন্নদাসত্বের অবসান ঘটায়।"

সমাজবাদীরা বেরিয়ে যাবার পরে আই ডব্লিউ ডব্লিউকে আরো ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। এর প্রধান অঙ্গ ছিল পাশ্চাত্ত্য খনিমজুর ফেডারেশন। ১৯০৭ সালে এই সঙ্ঘ রক্ষণশীলদের হাতে আসার পর পিতৃসংস্থা থেকে বিদায় নিল। এ সত্ত্বেও আই ডব্লিউ ডব্লিউর তাগদ রয়ে গেল যথেষ্ট। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে গতিমুখে অজস্র নিম্নস্তরের মজুরকে টেনে আনল এরা। মধ্য-পশ্চিমের চরমান শ্রমিকদের ঠাঁই ছিল শিকাগোর দপ্তরে—সংস্থার পত্রিকা অফিসও ছিল এখানে। এদের লড়াই সবচেয়ে ঘোরাল হয়ে উঠেছিল ১৯১২ সালে যখন ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর লরেন্স সুতাকলের ত্রিশ হাজার মজদুর ধর্মঘট সফল করে দাবি পুরিয়ে নেয়। ভাষণের স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের জন্যেও আই ডব্লিউ ডব্লিউ লড়েছে কম নয় এবং এ সব দঙ্গলে কখন কখন মারামারি রক্তারক্তিও ঘটেছে খুব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এদের অনেকে সরকারী ডাক অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। যুদ্ধের পর এদের ওপর সাঁড়াশির কামড় পড়ল দুদিক থেকে। একদিকে রাজ্যসরকারের দমননীতি, অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চাপ। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শিকাগোর আদালতে বিচারে এদের মাথা মাথা লোকেদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। আইন করে বিদেশ থেকে বেকার মজুর আসা রদ হল,—আই ডব্লিউ ডব্লিউর সভ্যতালিকায় ভাঁটা পড়ল। বাকি বকেয়ার মধ্যে অনেকে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর গরম হাওয়া তুষারপাতে জুড়িয়ে গেল।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর জোয়ারে ভাঁটা পড়ল রুশবিপ্লবের পর থেকে। ১৯১৯ সালে বলশেভিক দল সারা দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থাগুলিকে পরবৎসর মস্কোতে সমবেত হয়ে একটি নূতন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করবার

জন্যে আমন্ত্রণ পাঠাল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিক্ষিপ্ত সিণ্ডিক্যালিস্ট শক্তিগুলিকে একত্র করে দলে টানবার ফিকিরে ছিলেন লেনিন। সময়টা ছিল প্রশস্ত কারণ রুশ বিপ্লবের আকস্মিক ও চমকপ্রদ কীর্তিতে তারা তখন মুগ্ধ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে মস্কোর কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়ে তারা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জাতিক গঠনে সম্মতি দিল।

তাদের মোহ ভাঙতে বেশী দিন লাগল না। কিছুদিনের মধ্যে তারা প্রলিতারিয় একনায়কত্বের স্বরূপ দেখতে পেল। অবলশেভিক সমাজবাদীদের সঙ্গে রুশ নৈরাজ্যবাদীদের জায়গা হল জেলখানায়। বলশেভিক রুশের কূটনীতির সমর্থনে গোটা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাগানো হল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কূটকৌশল। সিণ্ডিক্যালিস্টরা বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ গড়তে চাইল, কমিউনিস্টরা রাজী হল এই সর্তে যে সে সঙ্ঘ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবে থাকবে। ১৯২১ সালে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবেদার একটি শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন হল—সেখানে সিণ্ডিক্যালিস্টরা হেরে গেল। ১৯২২-২৩ সালের বড়দিনে তারা বার্লিনে এক পাল্টা অধিবেশন করল। আর্জেন্টিনা, চিলি, মেকসিকো, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা মিলে ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন নামে এক আন্তর্জাতিক সিণ্ডিক্যালিস্ট সংস্থা তৈরি করল। নূতন আন্তর্জাতিকের বিঘোষিত নীতিমালার দ্বিতীয় দফায় বলা হল—

> "বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ সর্ববিধ আর্থিক ও সামাজিক একাধিকারের অবিচল প্রতিদ্বন্দ্বী। দল ও সরকারের তাঁবেদারি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত স্বাধীন শ্রমিকপরিষদের ভিত্তির উপর মাঠের ও কারখানার মজুরদিগকে লইয়া স্বাতন্ত্র্যশীল সমাজ সৃষ্টি করা ও সমাজকৃত্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা ইহার লক্ষ্য। রাষ্ট্র ও দলের রাজনীতির পরিবর্তে ইহা নির্ভর করে শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর। ইহা মানুষকে শাসন করিতে চায় না, চায় বিত্তের ব্যবস্থাপনা। সুতরাং ক্ষমতা অধিকার করা ইহার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সমাজজীবন হইতে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার দূর করা। ইহা বিশ্বাস করে যে বিত্তের একাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার একাধিকারেরও বিলোপ করিতে হইবে; এবং রাষ্ট্রকে যে কোন আকারে হাজির করিলে,

তাহা প্রলিতারিয় একনায়কত্ব হইলেও সর্বদা নূতন একাধিকার ও নব নব স্বার্থের জন্ম দিবে, কখনো জনমুক্তির সহায় হইবে না।"

এই থেকে কম্যুনিজম্ ও সিণ্ডিক্যালিজম্-এ ছাড়াছড়ি হল—আই ডব্লিউ এম এ চলল নিজের রাস্তায়। ১৯৩৩ সালে এর কেন্দ্রীয় দপ্তর বার্লিন থেকে হল্যাণ্ডে সরিয়ে আনা হল, তারপর মাদ্রিদে। তখন এর চলবার শক্তি নেই, এর কোষগুলির জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আই ডব্লিউ ডব্লিউ-ম্রিয়মান। ফ্রান্সে ১৯০৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর থেকেই সিজিটিতে ভাঙন ধরেছিল—একদল বিপ্লব ছেড়ে শান্তিময় সংস্কারের পথ ধরেছিল, আর একদল তরি ভিড়িয়েছিল কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে, কেবল এক টুকরো সিণ্ডিক্যালিস্ট গোষ্ঠী বার্লিনের আই ডব্লিউ এম এ-তে এসে যোগ দিয়েছিল। মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুত্থানের পর ইটালী ও জার্মানীর ছোট ছোট শাখাগুলি নিশ্চিহ্ন হল। পর্তুগাল ও স্পেনে একনায়কত্বের পাল্লায় পড়ে সিণ্ডিকেটগুলির একই হাল হল। স্পেনে প্রাইমো ডি রিভেরার তিরোধানের পর তারা আবার মাথা তুলেছিল বটে কিন্তু ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে বাঁচোয়া ছিল না। পূর্ব ইয়োরোপের সিণ্ডিক্যালিস্টরা একদিকে জার্মান নাৎসি অন্যদিকে রুশ কম্যুনিস্টদের জাঁতাকলে পড়ে ছারখার হয়ে গেল। কেবল সুইডেনের সঙ্ঘটি এই জাঁতাকল থেকে রেহাই পেয়ে কোন রকমে টিকে রইল। আরজেনটিনার সঙ্ঘ ফেদারেসিয়ন ওবেরা রিজিয়ন্যাল আরজেনতিনা জেনারেল উরিবুরা ও পেরঁর একতন্ত্র থেকে আত্মগোপন করে রক্ষা পেল। ১৯২৯ সালের মে মাসে গোটা সারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি সিণ্ডিক্যালিস্ট কংগ্রেসও আহ্বান করেছিল। এই কংগ্রেসে তারা গঠন করেছিল সারা আমেরিকার ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন। এটি ছিল আই ডব্লিউ এম-এর আমেরিকান শাখা এবং এর কেন্দ্র ছিল বুয়েনস আইরেস, পরে উরুগুয়ে।

সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের ধার ক্ষয়ে যাবার কারণ শত্রুপক্ষের উৎপীড়ন ততটা নয়, যত তার নিজস্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা। মধ্যবিত্তদের আশ মিটিয়ে গালাগালি দিলেও এদের অনেকেই ঐ শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন, যেমন পেলুতিয়ে, সরেল, লাগার্দেল। মধ্যবিত্ত সমাজবাদীদের সামাজিক কল্পনার মত তাদেরও সাধারণ ধর্মঘটের ভাষ্য ছিল সমান ধোঁয়াটে ও অবাস্তব। পাতাউ ও পুজের বিপ্লবের খসড়া এই কল্পনাবিলাসের একটি সুন্দর নমুনা। ক্রপটকিন 'রুটির জয়'তে যে সহযোগী মুক্ত সমাজের একটু আভাস দিয়ে ছেড়ে

দিয়েছেন এরা তার ওপর কল্পনার রঙ্ চড়িয়েছেন। মানবচরিত্র ও বাস্তব পরিবেশকে এরা পছন্দ মত সাজিয়ে নিয়েছেন যাতে বিপ্লবের স্রোত অবাধ গতিতে বইতে পারে। সবই যেন বিদ্রোহীদের জয়যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। ক্রপটকিনের মত যে আশাবাদী তিনিও ভূমিকায় লিখছেন—

> "সমাজবিপ্লবের গতিপথে যে প্রতিরোধ আসিতে পারে ইহারা তাহাকে বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের উদ্যোগ যে বাধা পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছে এইরূপ কল্পনা-বিলাস হইতে কত প্রকার বিপদ আসিতে পারে।"[১৫]

দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক নেতাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত প্রিন্সের বাস্তববোধ একটু বেশিই ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং সাধারণ ধর্মঘটের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রুধঁ বাকুনিন ও ক্রপটকিন তিনজনেই টের পেয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিকসংস্থা ও ধর্মঘটের সাফল্য মুক্তকণ্ঠে কামনা করেছেন, মুক্ত সমাজের বাহক বলে শ্রমিককে আশীর্বাদ কবেছেন। ধর্মঘটের বলে শ্রমিকরা শ্রেণীগত সুবিধা শুধু আদায় করে নি, কখনো কখনো বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনও সাধন করেছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট জারকে আধাগণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। ১৯২০ সালে জার্মানীতে এক জঙ্গীদল আচমকা সরকার দখল করে নেওয়ার পর জার্মান শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করে তাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিল। পার্লামেন্টি সমাজ-বাদীরা বৈধ উপায়ে যে সকল সংস্কার অর্জন করেছে শ্রমিক ধর্মঘটের চাপ পেছনে না থাকলে তা সম্ভব হত না।

কিন্তু শ্রমিকধর্মঘট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকাম হয়েছে তখনই যখন এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের সঙ্গে এ জড়িত থেকেছে এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। অন্যথায় শ্রেণীগত সংগ্রামেও ধর্মঘট বড় একটা সফল হয় না। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে যখন সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর স্বর্ণযুগ তখন সেখানে যে কটি ধর্মঘট হয় তার মধ্যে সফল হয়েছিল শতকরা ২৩টি, বিফল হয়েছিল শতকরা ৪১টি, মিটমাট হয়েছিল শতকরা ৩৬টির।[১৬]

---

১৫ ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা, ১৯০৫ সালের বিপ্লবপ্রচেষ্টার উল্লেখ।

১৬ সরকারী সংখ্যা—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

১৯০৬ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সিন্ডিটির অতবড় যে জীবনমরণ ধর্মঘট তাও বরবাদ হয়ে গেল, অনেক শ্রমিককে বিনাসর্তে কাজে ফিরে যেতে হল, বহু ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সকল যুদ্ধেই অবশ্যি হারজিত আছে। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র যখন তখন ছাড়তে নেই, তাতে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সফলতার দিকে না তাকিয়ে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা বাড়াবার জন্যে পারলেই ধর্মঘট করতে হবে এমন বেয়াড়া যুক্তি আর হয় না। ধর্মঘটে হেরে যাওয়ার পর শ্রমিকের মনে কি পরিমাণ অবসাদ আসে, সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে পিছিয়ে যায় কত বেশি তা আজ কারও অজানা নয়। যে ইংল্যাণ্ডকে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনে ফ্রান্সের অগ্রজ বলা যেতে পারে সেখানেও ১৯১২ সালে খনিমজুরদের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রের যুদ্ধ সংগঠন ও সম্বলের লড়াই। সম্বলে সর্বদা এবং সংগঠনে অধিক সময়ে ধনিকরা শ্রমিকদের চেয়ে বলবান।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র সাবতাজ। এটি শাঁখের করাত, দুদিকেই কাটে, যেমন ধনিককে তেমন শ্রমিককে। সরেল কাজে ঢিলে দেওয়া এবং মালপত্র খারাপ করার নিন্দা করেছেন কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি ব্যাহত হয়, আর বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করছে এই শক্তির ওপরই। বস্তুত সাবতাজের ভাঙননীতি শিশুমনোবৃত্তির পরিচয়। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের যখন ইউনিয়ন গড়বার অধিকার ছিল না তখন লুডাইট নামে পরিচিত তাদের একদল মেশিন ভেঙে তার ওপর রাগ ঝাড়ত। শৈশবের এই পাগলামি পরিণত বয়সের শ্রমিক আন্দোলনে সাজে না। এসব বুঝলেও দার্শনিক সরেল আন্দোলনের নেতাদের সামলাতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার যে অনর্গল উত্তাপ তিনি বর্ষণ করেছিলেন তাতে সংগ্রামীরা এমনি তেতে উঠেছিল যে আখেরের কথা ভাববার অবসর তাদের ছিল না। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ঘায়েল করা হল একমাত্র লক্ষ্য—এবং যন্ত্রভাঙা, মালে ভেজাল, কাজে ঢিলেমি এর চেয়ে মোক্ষম উপায় আর কি আছে? এর ফলে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হল খরিদ্দারের, সাধারণ লোক শ্রমিক আন্দোলনের ওপর বিগড়ে গেল।

কোনও ব্যবস্থা বিপ্লবের আঘাতে ধ্বসে পড়ে তখনই যখন নিজের গলদে তার গোড়া ক্ষয়ে যায়, যখন তার আয়ু ফুরিয়ে আসে, উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মার্কস্‌ও এ কথাই বলেছেন। সরেল শোনালেন এক অদ্ভুত কথা

যে ধনতন্ত্র যখন চরম সৃষ্টিক্ষম তখনই তাকে নাশ করতে হবে। কাজেই চাই এমন এক দৃঢ়মতি ধনিকশ্রেণী যারা সূচ্যগ্র ভূমি ত্যাগ করবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনিকরা এরকম গোয়ার্তুমি না করে আপসের রাস্তা ধরল, শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবি মিটিয়ে বিপ্লব থেকে তাদের সংস্কারের পথে টেনে নিয়ে এল।

এখানে কার্ল মার্কস্‌ও ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধনিকদের নির্বোধ স্বার্থপরতাই শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দেবে, বিপ্লব আনবে। ধনিকরা স্বার্থপর বটে তবে নির্বোধ নয়। তারা বোঝে শ্রমিকরা চায় ভাতকাপড়, বিপ্লব নয়। তারা স্বভাবত শান্তিপ্রিয়, সংস্কারবাদী। মুনাফার ছিঁটেফোটা দিয়ে তাদের তুষ্ট রাখা কিছু কঠিন নয়। তার ওপর সার্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে, কল্যাণকর আইন করে তারা বিপ্লবের ধার ভোঁতা করে দিল, শ্রমিক বেছে নিল নির্বাচন ও আইনরচনার পথ।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর গঠনমূলক পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যান্ত্রিক শিক্ষার অভাব। ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কারিগরদের সমবায় সমিতি গড়ে উৎপাদন চালাবার চেষ্টা করেছে। এগুলো টেকে নি। হয় তারা ব্যবসা গুটিয়েছে নয়ত মালিক-মজুর সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সে চশমাওলাদের একটা সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল তাদের মধ্যে ৬৫ জন সভ্য মালিক আর ১৩০০ জন মজুর।[১৭] সমবায় সমিতির না আছে পুঁজি ও যন্ত্র না আছে যান্ত্রিক শিক্ষা। প্রথম দুটি না হয় বিপ্লব করে হস্তগত হল, তৃতীয়টি বিপ্লবে আসবে না। সরেল তাঁর লাভেনির সোসিয়ালিসৎ দে স্যাঁদিকা (ইউনিয়নগুলির সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ, ১৮৮৭) পুস্তিকায় বার বার এই শিক্ষালাভের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু ইস্পাত, রসায়ন ইত্যাদি বড় বড় শিল্পের যান্ত্রিক বিদ্যা বুর্সেগুলি পাবে কোথা থেকে যে শ্রমিকদের শেখাবে? অবশ্য এ কাজ যে অসাধ্য নয় স্পেনের সিণ্ডিকেটগুলি তা দেখিয়েছে।

সরেলের সকল মিথের সেরা সর্বহারার নৈতিক ভূমিকা। অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত, বিনাশনে, বিষোদ্‌গারে অভ্যস্ত, চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বিবেকমুক্ত "সমাজযুদ্ধের এই বীর সৈনিকেরা" জয়লাভের পর এক অনুপম মহানুভবতা নিয়ে সংগঠন ও উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একদিকে তারা

১৭ ওয়েই : ইস্তোয়ার দ্যু মুভমাঁ সোসিয়াল আঁ ফ্রাঁস, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, পাদটিকা।

আনবে সাম্য ও মুক্তি আবার পরিচালনার জন্যে উচ্চতর প্রতিভাও বজায় রাখবে, প্রতিভার সঙ্গে সমতার, পরিচালনার সঙ্গে মুক্তির সামঞ্জস্য ঘটাবে "সর্বহারা বীরপুরুষ", সমাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আনবে নৈতিক বিপ্লব! বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলতে পারে কিন্তু বিপ্লব মেলে না। চরম আদর্শবাদীদের অদৃষ্টে যা থাকে সরেলের কপালেও জুটেছিল সেই হতাশা। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোলোনায় ইটালীয় সিণ্ডিকেটগুলির এক সম্মিলন হয়—সেখানে সরেল মত বর্জন করে এক চিঠি পাঠান ও চিঠিটা পড়া হয়।[১৮] রুশ ও ইটালীয় বিপ্লবের পর আবার তাঁর আশা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। লেনিন ও মুসোলিনিকে তিনি সম্বর্ধনা করলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে শ্রমিক গণতন্ত্রের ভিত তৈরী হচ্ছে এতে তাঁর সন্দেহ রইল না।

বিস্ময় লাগতে পারে এতরকমের আজব কথার ভেলকি দিয়ে সরেল একটা আন্দোলনের মন্ত্রদান করলেন কেমন করে? করলেন এই জোরে যে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনায় তিনি শুড়শুড়ি দিতে পেরেছিলেন, তাদের যুক্তিহীন অবচেতন মনকে তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। জবরদস্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রশস্তি গেয়ে তিনি শক্তিপূজারী নীট্‌শে ও ফাসিস্ত নায়ক মুসোলিনির মধ্যে সেতু বাঁধলেন আর তাঁর গুরু মার্কস্ ও প্রুদঁর আগুশ্রাদ্ধ করলেন। তিনি লেনিনকে প্রলিতারিয় রোমের স্থাপয়িতা বলে বন্দনা করেছিলেন, লেনিন এই বাক্য বিলাসের জবাবও দেননি। মুসোলিনি তাঁর স্তুতির প্রতিদান দিয়েছিলেন সিণ্ডিক্যালিস্ট গুরুটিকে ফাসিজ ম্ এর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা বলে সার্টিফিকেট দিয়ে!

সিণ্ডিক্যালিজ ম্-এর কিছু অদলবদল করে ইংল্যাণ্ডে গিল্ড সোস্যালিজ ম্ নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। এর প্রচারক কোল, হবসন প্রভৃতি, এরও লক্ষ্য "মালিকমজুর সম্পর্ক তুলে দিয়ে শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা।" রাষ্ট্রে এখন সকল দায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রায়িত। এর জায়গায় চাই এক বৃত্তিমূলক গণতন্ত্র যেখানে এক এক বৃত্তি ও সমস্বার্থ অবলম্বন করে এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠবে, স্বাতন্ত্র্য রেখে নিজ নিজ কাজ চালাবে। এভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে বিকেন্দ্রিত। উদ্যোক্তাদের গোষ্ঠীর পাশাপাশি থাকবে

১৮ এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ ম্, ২০১ পৃষ্ঠা।

ভোক্তাদের গোষ্ঠী, বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর পাশাপাশি আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এরা পরস্পর চুক্তি করে স্থির করবে কাজের সময়, দক্ষিণা, দান, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর বৈপ্লবিক প্রণালীর বদলে গিল্ড সোস্থালিজ্‌ম্‌ ধীরগতির পক্ষপাতী। ইউনিয়ন জোরদার হলে সাধারণ ধর্মঘটের ঝুঁকি না নিয়েও কাজ আদায় হতে পারে। যেমন এনক্রোচিং কন্‌ট্রোল ও কলেক্‌টিভ কন্‌ট্র্যাক্ট। প্রথমটিতে শ্রমিকরা একটু একটু করে চাপ দিয়ে কারখানা চালাবার দায়িত্বে ভাগ বসাবে। দ্বিতীয়টিতে ইউনিয়ন শ্রমিকদের হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের ভার এবং তাদের মজুরি একসঙ্গে গ্রহণ করবে। গিল্ড সোস্থালিস্টরা রাষ্ট্রকে একেবারে খারিজ করে না। অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্র হবে একটি—দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, রাজস্ব ইত্যাদি সমাজকৃত্য নিয়ে সে থাকবে। রাষ্ট্রের স্থান সম্বন্ধে এরা সকলে একমত নয়। কারও কারও মতে শ্রমিক বা উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৃত্তি-অবলম্বী যে গোষ্ঠীসমন্বয় গড়ে উঠবে, ভোক্তাদের নিয়ে আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমন্বয় হবে তার পাল্টা, সমপর্যায়ভুক্ত ও সমক্ষমতাপন্ন, যার শীর্ষদেশে থাকবে সরকার। গিল্ড সোস্থালিস্টরা তাদের পরিকল্পনাটিকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় সিণ্ডিক্যালিস্টদের একচেটিয়া ব্যবসায় ঘা পড়ল, তারা নাক সিঁটকিয়ে বলল, এতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধোঁয়াটে গন্ধ—এ মাল খাঁটি নয়। বারট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু এদের এই বলে সনদ দিলেন যে, "এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হয়নি। অবিরাম হিংসায় আবেদনের যে ভয় খাঁটি নৈরাজ্যবাদী বিধানে রয়ে গেছে তাকে এড়িয়ে স্বাধীনতায় পৌঁছবার সবচেয়ে সম্ভবপর রাস্তা এইটেই।"[১৯]

এঁদের কাছে দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমত, যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সেনা, পুলিস ও রাজস্ব সে কি অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর সমপর্যায়ে কারও স্বাধীনতায় হাত না দিয়ে বিড়াল-তপস্বীর মত বসে থাকবে? দ্বিতীয়ত জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী গিল্ডসমাজ গড়ে তোলবার সম্বল শ্রমিকশ্রেণীর কোথায়?

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ ও গিল্ড সোস্থালিজ্‌ম্‌ উভয়ের ধ্যানজ্ঞান এক শ্রেণীসর্বস্ব সমাজবাদ। এর জন্যে দরকার শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ সমস্বার্থে আবদ্ধ

১৯ রোডস্‌ টু ফ্রীডম, লণ্ডন, ১৯৫৪, ৯২ পৃষ্ঠা।

ঐক্যসচেতন জনগণ। এই ঐক্যবদ্ধ জনগণের বিস্তৃতি এতদূর হতে হবে যাতে শাসন ও প্রভুত্ব বাদ দিয়ে সরকারী কাজ ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব তারা হাতে নিতে পারে। এমন ঐক্যবদ্ধ গণশ্রেণী কোথায়? তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণী দ্বন্দ্বে ভরপুর। দক্ষ মোটা-বেতনের মজুর আর আনাড়ি দিনমজুর, জোতওলা চাষী আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক আর স্বাধীন হাতের কাজের কারিগর এদের মধ্যে স্বার্থ ও চেতনার কোন মিল নেই। এদের মধ্যে কিছু কিছু হতভাগ্যদের ক্ষেপিয়ে শিল্পসঙ্কট সৃষ্টি করা কিংবা সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এদের একসঙ্গে করে এক সমদর্শী মুক্ত সমাজ তৈরী করার কল্পনা প্লেটো ও টমাস মূরের স্বপ্নরাজ্যের মতই অবাস্তব।

স্বাধীনতার তপস্যায় সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর অবশ্যই অবদান আছে। তবে তা সাধারণ ধর্মঘটের স্তোত্রপাঠে নয়, বিপ্লবের মনোহারী চিত্রাঙ্কনে নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যে সাহস, স্বাধিকার বোধ ও আত্মবিশ্বাস এ জাগিয়ে তুলেছিল সেই এর অক্ষয় কীর্তি। এরা শ্রমিকদের যুযুৎসাকে বাঁচিয়ে না রাখলে ভোটের লড়াই ও আইনসভার চিৎকারে সমাজবাদ ডুবে যেত। আইনের মারফত শ্রমিকরা যাকিছু পেয়েছে তাও সংগ্রামী শ্রমিকদের দৌলতে। আধুনিক সমাজচিন্তায় এদের সবচেয়ে বড় নিবেদন বহুভিত্তিক বিকেন্দ্রিত সমাজের কল্পনা। শ্রমজীবী সমাজে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে স্বাতন্ত্র্যশীল সমিতি গড়ে উঠবে, এগুলি হবে মুক্ত সমাজের কোষ। এ ধারণা আজকাল বহুজনস্বীকৃত, যার বিকৃত অনুকরণের চেষ্টা ফাসিস্ত ইটালী ও কমিউনিস্ট রাশিয়াতেও হয়েছে।

১২। আমেরিকা: উনিশ শতক

উনিশ শতকে আমেরিকার যুগল মহাদেশকে ইয়োরোপীয়রা বলত 'নূতন পৃথিবী।' বস্তুত এই নূতন পৃথিবী ছিল 'নূতন ইয়োরোপ।' ইয়োরোপের ভাগ্যান্বেষীরা এসে এখানে বনবাদাড় সাফ করে বসবাস করেছিল। ইয়োরোপের উপছে-পড়া মানুষ ও মনন ঘর বেঁধেছিল পশ্চিম গোলার্ধে। সমুদ্রের ওপার থেকে বীজ এসে পড়ল কুমারী মাটির বুকে। লক লক করে বেড়ে উঠল সবুজ তাজা একটি চারা গাছ।

শুধু রাষ্ট্রবলে নয়, চিন্তায়, মননায়, শিল্প ও সংস্কৃতির উদ্যোগে পশ্চিম

গোলার্ধের মধ্যমণি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। তার একটি খণ্ডরাজ্যের নাম ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ যার বন্দর বস্টনে ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা এসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চা-এর বাক্স তুলে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। আমেরিকা যেমন ছিল নূতন ইয়োরোপ, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ তেমন ছিল 'নূতন ইংল্যাণ্ড'—ইংল্যাণ্ডের বেয়াড়া ছেলেদের উপনিবেশ। জন্মদাত্রী মা'র চেয়ে পালিকা মা'র প্রতি টান তাদের বেশী—নূতন মাতৃভূমিতে তারা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলল—আমেরিকার মুক্তি সনদে ঘোষণা করল মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্রের বুনিয়াদি নীতি।

আর্থিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভব হল নানাবিধ সমস্যার। যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্রের বিকাশ যে সমাজবৈষম্যকে তুলে ধরল জেফারসনের উদার শাসন বিধিতে তার সমাধান পাওয়া গেল না। যুগ বদলাবার সাথে সাথে সাম্য ও স্বাধীনতার রাস্তা নূতন করে খুঁজে বার করতে হয়, পৈত্রিক সনদে তার সন্ধান করা বৃথা। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের অগ্রজ, ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের পথিকৃৎ। সে দেশের মনীষা গণতন্ত্রের শাঁস বাদ দিয়ে খোল নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে না।

নৈরাজ্যবাদী ভাবনায় ইয়োরোপের আগে আগে চলেছে আমেরিকা,—আরো ঠিক ঠিক বলতে গেলে ছোট্ট রাজ্য ম্যাসাচুসেট্‌স্‌—ওয়ারেন, থোরো ও টাকারের দেশ। ওয়ারেন প্রুদঁর পূর্বসূরী, থোরো টলস্টয়ের। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামের পথদ্রষ্টা টাকার—যার বাস্তব পরীক্ষা হয়েছে গান্ধীর হাতে। বাকুনিনের বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদও আমেরিকার জমিতে শিকড় গেড়েছে, যার রক্তের ফসল ফলেছিল শিকাগোর হে-মার্কেটে। আর শ্রমিকদের সিণ্ডিক্যালিজম্‌ এখানে রূপ নিয়েছে আই. ডব্লিউ. ডব্লিউর মারফত। নৈরাজ্যবাদের সবকটি ধারাই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তায় ও কর্মে প্রবহমান।

১৭৯৯ সালে বস্টনের নিকটে অতি সাধারণ ঘরে যোসিয়া ওয়ারেনের জন্ম হয়। শিক্ষাদীক্ষা যেটুকু হোল তা নিজের চেষ্টায়। বিশ বছর বয়সে তিনি তিনটি বিদ্যেয় পাকা হয়ে উঠলেন—যন্ত্রশিল্প, গানবাজনা ও বেনিয়াবৃত্তি। ছেলেবেলাটা কেমন বেতালা কেটেছে তা এ থেকে বোঝা যায়। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে তিনি ইংল্যাণ্ডের সমাজবাদী শিল্পপতি রবার্ট ওয়েনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়েন তখন নিউ হারমনিতে একটি কমিউনিস্ট উপনিবেশ

গড়বার উদ্যোগ করছেন। ওয়ারেন তাঁর সঙ্গে কাজে নেমে পড়লেন। উপনিবেশটি বরবাদ হয়ে যাবার পর ওয়ারেন যৌথজীবন যাপনে বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। মজুর কেমন করে তার পরিশ্রমের ন্যায্যমূল্য পেতে পারে এই ভাবনা তখন তাঁর মাথায় ঘুরছে। ধনতন্ত্র এসে কারিগরের সর্বনাশ করেছে, সেদিনকার স্বাধীন শিল্পী হয়েছে আজ বেতনভোগী মজুর। মুদ্রা রাষ্ট্রের একচেটিয়া, মূলধন ব্যাঙ্কের সিন্দুকে; শ্রমের বাজারে চলেছে অবাধ প্রতিযোগিতা, আর পুঁজির ওপর অল্পকটি ভাগ্যবন্তের একচেটিয়া অধিকার। কাজেই শ্রমিক মরছে আর পুঁজিবাদী ফাঁপছে। হাতের কাজ আর মাথার কাজে আশমান জমিন ফারাক। যারা খেটে খায় তাদের সব দিক দিয়ে মরণ।

এ নিয়ে লেখা ও বক্তৃতা বহু হয়েছে। প্রতিকারের কাজ বড়-একটা হয়নি। ওয়ারেন রবার্ট ওয়েনের শিষ্য, কথার চেয়ে কাজ বোঝেন ভাল। ১৮২৬ সালে ওহিওর সিন্‌সিনাটিতে তিনি একটি কারখানা ও দোকান খুললেন—যেখানে সময়ের মাপে কাজের দাম স্থির হয়। দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবী আর আনাড়ি মজুর সকলের কাজের একদর। ইটখোলার মজুর যদি ডাক্তার ডাকে এবং ডাক্তার যদি এক ঘণ্টা রোগী দেখে তা হ'লে তার ফী হবে এক ঘণ্টা ইটখোলার কাজ। সিন্‌সিনাটির 'সময় ভাণ্ডার' এই নিয়মের ওপর দু বছর চলেছিল। এখানে কোন মুনাফা ধরা হত না। মাল পয়দা করতে যা খরচ তাই তার দাম, অবশ্যি কারিগরের শিক্ষার সময় ও ব্যয় তার মধ্যে ধর্তব্য। দোকান চালাবার খরচ বাবদ দামের ওপর শতকরা সাত হারে মাসুল ধরা হত। খরিদ্দার দোকানদারের যতখানি সময় নিত ঘড়ি ধরে সেই সময়টার দামও জিনিসের সঙ্গে যোগ করা হত। কারিগর ও মজুরকে দাম দেওয়া হত শ্রমনোটের মারফত, নগদ টাকায় নয়। অর্থাৎ ছুতোর পাঁচ ঘণ্টা কাজ করে একটা টেবিল তৈরি করলে একটা পাঁচঘণ্টার নোট পেত। এই নোট দিয়ে সে 'সময় ভাণ্ডার' থেকে পাঁচঘণ্টার অনধিক দামের যে কোন জিনিস কিনতে পারত। শ্রমনোটের পরিকল্পনাটা অবশ্য রবার্ট ওয়েনের।

ওয়ারেন দুখানি পুস্তকে তাঁর চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করেন,—"ইকুইটেব্‌ল্ কমার্স" বা ন্যায্য লেনদেন ব্যবস্থা (১৮৪৬) এবং "ট্রু সিভিলাইজেশন" বা খাঁটি সভ্যতা (১৮৬৩)। তিনি সমাজবাদের রাস্তায় যান নি। তাঁর রাস্তা

ব্যক্তিসর্বস্ব নিঃশাসন সমাজের। ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধিকার দিয়ে কয়েকটি নিরাজ যূথসমাজও তিনি গড়েছিলেন—এগুলি বেশ কিছুদিন টিকেও ছিল। অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসন থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে হবে। ব্যক্তি হবে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ম্প্রভু—তার ওপর থাকবে শুধু নিজের কর্মফলের শাসন। অপকর্ম করলে তার ফল সে নিজেই ভুগবে, তা নিয়ে অপরের মাথাব্যথা হওয়া উচিত নয়। অবশ্য তা বলে প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা প্রতিভার সৃষ্টির ওপর কেউ জবরদখল করে বসতে পারবে না। ওয়ারেন নিজে সুযোগ পেয়েও জমি কেনা-বেচায় লাভ করেন নি এবং নিজের যান্ত্রিক আবিষ্কারের ওপর কোন স্বত্ব রাখেন নি।

ওয়ারেন ছিলেন যন্ত্রবিদ্ ও বেনিয়া, হেনরি ডেভিড থোরো ছিলেন ভাবুক, কবি। ১৮১৭ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্-এর কংকর্ডে তাঁর জন্ম হয়। হার্ভার্ড থেকে পাস করে বেরিয়ে তিনি কিছুদিন একটি স্কুলে মাস্টারি করেন, তারপর রাস্তাঘাট তদারকের কাজ নেন। ছেলেবেলা থেকে প্রকৃতির রাজ্যের ওপর তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। আঠাশ বছর বয়সে তিনি লোকালয় ছড়ে ওয়াল্‌ডেনের অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিল পশু, পাখি, মাছ, রেড ইণ্ডিয়ান আর বই ও খাতাকলম। তখন যুক্তরাষ্ট্রে দাসব্যবসায় প্রচলিত ছিল। যে সরকারের আশ্রয়ে এই পাপপ্রথা টিকে আছে থোরো পণ করলেন তাকে খাজনা দেবেন না। খাজনা না-দেবার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। একজন বন্ধু খবর পেয়ে তাঁর দেয় টাকা মিটিয়ে দিলেন, ফলে একরাত্রের বেশি তাঁকে জেল খাটতে হল না। দু'বছর দু'মাস অরণ্য-বাসের পর তিনি ফিরে এসে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। আইন-অমান্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ (রেসিস্‌ট্যান্স টু সিভিল গভর্নমেণ্ট, ১৮৪৯ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর বনবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হল "ওয়াল্‌ডেন" বা আরণ্যক জীবন গ্রন্থে, ("ওয়াল্‌ডেন অর লাইফ ইন দি উড্‌স্"—১৮৫৪)।

অনেকের ধারণা থোরোর ধাত ছিল পলায়নপর। তাঁর নিশ্চল প্রকৃতিতে সভ্যতার উদ্দাম গতি সহ্য হত না বলেই তিনি বনবাস নিয়েছিলেন। আসলে থোরো খুঁজছিলেন জীবনের শ্রী ও ছন্দ। মানুষ ত' শুধু সামাজিক জীব নয়, সে প্রাকৃতিক জীবও বটে। ধনিক সভ্যতার দৌলতে মানুষ ও প্রকৃতি হয়ে

দাঁড়িয়েছে কারখানার কাঁচা মাল। ওয়াল্‌ডেনে থাকতে থোরো নিজের কুটির ও আসবাব নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন, গম শীম ও আলুর চাষ করেছিলেন, জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে এনে নিজে সেঁকে রুটি খেতেন। তাতে যে আনন্দ ও প্রাচুর্য তিনি ভোগ করেছেন তা নবাব বাদশার জোটে না। কায়িক শ্রম একটা কর্তব্য। এ শরীর সুস্থ রাখে, মন তাজা করে, মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে এসে তার জীবনে ছন্দ ও মাধুর্য এনে দেয়। নিজের রুটি রোজগার করবার জন্যে দেহক্ষয় করে খাটবার দরকার হয় না। মাটি অত কৃপণ নয়।

> "শুধু নিজের হাতের মেহনতে পাঁচ বছর আমি আমার প্রয়োজন মিটাইয়াছি। আমি দেখিয়াছি যে বছরে ছয় সপ্তাহ খাটিলেই সব দরকারী খরচ চালানো যায়।[১] সারা শীতকাল এবং গ্রীষ্মেরও অধিকাংশ সময় আমি পড়াশুনার জন্য পাইতাম।……
>
> মোট কথা আমার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা হইতে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা একটা কষ্টকর ব্যাপার নয়, বরং একটা মজার খেলা—অবশ্য যদি সরলভাবে ও জ্ঞানীর মত বাঁচিতে হয়।……কপালের ঘাম ফেলিয়া কাহারও জীবিকা সংগ্রহের আবশ্যক নাই, অবশ্য যদি না সে আমার অপেক্ষা অনায়াসে ঘর্মাক্ত হয়।"[১]

যান্ত্রিক সভ্যতার উন্মাদ গতি জীবনকে নাশ করে দিল। পরিশ্রমী হলেই হল? পিঁপড়েরা কি কম পরিশ্রম করে? কিসের জন্যে পরিশ্রম তা দেখবার দরকার নেই?

এই যন্ত্রবদ্ধ সমাজ একদল নিষ্কর্মাকে পয়দা করেছে যারা 'জীবন্ত মানুষের গায় জোঁকের মত লেগে থেকে তার জীবনীশক্তি শুষে নেয়।' অপরাধ সৃষ্টি হচ্ছে এই ধন-বৈষম্য থেকে। ওয়াল্‌ডেনে এ-বালাই ছিল না। সেখানে থোরোর ঘরের দরজা দিনরাত খোলা থাকত। ঘর খোলা রেখে তিনি দিনের পর দিন বাইরে ঘুরে এসেছেন অথচ হোমারের একখণ্ড কাব্য ছাড়া আর কিছু তাঁর খোয়া যায় নি।

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সকলে যদি আমি যেমন থাকিতাম

১ কটাক্ষ বাইবেল উক্তির প্রতি। ওয়াল্‌ডেন।

সেইরূপ সরলভাবে বাস করে তাহা হইলে দেশে চুরি ডাকাতি থাকিবে না। এসব উপদ্রব সেই সমাজেই শুধু থাকে যেখানে কেহ পায় কম।" (ওয়াল্‌ডেন)

মানুষের নৈতিক শোধন শাস্ত্রশাসন দিয়ে হয় না। নীতিজ্ঞানের উৎস বিবেক। যখন অপরের অন্ধ বিশ্বাস ও সামাজিক শাসন স্বাভাবিক ন্যায়-বোধের ওপর হাত দেয় তখন ব্যক্তিকে নিজের সততা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

এই সুদৃঢ় প্রতীতিই 'পলায়নপর' দার্শনিককে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে নামিয়েছিল এবং আইন-অমান্য প্রসঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধের রসদ জুগিয়েছিল। যে মানুষকে নিয়ে পশুর মত বেচাকেনা করে তাকে তিনি একটি পয়সা দেবেন না। ১৮৫১ সালে এণ্টনী বার্ন্‌স্‌ নামে একজন পলাতক দাসকে ধরে এনে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর সরকার মালিকের হাতে সমর্পণ করে। থোরো তখন একটি জনসভায় বলেছিলেন,

"ভাল সরকার জীবনকে অধিক মূল্যবান করে, মন্দ সরকার জীবনের মূল্য কমাইয়া দেয়। রেলপথ ইত্যাদি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সরঞ্জাম কিছুটা কমিলে তাহা বরদাস্ত হয় কারণ তাহা আমাদিগকে একটু সরল-ভাবে ও স্বল্পব্যয়ে থাকিতে বাধ্য করে মাত্র। আর যদি জীবনের মূল্যই কমিয়া যায়? মানুষ ও প্রকৃতির উপর দাবি আমরা কেমন করিয়া কমাইব, ন্যায়পরতায়, জীবনমূল্যে কেমন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিব?"

আমেরিকান জাতি উৎসন্ন যাক সেও ভাল তবু যে সরকার দাসপ্রথার প্রশ্রয় দিচ্ছে আর মেক্‌সিকোর ভূমি দখল করবার জন্যে যুদ্ধ করছে তাকে যেন তারা মান্য না করে। হাজার হাজার লোক অন্তরে এর বিরোধী কিন্তু বাইরে নির্বিকার। সকল ক্ষেত্রেই যে অন্যায়কে বাধা দেওয়া সম্ভব তা অবশ্য নয়। 'অন্তত এটা দেখতে হবে যে কাজ আমি দূষণীয় মনে করি তা যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া না হয়।' সরকার যদি আমাকে দিয়ে তা করাতে চায় এবং না-পারলে আমাকে কারারুদ্ধ করে তাহলে কারাগারই আমার উপযুক্ত জায়গা। যিনি আমার হয়ে খাজনা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছেন তিনি কর্তব্যের ওপর হৃদয়ের জুলুম খাটিয়েছেন।

অনেকে যুক্তি দেখান যে অন্যায় দূর করতে হলে সংখ্যাগুরুর সমর্থন

পাওয়া দরকার; জবরদস্তি বাধা দিতে গেলে অধিকতর অনর্থের সৃষ্টি হবে। তা যদি হয় ত দোষ সরকারের। সরকারই অধিকতর অনর্থের জন্যে দায়ী।

> "কেন সরকার প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া অন্যায়ের সংশোধন করে না? কেন বিবেচনাসম্পন্ন সংখ্যালঘুকে সমর্থন করে না?… কেনই বা সরকার সর্বদা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে, কোপার্নিকাস ও লুথারকে সমাজচ্যুত করে, ওয়াশিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে?" (রেসিস্টেন্স টু সিভিল গভর্নমেণ্ট)

যাঁরা সংখ্যাগুরুর ভোটে দাসপ্রথা রদ করতে চাচ্ছেন তাঁরা বাস করছেন স্বপ্নরাজ্যে। যেদিন সংখ্যাগুরু স্বেচ্ছায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ভোট দেবে সেদিন রদ করবার মত কোন দাসপ্রথা অবশিষ্ট থাকবে না। ভোটের গুনতিতে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু যখন তারা সকল শক্তি নিয়ে বাধা দেয় তখন তাদের সামলানো সংখ্যাগুরুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

> "সকল ন্যায়বান লোককে জেলে পুরিয়া রাখা কিংবা যুদ্ধ ও দাসপালন বর্জন করা এই দু'-এর মধ্যে একটি পথ বাছিয়া লইতে রাষ্ট্র কোন ইতস্তত করিবে না। এ বৎসর যদি এক সহস্র লোক খাজনা দেওয়া বন্ধ করে তাহাতে হিংসা ও রক্তারক্তি হইবে না, বরং দিলেই রাষ্ট্রকে হিংসা ও রক্তপাতে সাহায্য করা হইবে।"

এই প্রকার বিপ্লব হবে শান্তিপূর্ণ। 'আর না হয় কিছু রক্ত পড়লই। যখন বিবেক আহত হয় তখন কি একরকম রক্তপাত হয় না?'

থোরোর প্রত্যয় ছিল দৃঢ় যে কোথাও প্রতিরোধ শুরু হওয়া একান্ত দরকার—একজন অন্তত খাঁটি মানুষ এসে রুখে দাঁড়াক। থোরো পেয়েছিলেন মনের মত একজন লোক—যখন হার্পার্স ফেরিতে ক্যাপ্টেন জন ব্রাউন দাসপ্রথার প্রতিবাদে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন।[২] ১৮৫৯ সালে জন ব্রাউনের প্রাণদণ্ড হল। থোরো জনসভায় এসে শহীদের বন্দনা করলেন।

২ ১৮৫০ সালে পলাতক দাসদের ধরে প্রভুর হাতে সমর্পণ করার আইন পাশ হবার পর ইনি মনস্থ করলেন যে ভার্জিনিয়ার পর্বতে পলাতক দাসদের জন্যে একটি দুর্গ রচনা করবেন। ১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে হার্পার্স ফেরীর সরকারী অস্ত্রাগার লুঠ করে জন কুড়ি অনুচর নিয়ে (এঁদের মধ্যে তাঁর দুই ছেলেও ছিল) তিনি গ্রাম দখল করলেন এবং কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে রাখলেন। ওয়াশিংটন থেকে ফৌজ এসে বিদ্রোহীদের দমন করল। ভার্জিনিয়ার আদালতে বিচারের পর ব্রাউনের ফাঁসি হল।

যে অপরের স্বাধীনতা হরণ করে তার নিজেরও স্বাধীনতা থাকে না। ঘোড়ার মুখে যে লাগাম লাগান হল তার আর-এক মাথা সওয়ারের গলায় পাক দেয়। শাসন করা মানে স্বাধীনতা হরণ করা ও হারানো। থোরোর মূলমন্ত্র লাওৎসের মত, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল।' এ থেকে সিদ্ধান্ত হয়, 'যে সরকার আদৌ শাসন করে না সে সরকার সকলের শ্রেষ্ঠ।' কোন ভাল কাজ রাষ্ট্রকে দিয়ে হয় না। একটি মাত্র ভাল কাজ সে পারে,—তা হল কারও ব্যাপারে হাত না দেওয়া। রাষ্ট্র শ্রেয় বুদ্ধি ও সততায় নয়, শ্রেয় পশুবলে। বিবেককে নীচু হতে হবে পশুবলের কাছে?

> "আমরা আগে মানুষ তার পরে প্রজা। সত্যের মর্যাদা রক্ষার অভ্যাস যতটা অভিপ্রেয় আইনের মর্যাদারক্ষার অভ্যাস ততটা নয়।"

আইন ও ন্যায় এক নয়। আইন মানুষকে একটুও বেশী ন্যায়বান করেনি, বরং আইনের মান রাখতে গিয়ে বহু সৎ লোক অহরহ অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছে। আইনের পাকে পড়ে মানুষ হয় যন্ত্র, ফৌজের সিপাইর মত বোধহীন বিবেকহীন কাঠের পুতুল, 'ক্ষমতাপন্ন নীতিহীন ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত চলমান দুর্গ ও অস্ত্রশালা।' যারা বিবেক দিয়ে রাষ্ট্রের সেবা করতে যায় তারা গণ্য হয় রাষ্ট্রের শত্রু বলে।

আইন এবং স্বাধীনতাও দ্বন্দ্বাত্মক। আইন করে মুক্তি দেওয়া এক অদ্ভুত কল্পনা।

> "আইন কদাপি মানুষকে মুক্তি দিবে না। মানুষকেই মুক্তি দিতে হইবে আইনকে। যখন সরকার নিয়ম ভঙ্গ করে তখন যাহারা নিয়ম রক্ষা করে তাহারাই নিয়মশৃঙ্খলার ধারক। ···যে সত্যকে বুঝিয়াছে সে পৃথিবীর প্রধানতম বিচারকের অপেক্ষা উচ্চস্থান হইতে তাহার হুকুমনামা লাভ করিয়াছে। সেই যথার্থ রায় দিবার অধিকারী, তাহার উপর পড়িয়াছে বিচারকের বিচারের ভার।"

স্বৈরতন্ত্র লোকনিষ্ঠ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই ধাপে ধাপে রাষ্ট্র ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিপরায়ণতার দিকে। নিশ্চয়ই গণতন্ত্র এই অগ্রগতির শেষ ধাপ নয়। যতদিন না রাষ্ট্র ব্যক্তিকে এক স্বাধীন ও উচ্চতর সত্তা বলে মনে করবে, যে সত্তা থেকে সে পেয়েছে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, ততদিন রাষ্ট্র নিজেও মুক্ত ও নির্মল হবে না। এর মানে এই দাঁড়ায় যে মুক্ত রাষ্ট্রে কোন

জোরজুলুম নেই। কেউ যদি রাষ্ট্রের তাঁবে থাকতে না চায় তাহলে রাষ্ট্র তার ওপর হামলা করবে না, তার সঙ্গে প্রতিবেশী বন্ধুর মত আচরণ করবে। এই যখন রাষ্ট্রের পরিণতি হবে তখন রাষ্ট্রশাসন পাকা ফলটির মত খসে পড়বে আর রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক উন্নত এক শুচীশুদ্ধ অবস্থায় আমরা উত্তীর্ণ হব।

মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রগুরুদের মধ্যে থোরো অন্যতম। ন্যায়ের দণ্ড শাসন-দণ্ডের চেয়ে অনেক উপরে—টলস্টয় ও গান্ধীর এই জীবনসূত্র রচনা করে দিয়েছিলেন কংকর্ডের এই পলায়মান ভাবুক। যে যতবড় জ্ঞানীগুণী হোক না কেন তাকে গায়পায় খাটতে হবে—তার নিজের এবং সমাজের উভয়ের কল্যাণের জন্যে,—একথা বলেছেন অনেকে, কাজে করেছেন যে দু-চারজন সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক থোরো তাঁদের মধ্যে প্রথম।

১৮৫৪ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর বেডফোর্ডের নিকটে দক্ষিণ ডার্টমুথে বেঞ্জামিন আর. টাকারের জন্ম হয়। বস্টনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তখন থেকে তিনি ব্যক্তিপরায়ণ নৈরাজ্যবাদের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইয়োরোপ ঘুরে এলেন। তাঁর নেশা ছিল সাময়িক পত্র চালানো। বারকয়েক বিফল হয়ে শেষে ১৮৮১ সালে বস্টনে তিনি "লিবার্টি" নামে একটি মাসিক পত্রিকা দাঁড় করালেন। কিছুকাল "লিবার্টাস" নামে আর-একটি জার্মান সংস্করণও বেরুল। ১৮৯২ সালে তিনি নিউইয়র্কে এসে বসলেন এবং "লিবার্টি"-কে সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন। কয়েক বছর পরে এটি পাক্ষিক হল। ১৮৯৩ সালে তিনি "লিবার্টি"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন বার করলেন—"ইনস্টেড অফ এ বুক··· "। বই-এর দীর্ঘ নামের বাঙ্গলা করলে দাঁড়ায়—'যে ব্যস্ত লোকের বই লিখিবার সময় নাই বইএর বদলে তাহার রচিত দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের টুকরা টুকরা ব্যাখ্যান।'

'পণ্যমূল্যের যথার্থ পরিমাপক শ্রম',—এডেম স্মিথ "ওয়েল্‌থ্‌ অফ নেশন্‌স্‌"-এ এই যে সূত্রটি দিয়েছিলেন তার ওপরই উঠেছে সমাজবাদের শাস্ত্র। এ থেকে ওয়ারেন, প্রুধঁ ও মার্ক্‌স্‌ স্বতন্ত্রভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন,—শ্রমের ন্যায্য মজুরি তার পয়দা-করা মাল; এটাই একমাত্র ন্যায্য আয়ের পথ (অবশ্য দান, দায়াধিকার ইত্যাদির কথা আলাদা),—অন্য পথে যে যা আয় করে তা শ্রমিকের মজুরির ওপর ভাগ বসানো বই আর কিছু নয়; এই অন্যায় ভাগ

বগানো তিন প্রকারে ঘটে থাকে—সুদ, ভাড়া, মুনাফা;—তিনটিই মূলধন খাটিয়ে লাভ করবার রকমফের। মূলধন শ্রমেরই সঞ্চয়—তার লাভ শ্রমিকের প্রাপ্য, ধনিকের নয়। তবু যে ধনিক অন্যায়ভাবে মূলধন থেকে লাভ তোলে, ব্যাঙ্ক সুদ খায়, জমিদার খাজনা নেয়, বেনিয়া মুনাফা রাখে তার কারণ আইনের বলে মূলধন এদের মৌরুসী। শ্রমিককে তার স্বাভাবিক মজুরি দিতে হলে, তার পয়দা মালের ভোগাধিকার দিতে হলে তার একমাত্র উপায় এই মৌরুসী স্বত্ব ভেঙে দেওয়া।

এ পর্যন্ত মোটামুটি তিন সমাজবাদী সমমত। কেমন করে মূলধনে এক-চেটিয়া স্বত্ব ভাঙতে হবে তাই নিয়ে হল মতভেদ।

মার্ক্‌স্‌ চাইলেন ধনিক শ্রেণীর একাধিকার নাশ করে রাষ্ট্রের একাধিকার স্থাপন করতে। রাষ্ট্র হবে একমাত্র মহাজন, কারিগর, চাষী, বেনিয়া—তার সঙ্গে কারও পাল্লা দেওয়া চলবে না। জমি, যন্ত্র, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদি উৎপাদনের যাবতীয় সরঞ্জাম হবে সমাজের সম্পত্তি। শুধু উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য থাকবে ব্যক্তির জন্যে। সমাজ উৎপাদনের উপকরণগুলি হস্তগত করে রাষ্ট্রের মারফত পরিচালনা করবে, শ্রমের পরিমাপে পণ্যের দাম স্থির করবে, সবার জন্যে শ্রমবিভাগ করে দেবে। গোটা জাতি হবে একটা আমলাতন্ত্র। প্রজারা হবে সরকারের আজ্ঞাবাহী আমলা। রাষ্ট্রসমাজবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হবে রাষ্ট্রপূজনে।

ওয়ারেন আর প্রুঁদ দেখলেন ধনিক শ্রেণীর মৌরুসী স্বত্ব নির্ভর করছে রাষ্ট্রশক্তির ওপর। রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়িয়ে, তার হাতে সার্বভৌম সর্বাধিকার সমর্পণ করে এর প্রতিকার হবে না। এর প্রতিকার রাষ্ট্রকর্তৃত্বের জায়গায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাঁড় করান, একচেটিয়া অধিকারের জায়গায় অবাধ প্রতিযোগিতা চালু করা। তা হলেই জিনিসের দাম শ্রমের স্তরে এসে ঠেকবে। এখন যে তা হচ্ছে না তার কারণ প্রতিযোগিতা চলছে একতরফে। ধনিকেরা এমনভাবে আইন তৈরি করেছে যে শ্রমিকদের কাজে চলেছে অগাধ প্রতি-যোগিতা, ফলে শ্রমের দাম নেমেছে অর্ধাশনের স্তরে; ব্যবসাবাণিজ্যেও আছে কিছুটা প্রতিযোগিতা যার ফলে ব্যবসার লাভও কিছুটা সীমিত; আর যে মূলধনের ওপর নির্ভর করছে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবসার লেনদেন তার সরবরাহে বলতে গেলে কোন প্রতিযোগিতাই নেই। কাজেই সুদ ও খাজনার হার সপ্তমে চড়ে আছে। দরকার হল মূলধনকে লাভের জন্যে না-খাটিয়ে

জনসাধারণের কাজে নিয়োগ করা। মার্ক্‌স্ চাইলেন একে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে। ওয়ারেন ও প্রুদঁ চাইলেন একে ভেঙে ছড়িয়ে দিতে।

মৌরুসী স্বত্ব চার প্রকার—টাকা, জমি, শুল্ক ও আবিষ্কার। প্রথমটি প্রধান। টাকা তৈরি করা ও বাজারে ছাড়া সরকার ও ব্যাঙ্কগুলির একচেটে। যদি লগ্নির কারবার সকলের জন্যে মুক্ত করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ মূলধন সকলের আয়ত্ত হয় তাহলে লগ্নি টাকার দাম অর্থাৎ সুদ মূলধন চলাচলে যেটুকু খরচ তাতে এসে নামবে,—শতকরা এক-এর বেশি নয়। তখন ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেবে না, ব্যাঙ্কের মারফত চলাচল করবে মক্কেলদের টাকা। খাতক নামমাত্র সুদে টাকা পেলে বেশী লোক ব্যবসায়ে নামবে, শ্রমের চাহিদা বাড়বে, মজুরি বাড়বে, মজুর টাকা জমিয়ে যন্ত্র কিংবা জমি কিনবে, শেষে স্বাধীনভাবে শিল্পকর্ম অথবা জমি চাষ করবে। মূলধন শস্তা হলে পয়সা মালও শস্তা হবে। ঘর ভাড়াও কমবে কারণ ১% সুদে মূলধন পেলে ভাড়াটেরা টাকা ধার করে বাড়ি তুলবে, মোটা হারে বাড়িভাড়া দেবে না।

বর্তমানে জমি চাষ না-করেও এবং তাতে বসবাস না-করেও যে অনেকে তার মালিক হয়ে বসে আছে এ শুধু সরকারের ভূমিস্বত্ব আইনের জোরে। যে জমি চাষ করে অথবা জমিতে ঘর তুলে বসবাস করে সে ছাড়া আর কেউ জমির মালিক হতে পারবে না এমন নিয়ম হলে ভাড়া নেওয়া উঠে যাবে। অবশ্য ভাল জমির সুবিধা এবং আয় মন্দ জমির চেয়ে বেশি। কিন্তু জমি ও বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে অন্যায় ধনবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে জমির গুণাগুণ থেকে তেমন কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না।

তারপর শুল্কের একাধিকার। অল্প খরচে অনুকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্য যারা কিনে পোষণ করতে চায় তাদের ওপর কর বসিয়ে বেশী খরচে প্রতিকূল পরিবেশে উৎপন্ন দ্রব্যকে পোষণ করার যে সরকারী নীতি তার নাম শুল্কের একাধিকার। এই অধিকার সরিয়ে নিলে অর্থাৎ শুল্ক তুলে দিলে পণ্যের দাম কমবে, শ্রমিক শস্তায় জিনিস কিনতে পারলে তার জীবনের মান উন্নত হবে। অবশ্য প্রুদঁ সাবধান করে দিয়েছেন যে টাকার একাধিকার বন্ধ না-করে শুল্কের একাধিকার বন্ধ করলে সর্বনাশ হবে কারণ যে অল্প পরিমাণ টাকা দেশের বাজারে ঘুরছে তা বিদেশের শস্তা আমদানি মালের পিছনে বিদেশে চলে যাবে, দেশের শুল্ক-রক্ষিত ছোট শিল্পগুলি মারা পড়বে। বিদেশের সঙ্গে অবাধ পণ্যবিনিময়ের আগে দেশে টাকার অবাধ চলাচল আনতে হবে।

আবিষ্কারের ওপর মৌরুসী স্বত্ব প্রকৃতির সার্বজনীন বিত্তের ওপর অবৈধ একাধিকার। প্রকৃতির সম্পদ সকলের ভোগ্য। যখন একজন প্রকৃতির কোন নিয়ম বা সত্যকে আবিষ্কার করে তার ওপর একাধিকার বসায় এবং অন্যকে তার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন তা অসম, অবৈধ। এই অধিকার দূর করলে আবিষ্কর্তাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিজের পরিশ্রমের অতিরিক্ত অন্যায় সুবিধা সে ভোগ করতে পারবে না।

এই চারটি একচেটে অধিকার তুলে নিলে ব্যক্তি হবে অবাধ, মুক্ত। মার্ক্‌স্ ব্যক্তির হাত থেকে মূলধন নিয়ে রাষ্ট্রের হাতে দিয়েছেন, ব্যক্তিকে শূন্য করে রাষ্ট্রকে পূর্ণ করেছেন। ওয়ারেন ও প্রুধঁ রাষ্ট্রাশ্রয়ী একাধিকারগুলিকে কেড়ে নিয়ে মূলধন ব্যক্তির হাতে দিয়েছেন, রাষ্ট্রকে শূন্য করে ব্যক্তিকে পূর্ণ করেছেন।

> "নৈরাজ্যবাদীরা নির্ভীক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক,[৩] তার বেশী কিছু নয়। তাহাদের বিশ্বাস, 'যে সরকার যত কম শাসন করে সে সরকার তত ভাল' এবং যে সরকার আদৌ শাসন করে না তা সরকারই নয়।" (১৪ পৃষ্ঠা)

সরকার মানেই শাসন, নিয়ন্ত্রণ। যে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সে অত্যাচারী, আক্রমণকারী। এ আক্রমণ নানা প্রকারে হতে পারে, যথা ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা চোর গুণ্ডা ইত্যাদি করে থাকে, সমষ্টির ওপর ব্যক্তির আক্রমণ যা স্বৈরাচারী রাজা করে থাকে, ব্যক্তির ওপর সমষ্টির আক্রমণ যা আধুনিক গণতন্ত্র করে থাকে, আর যারা এই নিয়ন্ত্রণে বাধা দেয় তারা আক্রমণকারী নয়, আত্মরক্ষক। চোরগুণ্ডার আক্রমণ প্রতিহত করা, স্বৈরাচারী শাসনে বাধা দেওয়া, সংখ্যাগুরুর গণতান্ত্রিক আইন অমান্য করা, সব আক্রমণবিরোধী আত্মরক্ষামূলক কাজ। ভোটপত্র দিয়ে রাষ্ট্রের দমনপর চরিত্র ঢাকা পড়ে না। কোন্ পক্ষের জোর বেশি এবং কার কাছে মাথা নোয়াতে হবে সেটা নির্ধারণ করবার জন্যে ভোটপত্র একটা সোজা উপায়।

রাষ্ট্রশাসক তথা স্বাধীনতার শত্রুরা তিন মূর্তিতে দেখা দেয়। প্রথমত,

৩ অর্থাৎ জেফারসন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ব্যক্তি-অধিকারের মৌলিক নীতির উপর যে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেছিলেন তার অনুবর্তী।

যারা স্বাধীনতাকে প্রগতির লক্ষ্য ও উপায় বলে মানে না, যেমন ক্যাথলিক চার্চ ও রুশ সরকার। দ্বিতীয়ত, যারা নিজেদের স্বার্থে স্বাধীনতার জয়গান গায় কিন্তু অপরকে স্বাধীনতা ভোগ করতে দেয় না, যেমন প্রটেস্ট্যান্ট চার্চ এবং ম্যাঞ্চেস্টারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায়। তৃতীয়ত, যারা স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলে মেনে নেয় কিন্তু উপায় বলে মানে না এবং আগে স্বাধীনতাকে পদদলিত করে পরে তাকে মাথায় তুলতে চায়, যেমন কার্ল মার্ক স্-এর সমাজতন্ত্র। মার্ক্সবাদীরা বলে যে প্রলিতারিয় শাসনে রাষ্ট্র ও সমাজ এক হয়ে যাবে সুতরাং স্বাধীনতা খর্ব হবে না। তা বটে, তারা এক হয়ে যাবে ঠিক 'যেমন সিংহ ভেড়ার বাচ্চাটিকে গিলে ফেলবার পর দুটিতে এক হয়ে যায়।'

রাষ্ট্রকে বাতিল করে দিলেই যে আক্রমণ বন্ধ হবে তা নয়। হতে পারে যে কোন কোন লোক প্রতিবেশীর অধিকারের ওপর হামলা করবে। তার প্রতিকারের জন্যে তৈরী হবে আত্মরক্ষণশীল সংস্থার যা রাষ্ট্রের মত বাধ্যতা-মূলক নয়—যার ভিত্তি সকলের স্বাধীন ইচ্ছা। এই সংস্থা আক্রমণকারীকে সর্বতোভাবে বাধা দেবে। অনেকের মনে হতে পারে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ত স্বেচ্ছামূলক আত্মরক্ষণ সংস্থা। তা নয়। রক্ষণের চেয়ে আক্রমণের দিকে এর নজর বেশি। রক্ষণের নাম করে এ যে সকলকে খাজনা দিতে বাধ্য করে এইটেই একটা আক্রমণ। একজনের হয়ত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই—তবু তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, এমন কি তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যে রাষ্ট্র তার কাছ থেকে কর নিচ্ছে। রক্ষণের কাজ এখন রাষ্ট্রের একচেটে। আত্মরক্ষা সমিতির হাতে এলে রক্ষণের কাজে প্রতিযোগিতা হবে, অন্যান্য পণ্যের মত এরও দাম কমবে, যে যত শস্তায় কাজ দেবে সে তত সমর্থন এবং চাঁদা পাবে।

আক্রমণকারী ব্যক্তিকে তৈরি করে আক্রমণকারী রাষ্ট্র। অপরাধের উৎপত্তি হয় অভাব থেকে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করে রাষ্ট্র অভাব সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র উৎসন্ন হলে মূলধনের ওপর মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে, অভাব দূর হবে, অপরাধবৃত্তি থাকবে না, জেল পুলিশ ও সান্ত্রীর দরকার হবে না।

> "রাষ্ট্র আমাদের মুশকিল-আসানের কাজ করে বটে কিন্তু আমাদিগকে হাতকড়া পরাইয়া তাহার দাম আদায় করিয়া লয়। স্বাধীনতার

একটা বিকল্প পথ আছে এবং তাহাতে আরো শস্তাদরে মুশকিল-আসান হয়। সমবায় ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ধনের উৎপাদন বাড়াইতে এবং তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করাইতে পারে……সমবায় বীমা আপদে বিপদে ক্ষতিপূরণ দিয়া আকস্মিক ধনক্ষয়জনিত কষ্টকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লাঘব করিতে পারে (১৫৯-.৬০)। আত্মরক্ষা সমিতি আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করিতে, শাস্তি দিতে, আটক রাখিতে, এমনকি মারিয়া ফেলিতেও পারে (৫৫, ৫৬)। সভ্যদের ভিতর হইতে লটারীতে নির্বাচিত জুরী অপরাধের বিচার করিতে পারে—তাহাদের বিচার্য হইবে শুধু ঘটনা নয়, আইনও—আইনের ন্যায্যতা, ঘটনাক্ষেত্রে ইহা প্রযুজ্য কিনা এবং প্রযুজ্য হইলে আইনভঙ্গের জন্য কি পরিমাণ শাস্তি অথবা জরিমানা হইবে।” (৩১২)

স্বেচ্ছাসমিতি গঠিত হবে চুক্তি দ্বারা। কোন এলাকার ওপর এর রাজত্ব থাকবে না, যদিও চুক্তিবদ্ধ সভ্যরা জমির মালিক হতে পারে এবং চুক্তির নিয়মে নিজের নিজের জমিতে সুরক্ষিত হতে পারে। আবার তাদের মধ্যবর্তী কোন জমির মালিক সমিতির বাইরে থাকতে পারে এবং সমিতির কোন সভ্য পরে সমিতি ছেড়ে যেতেও পারে। কিন্তু সভ্যদের সম্মতিতে যে নিয়ম ধার্য হয়েছে তা প্রয়োগ করবার অধিকার সমিতির থাকবে। সমিতি সভ্যপদের শর্ত ধার্য করতে পারে—যেমন জুরীতে বসা কিংবা খাজনা দেওয়া। সমিতি চুক্তিভঙ্গ করে সভ্যদের ওপর হামলা করতে গেলেই তার খাজনা বন্ধ হবে, সমিতি ভেঙ্গে যাবে।

আশঙ্কা হতে পারে যে এতে করে ব্যাঙের ছাতার মত স্বেচ্ছাসমিতি গজিয়ে উঠে পরস্পর বিবাদ শুরু করবে। সে ভয় নেই। কারণ এই ব্যবস্থা বাস্তবে চালু হবার আগে মানুষের মনকে স্বাধীনতার জন্যে তৈরি করতে হবে—যাতে তারা তাদের ব্যাপারে বাইরের কোনরকম হস্তক্ষেপ বরদাস্ত না করে। তা হলেই যে সমিতি হবে সবচেয়ে নিরুপদ্রব সেই সমিতি তাদের সমর্থন পাবে এবং ঝগড়াবিবাদের ভয় থাকবে না। অবশ্য কখনই যে ঠোকা-ঠুকি লাগবে না তা নয়। যেমন ‘ক’ সমিতির সভ্য ‘খ’ সমিতির সভ্যের ওপর হামলা করেছে ‘খ’ ‘ক’-এর সভ্যকে গ্রেপ্তার করতে গেল, ‘খ’ রুখে দাঁড়াল কারণ তাদের মতে গ্রেপ্তারটা আক্রমণাত্মক। এ জাতীয় বিবাদেরও

সমিতিতে সমিতিতে চুক্তিদ্বারা নিষ্পত্তি হতে পারে,—একটি অন্তর-সমিতি আদালতও স্থাপিত হতে পারে।

"দেশরক্ষা একটা পণ্য, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মের অনুগত। খোলা বাজারে এই পণ্য বিক্রয় হইবে উৎপাদনমূল্যে। যদি অবাধ প্রতিযোগিতা চলে তাহা হইলে সবচেয়ে শস্তায় সেরা মাল যে দিবে তাহার মালই বিকাইবে। বর্তমানে এই পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয় রাষ্ট্রের একচেটিয়া। সকল একচেটিয়া বেনিয়ার মত রাষ্ট্র এই পণ্যের জন্য চড়া দাম আদায় করে, উপরন্তু বাজে মাল দেয়। খাদ্যের একচেটিয়া ব্যবসাদার যেমন পুষ্টির বদলে বিষ দেয়, দেশরক্ষার একচেটিয়া ব্যবসায়ী রাষ্ট্র তেমন রক্ষণের বদলে দেয় আক্রমণ: প্রথমের ক্রেতারা দাম দেয় বিষ খাইয়া, দ্বিতীয়ের ক্রেতারা দাম দেয় দাসত্বের শিকল পরিয়া। একটা ব্যাপারে রাষ্ট্র সকল একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে ছাড়াইয়া যায়। তাহার এই একটা মস্ত সুবিধা যে তাহার পণ্য কেহ নিতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, সে সকলকে ইহা কিনিতে বাধ্য করিতে পারে। সুতরাং যদি একই এলাকায় পাঁচছয়টি রাষ্ট্র তাহাদের বেসাতি লইয়া বসে তবে মনে হয় লোকে ঠিক দামে সবচেয়ে সেরা নিরাপত্তা কিনিতে পারিবে। তাহাদের কাজ যতই ভাল হইবে ততই তাহাদের প্রয়োজন কমিয়া যাইবে— বহুরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ফলে কোন রাষ্ট্রই টিকিবে না।" (৩৩)

নিরাজ ব্যবস্থায় মৌরুসী স্বত্ব উঠে যাবে কিন্তু বিত্তাধিকার থাকবে। নিজের পরিশ্রমে যে যা অর্জন করেছে, কিংবা জবরদস্তি ও প্রতারণা না-করে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছে, কিংবা স্বাধীন চুক্তির বলে যে যাকিছু ভোগদখল করেছে তাতে তার স্বত্ব বর্তাবে। অবশ্যি জমি অথবা এমন কোন জিনিস যা সকলে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করার মত যথেষ্ট মজুত নেই, তার মালিকানা কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যারা সেখানে চাষ করছে বা তা ব্যবহার করছে।

নিরাজ ব্যবস্থায় শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিকার দূর হবে না—ধর্ম, নীতি, সমাজ, পরিবার সর্বত্র শাসন দূর হবে, স্বাধীনতা আসবে। একটি মাত্র নীতিকথা সবাইকে মানতে হবে—'নিজের চরকায় তেল দাও'। জোর করে অন্যের পাপ দমন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

"নৈরাজ্যবাদী মনে করে যে স্বাধীনতা এবং তার প্রসূত সমাজকল্যাণ সকল পাপের ধন্বন্তরী। কিন্তু সে স্বীকার করে মাতাল, জুয়াড়ি, লম্পট ও পতিতার ইচ্ছামত জীবনযাপনের অধিকার, যতদিন না তাহারা সে জীবন স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিবে।" (১৫)

ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ একটি আইন করে স্থির হয়েছে যে সিফিলিস রোগগ্রস্ত কয়েদী ও অনাথাশ্রমের নিঃস্বদের রোগমুক্ত না হলে ছাড়া হবে না। সিফিলিস রোগ বড়-একটা সারে না সুতরাং তাদের দণ্ড যাবজ্জীবন কারাবাস। 'এখন থেকে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এ শুধু বড়লোক ও আইনমান্যকারীরা সিফিলিসসহ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।'

নিরাজ সমাজে সন্তানপালনের দায় পিতামাতার, সমাজের নয়। পিতামাতা নির্বাচন করবে ধাত্রী ও শিক্ষক। পিতামাতার অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না, তাদের দায়িত্বও অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে না। বাপমার বিরুদ্ধে সন্তানের কোন অধিকার নেই। যদি তারা সন্তানের অযত্ন করে তাতে কারও কিছু বলবার নেই। পরিত্যক্ত অথবা অনাথ শিশুকে পালন করবার বোঝাও সমাজ বইবে না—কেউ স্বেচ্ছায় বইতে চায় ত' আলাদা কথা।

যৌনসম্বন্ধ হবে মুক্ত, উভয়পক্ষের ইচ্ছাধীন। আইনের বিবাহ ও আইনের বিচ্ছেদ সমান অদ্ভুত। প্রত্যেক নরনারী স্বাবলম্বী হবে, প্রত্যেকের নিজের বাড়ি অথবা অন্তত একটি ঘর থাকবে, তাদের প্রেমসম্বন্ধ হবে ব্যক্তিগত রুচি ও আসক্তির মত বৈচিত্র্যশীল। এ থেকে যে সন্তানরা আসবে তারা নাবালক অবস্থায় মা-র হেপাজতে থাকবে, তারপর নিজের পায় দাঁড়াবে।

"পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে অবশ্য পূর্ণ সমতা আসবে না। অনেকে স্বাধীনতার চেয়ে সাম্যকে বেশী পছন্দ করে। আমি তাদের মধ্যে নই। আমি যদি মুক্ত ও সচ্ছল অবস্থায় জীবন কাটাইতে পারি তবে আমার প্রতিবেশীকে সমান মুক্ত কিন্তু বেশী সচ্ছল দেখিয়া আমি কান্নাকাটি করিব না। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সকলকে সচ্ছলতা দিবে, কিন্তু সমান সচ্ছলতা নয়। শাসন সকলকে সমান টাকার থলি দিতে পারে (নাও পারে); কিন্তু যাহা কিছু জীবনকে বাঁচিবার উপযুক্ত করে, সেই ধনে সকলকে সমান নির্ধন করিয়া ছাড়িবে।" (৩৩৩)

সমাজবাদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের কোন বিবাদ নেই, কোন অটুট সম্পর্কও নেই। সমাজবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটি একটি চৌর্যবিরোধী আন্দোলন,—শ্রমিকের শ্রমফল চুরি বন্ধ করার আন্দোলন। এ আন্দোলন চায় বিত্তবানের একাধিকার ও বিশেষ সুবিধা দূর করে সকলকে যার যার ন্যায্য পাওনা দিতে। নৈরাজ্যবাদ চায় সকলকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিতে এই শর্তে যে কেউ অপরের স্বাধীনতায় হাত দেবে না। সমাজবাদের লড়াই শোষণের বিরুদ্ধে, নৈরাজ্যবাদের লড়াই শাসনের বিরুদ্ধে। যেহেতু শোষণ নির্ভর করে শাসনের ওপর, ধনিক শোষণ চালায় সরকারী আইনের জোরে, এবং যেহেতু রাষ্ট্রশাসন বরবাদ হলে ধনিকশোষণও বরবাদ হবে, সেহেতু নৈরাজ্যবাদী বস্তুত সমাজবাদীও বটে।

শুধু শাসনের অবসান হলেই নিরাজ সমাজ আসবে না। যারা স্বাধীনতা চায়, তাকে যত্ন করে রাখতে পারে, কেবল তাদের জন্যেই নিরাজ সমাজ। বর্বরযুগে যে অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার দাম তারা বুঝত না, তাই তারা তা হারিয়েছে। সেই অন্ধযুগের সমাজ নৈরাজ্যের আদর্শ নয়।

শিকাগো হে-মার্কেটের শহীদরা তাদের আদর্শের জন্যে জীবন দিয়েছে,—তারা নমস্য। কিন্তু তারা ব্যক্তিনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদের পূজারী নয়। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে তারা এক সর্বনিয়ন্তা শ্রমিকতন্ত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যেখানে সবাইকে উৎপাদন ও পণ্যবিনিময় করতে হবে নির্ধারিত ব্যবস্থায়, যে ব্যবস্থা আনবার জন্যে সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে এবং যারা নিজের খুশিমত উৎপাদন ও বিনিময় করতে চায় তাদের দমন করতে হবে। সশস্ত্র বিপ্লবে পরাজয় অবধারিত, তারপর শতাব্দব্যাপী শাসন ও উৎপীড়ন ; আর সফল হলেও তার পরিণতি হবে স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার পথ ধীর, অবিরাম এবং সুনিশ্চিত—তিলে তিলে সরকারের এলাকায় জবরদখল করা, সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়ে নিজেদের অধিকার ঘোষণা করা, এই হল বাস্তব পন্থা।

নৈরাজ্যবাদীরা বৈষ্ণব নয়, নীতিবাগীশ অহিংসও নয়। হিংসা যেখানে কাযকরী সেখানে হিংসা চাই। যখন কথা বলবার অধিকার থাকবে না, যখন সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হবে, তখন অবশ্যই বোমা ও ডাইনামাইট দরকার হবে। কারণ তখন কোন শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম সম্ভব হবে না। অন্যথায় সন্ত্রাসনীতি হবে আত্মঘাতী। ষড়যন্ত্র, রক্তারক্তি, জিঘাংসা ইত্যাদি যে ক্লেদ-গ্লানি নিয়ে আসবে তা থেকে সমাজকে বাঁচানো যাবে না।

মুক্ত সমাজে পৌঁছবার দুটি উপায় আছে—একটি মিলনাত্মক আর একটি বিরোধাত্মক। মিলনাত্মক কাজ হল ব্যয়ের সমান মূল্য ধরে উৎপাদন ও বিতরণ চালাবার সমিতি গড়া, সমবায় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক ও বীমা সমিতি গঠন করা ইত্যাদি। এর দৃষ্টান্ত ওয়ায়েনের 'সময়ভাণ্ডার', প্রুদঁর 'বিনিময় ব্যাঙ্ক'।

বিরোধাত্মক উপায় হল—খাজনা দেওয়া বন্ধ করা, আইন অমান্য করা, সরকারী কর্মচারীদের একঘরে করা, পুলিশ ও সেনার জুলুমকে শান্তিপূর্ণভাবে বাধা দেওয়া এবং দলে দলে জেলে যাওয়া। খাজনা বন্ধ হল মোক্ষম অস্ত্র। সরকার যদি অনাদায়ী খাজনা মাপ করে দেয় তা হলে খাজনা না-দেনেওলাদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে ; আর যদি জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করতে যায় তবে তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়বে। যদি এক-পঞ্চমাংশ লোক খাজনা বন্ধ করে তবে বাকি চার-পঞ্চমাংশের খাজনায় খেলাপীদের খাজনা আদায়ের খরচ উঠবে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধে কেমন কাজ হয় তা দেখিয়েছে আয়র্ল্যাণ্ডের ল্যাণ্ড লীগ। ইংল্যাণ্ডের শাসনের বিরুদ্ধে পার্নেল আইরিশ চাষীদের নিয়ে এই কৌশলে লড়াই করেছিলেন। এ ব্যর্থ হবার কারণ আইরিশ নেতাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য – চাষীদের করমুক্তি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাই রাজনৈতিক সুবিধার লোভে তারা যুদ্ধ সম্বরণ করলেন।

> "আজকালকার সামরিক শৃঙ্খলার দিনে এই একমাত্র প্রতিরোধ যাহাতে কোন কাজ হইতে পারে। সভ্যজগতের যাবতীয় স্বেচ্ছাচারী শাসক বরং সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অবতারণা করিবে কিন্তু তাহাকে অমান্য করিতে বদ্ধপরিকর একদল প্রজার সম্মুখীন হইতে চাহিবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহ অনায়াসে দমন করা যায়। কিন্তু যে নিরুপদ্রব লোকেরা রাস্তায় জড় হয় না পর্যন্ত, কেবল ঘরে বসিয়া আপন আপন অধিকার রক্ষা করে তাহাদের উপর গুলি চালাইবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোন সেনাবাহিনীর নাই।" (৪১৩)

ক্ষমতা বেঁচে থাকে পরের স্বত্ব গ্রাস করে। শিকার যখন নিজের স্বত্ব আগলে দাঁড়ায় তখন ক্ষমতার মৃত্যু অবধারিত। মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, ভোট দিয়ে, কিংবা গুলি করে ক্ষমতাকে বধ করা যায় না, বধ করবার একমাত্র উপায় অনাহার। খাদ্য না জুটলেই সে মরবে। সরকারকে খাজনা না দিয়ে

স্বেচ্ছাসমিতিকে চাঁদা দাও। সরকারী মুদ্রা না ছুঁয়ে নিজের মুদ্রায় বেচাকেনা কর, নিজেরা সমিতি গড়ে ব্যাঙ্ক বীমা খোল, সরকার আপনিই খতম হবে।

টাকারের নৈরাজ্যবাদ প্রুদঁ ও স্টার্নারের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। প্রুদঁ থেকে তিনি নিয়েছেন স্বাধীন সমিতি দ্বারা লোককর্ম পরিচালনার পদ্ধতি, স্টার্নারের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিবাদ।

> "নৈরাজ্যবাদীরা শুধু প্রয়োজনসর্বস্ব নয়, তাহারা পুরামাত্রায় আত্মম্ভরীও বটে। মৌলিক অধিকারের মাত্রা জোর। যে কোন ব্যক্তি, তাহার নাম বিল সাইক্‌স্ কিংবা আলেকজাণ্ডার রোমানফ যাই হোক না কেন, কিংবা একদল লোক তাহারা চীনের ডাকাত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস যাই হোক না কেন, যদি তাহাদের অপরকে বধ করিবার বা বশ করিবার, কিংবা সারা দুনিয়াটা দখল করিবার শক্তি থাকে তবে সে অধিকারও তাহাদের আছে। সমাজের ব্যক্তিকে দাস বানাইবার অধিকার এবং ব্যক্তির সমাজকে দাস বানাইবার অধিকার সমান নয় তার কারণ তাহাদের শক্তি সমান নয়।" (২৪)

টাকারের দুর্বলতা এইখানে। প্রয়োজন বোধ ও অহঙ্কার রাষ্ট্রের বিকল্প জনশক্তি গড়ে তুলবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একচেটে অধিকার তুলে দিয়ে সকলকে জমিজমা ও মূলধন খাটাবার অধিকার দিলেই আর্থিক বৈষম্য মিটে যাবে এ কল্পনা অবাস্তব। সরকার ও ধনতন্ত্রের এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সমদর্শী অর্থসংগঠন গড়ে তোলা যে সম্ভব নয়, ওয়েনের নিউ লানার্কের কারখানা, ওয়ারেনের সময় ভাণ্ডার প্রুদঁর বিনিময় ব্যাঙ্ক তার প্রমাণ। টাকারের সার্থক অবদান নিরুপদ্রব প্রতিরোধের কৌশল। তাঁর এই অবদান টলস্টয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। গান্ধীর হাতে এ কৌশল পরীক্ষিত হয়েছে। এজন্যে নৈরাজ্যবাদের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়।

শতাব্দীর অষ্টম দশকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে পটপরিবর্তন হচ্ছিল। ধনতন্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছিল শ্রমিক আন্দোলন। বাঘের পিছনে ফেউর মত ধনতন্ত্রের পিছনে ছোটে বাজারমন্দা ও আর্থিক সঙ্কট, তার ঘা এসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর, তাদের বিক্ষোভ বেড়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটা অংশ ছিল বিদেশী—বিশেষ করে

জার্মান। এরা ছিল বনেদি আমেরিকানদের চেয়ে উগ্র। দুই শ্রেণীর দুটি সংস্থা ছিল—নরমদের সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি, গরমদের রিভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি। শেষেরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮১ সালে। এর নেতা ছিলেন এলবার্ট পারসনস ও অগাস্ট স্পাইস। এঁরা শিকাগোতে এক সম্মেলন করে প্রস্তাব নিলেন যে শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র দিতে হবে এবং তাদের অধিকারের ওপর হামলা হলে তারা বন্দুক চালাতে কসুর করবে না। ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির বিপাকের চাপে দলে দলে শ্রমিক নরম দল ছেড়ে এসে গরম দলে ভিড়তে লাগল।

এমন সময়ে আসরে একটি ব্যক্তির আবির্ভাব হল যাঁর মাথায় রামরাজ্যের কল্পনা ও প্রতিশোধের উত্তেজনা একসঙ্গে দানা বেঁধেছিল। 'নূতন পৃথিবীতে ইনিই হলেন বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের প্রবর্তক, জোহান মোস্ট, জাতিতে জার্মান। ১৮৪৬ সালে অগ্‌স্‌বার্গে তাঁর জন্ম হয়। অতি দুঃখের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এবং অস্ত্রোপচারে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে যায়। বই বাঁধাইর কাজ শিখে তিনি পাঁচ বছর মধ্য-ইয়োরোপে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বিকৃত চেহারার অভিশাপ। মানবজাতির ওপর বিদ্বেষে মন ভরে গেল তা সত্ত্বেও রয়ে গেল অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা। সামান্য শিক্ষায় যতদূর সম্ভব তিনি পড়াশুনা করলেন এবং কার্ল-মার্ক্‌স্‌ এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে যোগ দিলেন। শীঘ্রই আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর খ্যাতিলাভ হল এবং কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করে তিনি নেতৃত্বের পর্যায়ে উঠলেন।

১৮৭৯ সালে মোস্ট জার্মানী থেকে পালিয়ে এলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে "ফ্রাইহাইট" (স্বাধীনতা) নামে একটি পত্রিকা বের করে তিনি গোপনে জার্মানীতে প্রচার করতে লাগলেন। এর সুর ছিল অত্যন্ত চড়া এবং হিংসাত্মক। এই সুর ছিল জার্মান দলের নীতিবিরুদ্ধ, ফলে তিনি আন্তর্জাতিক থেকে বিতাড়িত হলেন। আর একবার জেল খেটে মোস্ট এলেন নিউ ইয়র্কে (১৮৮২) এবং বিপ্লবী সমাজবাদী দলে ভিড়ে পড়লেন। এরা তাঁর মত নৈরাজ্যবাদী ছিল না। তবে এরাও ছিল তাঁর মত ভোটতন্ত্রে অবিশ্বাসী ও হিংসায় আস্থাবান। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে পিট স্‌বার্গে উভয় পক্ষ একসঙ্গে সম্মেলন করে একটি শ্রমিক ফেডারেশন গঠন করল। ফেডারেশন শ্রমিকদের আহ্বান করল অস্ত্র ধারণ করতে। কারণ, 'কেবল

মজুরির লড়াই দিয়ে কিস্তিমাত করা যাবে না, সুতরাং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলিতারিয়দের সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিতে বাধ্য।'

সংগঠন বাড়তে লাগল দ্রুত। দু' বৎসরের মধ্যে এর সভ্য হল সাত আট হাজার। এদের অধিকাংশ জার্মান, বেশ কিছু অন্যান্য ইয়োরোপীয়, অল্প কিছু আমেরিকান। ফ্রাইহাইট ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল—এখন নিউ ইয়র্ক থেকে বেরুতে লাগল। এ ছাড়া "আরবাইটার সাইটুং" বা শ্রমিক সমাচার নামে একটি জার্মান দৈনিক এবং এলবার্ট পার্সনস-এর সম্পাদনায় "এলার্ম" নামে একটি ইংরাজী দৈনিক শিকাগো থেকে বেরুতে লাগল। ফ্রাইহাইটে মোস্ট খোলাখুলিভাবে সন্ত্রাসনীতি সমর্থন করতে লাগলেন। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয় এবং শ্রেণীযুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হয় তার পাঠও এতে থাকত। এরপর তিনি "রিভ্যলিউশিয়নের ক্রিগ্‌স্‌ভিসেনশাফ্‌ট্‌" (বিপ্লবী সমরবিজ্ঞান) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এতে শুধু বিস্ফোরক বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ ছিল না, কেমন করে এগুলো সংগ্রহ করতে হবে, কেমন করে টাকা জোগাড় হবে—চুরি জোচ্চুরি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়, অদৃশ্য কালি প্রস্তুত করা, বড়লোকদের ভোজসভায় খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া, আগুন লাগাবার জন্যে প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ব্যবহার ইত্যাদি বহু তথ্যের ফিরিস্তি ছিল। শেষের প্রক্রিয়ায় নিজেদের দোকান ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মোস্টের অনেক শিষ্য অগ্নিবীমা কোম্পানীর টাকা মারতে লাগল। এ ছাড়া অন্যান্য চোর গুণ্ডারাও মোস্টের সমরবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছিল। মোস্ট এদের সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। সহিংস ও গর্হিত কর্মের স্তুতিতে তিনি গুরু বাকুনিনকে ছাড়িয়ে গেলেন।

১৮৮৬ সালে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম থেকে এল আট ঘণ্টা কাজের দাবি। অতলান্ত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ধর্মঘটে মেতে উঠল। উত্তেজনা চণ্ড মূর্তি ধরল শিকাগো শহরে। ম্যাককর্মিক শস্যকাটার কারখানায় মজুরদের দশ ঘণ্টা খাটানো হচ্ছে শুনে পয়লা মে একদল ধর্মঘটী সেখানে হামলা করল। পুলিশ গুলি চালিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। একজন শ্রমিক প্রাণ হারাল। চৌঠা মে র‍্যানডল্‌ফ্‌ স্ট্রীটে হে-মার্কেট স্কোয়ারে জমল প্রতিবাদ সভা—বক্তৃতায় আগুন ছুটল। কিছুক্ষণ পরে এল পুলিশবাহিনী, আদেশ হল সভা ভাঙতে হবে। জবাবে একটি বোমা এসে পড়ল তাদের মধ্যে। পুলিশের একজন এবং জনতার কয়েকজন ধরাশায়ী

হল। তখন দুপক্ষই রিভলভার টেনে বের করল, গুলিবৃষ্টি হল এক পশলা। পুলিশের পক্ষে মরল সাতজন, আহত হল জনা পঁচিশ। অপর পক্ষে হতাহতের সংখ্যা জানা যায় না, অনুমান জন পঞ্চাশ।

কে যে প্রথম বোমাটা ফেলেছিল তা আজও কেউ জানে না। অথচ হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সভার বক্তারা, তার মধ্যে এলবার্ট পার্সনস ও অগাস্ট স্পাইস। এঁদের নিয়ে সাতজন আসামীর হল প্রাণদণ্ড, একজনের পনের বছর কারাদণ্ড। মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করে তাঁবেদার জুরী বসিয়ে অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। রাষ্ট্র ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে আসামীদের মতবাদ হল অপরাধ প্রতিষ্ঠার মস্ত বড় নজির। একজন তার জবানীতে বলেছিল,

> "আমি এদেশে পনের বৎসর বাস করিয়াছি এবং এখানকার ভোটপ্রথা এবং প্রশাসনিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি, দেখিয়াছি যে শাসনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কোন নীতির বালাই নাই। ধনী ও দরিদ্র সমান অধিকারসম্পন্ন বলিয়া আমার যেটুকু বিশ্বাস ছিল আমার এদেশের অভিজ্ঞতা তাহা মুছিয়া দিয়াছে। আমলা পুলিশ ও সিপাহীদের কীর্তিকলাপ আমার মনে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে এই অবস্থা আর বেশীদিন চলিতে পারে না।"

এই জাতীয় নির্ভীক্ স্বীকারোক্তি এবং নৈরাজ্যবাদী পত্রিকার বিস্ফোরক-শাস্ত্র হত্যার অপরাধ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হল। সুপ্রীম কোর্টের আপীলে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রইল। ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর সাতজনের ফাঁসি হল। সাত বৎসর পরে যখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়েছে তখন তদন্ত করে জানা গেল যে ঐ আটজনের একজনও হত্যার অপরাধে দণ্ডনীয় ছিল না।

সে যাহোক, শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাসে পয়লা মে'র স্মৃতি রক্ত ও আগুন দিয়ে চিহ্নিত হয়ে রইল।

এর পর থেকে ইয়োরোপের মত আমেরিকাতেও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন হিংসা ও সন্ত্রাসের কুটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। ১৮৯২ সালে পেনসিলভেনিয়ার হোমস্টেডে কার্নেগী ইস্পাত কোম্পানীর কারখানায় শ্রমিক ও সান্ত্রীদের মধ্যে একটা লড়াই হয়ে গেল। দু'পক্ষেই যখন বেশ কিছু হতাহত হয়েছে তখন এল জঙ্গী পুলিশ, শ্রমিকরা যুদ্ধে পরাস্ত হল। কিন্তু তার আগে আলেকজাণ্ডার বার্কম্যান নামে একজন তরুণ এনার্কিস্ট জেনারেল

ম্যানেজার হেনরি ফ্রিক-এর অফিসে ঢুকে তাঁকে গুলি করলেন। ফ্রিক সেরে উঠলেন। বার্কম্যানের ষোল বছর কারাদণ্ড হল।

১৯০১ সালে রাষ্ট্রপতি উইলিয়ম ম্যাকিনলে সেয়ন চলগশ নামে একজন পোল আমেরিকানের হাতে নিহত হলেন। চলগশ নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য ও ডাইনামাইট শাস্ত্র থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী চক্রের মাতব্বররা তাকে পাত্তা দিত না। তার সততার ওপরেও কটাক্ষ করা হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে নিজের সততা ও যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যেই সে বেচারা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার পরীক্ষায় নেমেছিল।

আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের তখন শেষ দশা। মোস্টের তখন বয়স হয়েছে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তিনি বার্কম্যানের কাজের স্তুতি করলেন না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিষ্যা এমা গোল্ডম্যান গুরুকে ত্যাগ করলেন। দলে ভাঙন ধরল। এদিকে তখন সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর আসর পড়ছে—আই. ডব্লিউ ডব্লিউ গড়ে উঠছে, তাতে তৈরী হচ্ছে স্বর্গরাজ্যের যাত্রাপথ আর সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে পাইকারি প্রতিহিংসার বন্দোবস্ত। শহীদ হয়ে কল্পনায় আত্মতুষ্টি লাভের চেয়ে ধনিককে ধনেপ্রাণে মারবার এই নতুন কল অনেক শ্রেয়। আমেরিকার শ্রমিক ঝুঁকল এই নতুন রাস্তায়।

১৩। সমীক্ষণ

ই ভি. জেংকার তাঁর "নৈরাজ্যবাদ" নামক ঐতিহাসিক সমালোচনা গ্রন্থের উপসংহারে রায় দিয়েছেন :

> "মানুষের কল্পনায় যত রকমের বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম গুরুতর বিভ্রান্তি নৈরাজ্যবাদ। কারণ ইহা এমন সব প্রত্যয় লইয়া এমন সব মীমাংসার দিকে চলিয়াছে যাহা মানব-প্রকৃতির ও জীবনসত্যের পরিপন্থী।[১]"

একাধিক মরমী ঐতিহাসিকের হাতে সমাজবাদের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নৈরাজ্যবাদের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা আজ পর্যন্ত হয়নি। এর সমঝদার-নিরপেক্ষ আলোচনা একান্ত দুর্লভ। পল এল্‌শ্‌বাশের তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে সপ্তরথীর রচনাবলী থেকে বহুল উদ্ধৃতি দিয়ে একটা পক্ষপাতহীন

১ ডের এনার্কিজমাস, জেনা, ১৮৯৫।

বর্ণনা দিয়েছেন বটে কিন্তু এমন একটা ধরাবাঁধা ছকের মধ্যে এঁদের ফেলেছেন যে মানুষগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় না।[২] ভিজেটেলীর পুস্তক শতকান্ত-কালের গুপ্তহত্যার একটি ফিরিস্তি।[৩] ইনি বলতে চান নৈরাজ্যবাদীরা স্বভাবে ও চরিত্রে আততায়ী। নৈরাজ্যবাদের বিচার বিশ্লেষণ নানা জনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করেছেন—কারও নিন্দাবাদ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, কেহ বা একে বিদ্রূপের অম্লরসে সিঞ্চিত করেছেন। প্রতিবাদীদের মধ্যে দুইজনের বিচার বিশেষভাবে বিচার্য,—একজন মার্ক্‌স্‌বাদী জর্জ প্লেখানভ্‌, অপরজন ফেবিয়ানপন্থী জর্জ বার্নার্ড শ'।

প্লেখানভের সমালোচনা দার্শনিক পদবাচ্য নয়।[৪] মার্ক্‌স্‌বাদের নিয়মে দর্শনের বিতর্ক শ্রেণীযুদ্ধের আওতায় পড়ে, সুতরাং মার্কসীয় শব্দকোষে যত প্রকারের কটুকাটব্য আছে তার কোনটি ইনি বাদ দেননি। প্রুধঁ চরমপন্থা ও নরমপন্থার মধ্যে দোদুল্যমান একটি পাতি বুর্জোয়া, 'আঙুলের ডগা পর্যন্ত অবাস্তবমতি।'

> "স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে ও রবার্ট ওয়েন হইতে যাহা তাঁহার স্বতন্ত্র তাহা হইল মনের চরম সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা, যাবতীয় বিপ্লবী ভাবনা ও আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ।" (৭৩)

প্রুধঁর অপরাধ তিনি বলেছিলেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের (১৮৪৮) ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল কাল পূর্ণ হবার আগে, সুতরাং এর ব্যর্থতা অবধারিত। সরকার অথবা সংবিধানের পরিবর্তনকে প্রুধঁ বিপ্লব বলে মনে করতেন না, আর সেইটেই ছিল ফেব্রুয়ারীর বিপ্লবীদের লক্ষ্য। শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্যে রাষ্ট্র অথবা শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি আপত্তি করেন নি। অথচ এই আপত্তিই তাঁর মুখে চাপিয়ে প্লেখানভ বলছেন,

> "প্রত্যেকটি শ্রেণী সংগ্রাম রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রাম। রাষ্ট্রবিরোধী সংগ্রামে

২ ডের এনার্কিজমাস, ১৯০০। এতে আছে গডউইন, প্রুধঁ, স্টার্নার বাকুনিন, ক্রপটকিন, টাকার ও টলস্টয় থেকে বহুল উদ্ধৃতি। ক্রপটকিনের "নৈরাজ্যবাদী নীতিধর্ম" শীর্ষক পুস্তিকা এর আগে প্রকাশিত হয়েছে অথচ বইটিতে ক্রপটকিনের নৈতিক মতবাদের কোন উল্লেখ নেই।

৩ ই. এ ভিজেটেলী : দি এনার্কিস্টস্‌, দেয়ার ফেথ এণ্ড দেয়ার রেকর্ড, লণ্ডন, ১৯১১।

৪ সোসিয়েলিজমাস্‌ আণ্ড এনার্কিজমাস, বার্লিন, ১৮৯৪। অনুবাদ, এলিয়ানর মার্ক্‌স্‌ এভেলিং, শিকাগো, ১৯০৭।

> বাধা দিলে তাহা দ্বারা শ্রেণী-সংগ্রামকেই সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হয়।" (৬২-৬৩)

প্রুধঁ, তথা নৈরাজ্যবাদীরা এর একটিতেও বাধা দেননি। পার্লামেণ্টি প্রথার যে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তাতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন কারণ তাঁরা মনে করেন পার্লামেণ্টের কায়দাকানুন বুর্জোয়াদের একটা ফাঁদ। মার্কসীয় প্রথার যে বৈপ্লবিক রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তাতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন কারণ তাঁরা মনে করেন গোটা শ্রমিকশ্রেণী কখনো একটা সরকারের কাজ চালাতে পারে না, সুতরাং এতে অল্প গুটিকতক লোক হাতে ক্ষমতা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নামে একটা স্বৈরতন্ত্র চালাবে। প্লেখানভ এই আশঙ্কা খণ্ডন করেন নি।

বাকুনিন ও তাঁর সমধর্মীরা পার্লামেণ্টি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন কারণ আইনসভার আবহাওয়ায় শ্রমিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের শ্রেণীচেতনা হারিয়ে ফেলে, তারা বুর্জোয়া আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পার্লামেণ্টের বুর্জোয়া পরিবেশ প্লেখানভের কাছেও খুব উপাদেয় নয়। তবে তাঁর বিশ্বাস এই পরিবেশ বদলাবে।

> "নির্বাচকদের পরিবেশ, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় দলের পরিবেশ, যাহারা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত এবং নিজ লক্ষ্যে সচেতন, তাহার কোন প্রভাব কি নিঃস্বদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর পড়িবে না?" (৯৯)

এই সম্ভাবনা প্রাক্‌বিপ্লব না বিপ্লবোত্তর কালের তা ঠিক স্পষ্ট নয়। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর কি ঘটবে তার নিশানা মার্ক্‌স্ নিজেই পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। বুর্জোয়াদের শক্তি নষ্ট করে, তাদের বিত্ত দখল করে শ্রমিকরাষ্ট্র শ্রেণীভেদ দূর করবে, তারপর ক্রমশ রাষ্ট্র অব্যবহারে ক্ষয় হয়ে যাবে। নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রনাশা কার্যকলাপের প্রতিবাদে প্লেখানভ অন্যত্র এই মার্ক্‌সীয় পন্থার অবতারণা করেছেন। এই নূতন পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধির কোন জায়গা নেই। যখন রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র দল করায়ত্ত করেছে, যখন সংবিধানে দ্বিতীয় কোন দল মঞ্জুর নয়, যখন নির্বাচন হবে সরকারের তৈরী প্রার্থীতালিকার ভেতর থেকে, তখনকার সে বিধিব্যবস্থাকে প্রুধঁ ও বাকুনিন ঠিক গণতান্ত্রিক বিধান বলে বুঝতে পারেন নি।

তবে সম্ভবত প্লেখানভ বিপ্লবোত্তর কালের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য করেন নি। তিনি বিশ্বাস রাখেন যে বুর্জোয়া পরিবেশের মধ্যেও শ্রমিকরা নির্বাচন ও

পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে। এ আশা হয়ত বা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু যে জার্মান সমাজবাদী দলকে দৃষ্টান্ত খাড়া করে তিনি এই কর্মকৌশলের সুপারিশ করেছিলেন তারা বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তিকেই প্রমাণ করে দিয়েছিল।[৫]

সম্পত্তিপ্রথা উচ্ছেদ করতে হলে রাষ্ট্রবল চাই,—বিপ্লব করে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এর প্রত্যাবর্তন রুখতে হলে উদ্যত শাসনদণ্ডের প্রয়োজন। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার্য। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের একমাত্র রক্ষাকবচ সমাজের সহযোগী বিবেকবুদ্ধি। তা বিপ্লব দিয়ে গড়া যায় না। মার্কস্‌বাদীদের পন্থাও যে কতদূর কার্যকরী তাতে সন্দেহ আছে। তারা একতান্ত্রিক সরকারের হাত দিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে চায়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক অনির্দিষ্ট কাল অপরিমিত রাষ্ট্রক্ষমতা ভোগ করবে, তারা অপর্যাপ্ত বিত্ত রাষ্ট্রের নামে হরণ করে এক নতুন স্বার্থপর শ্রেণী হয়ে দাঁড়াবে না—তা কে বলবে? ক্ষমতা কারও হাতে কায়েম হয়ে বসলে নানাবিধ স্বার্থ ও সুবিধা সঙ্গে সঙ্গে কায়েম হয়ে বসবে—বাকুনিন ও ক্রুপটকিনের এইটেই ছিল ভয়।

নৈরাজ্যবাদের ধ্যানধারণাগুলিকে যথাসাধ্য বিকৃত করে লেখক বিষোদ্‌গার করেছেন—এর অসারতা অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

> "ব্যক্তির অধিকার নিরঙ্কুশ এই কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নৈরাজ্যবাদী মানুষের কার্যকলাপের বিচার করে। অসীম ব্যক্তিঅধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের নীতিবোধ, সুতরাং চরম বর্বরোচিত দুষ্কর্ম অথবা বীভৎস স্বেচ্ছাচারের উপরেও তাহারা 'নিরপরাধ' রায় দিয়া থাকে।" (১৪০)

ক্রুপটকিন থেকে উদ্ধৃতির ঠিক পরেই এই মন্তব্য। তাঁর "নৈরাজ্যবাদী নীতিধর্ম" ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। প্রুদঁর "চার্চ ও বিপ্লবের ন্যায়ধর্ম প্রসঙ্গে" নামক বিরাট তিন খণ্ডের গ্রন্থও প্লেখানভের চোখে না পড়ার কথা নয়। কিন্তু এই সকল প্রামাণ্য নীতি-গ্রন্থকে এড়িয়ে তিনি সাংবাদিক স্তম্ভের কিছু গরম গরম কথা বেছে নিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের দেখিয়েছেন

৫ প্লেখানভের পক্ষে অবশ্য এতটা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছিলেন ১৮৯৪ সালে, সমাজবাদী দলের ডিগবাজির বিশ বছর আগে।

রক্তপিপাসু গুণ্ডা ও ডাকাতের মত করে যাদের কাছে 'কোন কাজ হিংসাত্মক না হলেই তা আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও সরকারের সঙ্গে আপসপন্থী।' হিংসাত্মক অপকর্মে উসকানি দিয়ে তারা বুর্জোয়াদের হাতে সমাজবাদী আন্দোলন দমন করবার সুযোগ তুলে দিচ্ছে। আসলে বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক সুরে নৈরাজ্যবাদীদের চোর ডাকাত বানিয়ে প্লেখানভ ও তাঁর দলই নৈরাজ্যবাদকে দমন করবার পথ পরিষ্কার করেছিলেন। চরিত্র হননের এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না।

প্লেখানভ নৈরাজ্যবাদকে কতদূর বুঝেছেন তার আর একটি নমুনা—

> "নৈরাজ্যবাদীরা গণতন্ত্রে বাধা দেয়, কারণ তাহাদের মতে গণতন্ত্র সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।" (১৪০)

নৈরাজ্যবাদীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের খুনখারাবি বুর্জোয়াদের দমননীতির অজুহাত দেয় অথচ এই নৈরাজ্যবাদই নাকি একটি বুর্জোয়া মতবাদ!—বুর্জোয়াদের 'লেসে ফের' বা অবাধ উদ্যোগ নীতির রকমফের! শেষে উপসংহারটি হল এই—

> "নৈরাজ্যবাদীরা বিপ্লবের নামে পথ প্রশস্ত করে প্রতিক্রিয়ার, নীতিধর্মের নামে সমর্থন করে চরম গর্হিত কর্ম, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে পদদলিত করে অপরের যা কিছু অধিকার।" (১৪১)

আশ্চর্যের কথা, এমন একটি অসার অবাস্তব মতবাদ এবং এমন কতকগুলো নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক নিয়ে সমালোচক এত সময় নষ্ট করলেন কেন? এর উত্তর—

> "এই যে অতিভোগে অবসন্ন সমাজ যাহার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে, যেখানে সকল বিশ্বাস বহুকাল হয় মরিয়া গিয়াছে, যেখানে সকল অকপট মত হাস্যকর বলিয়া পরিগণিত, এই যে ক্লান্ত পৃথিবী যাহাতে সকল প্রকার ভোগের উপচার ফুরাইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না কোন নূতন খেয়াল নূতন অমিতাচ র অভিনব অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে পারিবে,—সেখানে কিছু লোক আসিয়া এনার্কিস্ট কিন্নরদের কুহক সঙ্গীতে স্বেচ্ছায় কান পাতিয়া দেয়।… ক্ষয়িষ্ণু লেখক ও শিল্পীরা নৈরাজ্যবাদে দীক্ষা লইয়া "ক্রান্সবার্তা", "কলম" ইত্যাদি পত্রিকায় ইহার মন্ত্র প্রচার করে। ইহা জলের মত

পরিষ্কার। সর্বকল বুর্জোয়ার মধ্যে ভোগক্লান্ত যে ফরাসী বুর্জোয়া তাহাদের ভিতর হইতে খাঁটি বুর্জোয়া দর্শন নৈরাজ্যবাদের ধুরন্ধররা বাহির হইয়াছে। ইহা না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা ছিল।" (১৪৪-৪৫)

যে বুর্জোয়া সমাজে মার্ক্‌স্‌-এর সময় থেকে পচন ধরেছিল, প্লেখানভের সময়ে যার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত বিগলিত হয়ে গেছে, আজ পয়ষট্টি বছর পরেও তা বহাল তবিয়তে বর্তমান। একঘেয়ে জীবনযাত্রার বাইরে নূতন উদ্দীপনা আবিষ্কার করতে হলে তার উত্তম ক্ষেত্র কমিউনিজ্‌ম্‌ ও তার আন্দোলন। নৈরাজ্যবাদের চেয়ে এতে উদ্দীপনার রসদ বেশি। বিপ্লবের প্লাবনে সমাজের বহু ময়লা ভেসে ওঠে। কমিউনিস্ট বিপ্লবেও তাই হয়। কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিশেষত্ব শুধু এই যে এতে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজনটা একটু বেশী ব্যাপক এবং বিপ্লবের পরেও বলিদান বন্ধ হয় না।

এই হল প্লেখানভের পরিবেশিত তত্ত্ব যা ইংরাজী অনুবাদিকার মতে 'আমেরিকার প্রত্যেক সমাজবাদী ও শ্রমিক পত্রিকার গায় মোটা হরফে লাল কালিতে লেখা থাকা উচিত।' সত্যই সমালোচনাটি লাল কালিতে লেখা, —খোলাখুলি দলীয় প্রচার। প্রুধঁ ও মার্ক্‌স্‌-এর সময় থেকে শুরু হয়ে যে ঝগড়া পঞ্চাশ বছর গড়িয়েছিল, বইটি তারই একটি অধ্যায়। বইটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'এনার্কিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌'। কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বদলে সোস্যালিজ্‌ম্‌ শব্দ বসিয়ে লেখক একটি চাল চেলেছেন। প্রথমত এর ইঙ্গিত —এনার্কিজ্‌ম্‌ সোস্যালিজ্‌ম্‌ এর বিপরীত, নৈরাজ্যবাদ সমাজবাদী হতে পারে না। দ্বিতীয় ইঙ্গিত যে মার্ক্সীয় সমাজবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ একমাত্র খাটি সমাজবাদ, আর যা কিছু সমাজবাদ সব মেকি। আসল লড়াই যে রাষ্ট্রহীন সমাজবাদ ও রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজবাদের মধ্যে তা তিনি পাশ কাটিয়ে গেছেন। নৈরাজ্যবাদী চায় রাষ্ট্রকে নাশ করতে, কমিউনিস্ট চায় রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করতে। উভয়েরই কর্মের বাহন নিঃস্বরা, লক্ষ্য সমাজতন্ত্র,—ভেদ কেবল কর্মে। বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতাকে নাশ করলে কিংবা দখল করলে পর কোন্ পথে যে মুক্ত সহযোগী সমাজের আবির্ভাব হবে তার নিশানা ইতিহাসে অথবা ন্যায়শাস্ত্রে নেই, আছে কেবল বিপ্লবের রহস্যলোকে। এনার্কিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌ম্‌ দুই ই এক আকাশকুসুমের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তাদের রাস্তা মাটি ছাড়িয়ে আকাশে ওঠেনি।

বার্নার্ড শ'র সমালোচনা গালাগালি নয়, তথ্য ও যুক্তির ওপর নির্ভরশীল।[৬] নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক অপরাধের সম্পর্ক তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন,—

> "এই সকল পত্রিকা (যাহা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ধারক) পড়িলে মনে হয় সকল বিপ্লবীই সমাজবাদী, সকল সমাজবাদীই নৈরাজ্যবাদী এবং সকল নৈরাজ্যবাদীই ঘরজ্বালানি, খুনে এবং চোর। ইহার একটি ফল এই হইয়াছে যে যে-সকল কল্পনাপ্রবণ ফরাসী ও ইটালীয় দুর্বৃত্তরা খবরের কাগজ পড়ে তাহারা খুন করিতে অথবা চুরি করিতে গিয়া হাতে হাতে ধরা পড়িলে কখনো কখনো বলিয়া বসে যে তাহারা নৈরাজ্যবাদী এবং নীতির তাগিদে কুকাজ করিয়াছে। ইহা ছাড়া সকল দেশেই বিক্ষুব্ধ জনসমাজে যে সব লোক একটু বেশী হিংস্র ও বেপরোয়া তাহারা সহজে এনার্কিস্ট নামে আকৃষ্ট হয় কারণ এনার্কিস্ট বলিতেই মনে হয় বর্তমান অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সর্বস্বপণ সংগ্রাম।" (৪)

নৈরাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ, তার সঙ্গে শ'র বিবাদ নেই। বিবাদ উপায় নিয়ে, উপায়গুলো কতদূর কার্যকরী তাই নিয়ে। উপায় সম্পর্কে সকল নৈরাজ্যবাদী একমত নয়। শ' টাকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদ ও ক্রপটনিকের সমাজকেন্দ্রিক নৈরাজ্যবাদকে ধরে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

'দামের পরিমাপক শ্রম'—এডাম স্মিথের এই সূত্র থেকে ওয়ারেন, প্রুদঁ ও মার্ক্স্ সিদ্ধান্ত টেনেছেন, শ্রমের স্বাভাবিক মূল্য তার পয়দা করা মাল। হুইগ দল এর ওপরে তাদের অবাধ অর্থনৈতিক উদ্যোগের নীতিকে দাঁড় করিয়েছে। এই নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতায় টাকারের আপত্তি নেই। তাঁর বিশ্বাস যদি যাবতীয় মৌরুসী স্বত্ব তুলে দেওয়া হয়, যারা জমিতে বাস করে অথবা চাষ করে ভূমিস্বত্ব যদি শুধু তাদের ওপর বর্তায় তাহলে প্রত্যেক শ্রমিককে তার পরিশ্রমের ফলটুকু পুরোমাত্রায় দেবার যে সামাজিক সমস্যা তার সমাধান হবে একটি সোজা উপায়ে—সেটি হল সবাই যার যার নিজের

---

৬ ইম্পসিবিলিটিস অফ এনার্কিজম্, ফেবিয়ান ট্র্যাক্ট্ নং ৪৫, লণ্ডন, ১৮৯৩। এটি ১৮৮৮ সালে লেখা হয় এবং ১৮৯১ সালে একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হয়।

চরকায় তেল দেওয়া। স্বাধীনভাবে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে যার পাওনা রোজগার করে নেবে।

এর মধ্যে একটি মস্ত বড় ফাঁক আছে। শ্রমিকের ঘাড়ের ওপর থেকে মালিকের মুনাফা, খাজনা ইত্যাদি বোঝা যদি তুলে নেওয়া হয় তা'হলেও সে অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার পূর্ণ শ্রমমূল্য আদায় করতে পারবে না। শ্রম ছাড়া আরো কয়েকটি জিনিস আছে যা দ্বারা শ্রমের দাম ঠিক হয়—প্রাকৃতিক সুবিধা, ভৌগোলিক অবস্থান, ইত্যাদি। দুটি গমভাঙ্গা কল, একটির চাকা নদীর ধারায় ঘুরছে, আর একটির নিকটে নদী নেই। তার চাকা ঘুরছে হাতে কিংবা বিদ্যুতে। এ দুটির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সমান নয়।

> "কোন পক্ষ কারও সাহায্য না পাইলে প্রতিযোগীর সহিত সমানে সমানে পাল্লা দেওয়া হয়ত বা সম্ভব। কিন্তু একজনের পক্ষে থাকিবে জল ও বায়ু (কারণ জলচালিত কলের মত বায়ুচালিত কলও আছে) আর একজন খালি হাতে তাহার সঙ্গে পাল্লা দিবে ইহা খাঁটি নৈরাজ্যবাদ হইতে পারে বটে, তবে খাঁটি ন্যায়বিচার অবশ্যই নয়।" (৭)

সব জমির গুণ সমান নয়। চাষী সমান মেহনত করলেও স্থানভেদে ফলন কমবেশি হয়। সবচেয়ে অধম জমির চেয়ে ভাল জমিতে যেটুকু বেশী ফলন হয় সেটুকু বর্তমানে জমিদারের খাজনা, চাষীর কাছ থেকে প্রাপ্য। যদি চাষীকে জমির মালিক করে দেওয়া যায় তা'হলে সেই উদ্বৃত্ত ফলন তার হাতে আসবে, মন্দ ও ভাল জমির চাষীর মধ্যে ফারাক থেকে যাবে।

সুতরাং প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রত্যেককে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে দিলেও সাম্য ও ন্যায়বিচার স্থাপিত হবে না। এই অন্যায় বৈষম্য ব্যক্তিমালিকানা ও অবাধ প্রতিযোগিতায় ক্রমশ বাড়তে থাকবে।

প্রাকৃতিক সুবিধা থেকে যে ধনবৈষম্য আসবে তা টাকার অস্বীকার করেননি। আসলে তাঁর ঝোঁক স্বাধীনতার দিকে যত সাম্যের দিকে তত নয়। তাঁর ধারণা প্রত্যেকে যদি পুরোপুরি তার শ্রমের দাম পায় তা হলে এই সামান্য অসমতা মেনে নেওয়া যেতে পারে—এ থেকে কোন মারাত্মক বৈষম্যের উদ্ভব হবে না। টাকার এখানে ভুল করেছেন। সম্পত্তি বেচাকেনা,

উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগবাটোয়ারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি থেকে ধনবৈষম্য বাড়তে বাড়তে আবার ধনিক-নির্ধনের ব্যবধান সৃষ্টি হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ক্রপটকিনের সমাজধর্মী নৈরাজ্যবাদকে ইংরেজদের বোধগম্য করবার জন্যে বার্নার্ড শ' এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—

> "এমন এক ব্যবস্থা যাহাতে সকলের যা কিছু চাহিদা রাজস্ব হইতে মিটানো হয় এবং রাজস্ব দেওয়া হয় শ্রমে।" (১৩)

. সকলে স্বেচ্ছায় রাজস্ব দেয়, আদায় করবার জন্যে জোরজুলুম নেই। যদি কেউ রাজস্ব না দেয়? ক্রপটকিনের ভরসা জনমতের উপর। কিন্তু জনমত কি অপরাধী ও আদর্শবাদীদের ওপর সমান বিরূপ নয়? জনমত ত' অনেক স্বৈরাচারী রাজাকে পুজো দিয়েছে আর নৈরাজ্যবাদীদের শাপান্ত করেছে।

> "বিনা মেহনতে রুটি রুজির ব্যবস্থা হইলেও খাটিয়া খাইতে হইবে এমন কোন অকপট জনমত নাই। বরং ঠিক তাহার বিপরীত। বরং জনমত ইহাই শিখিয়াছে যে দৈনন্দিন কায়িক শ্রম ছোট-লোকদের কাজ। কিছু সম্পত্তি জুটাইয়া কাজ ছাড়িয়া বসিয়া খাওয়াই হইল সাধারণ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা।" (১৪)

মানুষের মধ্যে এই যে সমাজবিমুখী স্বার্থপরতা তার জন্যে ক্রপটকিন বর্তমান দূষিত ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এই সমাজব্যবস্থা দূর হলে লোকের স্বাভাবিক শ্রমবৃত্তি জেগে উঠবে, সে আর অন্যের ঘাড়ে চেপে অলসভাবে খেতে পরতে চাইবে না। তাই যদি হবে তা হলে আদিম যুগে যখন সবাই খেটে খেত তা থেকে সম্পত্তিপ্রথার উদ্ভব হল কেমন করে?

> "মানুষকে একটি স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত মনে করিয়া কোন লাভ নাই। সর্তহীন চূড়ান্ত ভালমন্দর রায় যদি ভুল বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানুষ সম্বন্ধে বরং এই ধারণাই হইবে যে সে একটি একগুঁয়ে স্বার্থপর শয়তান যে প্রকৃতির কঠোর শাসনে ধীরে ধীরে বুঝিতে বাধ্য হইতেছে যে তাহার প্রতিবেশীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অবহেলা করিয়া সে নিজেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে।" (১৫)

বর্তমান ব্যবস্থায় যারা স্বার্থসিদ্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তারা বিনা পরিশ্রমে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারলেও পরিশ্রম করবে এ সম্ভাবনা কম।

নিরাজ সমাজেও তারা এ সুযোগ ছাড়বে না। সে অবস্থায় খয়রাতি ভাণ্ডারগুলি কয়দিনেই লালবাতি জ্বালবে আর নিরাজ সমাজ সমাধিস্থ হবে। সুতরাং দুটির একটি জিনিস দরকার,—হয় বাইরের চাপ, বাধ্যতামূলক শ্রম, নয়ত'-বা গভীর সামাজিক ন্যায়বোধ। পরের বস্তুটি অকস্মাৎ লভ্য নয়, দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাস করলে পর আয়ত্ত হতে পারে। মোটামুটি এই হল ক্রপটকিন প্রসঙ্গে শ'র বিচার।

মানুষ প্রকৃতির শিকলে বাঁধা শয়তান না রক্তমাংসে কলঙ্কিত দেবদূত এ বিতর্কের শেষ নেই। তবে তার মনে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে সে কথা ক্রপটকিন ও নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া আরো অনেকে স্বীকার করেন। এই জৈব বৃত্তিগুলো বর্তমান অসম ব্যবস্থায় চাপা পড়ে আছে। ক্রপটকিন বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের ধাক্কায় এই অবশ বৃত্তিগুলো জেগে উঠবে। এটা কিছু অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার নয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এমন 'অলৌকিক' ব্যাপার ঘটতে দেখা গেছে—যখন অভিজাতদের মধ্যে জমিদারী স্বত্ব ত্যাগ করবার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। দরকার হল বিপ্লবের বান নেমে যাবার পরেও এই নৈতিক উচ্ছ্বাসকে জীইয়ে রাখা। সকল বিপ্লববাদীর মত ক্রপটকিনও একটু বেশী আশাবাদী ছিলেন, একটু বেশী স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তিনি ভোলেননি যে নতুন নৈতিক অভ্যাস আয়ত্ত না হলে নিরাজ সমাজ টিকবে না, ভোলেননি যে শ্রমিক সংগঠনের ভেতর দিয়ে যৌথ দায়িত্বের চেতনা বিপ্লবসাধনের আগেই জাগিয়ে তুলতে হবে। রুশ বিপ্লবের পরে তিনি এও বুঝেছিলেন যে এ তপস্যা দীর্ঘকালের, ধৈর্য ও নিষ্ঠায় তপঃকাল পূর্ণ হলে তবেই আসবে আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব।

টাকারের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে যে আয়বৈষম্য দেখা দেয় ক্রপটকিনের সমাজকেন্দ্রিক ব্যবস্থায়ও তা একেবারে দূর হয় না। শ' দেখাচ্ছেন যে-সকল বস্তুর চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি সেগুলি যাদের ভোগে লাগবে তারা বঞ্চিতদের চেয়ে ভাগ্যবান হবে। ঈস্ট এণ্ডের বাড়ির চেয়ে রিজেণ্ট পার্কের বাড়ি লোভনীয়, অথচ রিজেণ্ট পার্কে সকলের জায়গা হবে না। পাড়াগাঁয়ের বাড়ি আর লণ্ডনের বাড়ি সমান নয়। দেশসুদ্ধ লোক এসে লণ্ডনে ভিড় করবে তাও সম্ভব নয়। কিছু লোকের কপালে জুটবে লণ্ডন এবং রিজেণ্ট পার্কে বসবাসের

সুবিধা। তার দরুণ কিছু বেশী কাজ তাদের কাছ থেকে আদায় করা খুবই ন্যায়সঙ্গত।

এগুলি ছোটখাট ব্যাপার। এমন কোন মোক্ষম দাওয়াই নেই যাতে দেখতে দেখতে সব রোগ সেরে যাবে। তবে ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদে এ ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। শ্রম ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বাধামুক্ত হলে ঘর-বাড়ির ও শ্রম পরিবেশের অনেক উন্নতি হবে—রিজেন্ট পার্ক ও ঈস্ট এণ্ডের তারতম্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও মজুরের কারখানা এ দু-এর তফাত অনেক কমে যাবে।

শ'র সমাধান কম্যুউনিজম্ ও এনার্কিজম্ এর মধ্যপন্থা। আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে জবরদস্তি যৌথকরণ আমাদের সহ্য হবে না। আমাদের এমন সততা নেই যে নিঃশাসন স্বেচ্ছা-উদ্যোগে সমাজের উৎপাদন ও ভোগে সামঞ্জস্য ঘটতে পারে। দু-এর মাঝামাঝি রাস্তা সমাজবাদী গণতন্ত্র একমাত্র চলনীয় রাস্তা। নৈরাজ্যবাদীরা এ রাস্তার ধার ধারে না কারণ তাদের মতে গণতন্ত্র অল্পের উপরে বহুর শাসন। শ' তাঁর জবাবে ঠিকই বলেছেন যে এ শাসন অব্যর্থ, এ গণতন্ত্রের দেওয়া নয়, নৈরাজ্যবাদ একে কেড়ে নিতেও পারে না। অল্পের ওপর বহুর অধিকার সোজা অঙ্কের হিসেব—'দুজন ব্যক্তি একজনের অপেক্ষা বলবান, এই মাত্র।'

গণতন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত নালিশ টাকারের, ক্রপটকিনের নয়। ক্রপটকিন পার্লামেন্টি গণতন্ত্র চান না কারণ তাতে লোকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আসলে নৈরাজ্যবাদীরা খাঁটি গণতন্ত্রই চায়। টাকারও বলেছেন—'তারা নির্ভীক জেফারসনীয় গণতান্ত্রিক মাত্র।' স্বেচ্ছায় গড়া জনসংহতি যখন নিজেদের খুশিমত নিজেদের কাজ চালাবে তার চেয়ে ভাল গণতন্ত্র আর কি হতে পারে? শ'র সমাজবাদী গণতন্ত্র যদি তার বিকেন্দ্রণের পথে অগ্রসর হতে থাকে তা হলে পরিণামে তা নিরাজ ব্যবস্থায় এসে পৌছবে। গণতন্ত্র মানে যদি লোকরাজ হয় তা হলে তার সঙ্গে নৈরাজ্যবাদের বিবাদ নেই।

ক্রপটকিনের মুক্ত সমাজের প্রতিরূপ বিদ্বৎসমাজ, বণিকসঙ্ঘ, শিল্পিগোষ্ঠী ইত্যাদি যাতে যে যার রুচি ও আগ্রহ অনুসারে স্বেচ্ছায় এসে মিলিত হয়। শ' মন্তব্য করছেন—

> "এই সংস্থাগুলির প্রত্যেকটিতে অধিকাংশ সভ্যের ভোট অনুসারে বৎসরের মিয়াদে একটি কর্মপরিষদ নির্বাচিত হয়, এই কর্মপরিষদের

হাতে সংস্থার শাসনভার ন্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রপটকিন সংখ্যাধিক্যের ক্ষমতা ও গণতান্ত্রিক বিধানে আদৌ ভয় পান বলিয়া মনে হয় না।" (২২)

শ' খেয়াল করেননি যে দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে। স্বাধীন সমিতিতে সভ্যদের ওপর কর্মপরিষদ কোন জোর খাটাতে পারে না। বনিবনা না হলে যে কেউ সমিতি ছেড়ে দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশাসনে এ অধিকার নাগরিকের নেই। ব্যক্তি-অধিকার সুরক্ষিত করবার পক্ষে গণতান্ত্রিক নির্বাচন যথেষ্ট নয়।

সমাজে যদি পরস্পর সহনশীলতা না থাকে, যদি সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের পীড়ন করে তা'হলে রাজশাসন তুলে দিয়ে তার সুরাহা হবে এ ভরসা শ' রাখেন না।

> "শীতকালের ঠাণ্ডা জলহাওয়ার মত অসহনীয়তা আমাদের বহু অনিষ্ট করে। আমরা ওভারকোট চাপাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, আগুন জ্বালাইয়া যতদূর পারি শীতকষ্ট নিবারণ করি, বাকিটুকু সহ্য করি। তেমন গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রণ ইত্যাদি দ্বারা শাসনকার্যকে যথাসাধ্য সংযত করিবার পরও আমাদের রাষ্ট্রকে সহ্য করিতে হইবে।" (২৩)

প্রুদঁ, বাকুনিন ও ক্রপটকিন বৈধানিক গণতন্ত্রের যে আসল গলদটি তুলে ধরেছিলেন সে সম্বন্ধে শ' উচ্চবাচ্য করেননি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের রাজত্ব কেবল আনুষ্ঠানিক আকারে, বাস্তবে নয়, যে গণতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসে না, তাদের মধ্যে যে দু'চারজন ভোট পেয়ে পার্লামেণ্টে যায় বুর্জোয়া আবহাওয়ায় পড়ে তাদের মেজাজ বদলে যায়, মজুরদের সঙ্গে তাদের আর যোগাযোগ থাকে না এবং তারা হয়ে বসে কর্তা, মুরুব্বি। আর একটি দিকে শ' ও ফেবিয়ানদের নজর পড়েনি। পার্লামেণ্টের বিধান জনস্বার্থে প্রযুক্ত হতে পারে না যদি না তার পিছনে সক্রিয় জনশক্তির চাপ থাকে। যদি জনসাধারণের এই সামাজিক শক্তি না থাকে তা হলে শাসকশ্রেণী তাদের স্বার্থে ঘা লাগা মাত্র পার্লামেণ্টের বিধিব্যবস্থাকে বরবাদ করতে কসুর করে না। ১৯৫৩ সালে তিনটি অনগ্রসর মহাদেশে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। আফ্রিকার ব্রিটিশ গায়নায় ডক্টর জগনের সরকার জনভোটে নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ প্ল্যাণ্টারদের কায়েমী স্বার্থে হাত দেওয়া

মাত্রই জগন সরকার বিতাড়িত হলেন। দক্ষিণ আমেরিকার গুয়াতেমালার জনপ্রিয় আরবন্‌স্‌ মন্ত্রিসভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফলব্যবসায়ীদের স্বার্থহানিকর ভূমিবন্দোবস্ত চালু করতে গিয়ে বিদেশী ফৌজের তাড়নায় গদিচ্যুত হলেন। পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল হক ও যুক্ত ফ্রণ্ট সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করে ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে নতুন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্ব আর পাক-আমেরিকান সামরিক চুক্তি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে গেলেন অমনি তাঁদের আসন ছাড়তে হল, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর লাটসাহেবের শাসন চেপে বসল। এই তিন জায়গাতেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা গদি থেকে সোজা গিয়েছেন জেলখানায় কিংবা নির্বাসনে। সম্প্রতি নেপালেও তাই ঘটেছে।

ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি জনশক্তি গড়ে তুলেছিল। পার্লামেন্টি বিধানের ওপর এদের সজাগ দৃষ্টি ও তৎপরতা এবং ইংরেজদের একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও অভ্যাস ছিল বলে সেখানে সমাজবাদী গণতন্ত্র কতকটা সফল হতে পেরেছে। কিন্তু বার্নার্ড শ'র রচনার পর শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে নয়, ইয়োরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশেও সচেতন জনশক্তির অভাবে সমাজবাদী গণতন্ত্রের পরাজয় হয়েছে। নৈরাজ্যবাদেরও গলদ ঐ জায়গায়। এর প্রচারকরা অতিদার্শনিক। বৈধানিক গণতন্ত্র অথবা স্বেচ্ছাসমিতি যে কোন কাঠামোতে সমাজসাম্যকে বাঁধতে হলে তার পিছনে একটা লোকবল গড়ে তোলা দরকার। সিণ্ডিক্যালিস্টরা ছাড়া আর কেউ তা গড়বার মত কার্যক্রম দিতে পারেননি।

বারট্রাণ্ড রাসেলের সমালোচনা সংযত ও দরদী।[৭] নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসাত্মক কার্যকলাপের যে সম্বন্ধ তিনি দেখিয়েছেন তাতে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আছে।

> "সাধারণ লোকে এনার্কিস্ট বলিতে বোঝে এমন ব্যক্তি যাহার মস্তিষ্ক অল্পবিস্তর বিকৃত বলিয়া অথবা যে তাহার অপরাধপ্রবণতাকে উগ্র রাষ্ট্রমতের আবরণে ঢাকিতে চায় বলিয়া বোমা ছোড়ে কিংবা অন্ত কোন নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসে। এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়।

৭ রোড্‌স্‌ টু ফ্রীডম, এলেন এণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৫৪।

কোন কোন নৈরাজ্যবাদী বোমা ছোড়ায় বিশ্বাস করে, অনেকে করে না। অন্যান্য মতাবলম্বীরাও অবস্থাবিশেষে বোমা ছোড়ায় বিশ্বাস করে,—যথা, যাহারা সেরাজিভোতে বোমা ছুড়িয়া বর্তমান যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহারা ছিল জাতীয়তাবাদী,[৮] নৈরাজ্যবাদী নয়। যে সকল নৈরাজ্যবাদী বোমাছোড়ার সমর্থন করে এ বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে অন্যদের কোন মৌলিক নীতিগত পার্থক্য নাই—অবশ্য যে নগণ্য কয়েকজন টলস্টয়ের মত নির্বিরোধী শান্তির পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের কথা আলাদা। সমাজবাদীদের মত নৈরাজ্যবাদীরাও শ্রেণী-সংগ্রামের মত পোষণ করে। সরকার যেমন যুদ্ধ চালাইবার জন্য বোমা ব্যবহার করে তাহারাও তাই করে। তবে নৈরাজ্যবাদী যেখানে একটি বোমা তৈয়ার করে সেখানে সরকার করে লক্ষ লক্ষ, নৈরাজ্যবাদীর হিংসায় যেখানে একটি লোক নিহত হয় সেখানে সরকারী হিংসায় মরে লক্ষ লক্ষ। সুতরাং যে হিংসার প্রশ্নটি সাধারণের কল্পনা জুড়িয়া বসিয়া আছে তাহা আমরা আমাদের মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি কারণ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে হিংসার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই।” (৪৯-৫০)

তবুও নৈরাজ্যবাদের গায় হিংসার অপবাদ লেগেছে তার একটা কারণ আছে।

“আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বভাবত সর্বস্বীকৃত নৈতিক বাঁধনগুলি শিথিল করিয়া দেয়। যাহারা গভীর মানবপ্রেমে অনুপ্রাণিত তাহারা এই ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারে। অন্যদের মধ্যে ইহার ফলে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার বৃত্তি জাগিয়া ওঠে যাহা হইতে কোন মঙ্গল সাধিত হয় না।” (৬৬)

আধপাগল ও অপরাধীদের মধ্যে বেশকিছু লোক যে নৈরাজ্যবাদের দিকে

৮ ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড ও যুবরাণী সেরাজিভোর পথে নিহত হন। আততায়ীরা ছিল বসনিয়ার স্বাধীনতাকামী সার্ব। সার্বিয়ার সরকার হত্যাকাণ্ডে প্রশ্রয় দিয়েছে এইরূপ অভিযোগ করে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে এক চরমপত্র দেয়। এ থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত।

আতঙ্কই মূল এইটেই তার কারণ,—যদিও এই দুর্ভাবনা দিয়ে নৈরাজ্যবাদের বিচার করা অন্যায়।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র যে এক নতুন ধরণের স্বৈরতন্ত্র খাড়া করবে নৈরাজ্যবাদীদের এ আশঙ্কার ভাগীদার রাসেলও। উপরতলায় আমলাদের মত এতে এক সরকারী কুলীন জাত তৈরি হবে যারা নির্ভুল সবজান্তা, যারা ভাববে সমাজের ভালমন্দ তারা ছাড়া আর কেউ বোঝে না, তাদের পরিচালিত বিলিব্যবস্থা অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়।

কিন্তু রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থায় যেসব বিপদ আসতে পারে সেদিকে নৈরাজ্যবাদীদের খেয়াল নেই। ব্যক্তি সম্পত্তি উঠে গেলে চুরিচামারি কমবে বটে কিন্তু একেবারে যাবে না। জাদুঘর ও কলাভবন থেকে কিংবা দুষ্প্রাপ্য ব্যবহার্য বস্তুর সাধারণ ভাণ্ডার থেকে চুরির ভয় থাকবে। যৌন অপরাধ বন্ধ হবে না। বিদ্বেষ ও ঈর্ষাজনিত অপরাধ দূর হবে না। আইনের বিচার ও আদালতের শাস্তির পরিবর্তে অপরাধ শাসন করবে জনরোষ—সুস্থ মনে ধীরভাবে নয়, ঝোঁকের মাথায়। আইনের বিচারের চেয়ে সে বিচার উত্তম নয়। নানাভাবে স্বৈরাচারের আবির্ভাব হওয়াও খুব সম্ভব। কোন ক্ষমতালোভী ব্যক্তি যদি কিছু লোক জড় করে একটা স্বেচ্ছাবাহিনী তৈরি করে নিজের মতলবে কাজে লাগায়, কোন দাম্ভিক লোক যদি নেপোলিয়নের মত নাগরিকদের ওপর প্রভু হয়ে বসে তা আটকাবার কোন উপায় নেই। মানুষের মন লোভী, স্বার্থসন্ধী, ঝগড়াটে। নৈরাজ্যবাদ মানবচরিত্র বদলাবে কেমন করে? কায়েমী স্বার্থ চলে গেলে শত্রুতা দূর হবে এমন আশা করা ভুল। অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের দেশে এশিয়ানদের আগমন ও বসবাস বন্ধ করে দিয়েছে আর জাপান তার বাড়তি মানুষের উপনিবেশের জন্যে জায়গা খুঁজছে। দুই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও এই স্বার্থের দ্বন্দ্ব যাবে না।

> "পিপীলিকাদের মত পুরাদস্তুর সমাজবাদী কোন জাতির হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি কোন পিপীলিকা ভুল করিয়া পার্শ্ববর্তী ঢিপি হইতে তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহাকে তাহারা মারিয়া ফেলে। মানুষে মানুষে যেখানে কৌমব্যবধান বিস্তর—যেমন শ্বেত ও পীত মানুষে, সেখানে এ ব্যাপারে মানুষ ও পিপীলিকার প্রবৃত্তিতে বেশী তফাত নাই।" (১৫৭)

সুতরাং আইন নেই শাসন নেই এমন একটি নিরাজ সমাজ গড়ে উঠবার

কোন শাসনব্যবস্থা দেখা যাচ্ছেনা এবং গড়ে উঠলেও তার টিকে থাকবার আশা নেই।

নৈরাজ্যবাদীর আশা আর রাসেলের সংশয় দুইই অতিশয়। কেউ ইচ্ছে হলে নিজের তাঁবে একদল ফৌজ গড়ে রাখবে এমন স্বাধীনতা নৈরাজ্যবাদে নেই। নিরাজ সমাজ বিধিব্যবস্থাহীন শূন্যগর্ভ নয়। প্রুদঁ তাঁর "স্বীকারোক্তি" গ্রন্থে যে নকশা দিয়েছেন তাতে শান্তিরক্ষা ও দেশ রক্ষার ভার নিয়েছে স্বেচ্ছায় ও সহযোগিতায় গড়া একটি জনবাহিনী। যার খুশি অস্ত্র রাখতে পারে, খুশি না হলে কেউ গ্রামরক্ষাবাহিনীতে যোগ না দিতে পারে, তা বলে নিশ্চয় সে একটা পাল্টা ফৌজ গড়তে পারবে না। তাকে যদি সেই অপচেষ্টায় বাধা নাও দেওয়া হয় তবু শুধু শুধু লোকে তার সঙ্গে ভিড়বেই বা কেন? রাসেলের আশঙ্কা সমাজতন্ত্রে কৌমবিদ্বেষ দূর হবে না। কিন্তু সমাজতন্ত্র ছাড়াই কি কৌমবিদ্বেষ ক্রমশ দূর হচ্ছে না? পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং এশিয়ার স্বাধীন জাতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ানদের প্রতি ইয়োরোপীয়দের ঘৃণার ভাব কি কমে নি? আফ্রিকায়ও আজ কালো জাতি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারের বর্বর অস্পৃশ্যতানীতি আজ শ্বেত মহলেও ধিক্কৃত। জনমানসে নতুন ভাবনা নতুন চেতনা উদ্রিক্ত হলে তবেই নৈরাজ্যবাদী বিপ্লব সম্ভব, তখন সেই ভাবনা-চেতনা হবে আজকের উপসর্গগুলির প্রতিষেধক।

সমাজবাদ, রাষ্ট্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদের মত নৈরাজ্যবাদেরও রকমফের আছে। সকল নৈরাজ্যবাদী এক ছাঁচে পড়েন না। স্টার্নার, বাকুনিন ও টলস্টয়ের মধ্যে ততখানি ব্যবধান যে ব্যবধান অহংকার, সন্ত্রাস ও শান্তির মধ্যে। তবুও মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নৈরাজ্যবাদী চায় সকল রকমের আধিপত্য থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি, ধনতন্ত্র থেকে শ্রমিকের মুক্তি, চার্চের হাত থেকে বিশ্বাসীর মুক্তি, রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের মুক্তি। আক্রমণ প্রধানত রাষ্ট্রের ওপর কারণ ধনতন্ত্র ও চার্চকেই রাষ্ট্র ধরে রেখেছে। রাষ্ট্র একটি পীড়নযন্ত্র। এই যন্ত্রটি যার আয়ত্ত হয় ক্ষমতার মোহ তাকে পেয়ে বসে। এ দিয়ে কারও কল্যাণ হয় না। মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করে একভাবে যন্ত্রের মত চালাতে এ অভ্যস্ত। এর জায়গায় নৈরাজ্যবাদ আনতে চায় ব্যক্তি ও সমাজ, তাদের বিচিত্র ভাবনা, চেতনা, সৃষ্টিসম্ভাবনা। মুক্ত সমাজের মৌল কেন্দ্র হবে গ্রাম ও কর্মশালা—পরস্পরের প্রয়োজনে এরা মিলবে, বৃহত্তর সার্বজনীন ক্ষেত্রে সমিতি ও সংহতি গড়ে তুলবে, লোককৃত্য পরিচালন করবে। যে কাজ এখন

চলে শাসনে সে কাজ চলবে সহযোগিতায়, যে কাজ এখন চালায় সরকারী আমলা সে কাজ চালাবে নির্বাচিত অভিজ্ঞ লোক। এই হল নৈরাজ্যবাদের প্রধান সূত্র যদিও এর ওপরও সকলে একমত নয়।

চিত্রটি কল্পনার রঙে অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই। বিপ্লবে কিংবা কূটনীতিতে নৈরাজ্যবাদীরা কোথাও বাস্তবতাবোধের পরিচয় দেননি। বিপ্লবের আয়োজন কঠোর শৃঙ্খলা ও শাসনসাপেক্ষ যা নৈরাজ্যবাদে বরদাস্ত হতে পারে না। উদ্দেশ্য ও উপায়ের এই অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবপ্রচেষ্টা পঙ্গু হয়ে গেল। তবু এঁরা একটা মস্ত বড় কাজ করেছেন—এঁরা বহু বদ্ধমূল বিশ্বাসে নাড়া দিয়েছেন, বহু সনাতন সত্যের ওপর সন্দেহের বীজ ছড়িয়েছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও শাসন মানবচরিত্রকে শোধন করেছে না দূষিত করেছে বেশি, সম্পত্তি প্রথায় সাধারণ মানুষের সমৃদ্ধি হয়েছে না দারিদ্র্য বেড়েছে, মানবিক অধিকার রক্ষায় ও ন্যায়বিচারে আইনের অবদান কিছু আছে কি নেই, আইনে অপরাধ কমেছে না বেড়েছে, শান্তি না যুদ্ধ সরকার প্রজাকে কোন্‌টা দিয়েছে বেশি, রাষ্ট্রযন্ত্রে কোথাও কোন মানবিক অনুভূতি আছে কিনা এবং সমাজবাদ ও জনকল্যাণের আদর্শে নিয়োজিত হলেও তার যান্ত্রিক প্রকৃতি যায় কিনা, আর বিপ্লবের দ্বারা একটা নতুন যন্ত্র বসালে তাতে সাম্য স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্র আসতে পারে কিনা—এসকল প্রশ্ন আগে ছিল না। নৈরাজ্যবাদীদের সমাজচিত্র অবাস্তব হতে পারে কিন্তু এ প্রশ্নগুলি উড়িয়ে দেবার নয়।

১৭৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় কনভেন্‌সনের সভায় দাঁড়িয়ে রোব্‌স্‌পীয়ের বলেছিলেন—'স্বাধীনতার বীরপুরুষের হাতে যে তরবারি ঝলকিত হয় তাহা স্বৈরাচারীর হাতের অস্ত্রের মতই। ...বিপ্লবের শাসন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার শাসন।' এই বৈপ্লবিক কূটাভাসেরই প্রতিধ্বনি লেনিনের সর্বহারার গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব, দুই বিশ্বযুদ্ধের 'সমরান্তক সমর'—লড়াই-র অবসান ঘটাবার জন্যে লড়াই। রুশো তাঁর "কঁত্রা সোসিয়াল" পুস্তকে সমীচীন প্রশ্ন করেছেন—'মানুষকে অধীন করে মুক্ত করবার অচিন্তনীয় কায়দাটি কি?'

স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তার অপব্যবহার যাতে না হয় তার জন্যে শাসন চাই,—এই হল রাষ্ট্রের যুক্তি। কিন্তু শাসনেরও অপব্যবহার হয় এবং সেটা আরো খারাপ, সুতরাং একে দূর কর—এই হল নৈরাজ্যের যুক্তি।

দার্শনিক তত্ত্বকথা ছেড়ে যদি ইতিহাসের সাক্ষ্য নিয়ে বিচার করা যায় তাহলে কোন পক্ষে সরাসরি রায় দেওয়া সম্ভব নয়। উদার মুক্তিপরায়ণ

সমাজে সকলের স্বাধীনতা স্বীকৃত, সেখানে স্বাধীনতা পরম সম্পদ। যে সমাজে এ উদারতা নেই সেখানে স্বাধীনতাকে শাসনের ওপর ভর করতে হয়। অনুদার সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রশাসন বিপরীত নয়। একতান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক সরকার জাতির সঙ্কীর্ণতা থেকে ব্যক্তির অধিকারকে মুক্ত করেছে, সামাজিক পীড়ন থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে উদ্ধার করেছে ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কামাল আতাতুর্ক ধর্মীয় শাসন থেকে তুর্কদের মুক্ত করেছিলেন, লালচীন চাষীদের ভূমিদাসত্ব মোচন করেছে, মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা দিয়েছে। ফ্রান্সের পঞ্চম গণতন্ত্র আলজিরিয়ায় ফরাসী অধিবাসীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে ইচ্ছুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রোবিদ্বেষকে আইনের জোরে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য সরকারী উদারতার পিছনে যুগশক্তির তাগিদ থাকে। তবু স্বাধীনতার পথের বাধা সরিয়ে দেবার জন্যে বার বার রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

আর রাষ্ট্রশক্তির বিকল্প যে সকল প্রতিষ্ঠানকে নৈরাজ্যবাদীরা আদর্শ খাড়া করেছেন তাদের ওপর খুব ভরসা রাখা যায় না। এগুলি হল শ্রমিক ইউনিয়ন, পৌরসভা, বণিকসঙ্ঘ এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনসেবার সমিতি। রাষ্ট্রে যে দুর্নীতি ও বিকার দেখা যায়, প্রথম তিনটিও সেই দোষে দুষ্ট কারণ এদের মধ্যেও শাসন ও শোষণের সুযোগ উপস্থিত। জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলিতে সে সুযোগ অনেক কম তাই তাদের মধ্যে স্বাধীনতা ও সহযোগিতার আবহাওয়া একেবারে নষ্ট হয় না।

নিরাজ সমাজ আনবার আগে যে একটা আমূল নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন আছে আদর্শের নেশায় বিভোর হয়ে নৈরাজ্যবাদীরা এই সত্যটির দিকে ফিরে তাকাননি। যে সমাজে কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকবে না, শুধু স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায় সকল কাজ চলবে, সেখানে আগে একটা আধ্যাত্মিক বিবর্তন চাই। বর্তমান সমাজের সর্বাঙ্গ শাসনকর্তৃত্বের অভ্যাসদোষে দূষিত, তার কোথাও ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতীক খুঁজবার চেষ্টা বৃথা। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নেবার আগে ব্যক্তিকে নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে, নতুন ভাবনা ভাবতে হবে, নতুন রুচি জাগাতে হবে। গড্‌উইন ও প্রুদঁ প্রজ্ঞানের ধীরনিশ্চিত অগ্রগতিতে আস্থা রেখেছিলেন। তাঁরা মানুষের আত্মিক-নৈতিক পুনর্গঠনের দিকে মন দেননি।

যে অবস্থায় শাসন ব্যতিরেকে সমাজের কাজ চলতে পারে সেই অবস্থা সৃষ্টি করবার কাজে নৈরাজ্যবাদীরা যেমন অবহেলা করেছেন, তেমন যে অবস্থায় শাসন অবশ্যম্ভাবী তার প্রতিও এঁরা যথেষ্ট সচেতন নন। তাই কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানের ওপর তাঁদের আক্রমণ অতিবিদ্বেষ ও পক্ষপাতে দুষ্ট। রাষ্ট্রের শতসহস্র ছিদ্র তাঁরা দেখিয়েছেন কিন্তু তারও যে একটা সাত্মক ভূমিকা আছে, তাকে সরিয়ে নিলে সমকালের অবস্থা কি হতে পারে তা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। তাই তাঁরা অবাস্তব অত্যাশায় এক রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁরা বোঝেন নি যে ইতিহাসের ধারায় রাষ্ট্র, বিত্ত ও ধর্ম মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যেই এসেছে, তাদের আনুষঙ্গিক কোন কোন প্রতিষ্ঠান এখনও এই সমাধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সকল মানবিক উদ্যমের মত এতেও আছে যথেষ্ট দোষত্রুটি, অপূর্ণতা এবং এজন্যেই এদের পরিবর্তন অত্যাবশ্যক—এদের সরিয়ে কালের উপযোগী বিকল্প ব্যবস্থা আনবার জন্যেই বিপ্লব। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা যখন রাষ্ট্র, বিত্ত ও ধর্মানুষ্ঠানকে সনাতন, পবিত্র ও অনিন্দ্য বলে পুজো করতে বসলেন তখন এঁদের ভুল হল আরো সাংঘাতিক, তখন ইতিহাস দাঁড়াল নৈরাজ্যবাদীর পক্ষে। কিন্তু অতীতকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে না দেখতে পারার ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি হল অস্পষ্ট, নতুন সমাজের চিত্র হল অবাস্তব এবং তাঁদের পথ হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

নৈরাজ্যবাদ কতক মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দাবি করেছে, ভুলে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবার রাস্তা দেখাতে পারে নি। প্রজ্ঞানের ধীর গতি আর বিপ্লবের দ্রুত গতি দুই-ই সমান ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের শক্তি বাড়তে বাড়তে হয়েছে অতিকায় দৈত্যের মত যা ছিল চেঙ্গিজ খাঁ ও নেপোলিয়নের কল্পনার অগোচর।

পাশ্চাত্ত্য জগতে নৈরাজ্যবাদ যখন নিদ্রার আবেশে ম্রিয়মান অথবা বিভীষিকার উত্তেজনায় উন্মত্ত তখন এর পুনরাবির্ভাব হল প্রাচ্যে যেখানে আড়াই হাজার বছর আগে এর জন্ম হয়েছিল। নতুন বিশ্বপরিবেশে প্রাচ্যখণ্ডে উত্থিত হল এক আত্মিক বিদ্রোহের ঘোষণা, বিত্ত ও ক্ষমতার উন্মাদ কামনার বিরুদ্ধে মানবাত্মার সাবধানবাণী। এই নব নৈরাজ্যবাদের ঋত্বিক টলস্টয়, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী।

নাম-সূচী

BIBLIOGRAPHY

I. *The Ancient Age*

1. China—Taoism

Lao Tzu : Tao-te Ching. Tran. The Way and its Power. Aithur Waley. Allen and Unwin, London 1934

Lin Yutang : The Wisdom of China. (Laotse and Chuangtse). London 1944

James Legge : The Texts of Taoism. S. B. E. vols. 39, 40. Oxford 1891

Paul Carus : Laotze's Tao-Teh-King. Chicago 1898

,, The Canon of Reason and Virtue. Chicago 1913

Herbert A Giles : Chuang Tzu, Mystic, Moralist and Social Reformer, 2nd. ed. London 1926

E. D. Thomas : Chinese Political Thought, New York 1927

Fung Yu-lan : The History of Chinese Philosophy, Part I. Tran. D. Boode, Henry Votch. Peiping 1937

Arthur Waley : Three Ways of Thought in Ancient China, London 1939

Joseph Needham : Science and Civilization in China, vol. II. Cambridge 1956

Liang chi-chao : History of Chinese Political Thought. Tian. L. T. Chen. Kegan Paul, London 1930

2. India—Dream of Krita Age

Rig Veda, Sama Veda and Yajur Veda. Tran. R. T. H. Griffith

Rig Veda. Tran. Max Muller and Oldenberg. S. B. E. Nos. 32, 46

The Mahabharata. Tran. P. Roy, Calcutta

Dialogues of the Buddha (Dighanikaya). Tran. T. W. and C. A. F. Rhys Davies

Strabo's Geography. Tran. Hamilton and Falconer

Fragments of Megasthenes, Complied by Schoff. Tian. McCiindle

3. The Levant—Polis vs. Cosmopolis

Plato : Republic. Tran. F. M. Cornford

Aristotle : Politics. Tran. Ernest Barker

Diogenes Laertius : Lives and Opinions of Eminent Philosophers, vol. II. Tran Richard Hicks. London 1925

Heinrich Gomperz : Greek Thinkers. English Translation

Robert Eisler in Encyclopaedia of Social Sciences, *Cynics*

Edwyn Bevan : Stoics and Sceptics. Clarendon Press 1913

G. L. Dickinson : The Greek View of Life. London 1920

II. *The Medieval Period*

4. Christian World : The Kingdom of Heaven

Ernest Barker : From Alexander to Constantine (Passages and Documents) Oxford 1956

E. Vernon Arnold : Roman Stoicism. Cambridge 1911
The Holy Bible. Oxford
St. Augustine : De Civitate Dei
H. L. Mansel : The Gnostic Heresies. London 1875
G. R. S. Mead : Fragments of a Faith Forgotten. London 1900. Revised Edition 1906
J. Watson : The Philosophical Basis of Religion. Glasgow 1907. pp. 248-300
E. F. Scott in Encyclopaedia of Religion and Ethics. *Gnosticism*
Otto Gierke : Political Theories of the Middle Ages. Tran. F. W. Maitland. Cambridge 1951
C. Vogl : Peter Cheltschizki. Zurich 1926
Sebastian Franck : Chronicles
,, : The Book of the Seven Seals
Karl Kautsky : Communism in Central Europe in the time of the Reformation, 1897. Tran. J. L. and E. G. Mulliken, New York 1959
E. Belfort Bax : The Peasants War in Germany, London 1899
,, : Rise and Fall of the Anabaptists, London 1903
Vladimir Nosek : The Spirit of Bohemia, London 1926
E. A. Payne : The Anabaptists of the Sixteenth Century. London 1949
R. Heath : Anabaptism from its Rise at Zwickau to its Fall at Munster, 1521-1536. London 1895
Henry E. Dosher : The Dutch Anabaptism. Philadelphia 1921
Leopold Von Ranke : History of the Reformation in Germany. Tran Sarah Austin. London 1905
Cambridge Modern History. Vol. II. The Reformation 1907
Will Durant : The Reformation. New York 1957
Lindsay : History of the Reformation. Vol. II.

III. The Period of Enlightenment

5. William Godwin :

An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Virtue and Happiness, 2 vols. London 1793. First Edition
Kegan Paul : William Godwin, His Friends and Contemporaries. London 1876
Ford K. Brown : The Life of William Godwin. London 1926
George Woodcock : William Godwin. Porcupine Press. London 1946
H. N. Brailsford : Shelley, Godwin and Their Circle. Home University Library. London 1913
William Hazlitt : The Spirit of the Age (Essay on Godwin). Ed. W. C. Hazlitt. London 1906
F. J. C. Hearnshaw (ed) : Social and Political Ideas of the Revolutionary Era (Essay on Godwin)

6. P. J. Proudhon :

Complete Works in French. 11 vols. Ed. C. C. A. Bougle and Henri Moysset 1923-32

Henri de Lubac : The Un-Marxian Socialist, a Study of Proudhon. 1944. Tran.. New York 1948
Shi Yung Lu : The Political Theories of P. J. Proudhon. New York 1896
Charles A. Dana : Proudhon and His Bank of the People. New York 1896
D. W. Brogan : Proudhon, Hamish Hamilton, London, 1934
George F. Woodcock : Pierre Joseph Proudhon. 1956
Hampden Jackson : Marx, Proudhon and European Socialism. London 1957
Charles Gide and Charles Rist : A History of Economic Doctrines. Second English Edition. Tran. R. Richards. London 1948

7. Max Stirner :

Ego and His Own. Tran. S. T. Byington. New York 1907
John Henry Mackay : Max Stirner, Sein Leben und Sein Werk
Max Adler in Encyclopaedia of Social Sciences. *Stirner, Max*
Sidney Hook : From Hegel to Marx, Victor Gollancz, London 1936

IV. The Period of Revolution

8. Michael Bakunin :

Bakunin's Works. 6 vols. Ed. Max Nettlau and Guillaume, Paris 1895-1913
G. P. Maximoff : Political Philosophy of Bakunin. Free Press. USA. 1953
God and the State. Tran. B. R. Tucker. New York
Confessions. Ed. Max Nettlau
Y. Steklov : Michel Bakunine, ein Lebensbild, Stuttgart 1913
M. Bakunin : Marxism, Freedom and the State. Ed. and Tran. K. J. Kenafick. London
E. H. Carr : Michael Bakunin, London 1937
V. V. Zenkovsky : History of Russian Philosophy. Tran. George L. Kilne. London 1953. Vol. I.
K. J. Kenafick : Michael Bakunin and Karl Marx. Melbourne 1948
Eugene Pyziur : Doctrine of Anarchism of Michael Bakunin. Marquette. Wisconsin 1955
David Hecht : Russian Radicals Look to America. Cambridge 1947
Hans Kohn : Pan-Slavism, its History and Ideology. Notre Dame 1953
Samuel Rezneck : Political and Social Theory of Bakunin. American Political Science Review, 1927, vol. XXI.

9. Nihilism in Russia

A. Herzen : History of Revolutionary Ideas
N. G. Chernyshevski : What is to be Done ?
A. Coquart : Dmitri Pisarev et l'ideologie du nihilisme russe. Paris 1946
Turgeniev : Fathers and Sons
Peter Lavrov : Historical Letters
Stepniak : Nihilism as it is. Tran. London 1894

Stepniak : Underground Russia. Tran. London 1883
Max Nomad : Apostles of Revolution. Boston 1939. Tran. of Revolutionary Catechism in pp. 228f.
Vera Figner : Memoirs of a Revolutionist. Tran. New York 1927
F. Venturi : The Roots of Revolution. Tran. F. Haskell. London 1960
Albert Camus : The Rebel. Tran. Anthony Bower. London 1954
Sir John Maynard : Russia in Flux. London 1941
Hugh Seton-Watson : Decline of Imperial Russia (1853-1914). London 1956
Richard Hare : Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution, London 1959

10. P. A. Kropotkin :

Books and Pamphlets of Kropotkin published by Chapman and Hall, Smith, Elder And Co., and Freedom Press, London and by Putnam's, New York
Kropotkin's Revolutionary Pamphlets. Ed. Roger N. Baldwin. Vanguard Press. New Fork 1927
Robert Read : Kropotkin—Selections from his Writings with Introduction. London 1942
George Woodcock and Ivan Avakumovic : The Anarchist Prince. London 1950
John Hewetson : Mutual Aid and Social Evolution. London
Camillo Berneri : Kropotkin—His Federalist Ideas. London

11. Syndicalism :

F. Pelloutier : L'histoire des Bourses du travail. 1902
G. Sorel : L'avenir socialiste des syndicats 2nd edn. Paris 1901
,, : Les illusions du progres. Paris 1908
,, : Reflexions sur la violence. Paris 1908. Tran. T. E. Hulme. London 1925
H. Lagardelle : Syndicalisme et la confederation generale du travail 1908
Victor Griffuelhes : L'action syndicaliste. Paris 1908
E. Pouget : Le sabotage. 1910
E. Pataud and E. Pouget : Syndicalism and the Cooperative Commonwealth. Tran. Charlotte and Frederic Charles. Oxford 1913
Louis Levine : Syndicalism in France. Columbia University Studies. New York 1914
J. A. Estey : Revolutionary Syndicalism. London 1913
M. Dashar : History of Revolutionary Movement in Spain 1934
P. F. Brissenden : The I. W. W., a Study of American Syndicalism. Columbia University Studies. 2nd edn. New York 1920
J. G. Brooks : American Syndicalism : the I. W. W. Macmillan 1913
Rudolph Rocker : Anarcho-syndicalism. London 1938
Werner Sombart : Sozialismus und soziale bewegung. 9th edn. Jena 1920. Tran. Socialism and the Social Movement. 1909
Pierre Besnard : Les Syndicate ouvriers et la revolution sociale. Paris 1932
T. Mann : Symposium on Syndicalism. London 1910

G. D. H. Cole : Self-Government in Industry. London 1917
,, : Guild Socialism Restated

12. American Anarchism

Josiah Warren :

Josiah Warren : Equitable Commerce. New Harmony 1846. 3rd edn. by Stephen Pearl Andrews, New York 1852
Josiah Warren : True Civilization, Boston 1863
Stephen Pearl Andrews : The Science of Society. 2 vols. New York 1854
William Bailie : Josiah Warren. Boston 1906

Henry David Thoreau :

Writings of Henry David Thoreau. 20 vols. Ed. F. B. Sanborn and B. Terry, New York 1900
H. S. Salt : Life of Henry David Thoreau. London 1896

Benjamin R. Tucker :

W. B. Greene : Mutual Banking. Mass. 1850
W. B. Greene : Socialistic, Communistic, Mutualistic and Financial Fragments. Boston 1875
Lysander Spooner : A Letter to Thomas F. Bayard. Boston 1882
Lysander Spooner : A Letter to Grover Clevelend, Boston 1886
B. R. Tucker : Instead of a Book . . . a Fragmentary Exposition of Philosophical Anarchism New York 1897
Emma Goldman : Anarchism and Other Essays. Freedom Press, London
Alexander Berkman : A. B. C. of Anarchism. Freedom Press, London
,, : Prison Memoirs of an Anarchist, Freedom Press, London
Max Nomad : Apostles of Revolution. Boston 1939. Ch. V.
E. M. Schuster : Native American Anarchism. Northampton, Mass. 1932

Critique :

G. V. Plekhanov : Anarchism and Socialism. Tran. E. M. Aveling. Chicago 1907
G. B. Shaw : Impossibilities of Anarchism. Fabian Tract No. 45. London 1893
B. Russell : Roads to Freedom. Allen and Unwin, London
C. M. Wilson : Anarchism in 'What Socialism is'. Fabian Tract No. 4 London 1886
Elisee Reclus : Evolution, Revolution and the Anarchist Ideal. Paris 1898. Tran. Freedom Press, London
Jean Grave : La societe mourante et l'anarchie. Paris 1895
,, : La societe lendemain de la revolution. Paris 18
E. Malatesta : Anarchy. Tran. Freedom Press. London

श्री

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টির অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ। শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা তত্ত্বকথা, রসবোধ ও বিচার বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। অতিসূক্ষ্ম ও সাধারণের পক্ষে দুরূহ বিষয়গুলি তাঁর অননুকরণীয় বাচনভঙ্গীতে সহজ সরল সরস ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে তাঁর দ্বিমুখী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অধ্যাপকের মত শিক্ষা দান করেন নি, সেকালের ঋষি ও গুরুর মতই দীক্ষা দিয়ে গেছেন শিল্পশাস্ত্রে।

'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা, রূপকলার আলোচনা ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী গ্রন্থ, এবং এ যুগে আমাদের মধ্যে রসবোধের উন্মেষসাধনে অতুলনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বঙ্গসাহিত্যের এটি এক অমূল্য সম্পদ।'

—নন্দলাল বসু

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক যে পড়তে পেলুম তার জন্য 'রূপা কোম্পানী'-কে ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলীর সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষণীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক।...'

[বিষ্ণু দে, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৬৯]

'চিত্রশিল্পে ও কথাশিল্পের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। সেজন্য যাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই রূপতত্ত্ব ও শিল্পের নানা দিকের কথা পড়লে লাভবান হবেন। খুব যত্ন করে ছাপা, সুন্দর একখানি ফোটোগ্রাফসহ কাপড়ে বাঁধাই। দাম খুবই সস্তা।...'

[পরিমল গোস্বামী, যুগান্তর, ৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৯]

দাম : ১২·০০ টাকা

আইনস্টাইন

জীবন-জিজ্ঞাসা

সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

মানুষ আইনস্টাইনের পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। এ যুগের একজন অদ্বিতীয় মানবদরদী মহাপুরুষের মানসলোকের গঠন ও গতিপ্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়েছে এই রচনা-সংকলনে। আইনস্টাইনের জীবিত-কালে তাঁর নিজের তত্ত্বাবধানে এ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার প্রবন্ধা-বলীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর সর্বশেষ রচনাগুলি। এই পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্বে বিশ্বের কোন ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।

বিজ্ঞান-রাজ্যের বিস্ময়, পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্রদের মত কৌতূহলাবৃত অসীম প্রতিভাধর এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার পরিচায়ক এই গ্রন্থ—জীবন জিজ্ঞাসা।

জাতীয় অধ্যাপক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভূমিকায় বলেছেন :

"শ্রীমান শৈলেশ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি আইনস্টাইনের নানাবিধ প্রবন্ধের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছেন এমন কতকগুলি, যাতে আইনস্টাইনের ব্যক্তিত্বে বিজ্ঞান ছাড়া যে একটি বিশেষ দিক ছিল এবং সেটি যে তাঁর মূল অহিংসাবাদ ও শান্তিবাদের যা তিনি বিশ্বাস করেন, তার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। আমি আশা করি যে চিন্তাশীল পাঠক তাঁর দ্বারা অনূদিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের মত একজন বিরাট মানুষের ব্যক্তিত্বের সাহচর্য পাবেন। আমি এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

দাম : ৮·০০ টাকা

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

সংকলক ও অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফ্রান্স—স্বচ্ছ যুক্তি, রুচিস্নিগ্ধ শিল্পীমন, রসগ্রাহী আবেগপ্রবণতার দেশ। আমাদের দেশ সম্বন্ধে সে-দেশের শিক্ষিত জনমনে বহুদিনের কৌতূহল। বিশ্ব-মানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীরা নতুন ক'রে ভালবাসতে শেখেন শাশ্বত এই ভারতবর্ষকে। …প্রথম যে ফরাসী রসিক রবীন্দ্রনাথ প'ড়ে মুগ্ধ হন এই শতকের সূচনায়, তাঁর নাম আজ সকলেই জানে : কবি স্যাঁ-জন্ পার্স। তিনি তৎপর হয়েছিলেন বলেই ফরাসী ভাষায় 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম অনুবাদ করলেন বিখ্যাত কবি আঁদ্রে জিদ্। তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি। তারপর, এই পঞ্চাশ বছরে ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে জানতে চেয়েছে, জেনেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। স্যাঁ-জন্ পার্স, আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু ক'রে হাল আমলের অগণ্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তারই কয়েকটি এখানে সঙ্কলিত হ'ল মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে। সাহিত্যরসিকের কাছে যেমন, তেমনি ঐতিহাসিকের কাছেও অমূল্য অপরিহার্য এই সঙ্কলন।

দাম : ৫'০০ টাকা

বারট্রাণ্ড রাসেল

সুখের সন্ধানে

অনুবাদক : পরিমল গোস্বামী

মানুষের আনন্দের উৎস অংশতঃ অন্তরঙ্গ, আর অংশতঃ বহিরঙ্গ। এই গ্রন্থে সেই অন্তরঙ্গ দিকটাই আলোচিত হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন তা যদি পাওয়া যায়, আর শারীরিক সুস্থতা যদি থাকে তাহলেই প্রতিটি মানুষ সুখী। তবু আনন্দ সুদুর্লভ। কেন? বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে স্বীকৃত বারট্রাণ্ড রাসেল, সেই সমস্যার সমাধান উপস্থাপিত করেছেন, আর মনকে কি ভাবে সঞ্চালিত করলে সুখলাভ সম্ভব তা আলোচনা করেছেন।

'...বিদগ্ধ জনের জন্যে লেখা দুরূহ চিন্তাচ্ছন্ন প্রবন্ধ পুস্তক এটি নয়। যেসব মানসিক অশান্তি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হয় অথচ যা মানুষের জীবনকে অনেক সময় ব্যর্থ পর্যন্ত করে দিতে পারে, সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা এই বাধাসমূহকে সহজেই দূর করা সম্ভব, মাত্র সতেরটি অধ্যায়ে লেখক অতি সুন্দরভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন।...'

(দেশ, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬০)

'এমন একদিন ছিল, প্রয়োজনমত আহার, বাসস্থানের সংস্থান করতে পারলেই মানুষ যখন সুখী হত। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেমন অনেক কিছু পেল তেমনই হারাল তার মানসিক শান্তি অর্থাৎ সুখ। সুখ কী, সুখী হবার কী উপায়, মানুষ অসুখী হয় কেন, এইসব প্রশ্ন মনোবিদদের মত আমাদের মনেও অশান্তি সৃষ্টি করে।...আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব আপাততুচ্ছ অশান্তি মনকে বিষিয়ে তোলে, জীবনকে প্রায় নিরর্থক জ্ঞান করতে প্ররোচনা দেয়, সেগুলি দূর করা শ্রমসাধ্য হলেও যে অসম্ভব নয়, এই গ্রন্থের সতেরটি অধ্যায়ে লেখক তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন।...গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন, "যেসব ব্যবস্থা আমি পাঠকদের উদ্দেশে নিবেদন করলাম, তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমর্থিত এবং নিজে যেখানেই এ ব্যবস্থা অনুসরণ করেছি সেখানেই সুফল পেয়েছি।"...জীবনের উপলব্ধ সত্যকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন বর্তমানকালের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক।...শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর তর্জমা যেমনই স্বচ্ছন্দ, তেমনই সাবলীল। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই।'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৬১)

দাম : ৫·০০ টাকা

বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ইতিহাসের অগ্নিচক্র ঘুরেছে ভারতের উত্তরে আর দক্ষিণে। কিন্তু পূর্ব ভারতের তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বাঙালী। সেই খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত বাঙালী আজ সারা ভারতের সমস্যা। তবুও নতুনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতায়, সমীকরণের অসাধারণ শক্তিতে সে আজো ভাস্বর। তার বর্তমান বিপর্যয় এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। তাই বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আপনার বইখানি পড়িয়া আনন্দিত ও লাভবান হইলাম। আপনি বাঙালীর কথা অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

এই সুন্দর পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তাশীল পাঠকসমাজে ইহার আদর হইবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

খুব ভালো লেগেছে, আগাগোড়া সমান তৃপ্তি পেয়েছি। ছোট্ট বইটিতে আপনি এত কথা কি করে লিখলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। তার চেয়েও অবাক হয়েছি দেশের ইতিহাসে আপনার দৃষ্টি ও অনুরাগের গভীরতা দেখে। এতটা অন্তর্দৃষ্টি আমাদের অনেক পেশাদার ঐতিহাসিকদেরও নেই। আপনার মনন, অধ্যয়ন ও দৃষ্টি সার্থক।

নীহাররঞ্জন রায়

বিভিন্ন আকর হইতে অতি মূল্যবান ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আহরণ করিয়া বাঙালীকে বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার যে চেষ্টা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহা উচ্চ অঙ্গের সংশ্লেষশক্তির পরিচয় বহন করে। মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বই খানির অন্যান্য দেশী ভাষায় অনুবাদ ও বহুল প্রচার কামনা করি।

কালিদাস নাগ

দাম: ৬·০০ টাকা

আমার ঘরের আশেপাশে

ডঃ তারকমোহন দাস

এম.এস-সি., পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন), ডি.আই.সি.

রীডার, কৃষিবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

নিজেদের দেশের ফুলফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। দেশের সম্পূর্ণ পরিচয় আজ শুধু নদনদী ও স্থাপত্য-কীর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে দেশের পশু-পক্ষী ও গাছপালার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও। উদ্ভিদের হাত ধরেই আমরা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধাপগুলি পার হয়ে এসেছি। ইতিহাসের পাতা ওলটালে তাই দেখা যায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছে বৃক্ষদেবতা। যে সব আমাদের দেশের নিজস্ব গাছপালা তাদের অতুলনীয় রূপ, রস ও সৌরভের সঙ্গে আমাদের রুচি ও রসবোধ কতো নিবিড়-ভাবে জড়িত ছিল তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায় আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। এই সব দেশজ গাছপালা, আমাদের মাটির সঙ্গে যাদের হাজার হাজার বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা আজও পথে-প্রান্তরে জীবনের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে দিগন্ত রঙীন করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নির্লিপ্ত দৃষ্টির সম্মুখেই।—কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? আমাদের জাতীয়-মানস ও ভাবধারার সঙ্গে কোথায় তাদের সংযোগ?—সেই কাহিনী পরিবেশনই এই বইএর মূল লক্ষ্য।

দাম : ৫·০০ টাকা

শৈলপুরী কুমায়ুন

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কুমায়ুন পর্বতমালার কয়েকটি মনোরম শৈলাবাসকে কেন্দ্র করে এই ভ্রমণ-কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। শৈলনন্দিনী নৈনীতাল, রূপবতী রাণীক্ষেত, আনন্দতীর্থ আলমোড়া আর কাব্যভূমি কৌসানী এই ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। গিরি, নদী, অরণ্য আর মানুষ এই রচনায় বিরাজ করছে একাত্ম মহিমায়। যে-কোনো ভ্রমণ-রসপিপাসুর কাছে এই গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে তথ্য আর আনন্দের অফুরান উৎস বলে গণ্য হবে।

'ভ্রমণকাহিনীতে পায়ের চলাটাই ত সব নয়, মনের চলাটাই আসল। শুধু ঘর ছেড়ে বার হওয়া নয়, বাইরেকে ঘর করার মত অন্তরের ঐশ্বর্য ও সহানুভূতির তীক্ষ্ণতাও চাই। প্রতি মুহূর্তে বাইরের সবকিছু রঙ ও রস ধরবার মত সজাগ মনের চোখ মেলে রাখতে না পারলে বিশ্বভুবন ঘুরেও কিছুই মেলবার নয়। সেই মন যতখানি সজাগ, সজীব, সত্যাশ্রয়ী ও গভীর, ভ্রমণকাহিনীও ততখানি সার্থক। 'শৈলপুরী কুমায়ুন' এমনি একটি সার্থক ভ্রমণকাহিনী।....'শৈলপুরী কুমায়ুন' লেখক একবারই গেছলেন, কিন্তু এ কাহিনীতে তাঁর সঙ্গে বার বার সেখানে গিয়েও পাঠকের আশ মিটবে না, এটুকুও অন্ততঃ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দাম : ৫·০০ টাকা

এই লেখকের

বসন্ত বিলাপ [কাব্য নাটিকা] ৪·০০